কি মায়াদয়া থাকে? জগতে সমস্ত কঠিন বস্তুর দৃষ্টান্তই পাষাণ। পাষাণে ঘাস জন্মে না, বৃক্ষ জন্মে না, জলবিন্দুও থাকে না।”

“থাকে না? পাষাণে জলবিন্দু থাকে না?—সমস্ত নদনদীর উৎপত্তি-স্থান পাষাণ।”

“তাহাতে কি বুঝিব?”

“আর কিছু বুঝিতে পারিস আর না পারিস, মনে করিয়া দেখ, একটী ছোট কথা। পর্ব্বতনন্দিনী ভাগীরথী গঙ্গা।”

“আমার অপরাধ হইয়াছে। সকল অপরাধের ক্ষমা আছে,—হৃদয়েশ্বরি! আমার এই সামান্য অপরাধের কি ক্ষমা নাই?”

“কথায় কথায় কথা বাড়িয়া যাইতেছে। তোর মত নীচাত্মার সঙ্গে আমি আর বাগ্‌বিতণ্ডা করিতে ইচ্ছা করি না। যে ধামে গমন করিতে-ছিলাম, সেই ধামে, সেই নিত্যধামে—সেই শান্তিধামে প্রস্থান করি। এ জন্মে আর ফিরিয়া আসিব না। মহাপ্রস্থান। আমি পাষাণী, ধূমে প্রাণ গেল না, পাষাণশিখর হইতে ভূতলে পতিত হইয়া দেহ চূর্ণ করিব, পাষাণতল হইতে আমার জীবাত্মা আকাশে সেই শান্তিনিকেতনে উড়িয়া যাইবে।”

এই শেষ বাক্যটী উচ্চারণ করিয়া, বিবশা, বিষাদিনী রমণী যেন উন্মাদিনীর ন্যায় চপলাবেগে গৃহ হইতে ছুটিয়া বহির্গত হইলেন। কৃষ্ণবর্ণ এলো কেশ পৃষ্ঠদেশে যমুনাতরঙ্গের মত তরঙ্গিত হইয়া বামে দক্ষিণে হেলিতে দুলিতে লাগিল। মন উদাস, নাসারন্ধ্রে ঘন ঘন সুদীর্ঘ শ্বাস প্রশ্বাস, উভয় হস্ত একত্রসম্বদ্ধ, চরণ অস্থির, চক্ষু উন্মীলিত, কর্ণ যেন বধির।

কামিনী ছুটিলেন। নীরবে ছুটিলেন না, একটী গান গাইতে গাইতে ছুটিয়া চলিলেন।

মহেশ্বরি!—

কোথা যাইতেছি আমি অনন্ত আকাশে,
দেহি মা অনন্ত বল অবলা হৃদয়ে!

পক্ষ নাই, তবু যেন উড়িবারে পারি,
সংসারে আমার আর মায়াদয়া নাই,
জীবনেতে হইয়াছে বিড়ম্বনা জ্ঞান,
আশা-চপলারে আমি খেদায়েছি দূরে।
ভালবাসি? এ কি লজ্জা! আর বাসিব না!
যাতনা পাবার যত, সব পাইয়াছি,
ভুগিয়াছি শত শত সংসারের ফল।
সাক্ষাতে প্রত্যক্ষে মম নয়নসমীপে—
এসেছিল মহাপাপী দংশিতে আমায়।
আর কি সে মন আছে? যে মনে তখন—
হয়েছিল অকস্মাৎ সত্য ভালবাসা।
ফুরায়ে গিয়াছে সব! সত্য ভালবাসা—
আর পাইবে না স্থান এ পোড়া হৃদয়ে!

গীত গাইতে গাইতে কামিনী ছুটিতেছেন। সঙ্গে সঙ্গে সেই পরপ্রণয়ী বিশ্বাসঘাতক পুরুষ। এলোকেশীর দৃষ্টি পশ্চাতে নাই, বামে নাই, দক্ষিণে নাই, সম্মুখেও নাই। দৃষ্টি গগনে। উৰ্দ্ধ দৃষ্টি হইলেই ভবজীবের মৃত্যুর লক্ষণ জানা যায়। কিন্তু উৰ্দ্ধদৃষ্টি হয় কখন? সুখের সময়। জগতে যাঁহারা সুখ অনুভব করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, তাঁহারা সাক্ষ্য দিবেন, পরম সুখেই উৰ্দ্ধনেত্র, শিবনেত্র। শিবের নাম ত্রিলোচন। সদাশিবের তিনটী চক্ষু। কি কি নাম? চন্দ্র, সূর্য্য, বহ্নি। সৰ্ব্বক্ষণই ত্রিলোচনের ত্রিলোচন অৰ্দ্ধনিমীলিত, ঢুলু ঢুলু। কিন্তু কি নিমিত্ত? সদানন্দ সদা সুখী, সেই কারণেই তাঁহার একটী নাম আশুতোষ। আশুতোষের উপযুক্ত নাম সদানন্দ। সদানন্দ সৰ্ব্বদা ঢুলু ঢুলু নেত্রে বিরাজ করেন। আমাদের দেশের মূর্খ পণ্ডিতেরা সেই নিমিত্ত তাঁহাকে সিদ্ধিপানে উন্মত্ত বলিয়া অপবাদ দেন। অপবাদ বলা হইল কেন? ভক্তেরা ভাং ধুতুরা দিয়া

শিবের পূজা করেন; সেটী অর্চ্চনার অঙ্গ।—যেটী আরাধনার অঙ্গ, সামান্য বুদ্ধিতে সেটী অপবাদের অঙ্গ হইতে পারে না। বিষম ভ্রম। সে ভ্রম তোমার আমার হইতে পারে, কিন্তু জগৎকে যাঁহারা প্রতারণা করিতে জানেন না, ঋষি নামে যাঁহারা পরিচয় দেন, সেই সকল ঋষিদেরই বেশী ভুল। প্রণয়ের কথা বলিতে বলিতে আমরা শাস্ত্রের কথা, ঋষির কথা আকর্ষণ করিতেছি কেন? তাহার একটী মূল কারণ আছে। নিত্যবস্তু প্রণয় ছাড়া জগতে আর কিছুই নাই। ত্রিজগতে সেই বস্তুই;—সেই বিশুদ্ধ প্রণয়-বস্তুই চিরনিত্য, আর সমস্তই অনিত্য। শিব যাহা জানিয়াছেন, জীব তাহার অনুকরণ করে, কিন্তু সমন্বয় দেখাইতে পারে না। মহাদেব মহা-যোগী। একজন শাস্ত্রকর্ত্তা তাঁহাকে বৃষারূঢ় বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। সেই প্রমাণে দেশের কুম্ভকারেরা শিবের নীচে একটী ষাঁড় গড়িয়া দেয়, চিত্র-করেরা এক একটী ষাঁড় আঁকিয়া রাখে। এ ভ্রম কাহার?—ঋষির। মহা-দেব মহাযোগী;—তিনি বৃষাসনে বসিয়া যোগ সাধন করেন, জগতে সেই বৃষাসনের পরিবর্ত্তে প্রকাণ্ড শৃঙ্গবিশিষ্ট প্রকাণ্ড এক ষাঁড়। প্রজাপতি ব্রহ্মা একজন মহাযোগী, তিনি হংসাসন করিয়া যোগ সাধন করেন, প্রসিদ্ধি হইয়াছে, ব্রহ্মা একটা হাঁসে চড়িয়া স্থানে স্থানে পরিভ্রমণ করিতেন। যোগাসনের নাম হংস, মূর্ত্তি পূজার সময় দেখা যায়, দিব্য একটী রাজহাঁস! এ ভ্রম আমাদের নয়,—ঋষির। অপ্রাসঙ্গিক হইলেও বৈকুণ্ঠপতি বিষ্ণুকে এই স্থানে আকর্ষণ করিতে হইল। তিনিও মহাযোগী। তাঁহার যোগা-সন গরুড়াসন। সেই সূত্র হইতে ত্রিলোকপতি নারায়ণকে গরুড়বাহন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হইতেছে। গরুড়পক্ষী তাঁহাকে পৃষ্ঠে করিয়া দেশ দেশান্তরে উড়িয়া বেড়ায়। এ কথার মাহাত্ম্যকে নমস্কার! যাঁহারা ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাঁহাদিগকেও শত নমস্কার! জগৎসংসার অন্ধকারে রহিয়াছে, সত্ত্বরজস্তমোগুণে যিনি, অথবা যাঁহারা সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ের কর্ত্তা তাঁহারা যে, ষাঁড়ে চড়িয়া, হাঁসে চড়িয়া অথবা গরুড়ে চড়িয়া খেলা করিয়া বেড়ান, এ কথায় যাহাদের বিশ্বাস হয়, তাঁহাদের তুল্য সুপণ্ডিত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সুদুর্ল্লভ!

প্রসঙ্গ ত্যাগ করিয়া অনেক দূর আসা হইয়াছে। সুখের সময় মানুষ

শিবনেত্র হয়, জগতের জীবের মৃত্যুই পরমসুখ, এই কথা সপ্রমাণ করিবার নিমিত্তই মৃত্যুকালে ক্ষণবিনশ্বর জীবকুলের চক্ষু ঊর্দ্ধ দিকে উত্থিত হইয়া থাকে। যে কামিনী ছুটিতেছেন, তাঁহারও চক্ষু ঊর্দ্ধ দিকে। পশ্চাতে একজন লোক আসিতেছে, ভ্রূক্ষেপ নাই।

অতর্কিতভাবে সেই অনুগামী লোক চীৎকারস্বরে কহিল, "জীবিতেশ্বরি! কোথায় যাও?"

আকাশে অকস্মাৎ অশনিধ্বনি হইলে জগতের জীবসংসার যেমন ভয়-চকিত হইয়া অন্য দিকে মুখ ফিরায়, বিজন পথবাহিনী কামিনীও সেইরূপ পশ্চাৎদিকে মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন, সেই লোক। ঘৃণায় যুগল হস্তে নয়ন আবরণ করিয়া স্বগতবাক্যে মৃদুস্বরে কহিলেন—

যারে হেরিব না বলি প্রতিজ্ঞা করেছি।
যার তরে এ সংসারে উদাসী হয়েছি॥
যার তরে চলিয়াছি অন্তিম প্রস্থানে।
এ কি বিড়ম্বনা! এবে সে কেন এখানে?

কে কোন্ দিক দিয়া কোথায় চলিয়া গেল, কেহই কিছু নিরাকরণ করিতে পারিল না। বনপথে নিশাভাগে যে কামিনী একাকিনী বহির্গত, সে কামিনী মানবী। আকাশের সৌদামিনী আকাশে একবার হাসিয়া নেত্র পালটিতে তৎক্ষণাৎ অমনি মেঘের কোলে লুকাইয়া যায়। কুহকিনী ডাকিনী যোগিনীরা দেখিতে দেখিতে বাতাসের সঙ্গে মিলাইয়া যায়। পুরাণশাস্ত্রের দেবতার ও মুনিঋষির অন্তর্দ্ধানের মত সংসারের মায়াবী মায়াবিনীরা ভোজবাজীর পুতুল হইয়া মরিচবিহীন কর্পূরের মত উড়িয়া যায়। সত্য মিথ্যা কে জানে? শুনা কথা, প্রবাদবাক্য। কিন্তু এ কামিনী মানবী, কিরূপে কোন্ দিক দিয়া কোথায় উবিয়া গেল, কিছুই জানা গেল না। যে লোক সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছিল, আশ্বাসে হতাশ্বাস হইয়া সেই বা কোথায় গেল, তাহাও দেখা গেল না। পথ অন্ধকার, নক্ষত্রেরা হাসিয়া উঠিল। মেঘের আড়ালে চাঁদ একটু লুকাইলেন, অল্পক্ষণ পরেই পুনর্ব্বার সুপ্রকাশ। ক্ষণস্থায়ী বিরহ।—বিরহান্তে তারামালার সহিত তারানাথের

পুনরায় মিলন। কিন্তু তাহারা যে কে কোথায় গেল, পুনর্ম্মিলন হইবে কি না, পুনর্ম্মিলনের আশা রহিল কি না, এ প্রশ্নের উত্তর এখন ভবিষ্যতের গর্ভে।

পঞ্চত্রিংশ প্রবাহ।

কারে তুমি চাও?

আঁখি মেলি দেখিতেছ, দেখিতে কি পাও?
প্রাণ খুলে বল দেখি, কারে তুমি চাও?

আর্য্যরত্ন।

একটী পান্থশালা। বৈশাখ মাস। সন্ধ্যা হইতে দুই চারি দণ্ড বিলম্ব। প্রচণ্ড সূর্য্য আপনার তেজে জগৎকে দগ্ধ করিয়া আপনিও বিদগ্ধ হইয়াছেন। যে কেহ অপরকে দগ্ধ করে, সে কি নিজে দগ্ধ হয় না? অবশ্য হয়। শীঘ্র কিম্বা বিলম্বে। দেশে একটী গীত আছে, "মনে দুঃখ দিলে পরে প্রাণে দুঃখ পেতে হয়।" সূর্য্য সে নবলোকের কথা গ্রাহ্য করেন না। তিনি সকলকে সন্তপ্ত করিয়া আপনি জুড়াইবার জন্য শেষের শীতল শৈলে বিশ্রামার্থ গমন করিলেন, বিশ্বসংসার অন্ধকার হইল। যাহারা পুড়িয়াছিল, সূর্য্যকে বিদায় দিয়া তাহারা শীতল হইবার জন্য সন্ধ্যার অন্ধকার সলিলে স্নান করিল। অন্ধকার জলে অবগাহন। হিন্দু দেশ, হিন্দু ধর্ম্ম, ঘরে ঘরে শঙ্খঘণ্টা বাজিল, দেবদেবীর আরতি হইয়া গেল। দূর হইতে পবন আসিয়া চামর বীজন করিলেন। পৃথিবী শান্ত। একটী মন্ত্র আছে।

"অগ্নি ত্বং সমুদ্রে গচ্ছ, পৃথ্বি ত্বং শীতলা ভব।"

মন্ত্র সার্থক। অগ্নি সমুদ্রে গেল, পৃথিবী শীতলা হইলেন, সূর্য্য অস্তগত। সন্ধ্যার পর পান্থশালায় দুটী অতিথি। অতিথিরা চুপি চুপি গল্প করিতেছে। নানা দেশ পর্য্যটনের গল্প, নানা দুর্ঘটনার গল্প, নানা সৌভাগ্যের গল্প, কিন্তু কল্পনার গল্প নয়। ভবযাত্রায় যাহার জীবনে যে দিন যাহা

ঘটিয়াছে, যে যে বিপদের সহিত, যে যে সম্পদের সহিত, যে দিন যেখানে যাহার সাক্ষাৎ হইয়াছে, নির্জ্জনে উভয়ে সেই সকল কথোপকথন।

এক জন শিহরিয়া উঠিল। কহিল, "তুমি কাহার কথা বলিতেছ?"

"তাহারই।"

"তুমি তাহাকে কোথায় দেখিয়াছিলে?"

বক্ষে হস্ত প্রদান করিয়া দ্বিতীয় ব্যক্তি উত্তর করিল, "এইখানে।"

"ঐ খানে? সে এখনও ঐখানে আছে?"

"ছিল।"

"এখন?"

"এখনও আছে।"

"তবে কাঁদিতেছ কেন?"

"দেখিতে পাই না।"

"এ বড় হাসির কথা। যেখানে দেখিয়াছিলে, যেখানে ছিল, সেই খানেই আছে, অথচ দেখিতে পাও না, এ কথার মর্ম্ম বুঝিলাম না।"

"আমি বৃদ্ধ হইয়াছি।"

"তাহা ত দেখিতেছি, কিন্তু কাঁদ কেন?"

"যে কাঁদায়, তাহারি জন্য কাঁদি।"

"আচ্ছা, এই বৃদ্ধ বয়সে তোমার কি,—তোমার কি সে বিরহের আর শান্তি হইবে না?"

"তুমি একটু চুপ কর। আমি এক নূতন বেশ পরিধান করি।"

"কর।"

বক্তার কক্ষদেশে একটী বস্ত্রাধার ছিল, সেইটী উন্মুক্ত করিয়া সত্য সত্য তিনি এক নূতন বেশ পরিধান করিলেন। বৃদ্ধশরীরে বসনভূষণেরা যেন নবীন যৌবন সঞ্চার করিয়া দিল। নীলবর্ণ অঙ্গরক্ষ, মস্তকে নীলবর্ণ টুপি, কৃষ্ণবর্ণ শ্মশ্রুরাজী, যাহা কখনও ছিল না, তাহা। পরিধান শুক্লবাস, দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলীতে পাঁচটী, আর বাম হস্তের অঙ্গুলীতে একটী স্বর্ণ অঙ্গুরী। গলদেশে আনাভিলম্বিত কৃষ্ণবর্ণ রেশমের পাটা, তাহার সঙ্গে পেস্‌কবচ বাঁধা। •

নবীন বেশ ধারণ করিয়া বিরহী নায়ক উপর্য্যুপরি দুই তিন বার সুধাময় পানপাত্রের মর্য্যাদা রক্ষা করিলেন। রজনী ক্রমশই অগ্রবর্ত্তিনী হইতে লাগিল।

দ্বিতীয় বক্তা গম্ভীর বদনে গম্ভীরস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "দেখিতেছি, তুমি থাকিয়া থাকিয়া চমকিয়া উঠিতেছ, ভয় কর কিসের?"

"ভয় করি ভয়কে। ভয় কিন্তু আমাকে দেখিয়া ভয় করে। তোমার ভয়ে আর আমার ভয়ে একটু তফাত আছে।"

"সে কিরূপ?"

"প্রকাশ করিতে পারি না।"

"আমি তোমার চিরসুহৃদ, উলঙ্গ বয়সের, শিশুকালের বন্ধু, প্রকাশ না করিলে শান্তির উপায় হইবে কিরূপে?"

"বুক জ্বলিয়া যাইতেছে, জীবাত্মা ধড়্‌ফড়্ করিতেছে, রসনা শুষ্ক হইয়া যাইতেছে, আর কথা কহিবার ক্ষমতা নাই।"

বক্তার বন্ধু নিতান্ত চিন্তাকুল হইয়া সখার মস্তকে বারম্বার সুশীতল বারি অভিসিঞ্চন করিলেন, আশাকে সহচরী করিয়া অশেষবিধ সান্ত্বনা-বাক্যে নানা প্রকারে প্রবোধ প্রদান করিলেন, ফল হইল না।

বিমর্ষ অতিথি কিঞ্চিৎ ক্ষীণস্বরে একটী বার মাত্র কথা কহিয়া বলিলেন, "আমার সর্ব্বস্ব!"

"তোমার সর্ব্বস্ব কি?"

"যাহা ছিল, তাহা নাই!"

"অর্থ?"

"অর্থকে আমি পদতলে দলন করি।"

"তবে?"

"আমি ধ্বংস হইয়াছি!"

"মানে করিয়া বুঝাইয়া দাও।"

"মানে আমি জানি না।"

কথা হইতেছে, এমন সময় একজন গোপ আসিয়া এক খণ্ড কাগজ দেখাইয়া দাবী করিল, মাখনের মূল্য আট টাকা।

দেনদার অনেকক্ষণ ইতস্তত করিয়া গাত্রবস্ত্র হইতে তিনটী তাম্রমুদ্রা বাহির করিয়া সম্মুখে ছড়াইয়া দিল,—দিয়াই চীৎকারস্বরে ক্রন্দন করিয়া ভূমিতলে আছাড় খাইয়া পড়িল,—বলিল, "এই আমার শেষ, এই আমার সম্পত্তি, এই আমার সর্ব্বস্ব !"

লজ্জা পাইয়া, যাহা ইচ্ছা গালাগালি দিয়া, মাখন-সরবরাহকার বিরক্ত রক্তমুখে বাহির হইয়া গেল। দেউলে বন্ধুর বন্ধু অনেক আশ্বাসে, অনেক সান্ত্বনায়, অনেক প্রবোধে, অনেক সেবাশুশ্রূষায় তাহাকে শান্ত করিয়া তুলিয়া শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হইলে উপকার হয়, স্পষ্ট করিয়া বল।"

"আমার বলিবার আর কিছুই নাই। যাহা ছিল, তাহা দিয়াছি, কল্য কি খাইব, সংস্থান নাই! ঋণ পুঞ্জপুঞ্জ!"

"তবে তুমি কি চাও?"

"চাহিবার আর কিছুই নাই।"

"এক পরামর্শ আছে।"

"বল।"

"হাকিম-লোককে জানাইয়া দেউলে হও।"

উভয় কর্ণে হস্ত প্রদান করিয়া নিঃসম্বল অতিথি বিকটস্বরে কহিল, "বড় লোকের সন্তান, অতুল বিক্রম, অতুল সম্ভ্রম, দেউলে নাম লইয়া আমি কি সমস্ত হারাইব?"

"ইহা ভিন্ন আর ত উপায় নাই। আমি—"

কথা সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বে চঞ্চল পদে একটী রমণী সেই পান্থশালায় প্রবেশ করিল। পান্থশালা সর্ব্বদাই অবারিত। স্ত্রীপুরুষ যাহার ইচ্ছা, যে সময়ে ইচ্ছা, সতত‍ই গতিবিধি করিতে পারে। রমণী আসিয়া অদূর-স্থিত একখানি কাষ্ঠাসন আশ্রয় করিয়া নতশিরা হইল। চক্ষে রুমাল দিয়া কাঁদিতে লাগিল।

এই অবসরে গৃহস্বামী প্রবেশ করিলেন। সেই কামিনীর সেই ভাব দেখিয়া সদয়ভাবে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন মা তুমি কাঁদ? আমি দরিদ্র,—আমার এই আশ্রম সকলের জন্যই মুক্ত, সঙ্কটে পড়িয়া থাক,

বিপদ আসিয়া থাকে, যতক্ষণ আমার আশ্রমে থাকিবে, ততক্ষণ কোন সঙ্কট, কোন বিপদ, কোন ভয়, এখানে প্রবেশ করিবে না। নির্ভয়ে, নিশ্চিন্তে, নিরুপদ্রবে, সচ্ছন্দে এখানে থাকিতে পাইবে।”

“তা নয়।” কামিনী কাঁদিয়া সকরুণস্বরে কহিল, “না পিত! তা নয়। আমার বিপদ নাই, আমার সঙ্কট নাই, আমার শঙ্কা নাই, আমার চিন্তা নাই, আমার কিছুই নাই।”

“তবে কেন মা তুমি কাঁদ?”

“আমার একটী পাখী হারাইয়া গিয়াছে।”

“সেই দুঃখে আমি আর পাখী পুষি না।”

“আমি পুষি।”

“তবে ত উড়িয়া গেল!”

“সে পাখীর দোষ, আমি ত ছাড়িয়া দিই নাই।”

“সব পাখীরই ঐ দোষ। যাহারা পোষে, তাহারা ছাড়িয়া দেয় না।”

“পিতা তুমি; আমি তোমার চরণে প্রণাম করি।”

“মা সতীলক্ষ্মি! এখন তুমি কি চাও?”

“পাখী।”

“যদি না পাওয়া যায়?”

“আমি পাখী হইব, আমি আকাশপথে উড়িব—; যে দেশে পাখী থাকে, উড়িয়া উড়িয়া সেই দেশে যাইব, কিন্তু পাখী না পাইলে—”

দুই জন অতিথির মধ্যে একজন অতিথি,—যে অতিথি সম্প্রতি নবীন পরিচ্ছদ ধারণ করিয়াছিল, সেই অতিথি উঠিয়া দাঁড়াইয়া যুগল হস্ত বিস্তারে কামিনীকে কহিল, “বিহঙ্গিনি! কাহার দোষ দাও? পাখী উড়িয়া গিয়াছে, বেশ করিয়াছে, তুমি অন্বেষণ করিতে আসিয়াছ, ধিক্ তোমাকে, ধিক্ তোমার প্রাণকে, ধিক্ তোমার মনকে। দেখিতেছি, তুমি একটী পাখী। আমারও ঠিক এমনি একটী পাখী ছিল, উড়িয়া গেল, কেন উড়িয়া গেল, কোথায় উড়িয়া গেল, কিছুই জানিলাম না, সেই পাখীর শোকে আমি সন্ন্যাসী।”

নূতন সাজে অতিথির যেরূপ আকৃতির বিকৃতি হইয়াছিল, তাহা দেখিয়া

চিনিয়া লয়, কাহার সাধ্য। কটাক্ষ—কটাক্ষ—কটাক্ষভঙ্গীতে পুনঃপুন সেই দিকে চাহিয়া চাহিয়া উন্মাদিনী কামিনী করুণস্বরে কহিল, "আমি মরিতেছিলাম, মরিতে পাইলাম না। এখানে কি মরিবার স্থান আছে?"

শ্মশ্রুধারী কহিল, "মরিবার স্থান জগৎসংসারের সর্ব্বত্রই প্রশস্ত।"

"তবে কেন আমি এখানে আসিয়াছি?"

"তুমিই জান।"

ছদ্মবেশ ধরা, ছদ্মবেশ চেনা, সকলের পক্ষে সুসাধ্য হয় না। কিন্তু যেখানে মনে মন গাঁথা থাকে, সেখানে অধিকক্ষণ অপ্রকাশ থাকে না।

কামিনী বসিল। যে অতিথি ছদ্মবেশী অতিথিকে সান্ত্বনা দিতেছিলেন, তিনিও নিস্তব্ধ হইয়া বসিলেন। চারি চক্ষু, ছয় চক্ষু, আট চক্ষু, চক্রবৎ ঘুরিতে লাগিল। দ্বিতীয় অতিথি কহিল, "এখন সত্য করিয়া বল দেখি, তুমি কি চাও?"

"ডাকাত! যে ডাকাত দিবাভাগে আমার চিত্তধন চুরি করিয়া পলায়ন করিয়াছে, সেই ডাকাত!"

"কোথায় পলায়ন করিয়াছে জান?"

"না।"

"যদি আমি ধরিয়া দিতে পারি?"

"চরণের দাসী হইয়া থাকিব।"

"তোমার পাখীর নাম কি?"

"মনে পড়ে না।"

"তবে অন্বেষণ কর কেন?"

"মন বোঝে না।"

"তবে তুমি নাম জান।"

"জানি, কিন্তু বলিতে ঘৃণা হয়, লজ্জা করে।"

"আমিও জানি।"

"তুমি বুঝি দৈবজ্ঞ?—আচ্ছা, কি বল দেখি।"

"যখন তুমি বলিলে না, তখন আমি বলিব কেন?"

"বিশ্বাসঘাতক! কিন্তু এখনও আমি তাহাকে ভালবাসি।"

"আর ভালবেসো না।"—দ্বিতীয় অতিথি একটু গম্ভীরভাবে চিন্তা করিয়া কহিল, "আর ভালবেসো না।"

"কেমন করিয়া ভুলিব ?"

"সে লোকটা দেউলে।"

"তাহাতে আমার কি ক্ষতি ? আমার পিতার অনেক অর্থ আছে।"

"সে লোকটা বুড়ো, অধিক দিন বাচিবে না, তুমি হেন রূপসী সুন্দরী যুবতী, বুড়োকে যৌবন দান করিবে কেন ? এমন নবীন তরুণ যৌবন বিথোরে নষ্ট করিবে কেন ?"

"করিব, আমার ইচ্ছা আছে।"

"যদি মরিয়া যায় ?"

"অমরের অমৃত নাম মিথ্যা হইবে।"

"বুঝিতে পারিলাম না।"

"তুমি মূর্খ।"

"কিরূপে জানিলে ?"

"কথায় আর ব্যবহারে।"

"তাহার অর্থ নাই।"

"তোমার কথারও অর্থ নাই।"

"তাহার টাকা নাই।"

"আমার আছে।"

"তুমি কি টাকা দিয়া তাহাকে পালন করিবে ?"

"কেন করিব না ? যাকে সর্ব্বস্ব দিয়াছি, তার কাছে টাকা কোন্ ছার ?"

"কিন্তু সে যদি তোমাকে না চায় ?"

"না চায়, যে পথে যাইতেছিলাম, সেই পথে যাইব।"

"তা কেন ?"

"তবে কি ?"

"আমাকে বরণ কর, আমি যুবা, আমি রূপবান, আমি ধনবান, আমি যাহা ইচ্ছা, তাহা করিতে পারি, আমাকে বরণ কর।"

"তোমার মাথায় আমি পদাঘাত করি!"

ঘৃণাব্যঞ্জকস্বরে এই কথা বলিতে বলিতে উদাসিনী উন্মাদিনী কামিনী পান্থশালা হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইতেছিল, হঠাৎ পশ্চাৎ হইতে বাধা দিয়া কে যেন নাম ধরিয়া ডাকিল, "মিহির! কোথায় যাও? তোমার চির অনুগত, চির পদাশ্রিত প্রণয়দাস প্রেম-কিঙ্কর ছদ্মবেশে এখানে বসিয়া কাঁদিতেছে, তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া তুমি কোথায় যাও?" ভুজঙ্গিনীর লাঙ্গূলে আঘাত করিলে সে যেমন মুখ ফিরাইয়া ফোঁস করিয়া উঠে, চপলা উন্মাদিনী ঠিক সেইরূপে মুখ ফিরাইয়া গর্জ্জন করিয়া কহিল, "কে তুই? মরণে একজন বাধা দিয়াছিল, গমনে বাধা দিস্, কে তুই?"

এই পর্য্যন্ত প্রশ্ন উত্তর সমাপ্ত। বিরহিণী দ্রুতবেগে সরাই হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। ছদ্মবেশী নায়ক মনে মনে যত আশা করিয়াছিল, সাগরের জলে সমস্তই ভাসিয়া গেল, স্পষ্টাক্ষরে চিত্তপটে আঁকা রহিল— "আশা চপলা।"

ষট্‌ত্রিংশ প্রবাহ।

তুমি আর আমি।

তব লাগি প্রাণসখি! হব বনগামী।
হৃদয়ে জাগিবে সদা, তুমি আর আমি॥

ভারতরত্ন।

প্রেমের গতি অতি বিচিত্র। সুপাত্র অপাত্র কিছুই বিবেচনা করে না। বনলতা যেমন বনতরুকে আলিঙ্গন করে, প্রণয় তেমনি পাত্রাপাত্র বিবেচনা না করিয়া যাহাকে তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া থাকে, কিন্তু সেরূপ প্রণয়কে চিতানলে ভস্ম করিবার পূর্ব্বে যদি আমরা ইচ্ছাবশে পদতলে বিদলন করি, তাহা হইলে প্রায়সংসারে পাপী হইতে হইবে না। মনে

কর, আমি একজনকে ভালবাসিয়াছিলাম;—অন্তরের সহিত;—প্রাণের সহিত, অকপট অনুরাগের সহিত আমি একজনকে ভালবাসিয়াছিলাম, সে আমাকে ভালবাসিয়াছিল, ত্রয়োদশ বৎসরের তপস্যার ফল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে শত বর্ষ, সহস্র বর্ষ,—দশ সহস্র বর্ষ,—কেহ কেহ বা আরও অধিক সহস্র বর্ষ তপস্যা করিয়া দেবতার নিকটে বর প্রার্থনা করিতেন, দেবতা সাক্ষাৎ হইয়া বরদান করিতেন; এখন কলিযুগ, এখন অতি অল্প দিনের তপস্যাতেই দেবতারা সদয় হন। আমার ত্রয়োদশ বর্ষ তপস্যার ফল;—সেই ফলে সেই দেবতাকে আমি তুষ্ট করিয়াছিলাম, দেখা হইবা-মাত্রই ভালবাসিয়াছিলাম, কিন্তু মনে কর, সে প্রণয়ে যে বিচ্ছেদ হইবে, সে কথা মনে ছিল না। মনের অগোচরে নিদারুণ বিচ্ছেদ আসিয়া হৃদয়ে প্রবেশ করিল। জগৎপিতা সৃষ্টি করিয়াছেন, জোড়া জোড়া।—দেবদেবী জোড়া, গন্ধর্ব্বগন্ধর্ব্বী জোড়া, কিন্নরকিন্নরী জোড়া, রাক্ষসরাক্ষসী জোড়া, মানবমানবী জোড়া, পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ, বৃক্ষলতা, সমস্তই জোড়া জোড়া। তিন পাঁচ সাত কোথাও নাই। একাকীও কোথাও না। তবে আমি কেন একা থাকি? বিধাতা জানেন; আর যাহাকে ভালবাসিতাম, সেই জানে।

তৈমুরবংশের ষষ্ঠ বংশধর সেখ মীরজার পুত্র সুলতান বাবর যখন ভারতের প্রাচীন রাজধানী হস্তিনাপুরীর অধিকারী হন, স্থূল কথায় বাবর যখন দিল্লী অধিকার করেন, সেই সময় আমি দিল্লীতে গিয়াছিলাম। আমি দীর্ঘজীবী। এই আখ্যায়িকার নায়ক-নায়িকারা কে কোথায় যে তখন, তাহার উদ্দেশ ছিল না। তখন এইরূপ এক রহস্য উপস্থিত হইয়াছিল। এখন এক দিন সন্ধ্যার পর দিল্লীর খাসমহলের পশ্চিম দরজায় একখানি সুরম্য অট্টালিকায় সুমধুর সঙ্গীতধ্বনি সমুত্থিত হইয়াছিল, কৌতুকে, কৌতূহলে, দ্বারসমীপবর্ত্তী হইয়া দেখি, যুগল রূপ। নায়িকা একটী বিবি। নাম রেজিয়া। নায়ক এক জন রজপুত, নাম অপ্রকাশ। দুই জনে রহস্য। নায়িকা হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এ দেশে কত দিন?"

"তিন মাস।"

একটু যেন বিস্ময় প্রকাশ করিয়া,—পূর্ব্বের কোন কথা যেন স্মরণ করিয়া রেজিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তিন মাস পূর্ব্বে কোথায় ছিলে ?"

"মনে হয় না। তোমাকে দেখিয়া সমস্তই ভুলিয়া গিয়াছি।"

"আমি মুসলমান, তুমি হিন্দু, আমার সঙ্গে তোমার মনের মিলন অসম্ভব। আজ আসিয়াছ, কাল থাকিবে না। আমরা নারীজাতি, অর্থের দাসী, আর কাহারও দাসী নই, পূর্ব্ব প্রণয় ভুলিয়া যাও।"

"পূর্ব্ব প্রণয় আমার ছিল না।"

"মুখ দেখিয়া তাহা বুঝিয়াছি।"

"আমি মিথ্যাকথা বলি না।"

"সমস্তই তোমার মিথ্যা।"

"কিসে জানিলে ?"

"তুমি একজনকে ভালবাসিয়াছিলে।"

"সত্য।"

"তবে আর একজনকে ভালবাসিবে কিরূপে ?"

"সে আমাকে ছাড়িয়া গিয়াছে।"

হাস্য করিয়া রেজিয়া কহিল, "আর, আমি যদি ছাড়িয়া যাই ?"

"তুমি যদি ছাড়িয়া যাও ? তবে যে পথে যাইতেছিলাম, সেই পথেরই চির পথিক হইব।"

"সে কোন্ পথ ?"

"মহাপ্রস্থান।"

"সে পথে আমি কি তোমার সঙ্গিনী হইতে পারি না ?"

"তুমি মুসলমান।"

"যদি আমি মুসলমান না হই ?"

পথিক চমকিয়া উঠিলেন। কহিলেন, "প্রাণেশ্বরি! তুমি——"

"আমারে তুমি ও নামে সম্বোধন করিও না; আমার স্বামী আছে। আমি যবনকন্যা, যবনের পত্নী; তোমার সহিত রহস্য করিতছিলাম।"

"তুমি রহস্য করিতেছিলে, কিন্তু আমি রহস্য করিতেছি না।"

"তাহা হইলে কি হইবে ?"

"ইচ্ছা তোমার।"—গম্ভীর বদনে রজপুতকুমার বিনা-বিবেচনায় ত্বরিত-স্বরে অতি সংক্ষেপে উত্তর করিল, " ইচ্ছা তোমার !"

"আমার আর ইচ্ছা কি ? আমি যবনী, তুমি হিন্দু।" .

"ভালবাসার চক্ষে যবনী হিন্দু নাই।"

"তবে তুমি কি বলিতে চাও ?"

"তুমি আর আমি।"

"ছি তোমাকে ! তুমি মন ঠিক রাখিতে জান না, অথচ প্রণয় আকাঙ্ক্ষা কর।"

"জানি না ?"

"জান ?—আচ্ছা, যদি তোমার সেই হিন্দু পত্নী এখানে আসে, তা হলে তুমি কি আর এই রেজিয়াকে মনে করিতে পারিবে ?"

"বিবাহ হয় নাই।"

"সে কথা আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি না। যে হিন্দু কামিনীকে তুমি একবার প্রণয় দান করিয়াছিলে, সেই কামিনী যদি দিল্লীতে আসে, তখন কি এই রেজিয়া তোমার মনে থাকিবে ?"

"সে এত দূর আসিতে পারিবে না।"

"বড় দুঃখে হাসালে তুমি। সত্য প্রণয় কি দূরদূরান্তরে থাকে ?"

"সে এখানে আসিবে না।"

"সে কি তোমাকে ত্যাগ করিয়াছে ?"

"হুঁ।"

"তুমি কি তাহাকে ত্যাগ করিয়াছ ?"

"হু।"

"নাম মনে আছে ?"

"ছিল ; এখন ভুলিয়া গিয়াছি।"

"মিথ্যা কথা। যার সঙ্গে ভালবাসা থাকে, বিরহবিচ্ছেদে কি তার নামটী পর্য্যন্ত ভুলে যাওয়া যায় ?"

"যায় না ত আমি ভুলিলাম কিরূপে ?"

"মিথ্যা কথা।"

"প্রাণেশ্বরি! আমি তোমার কাছে মিথ্যা কথা বলিতেছি না। গঙ্গা-যমুনার শপথ, চন্দ্রসূর্য্যের শপথ, সে সাপিনীকে,—সে বিশ্বাসঘাতিনীকে আমি ভুলিয়া গিয়াছি, নাম পর্য্যন্ত।"

"আচ্ছা, আমি যদি মনে করিয়া দিতে পারি?"

"অসাধ্য।"

"তবে তুমি আমার?"

"চিরদিনের।"

"আমি মুসলমান।"

"শিরোধার্য্য।"

"তবে ত তুমি ভালবাসা জান না?"

"কেন না?"

"যাহাকে একবার ভালবাসিয়াছিলে, তাহাকে ভুলিয়া আবার এক অজ্ঞাত পাত্রে ভালবাসা সম্প্রদান করিতে আসিয়াছ, তোমার মত চোরকে বিশ্বাস করিবে কে?"

"আমি চোর?" বালিশে মাথা রাখিয়া চক্ষের জলে ভাসিয়া দুরন্ত চতুর লম্পট কৃত্রিম ভালবাসা জানাইয়া কহিল, "আমি চোর?—আচ্ছা, যদি চোর হই, এই রাত্রে আমাকে বিচারে সমর্পণ কর।"

হাস্য করিয়া রেজিয়া কহিল, "এখন না, এখন আমার মুখে সরাপের গন্ধ আছে। কোতোয়ালি আমার কথায় বিশ্বাস করিবে না, আজ থাক; খানা খাও; যাহা চুরি করিতে হয়, চুরি কর, সকালে বিচার।"

নিশা অগ্রসর হইতেছে। নিশা কাহারও বাধা মানিতেছে না; গৃহে পুনঃপুন মধুপাত্র ফিরিতেছে, ঘুরিতেছে, ডালে ডালে কোকিলেরা ডাকিতেছে, গাইতেছে, উড়ে উড়ে এক পাখী বোলে গেল, চোক্ গেল! মুসলমানের বৌ চট্‌পট্ করিয়া কথা কহিতেছে, মুখে যেন খই ফুটিতেছে, পাখী আর লজ্জায় বলিতে পারিল না, লজ্জায় মানভঞ্জনের সুরে ডাকিতে পারিল না, বৌ কথা কও!

রেজিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি আমাকে ভালবাস?"

"তুমিও কি আমাকে ভালবাস?"

"এক কথার আর এক উত্তর!—সত্য উত্তর তুমিও দিতে পার, আমিও দিতে পারি; কিন্তু আগে তুমি—"

"ও মা! আমি কোথায় এসেছি! কাহাকে ভুলিয়া যাইতেছি! মহাদেবি! এসো মা আমার হৃদিপদ্মাসনে! কোথায় আমি! যবনকন্যা আমাকে প্রতারণা করে, আমার প্রাণতোষিণী মিহিরমোহিনী,—না মা! সে নাম অহরহঃ আমার হৃদয়ে জাগে, সে রূপ অহরহঃ আমার হৃদয়ে জাগে, তাহারে কি আমি হারাইব? না ত! হারাইব না। ছি! যবনকন্যার প্রণয়ে আমি কি বিমোহিত হইব? না ত! মিহিরমোহিনীর কাছে যাই; মিহিরমোহিনী কি আমারে অগ্রাহ্য করিবে?

করুক, তাহাতে আমি কভু ডরিব না।
তাহার বিরহবিষে কভু জরিব না॥
ধরিতে সে আসে যদি, তবু ধরিব না।
সে বিরহে মত্ত হয়ে কভু মরিব না॥
চিনেছি প্রাণের বস্তু রেজিয়া আমার।
রেজিয়া, রেজিয়া সতী জীবনের সার॥

মিহিরমোহিনীর মুখে আমি পদাঘাত করি!"—আগেকার কথাগুলি মনে মনে উচ্চারিত হইল, শেষের কথাটী মুক্তকণ্ঠে।

"তবে না কি তুমি প্রণয় জান?"

"অন্যথা কিসে?"

"ভালবাসার মুখে পদাঘাত?"

"তুই কি জানিস্?"

"মা জীবিতেশ্বর! জানি না। কপটতা নয়। আমি তোমার মনের ভাব বুঝিয়াছি। দোষী আমি! তুমি আমাকে বঞ্চনা করিতেছ না, আমি তোমাকে বঞ্চনা করিতেছি না, তথাপি ঘন ঘন দীর্ঘ অদর্শন ঘটিতেছে। এটী যথার্থই মায়ার খেলা, সন্দেহ নাই। তুমি আমার পর হইবে, এ নিদারুণ কথা স্বপ্নেও ভাবনা করিলে আমার হৃৎকম্প হয়। আমাতে আর

আমি থাকি না। তুমি যদি ঘৃণা করিয়া পরিত্যাগ কর, তবে দাসী আর কি সুখে পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিবে? তোমারে আমি মনঃপ্রাণ সমস্তই সমর্পণ করিয়াছি। একবার দান করিয়া পুনর্ব্বার তাহা আর ফিরাইয়া লইতে নাই; অকলঙ্ক শুদ্ধ অন্তঃকরণ তাহা কখনও পারেও না। যদি কোথাও কেহ কখনও সেরূপ বিশ্বাসঘাতকের কার্য্য করে, তাহাকে মহাপাতকে লিপ্ত হইতে হয়। কেন না, তাহার নাম অপহরণ। প্রাণেশ্বর! ইহা কি তুমি অস্বীকার কর?"

"কথায় তোমাকে কেহ আঁটিয়া উঠিতে পারে না। যখন দেখা হয়, মুখে তখন যাহা যাহা তুমি বল, কার্য্যের সঙ্গে সে সকল কথার মিল থাকে না। ইহাই আমার অত্যন্ত আক্ষেপ। এখনও তুমি আমাকে জীবিতেশ্বর বলিয়া সম্বোধন করিতেছ, অন্তরাত্মা সাক্ষী, আমিও অহরহঃ দর্শনে অদর্শনে তোমাকে জীবিতেশ্বরী বলিয়া ডাকি। কিন্তু জীবিতেশ্বরি! আমার বোধ হয়, তোমার হৃদয় কিছু চঞ্চল। তোমার প্রণয়ে বোধ হয় সর্ব্বদা স্থিরতা থাকে না।"

"স্থিরতা থাকে না?"

"লক্ষণে ত সেরূপ বোধ হয় না।"

"এখনও মনে কর, আমি যবনকন্যা যবনপত্নী।"

"সম্মুখস্থ কাষ্ঠাসনে সজোরে মুষ্ট্যাঘাত করিয়া প্রণয়ী যুবক উচ্চকণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "পাষাণে যেমন রেখা পড়ে, আমার হৃদয়ে সেইরূপ তোমার প্রতিমা অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। তুমি যে জাতি, যাহার কন্যা, যাহার পত্নী, তাহা আমি প্রেমাক্ষরে চিত্তপটে চিত্র করিয়া রাখিয়াছি। তুমি—"

ইঙ্গিতে বাধা দিয়া গম্ভীর বদনে বেজিয়া কহিল, "চুপ কর, অত উচ্চস্বরে কথা কহিও না। আমি অপরের বিবাহিতা স্ত্রী। তুমি হিন্দু, তোমার প্রণয়ে মুগ্ধ হইয়াছি। পাপ হইতেছে কি না, বুঝিতে পারিতেছি না। প্রণয়ের চক্ষু আছে, কিন্তু সে চক্ষু পাপপুণ্য দেখিতে পায় না। তথাপি কি জানি, তোমার কণ্ঠধ্বনি শ্রবণ করিয়া যদি কেহ হঠাৎ এখানে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে মহাবিপদ উপস্থিত হইবে। সে বিপদে

তুমিও আমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না, আমিও তোমাকে রক্ষা করিতে পারিব না।”

পূর্ব্ববৎ উচ্চকণ্ঠে প্রণয়ী যুবা সদর্পে, সদম্ভে, চীৎকার করিয়া কহিল, “বিপদকে আমি গ্রাহ্য করি না।”

কৃত্রিম শঙ্কিতভাব প্রদর্শন করিয়া সভয় মৃদুকণ্ঠে রেজিয়া কহিল, “আবার বলিতেছি, চুপ্ কর, তুমি বিপদকে গ্রাহ্য কর না, কিন্তু আমি ভয় করি।”

“তুমি স্ত্রীজাতি, স্বভাবতই অত্যন্ত ভীরু, কিন্তু আমি ক্ষত্রিয়কুমার, আমি বীরপুরুষ, বিপদ আমার অলঙ্কার, বিপদে আমার ভয় কি?”

সত্য সত্য রেজিয়ার বাক্যই ফলিয়া গেল। সহসা পুনঃপুন দ্বারে আঘাত। আঘাতের উপর আঘাত। জলদগর্জ্জনের ন্যায় ভীম গর্জ্জন। রেজিয়া যেন মহাভয়ে কম্পিত হইতে লাগিল, মুখে আর বাক্য নাই।

বারম্বার সবল পদাঘাতে ঝন্ ঝন্ শব্দে দরজা ভগ্ন হইয়া গেল। একজন অস্ত্রধারী যুবাপুরুষ ভীম বীরবেশে গৃহমধ্যে উপস্থিত। সেই মূর্ত্তি প্রবেশ করিয়াই মেঘগম্ভীরস্বরে আগন্তুককে সম্বোধনপূর্ব্বক তিরস্কারবাক্যে কহিতে লাগিল, “পাষণ্ড! কে তুই? বাদসাহমহলে নিশাকালে অনধিকার প্রবেশ? হৃদয়ে কি কিছুমাত্র শঙ্কা নাই? স্ত্রীলোকের অন্তঃপুরে কোন্ সাহসে প্রবেশ করিয়াছিস্? এই দণ্ডে এই তরবারি আঘাতে তোর ঐ ঘৃণিত দেহ হইতে ঘৃণিত মস্তক বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিব। তুই দস্যু, তোকে বধ করিলে কিছুমাত্র পাপ হইবে না। আর তুই পাপীয়সি! এই মুহূর্ত্তে তোকেও এই দুষ্কর্ম্মের প্রতিফল ভোগ করিতে হইবে। এই অস্ত্র, আমার এই সুশাণিত ভীষণ অসি, এই মুহূর্ত্তে তোর বক্ষের রক্ত পান করিবে। দেখ্, তোদের আজ কি দশা হয়!”

অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া অবনতমস্তকে রেজিয়া বেগম অল্প অল্প হাসিয়া কপট ভয়ে যেন বিমনা হইল। মুখে একটীও কথা নাই, কলেবর বিকম্পিত। কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে যে ক্ষত্রিয়কুমার আপনাকে নিঃশঙ্ক বীরপুরুষ বলিয়া আস্ফালন করিতেছিল, বিপদ আমাদের অলঙ্কার বলিয়া কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে যে বীরপুরুষ সদর্পে দম্ভ প্রকাশ করিতেছিল, অস্ত্রধারীর

প্রবেশে এককালে তাহার কণ্ঠতালু বিশুষ্ক হইয়া গেল। ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম দেখা দিল। ঘন ঘন অধরোষ্ঠ কাঁপিতে লাগিল। মাথা তুলিয়া একটীও কথা কহিতে পারিল না। সেই প্রবেশকারী অস্ত্রধারী অসি নিষ্কাষিত করিয়া ভীম জলদগর্জ্জনে উভয়কেই পুনঃপুন ভয় দেখাইতে লাগিল। অসিহস্তে যেন গৃহমধ্যে রণমদে মত্ত হইয়া নৃত্য আরম্ভ করিল। অনধিকারপ্রবেশকারী রাজপুতকুমার থরহরি কম্পমান। শুষ্ক হৃদয়ে একেবারে নির্ব্বাক্।

এমন হইয়াই থাকে। অপরের গৃহ, রাত্রিকাল, অপরের বিবাহিতা পত্নী সম্মুখে, গৃহ নির্জ্জন,—নির্জ্জনে উভয়ে বসাভাস, এমন দুঃসাহসিক কার্য্যে কোন্ সাহসী পুরুষের হৃদয়ে না ভয়ের সঞ্চার হয়। অনুচিত প্রণয়াকাঙ্ক্ষী ঘন ঘন কাঁপিতেছে, এক ধারে বসিয়া রেজিয়া সুন্দরী কাঁপিতেছে, তরবারিহস্ত নবীন প্রবেশকারী এই কাটি, এই কাটি, এই কাটিলাম, বলিয়া গর্জ্জন করিতেছে, গৃহে অতি বিভীষণ দৃশ্য! অস্ত্রধারীর মুখে যদি ঘনগর্জ্জন না থাকিত, তাহা হইলে মহাঝড়ের পর মহাসাগর যেমন শান্ত হয়, জীবলোকের মাথার উপর অনন্ত আকাশ যেমন স্তম্ভিত হয়, বায়ুবিরহিত অরণ্যমধ্যে বৃক্ষলতাকুল যেমন নিস্তব্ধ হয়, সেই রাত্রিকালে দিল্লীনগরে সেই মুসলমানগৃহ সেইরূপ শান্ত, স্তম্ভিত ও নিস্তব্ধ হইত, সন্দেহ নাই।

গৃহে একটী দীপ জ্বলিতেছিল। গবাক্ষপথে পবন-সঞ্চার ছিল না, দীপটী উজ্জ্বল, নিষ্কম্প। সেই সমুজ্জ্বল দীপজ্যোতি তর্জ্জনগর্জ্জনকারীর শাণিত, মার্জ্জিত, মুক্ত অসিগাত্রে ক্ষণে ক্ষণে প্রতিফলিত হইয়া সূর্য্য-প্রতিবিম্বিত স্বচ্ছ দর্পণ অথবা নিম্নগামী সরসী সলিলের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা বিকাশ করিতেছিল।

অকস্মাৎ গৃহ নিস্তব্ধ। রাজপুতপুত্র ও রেজিয়া, ইহারা উভয়েই ত নিস্তব্ধ ছিল, নূতন প্রবেশকারীও ক্ষণকালের জন্য নিস্তব্ধ। গগনসমুদ্রে বায়ুও নিস্তব্ধ। ভয়ানক নিস্তব্ধ। বিজন শ্মশান যেমন নিস্তব্ধ, বিজন শবগৃহ যেমন নিস্তব্ধ, মহাসঙ্কটাপন্ন রোগীর আত্মীয়শূন্য মৃত্যুশয্যা যেমন নিস্তব্ধ, সেই ত্রিমূর্ত্তি অধিষ্ঠিত যবনগৃহও সেই নিশীথসময়ে সেইরূপ ভয়ঙ্কর নিস্তব্ধ।

কিন্তু সে নিস্তব্ধতা কতক্ষণ? অর্দ্ধ দণ্ড মাত্র। বোধ হয়, পূর্ব্বের ইঙ্গিত ছিল, চারি জন অস্ত্রধারী প্রহরী লৌহশৃঙ্খল হস্তে লইয়া অকস্মাৎ সেই নিস্তব্ধ কক্ষমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক অর্দ্ধদণ্ডের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া দিল। প্রথম প্রবেশকারীর আদেশে তাহারা বিরাটমূর্ত্তি ধারণ করিয়া রেজিয়াকে আর সেই আগন্তুক বীর যুবাকে সুদৃঢ় লৌহনিগড়ে সুদৃঢ়রূপে বন্ধন করিল। অনন্তর সেই প্রণয়ী বীরপুরুষকে আকর্ষণ করিয়া অপর এক অন্ধকার কক্ষমধ্যে নিক্ষেপ করিল। রেজিয়া পূর্ব্বে যে গৃহে ছিল, সেই গৃহেই রহিল। উভয় গৃহেই চাবি পড়িল। প্রহরীরা স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেল, যাহার আদেশে উভয়ে বন্দী, সে ব্যক্তিও আপন বিরামকক্ষে প্রবেশ করিল। রাত্রি অন্ধকার। যে দুটী গৃহে দুই জন বন্দী, সে দুটী গৃহও ঘোর অন্ধকার। সে ঘোর অন্ধকারে বন্দীরা করিতেছে কি? রেজিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে। হাসিতেছে আর মনে মনে কত কি কল্পনা করিতেছে। তাহার বন্ধন কিছু শিথিল ছিল, তাদৃশ ক্লেশ ছিল না। প্রহরীরা বোধ হয়, স্ত্রীজাতি বলিয়া তাহাকে কিছু আলগা করিয়া বাঁধিয়াছিল, সেই জন্যই বন্দিনীদশায় হাসি। তাহাই যদি সম্ভব হয়, তবে রেজিয়া একাকিনী এক গৃহে রহিল কেন? প্রভুর আদেশ, সঙ্কেতের আভাস। তাহাতে সহজেই উল্লাস জন্মিতে পারে। ইহাও যদি সম্ভব হয়, তথাপি কল্পনা কিসের?

বন্দিনীর আবার কল্পনা কি? এই কল্পনা, যাহাকে ভালবাসিয়াছিলাম, যাহাকে বহুদিন দেখি নাই, সে আমাকে চিনিতে পারিল না। আমি মুসলমানী বলিয়া পরিচয় দিলাম, তাহাতেই বিশ্বাস করিল, তথাপি অনুরাগ ছাড়িল না। আহা! প্রণয়ের কি চমৎকার ধর্ম্ম! জাতি মানে না, কুল মানে না, বিবাহিতা, অবিবাহিতা, কিছুই মানে না, সত্য অনুরাগের পাত্রী কি না, তাহাও বিবেচনা করে না, ইহার কি ধর্ম্ম, উহার কি ধর্ম্ম, সে দিকেও ভ্রূক্ষেপ রাখে না। সমস্তই যেন একে এক মিশাইয়া যায়। যদি এত দূর আশ্চর্য্য কথা, তবে প্রণয়কে লোকে অন্ধ বলে কেন? অন্ধ বলিবে না ত কি বলিবে? যখন কিছুই জানে না, কিছুই দেখে না, কিছুই মানে না, তখন প্রণয় অন্ধ না ত কি? রেজিয়া ইহাই ভাবিতেছে।

একবার ভাবিতেছে, প্রণয়ের চক্ষু নাই, আবার ভাবিতেছে, প্রণয়ের চক্ষু আছে। যখন ভাবিতেছে, চক্ষু নাই, তখন কল্পনা তাহার কাণে কাণে বলিয়া দিতেছেন, যাহাকে তুমি ভালবাস, সে তোমার হইবে। যখন ভাবিতেছে, চক্ষু আছে, তখনও কল্পনা আসিয়া তাহার কাণে কাণে কহিতেছেন, যাহাকে তুমি ভালবাস, তাহাকে তুমি পাইবে।

দুই দিকেই কল্পনার সমান উত্তর, সমান আশ্বাস, সমান উপদেশ। দুই দিকেই নিশ্চয়। তবে বেগিয়া অবসন্ন হইবে কেন? রেজিয়া তবে নিরাশ্বাস হইবে কেন? প্রার্থিত প্রণয়ে বেজিযাকে তবে হতাশ্বাস হইতে হইবে কেন? রেজিযা সুন্দরী আশার আশ্বাসে এক একবার মনে মনে বলিতেছে, তুমি আর আমি। এক একবাব সংশয়মেঘ আসিয়া তাহার অন্তর-আকাশকে ম্লান করিয়া দিতেছে, তখনি তখনি আবার আশাসতী তাহার হৃদয়াকাশে সমুদিত হইয়া মধুর স্বরে কহিতেছেন, বাসনা ফলবতী হইবে। কল্পনাসুন্দরী একটু পরে উড়িয়া আসিয়া তাহার কর্ণমূলে বাঁশী বাজাইতেছেন, আশা চপলা।

দ্বিতীয় গৃহে দ্বিতীয় বন্দী। সে বন্দীর হৃদয়ে তেমন সজীব আশা নাই, কিন্তু কল্পনা আছে। শৃঙ্খলবদ্ধ বন্দী ভাবিতেছে, আমি কি করিলাম। কোথায় ছিলাম, কোথায় আসিলাম! যে বস্তু ভালবাসা ছিল, তাহাকে কোথায় হারাইলাম! নবীন ভাবে যাহাকে ভালবাসিব মনে করিতেছিলাম, যাহাকে অমৃত জ্ঞান হইতেছিল, সে এখন বিষ হইল! তবে আর কাহার জন্য? যবনকন্যা? তাহার আশার আশ্বাসে আমি পাগল? কিন্তু সে ত আমার হইবে না! আমি কারাগারে বন্দী। রজনীপ্রভাতে হয় ত আমার প্রাণ যাইবে। হয় ত কেন, নিশ্চয়ই যবনেরা কল্য আমাকে কাটিয়া ফেলিবে! দুষ্ট রেজিযা অনেকক্ষণ আমার সঙ্গে প্রতারণা-পাশা খেলিয়াছে। বিশ্বাসঘাতিনী বিষধরী, দুরন্ত যবনের হস্তে আমারে বন্দী করিয়া দিয়াছে। আর আমার পরিত্রাণ নাই। কিন্তু হা পরমেশ্বর! এখনও,---এখনও আমি তাহাকে ভালবাসি। মায়াময়ি আশা! তোমার মোহিনী মায়া কে জানে? কেন তুমি আমাকে প্রবঞ্চনা কর? মুক্ত করিয়া দাও, পলায়ন করি। আর আমার নবীন প্রণয়ে অভিলাষ নাই। এই

দারুণ বন্ধন মুক্ত হইতে পারিলে মায়াময় সংসার পরিত্যাগ করিয়া সংসার-বিরাগী সন্ন্যাসী হইয়া পবিত্র তীর্থে তীর্থে পরিভ্রমণ করিব। ভ্রমেও আব আমি বলিব না, তুমি আর আমি। অশ্রুপ্রবাহে ভাসিতে ভাসিতে নবীন প্রণয়ী এইরূপ নানাপ্রকার সংশয়, আশঙ্কা, আর কল্পনা করিতেছে, আশাকে ধিক্কার দিতেছে, ঠিক সেই সময়ে কল্পনা আসিয়া তাহাকে প্রবোধ দিয়া কহিলেন, কাহার আশ্বাসে বিশ্বাস কর? আশা চপলা।

তোমরা একটু স্থির হও। এই অবসরে আমি একবার কল্পনাদেবীর স্তব করি। দেখি দেখি, তিনি তোমাদের প্রতি সুপ্রসন্ন হন কি না"

নমি আমি তব পদে আকাশকুমারি!
উড়ে উড়ে কোথা যাও, নাহি দাও ধরা।
তোমার আশ্রিত যত মহাকবিকুল,
এত কি অস্থিরা তুমি? তাঁহাদের গতি—
কি হবে মা সতীলক্ষ্মি? কহ দেখি দাসে।
পুনঃ প্রণিপাত করি! দেখিতে না পাই—
চর্ম্মচক্ষে মহেশ্বরি! রাঙ্গা পা দুখানি।
তথাপি ও পদযুগ অন্তরে ধেয়াই।
স্বর্গে যাই, মর্ত্তে আসি, প্রবেশি পাতালে,
অনায়াসে উড়ে যাই, শৈলরাজশিরে,
সাগরের জলে ডুবি, মহারণ্যে পশি,
কভু কোলাহলপূর্ণ জনপদ মাঝে—
প্রবেশ করি মা আমি, প্রসাদে তোমার।
কথনো বা রাজা হই, কভু মন্ত্রী সাজি।
কভু বিদূষক হয়ে হাসাই সংসারে,
কথনো বিরহীবেশে প্রেমিকে কাঁদাই।

কখনো বানর বেশে উঠি বৃক্ষশাখে,
পাখী হয়ে কভু শূন্যে উড়ে উড়ে যাই,
গন্ধর্ব্ব সাজিয়ে কভু বাজাই বাজনা,
কিন্নরী হইয়ে কভু দেবসভাতলে,
অমরাবতীর গীত গাই মনোরমে!
কখনো গরুড় হয়ে বিষ্ণু পৃষ্ঠে লয়ে,
ভ্রমি আমি বিশ্বমাঝে, তোমারি প্রসাদে।
কখনো রাক্ষস হয়ে, ভীমরূপধারী,
দানব মানব পশু ধরে ধরে খাই!
কখন বা নাগরূপে ডুবি কালীদহে,
গোকুলবিহারী কৃষ্ণে মাথায় নাচাই।
কখন বা ব্রজধামে যশোমতী রূপে,
বৈকুণ্ঠের পতি ব্রহ্মে ভাবি পুত্রভাবে।
কখনো যমুনাজলে ভাসাইয়ে তরী।
পার করি তাঁরে, যিনি ভবের কাণ্ডারী।
তুমি মা কল্পনাসতি! সহায় আমার,
যোড় করে, তব পদে শত নমস্কার!
তুমি মা প্রকৃতিকন্যা, তোমারি কৃপায়,
বাঁচে জীব। প্রণিপাত তব রাঙা পায়।

সপ্তত্রিংশ প্রবাহ।

অভয়া।

এসেছি শ্মশানে আমি রক্ষিবারে তোরে!
বরাভয় হাতে করি,—মা ভৈ মা ভৈ!
কার সাধ্য কে পারিবে সংহারিতে তোরে?
বাছাধন! আমি তোর জননী অভয়া।

চণ্ডী।

সময় কাহারও হাতধরা নয়। মহাকালের বুকের উপর মহাকালী নৃত্যকালী দিন দিন অষ্ট প্রহর অবিশ্রান্ত নৃত্য করিতেছেন। নিত্যই প্রভাত হয়, নিত্যই গগনে সূর্য্যদেবের উদয় হয়, নিত্যই সন্ধ্যা হইয়া থাকে, নিত্য সন্ধ্যাকালে আকাশে তারাফুল ফোটে, নিত্যই রাত্রি আইসে, নিত্যই ধূসরবসনা ধূম্রবরণী উষাসতীর আগমন হয়. কিন্তু চন্দ্র সকল দিন দেখা দেন না। আজিও উষা আসিয়াছিলেন, আজিও প্রভাত হইয়াছিল, আজিও সুপ্রখর প্রভাকর মধ্য গগনে সমুদিত হইয়া ধরাধাম দগ্ধ করিয়াছিলেন, আজিও প্রদোষ আসিয়াছিল, আজিও গগনকাননে নানা জাতি তারাফুল ফুটিয়াছে, কিন্তু চন্দ্র নাই। কারাগারে একজন যুবা-পুরুষ বন্দী। আজিও রাত্রি আসিয়াছে। এই রাত্রিকালেই সেই যুবা বন্দী নিরাশ্রয়, নিঃসহায় হইয়া মনে মনে কত কি ভাবিতেছে, কে তাহা গণনা করে? একবার ভাবিতেছে, এই বারেই প্রাণ গেল, এই বার তাহারা আসিয়া আমাকে মারিয়া ফেলিবে, তিন দিন তিন রাত্রি অনাহার, যদি তাহারা দয়া করিয়া না মারে, উপবাসেই প্রাণ যাইবে। আবার ভাবিতেছে, ওঃ! কেন ভালবাসিয়াছিলাম! প্রাণে প্রাণ মিশাইয়া,—হৃদয়ে হৃদয় গাঁথিয়া,—মনে মন মিলাইয়া কেন তাহাকে ভালবাসিয়া-

ছিলাম! ওঃ! সংসারে ভালবাসার কি এই শাস্তি? যবনের কারাগারে বন্দীদশায় প্রাণ যায়! মিহিরমোহিনি! তোমার কাছে আমি পাপী হইয়াছি, তোমার অকৃত্রিম ভালবাসায় সন্দেহ করিয়া,—অকারণে তোমাকে অবিশ্বাসিনী ভাবিয়া, তোমারই নিকট আমি অবিশ্বাসী হইয়াছি। কিন্তু প্রাণাধিকে! তুমি ত অবিশ্বাসিনী নও, তবে আমি যবনকন্যার প্রণয়ে অনুরাগী কেন? পাপাচারিণী যবনী আমারে প্রতারণা করিয়াছে, তাহারই প্রতারণাজালে জড়িত হইয়া, তাহারই কুহকে আমি কারাগারে বন্দী। প্রণয়ের কি আশ্চর্য্য কুহক! যে কুহকে জগৎসংসার পাগল, সে কুহকে আমি যে পাগল হইব, ইহা কি বড় বিচিত্র কথা! মহাযোগী মহেশ্বর, তিনিও প্রেমের কুহকে পাগল, তিনিও দক্ষযজ্ঞ সমাধানের পর সতীদেহ মস্তকে লইয়া ত্রিভুবন পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। আমি ত তেমন পারিলাম না! পারিবার প্রয়োজন? আমার মিহিরমোহিনী ত মরে নাই। সেই আমার প্রাণাধিকা প্রিয়তমা প্রাণেশ্বরী পৃথিবীতে এখনও বাঁচিয়া আছে। তবে আমি শিবের মত পাগল হইব কি জন্য? যদি হইব না, তবে যবনীর প্রণয়ে কেন পাগল হইলাম! কেন আমাকে বিনাদোষে বন্দী হইতে হইল! কেন আমাকে বিনাদোষে বন্দীদশায় বন্দীনিবাসে শৃগালকুক্কুরের ন্যায় প্রাণ হারাইতে হইল।

"বিনাদোষে?—না, না! বিনাদোষ কি প্রকারে? শত শত দোষে আমি দোষী, সহস্র সহস্র অপরাধে আমি অপরাধী, মিহিরমোহিনীর প্রণয়ে আমি অবিশ্বাসী। উঃ! বিশ্বাস! জগতে বিশ্বাস কি অমূল্য পদার্থ! এই বিশ্বাসে বিশ্বসংসার অপ্রতিহত গতিতে অহরহ চলিতেছে। অকপট প্রণয়ের অকৃত্রিম বিশ্বাস! সেই বিশ্বাস আমি রাখিতে পারি নাই। মিহিরমোহিনী আমাকে প্রাণের সঙ্গে ভালবাসিত, এখনও বাসে। আমিও একদিন তাহাকে অন্তরে অন্তরে গাঁথিয়া তাহার অন্তরের প্রণয়কে কণ্ঠহার করিয়া গলায় পরিয়াছিলাম, এখন ত আর সে দিন নাই! কিন্তু কাহার দোষে? আমি সহস্র সহস্র দোষে দোষী, আমারই দোষে মিহিরমোহিনী আমার পর হইয়াছে, কিন্তু না ত! আমি ত তাহার পর হই নাই, মিহিরমোহিনী ত আমাকে পর ভাবিতেছে না, আমি পাপী, আমি অবিশ্বাসী,

আমি বিশ্বাসঘাতক; আমি তাহার প্রণয়কে পৃথিবীর ধূলার ন্যায় দূরে পরিত্যাগ করিয়াছি, আমার তুল্য পাপী পৃথিবীতে আর কে আছে? যে প্রেমে ত্রিসংসার বাঁধা, সেই প্রেমে যে নরাধম অবহেলা করে, তাহার তুল্য পাপী সংসারে আর কে আছে? সেই পাপে আমি পাপী, সেই পাপেই আমার এই দুর্দ্দশা! অন্ধ কারাকূপে বন্দিদশায় প্রাণ যায়! পাপিনী যবনী রূপের আগুনে আমাকে দগ্ধ করিয়া আমার অটল অচল মনকে আকর্ষণ করিয়া লইয়াছে! উঃ! কাহাকে পাপিনী বলি! আমি পতঙ্গ, ইচ্ছা করিয়া সেই রূপানলে ঝাঁপ দিয়াছি, এত বিপদেও সেই মূর্ত্তি আমি হৃদয়ে ভাবনা করিতেছি, ভুলি ভুলি করিয়াও ভুলিতে পারিতেছি না, কবির কথা মনে হয়, দারুণ বিষাদে চীৎকার করিয়া বলি, "পৃথিবীতে কভু যেন কেউ কারেও ভালবাসে না।" কিন্তু তখনই আবার ভুলিয়া যাই। প্রাণ যায়, যাউক, হৃদয় দগ্ধ হয়, হউক, অন্তরাত্মা আমারে ছাড়িয়া যাইতে চান, যান্, রেজিয়াকে আমি ভুলিতে পারিব না। রেজিয়া আমার হৃদয়সর্ব্বস্ব, জীবনসর্ব্বস্ব, সংসারসর্ব্বস্ব, রেজিয়ার জন্য এই কারাগারে আমাকে মরিতে হয়, সচ্ছন্দে মরিব, প্রাণে আর আমার বিন্দুমাত্র মায়া নাই, মায়া আমাকে কেন যে এক একবার ছলনা করে, জানি না। ঐ বুঝি তাহারা আসিতেছে! এই বার নিশ্চয়ই প্রাণ যাইবে! বড় দুঃখে হাসি আইসে। প্রাণে আমার মায়া নাই, তবে আবার প্রাণের ভয়ে কাঁপি কেন? যম! যম! যমকে আমার ভয় কি? আমি প্রেমের ভিকারী, প্রেমের সন্ন্যাসী, প্রেমের দায়ে কারাগারে কয়েদী; যমকে আমার ভয় কি? চৈতন্যচরিতামৃতের কবি বলিয়াছেন, "কীর্ত্তনের পরিশ্রম জানেন গৌর রায়!" বর্ণে বর্ণে এই বাক্য সত্য। নামের মহিমা, প্রেমের মহিমা, সংকীর্ত্তনের মহিমা, কেবল গৌরাঙ্গদেবই জানিতেন। প্রেমের মহিমা আমি জানিতাম না, জানিলে মিহিরমোহিনীকে অবিশ্বাস করিতাম না, তাহার পবিত্র অকপট প্রণয়কে কলঙ্কিত ভাবিতাম না, সে বিশুদ্ধ প্রণয়ে সন্দেহও করিতাম না। এখন জানিয়াছি, জীবনে আর রেজিয়াকে ভুলিতে পারিব না। ঐ বুঝি তাহারা আসিতেছে!

বন্দী নিস্তব্ধ। যাহাদের ভয়ে তাহার হৃৎকম্প হইতেছিল, তাহারা

কেহই আসিল না। কারাগারের লৌহ কবাট যে ভাবে যেমন অবরুদ্ধ, সেই ভাবে তেমনি অবরুদ্ধই রহিল, তথাপি গৃহে যেন কাহার সঞ্চার অনু-মিত। বন্দীর নয়ন এক একবার নিমীলিত হইয়া এক একবার অল্পে অল্পে উন্মীলিত হইতেছিল। সহসা ঘোর নিশাকালে নিমীলিত নয়নে বন্দী যেন দেখিল, শিয়রে পদ্মপলাসলোচনা হরমোহিনী দেবীমূর্ত্তি। পরিধান রক্তবাস, অধরে মৃদুমন্দ হাস্য, বাম হস্তে খড়্গ, দক্ষিণ হস্তে বরাভয়। দেবী অভয়া। দেবী যেন প্রফুল্ল বদনে কহিতেছেন, মা ভৈ!

শৃঙ্খলবদ্ধ যুবা মুদিত নেত্রে চিন্তাকুল হৃদয়ে সেই মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া তারস্বরে কহিতে লাগিলঃ—

বড় ভাগ্যফলে আজি, দেবী ভবরাণি!
হেরিলাম হৃদিপদ্মে রাঙা পাদুখানি॥
পড়েছি সঙ্কটে ঘোরে শঙ্করমোহিনি!
দুস্তারে নিস্তার কর ভবনিস্তারিণী॥
বন্দী আমি যবনের অন্ধ কারাগারে।
দাক্ষায়ণী বিনা কে বা রক্ষিবে আমারে?
রক্ষা কর, রক্ষাকালি! এই ভিক্ষা করি।
বিপদের বন্ধু তুমি, জগত ঈশ্বরী॥
কেন আমি আসিয়াছি এ রাক্ষসধামে।
কেন আমি মজিয়াছি রেজিয়ার নামে॥
কে সে পাপীয়সী দুষ্টা? হেরিয়া তাহারে,
কেন আমি মজিয়াছি ভালবাসিবারে॥
ভালবাসা বস্তু কি মা সংসারেতে নাই?
সত্য ভালবাসা হৃদে নাহি পায় ঠাঁই॥
আগে ভালবেসেছিনু, মিহিরমোহিনী,
সে আমার কোথা গেল শঙ্করমোহিনী?

যবননন্দিনীপ্রেমে কেন মজিলাম।
তেমন পবিত্র প্রেম কেন ত্যজিলাম ॥
সে আমার, আমি তার, মনে ছিল তাই।
এখন কোথায় গেল খুঁজিয়ে না পাই ॥
কে মা তুমি আসিয়াছ ? রক্ষিতে আমারে,—
মঙ্গলা অভয়া বুঝি ? নমি মা তোমারে ॥
প্রণতি ও রাঙা পদে শঙ্করী অভয়া।
দয়াময়ী বিশ্বময়ী কর মোরে দয়া ॥
যবনের কারাগারে বন্দী আছি আমি।
সকলি জান মা তুমি, তুমি অন্তর্যামী ॥
অভয়া, অভয়া তুমি, দেহি মা অভয়।
তারো মা এ ঘোর ভয়ে পাইয়াছি ভয় ॥

লোকে ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখে। গাঢ় নিদ্রায় স্বপ্ন হয় না, তন্দ্রাবেশেই স্বপ্ন হয়। এই যুবার নিদ্রাও নয়, তন্দ্রাও নয়, ঘোর বিপদে সশঙ্কিতভাবে জাগরণ। তথাচ যেন স্বপ্ন হইতেছে। স্বপ্নে দেখিতেছে কি ? দেখিতেছে, এক দেবীমূর্ত্তি। লোকে যেমন সৌদামিনী দেখে, চৈত্রমাসের আকাশে যেমন চপলা খেলা করে, যুবা পথিক কারানিবাসে শয়ন করিয়া শৃঙ্খলবদ্ধ বন্দিদশায় সেইরূপ দেবীমূর্ত্তি দর্শন করিতেছে। এক বার দেখিতেছে, একবার হারাইতেছে। চক্ষু তাহাকে বঞ্চনা করিতেছে, কিন্তু কর্ণ বঞ্চনা করিতেছে না। বন্দী শুনিতেছে :—

এসেছি অভয়া আমি রক্ষিবারে তোরে।
কাহারে ডরিস্ তুই ? সঙ্গে সঙ্গে আছি।
জানি আমি মন তোর অখল সরল,
বাঁধা পড়েছিস্ বাছা, যবনের করে,

ভয় নাই, নিস্তারিব, নিস্তারিণী আমি;
অভয়া,—অভয়ারূপে উরিয়াছি ভবে,
ভীম খড়্গ করে করি রক্ষিবারে তোরে।
কার সাধ্য স্পর্শ করে বাছনি আমার,
এক গাছি কেশ তোর! থাকিতে সম্মুখে—
আমি দেবী হরবাণী অভয়া অভয়া।
যাই বাছা! আর আমি থাকিতে না পারি,
দেখা পাবি এই রূপে ডাকিবি যখন।

দেবী অন্তর্দ্ধান হইলেন, স্বপ্নঘোর ভাঙ্গিয়া গেল। বন্দী তখন যেন অকস্মাৎ চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া নেত্র উন্মীলন করিল। দেখিল, কারাগৃহ অন্ধকার, কেহ কোথাও নাই, জাগ্রতস্বপ্নে যে দেবীমূর্ত্তি হৃদয়ে দর্শন করিতেছিল, সে মূর্ত্তির অদর্শন। কিন্তু আশ্চর্য্য! হস্তপদে আর বন্ধন নাই। দ্বার অবরুদ্ধ, কে কোথা হইতে আসিয়া অলক্ষিতে বন্ধন মোচন করিয়া দিয়া গেল! রাজপুত রাজপুত্র তাহা জানিতে পারিল না।

সে কথা অপেক্ষা এ কথা আরও আশ্চর্য্য। একজন বিদেশী পথিক এক যবনকন্যার গৃহে অনধিকারপ্রবেশ করিয়াছিল। অনুচিত প্রেম-সম্ভাষণে অপরাধী হইয়া কারাগারে বন্দী হইয়াছিল। সেই অনধিকার-প্রবেশকারী এখন কি রাজপুত্র? কে জানে সৃষ্টিসংসারের কি খেলা! যদি তিনি রাজপুত্র হন, তাহা হইলে অবশ্যই একদিন পরিচয় পাওয়া যাইবে। আমি যদি এই স্থানে কবি হইতাম, তাহা হইলে এই ক্ষেত্রেই বলিতে পারিতাম, বলিতেও যদি না পারিতাম, জিজ্ঞাসাও করিতে পারিতাম——

রাজপুত্র?—

কোথায় নিবাস তব, কেন আসিয়াছ?
কেন বাঁধা পড়িয়াছ, কোন্ অপরাধে,—

যবনের কারাগারে? প্রেমের পিপাসা,—
জানি আমি, শীতকালে কণ্ঠ শুষ্ক করে!
তুমি কি রাজার পুত্র, প্রেমের ভিকারী?
ধিক্ ধিক্ শতধিক্! ধিক্ হে তোমারে!
পেলে না প্রেমের পাত্রী এ বিশ্বসংসারে?
যবনীতে করিয়াছ প্রাণ সমর্পণ?
সেই পাপে বন্দী আজি অন্ধ কারাগারে।

এ কথাতে কেহ উত্তর দিল না। বন্দী তখন বন্ধনমুক্ত হইয়াছেন, কিন্তু তিনি সুখী নহেন। সুখ কাহাকে বলে, তাহা তিনি জানেন না। কেন জান? তিনি একাকী। জগৎসংসারে কেহ একাকী থাকিতে ভালবাসে না। আসঙ্গলিপ্সা মানবসংসারকে স্নেহমায়াবন্ধনে একত্র জড়ীভূত করিয়া রাখে। এ কয়েদী রাজপুত্রই হউন, দরিদ্রপুত্রই হউন, অথবা ঋষি-পুত্রই হউন, তথাপি তিনি একাকী। সংসারে তাঁহার সুখ নাই। দিনমানে আকাশে সূর্য্যের উদয় হয়। ভারতবর্ষের কবিদের কল্পনায় দিবসে জলে কমলিনী ভাসে আর হাসে। নিশাকালে আকাশে চন্দ্র উদয় হয়, আমাদের কবিকল্পনায় কুমুদিনী ভাসে আর হাসে। কিন্তু একাকী কেহ হাসে না। যে হাসে, সে পাগল। এই যবন-কারাগারের বন্দী শৃঙ্খলমুক্ত হইয়াছেন, বিমুক্ত বাতায়নপথে উষাকালে সুস্নিগ্ধ সমীরণ প্রবাহিত হইতেছে, কিন্তু তিনি হাসিতে পারিতেছেন না। প্রভাত হইবে নিশ্চয়, প্রভাতে সূর্য্য উদয় হইবে নিশ্চয়, কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে সূর্য্যের উদয় হইবে কি না, তাহার নিশ্চয় নাই। চাঁদ যেমন উষাকে ভয় করেন, সূর্য্য তেমনি উষাকে ভাল-বাসেন। আমাদের দশমহাবিদ্যারূপে ধূমাবতীর যেমন বর্ণ, ধূসরবসনা উষাসতীর ঠিক্ সেইরূপ বর্ণ। চন্দ্র কেন যে তাঁহাকে ভালবাসেন না, তিনিই বলিতে পারেন। কেন জান? তিনি তারাপতি,—তিনি কুমুদিনী-পতি। কাহার প্রতি আক্রোশ? ঋষিরা তাঁহাকে উষাপতি বলেন না। উষাপতি কে? শ্রীমদ্ভাগবতে যাঁহাকে উষাপতি বলে, তিনি সত্য উষাপতি

নহেন। ভাক্ত ভাগবত বৈষ্ণবের বাক্য আমি গ্রাহ্য করি না। উষাপতি সূর্য্যদেব। সূর্য্য যখন রক্তবর্ণ হইয়া পূর্ব্বাকাশে উদয় হন, উষা তখন কমলিনীর ঈর্ষায় ঘোমটা দিয়া চলিয়া যান। কিন্তু কপালে একটী সিঁদুরের ফোঁটা। ঢাকার এক জন পাগল কবি বুড়ীগঙ্গার তীরে বসিয়া উষাকালে সর্ব্বাঙ্গে কাদা মাখিয়া ললিত রাগিণীতে উষাসতীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন—

> "অয়ি সুখময়ী উষে! কে তোমারে নিরমিল?
> বালার্ক সিন্দূরবিন্দু কে তোমার ভালে দিল?
> এই ছিল জীবগণ, মহা ঘুমে অচেতন,
> কে বা জাগাইল বল, কে বা বল হাসাইল?"

উষার বর্ণনায় এই কথাই ঠিক। সূর্য্যকে দেখিয়া উষার লজ্জা হয়। ভাসুর বুঝি? তাহা কেন? সূর্য্য বরং তারাদলের ভাসুর হইতে পারেন, কুমুদিনীর ভাসুর হইতে পারেন, উষার ভাসুর হইতে পারেন না। তবে যে উষা কেন ঘোমটা দিয়া পলায়ন করিল, সে কথার মীমাংসা আছে। এখনকার কথা উষার বিদায়, সূর্য্যের উদয়। ধরাধাম স্বর্ণবর্ণ। যবন-কারাগারের বন্দী এতক্ষণ জগৎসংসার অন্ধকার দেখিতেছিলেন, এখন গবাক্ষপথে সূর্য্যের আলো দেখিলেন, মনে হয় ত একটু আনন্দ আসিল, কিন্তু সে আনন্দ কতক্ষণের? চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিলেন, শূন্যময়। পাঠক মহাশয়! আপনি হয় ত নিশাপ্রভাতে এমন শূন্যময় সংসার কোন দিন না কোন দিন দর্শন করিয়া থাকিবেন। কিন্তু এ রাজপুত্রের কি ভ্রান্তি? দ্বার রুদ্ধ, ঘর অন্ধকার, অথচ বন্ধনমুক্ত, তথাপি তিনি জানিতেছেন না, দেবদেবীর দয়া, দেবদেবীর মায়া। আমি বলিতে পারি, এ সকল কেবল আশার লীলাখেলা; আশা আসে আর যায়, জীবলোককে প্রতারণা করে, জীবলোককে আশ্বাস দান করে। আশা চপলা।

অষ্টত্রিংশ প্রবাহ।

আবার তুই?

"——কোথা পদ্মালয়া রমা?
দ্রৌপদী বুঝি?—আ মরি কি সতী!
শাশুড়ীর উপযুক্ত বধূ!"

বীরাঙ্গনা।

আবার তুই? কেন আবার সর্ব্বনাশি! কেন আমার সর্ব্বনাশ করিতে আসিয়াছিস্? প্রভাত হইয়াছে, আমার মনে যে অন্ধকার ছিল, কাকেরা তাহা হরণ করিয়া সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া দূর দূরান্তরে প্রস্থান করিয়াছে। আবার তুই কেন এখানে? অন্ধকার আর আমার অন্তঃকরণকে আচ্ছন্ন করিতে পারে না। তোর কি সাধ্য আর আমাকে প্রতারণা করিস্!

বাহির হইতে কারাগৃহের দ্বার উন্মুক্ত। সত্য সত্যই কারাগারে এক অবগুণ্ঠনবতী রমণীর প্রবেশ। সেই রমণী হাস্য করিয়া কহিল, "তুমি যাহারে উদ্দেশ করিয়া কথা কহিতেছ, আমি সে নহি। আমি রেজিয়া নই, আমি বেগম্ নই, আমি বেগমের সহচরী, মিহিরা।"

"মিহিরা? এ নামে যে আমার বুক্ ফাটিয়া যায়! কিন্তু সে মূর্ত্তি ত তোমার নয়? তুমি কোথা হইতে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলে?"

"আমি?" হাস্য করিয়া অনুচরী কহিল, "আমি? আমি তোমারে অনেক দিন পূর্ব্বে ভালবাসিয়াছিলাম।"

যুবা সচকিত হইয়া কহিলেন, "তুমি আমাকে ভালবাসিয়াছিলে?"

"হ্যাঁ।"

"আশ্চর্য্য কথা!"

"তোমার পক্ষে আশ্চর্য্য হইতে পারে, কিন্তু হ্যাঁ।"

"তুমি থাক কোথায়?" সেইরূপ আশ্চর্য্যভাব প্রকাশ করিয়া সেই বিদেশী যুবা সচঞ্চল স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি থাক কোথায়?"

"নবাববাড়ী।"

"নবাব?—নবাব কে?"

"নবাব।—নাম করিতে নাই। শ্রী—"

"আমি জানি হিন্দুবাই ত পতির নাম ধরে না। কিন্তু তোমাদের বাধা কেন?"

"কেন? তাহা কি তুমি জান না?"

"বিস্মিত হইয়া রাজপুত্র কহিলেন," "তবে কি তুমি—"

"বাধা দিয়া মিহিরা কহিল," "যাহা তুমি অনুমান করিতেছ, তাহাই আমি।"

"বুঝিতে পারিলাম না।"

"যখন বেগমের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে, তখন বুঝিতে পারিবে।"

"বেগমকে আর আমি দেখিব না।"

"কি জন্য?"

"সেই জন্য আমার মহাবিপদ।"

"তবে তুমি কাহাকে দেখিবে?"

"মনে হয় না।"

"মনে কর।"

"মনে করিতে ভয় হয়।"

"তবে সে কি ভূত?"

"এক প্রকার তাই।"

"এক প্রকার কি রকম?"

"পাঁচীলে বসিয়া ছিল, হৃদয়ে নামিয়াছিল, ঝুপ করিয়া কোথায় পড়িয়া গেল!"

"ভূতের নাম জান?"

"জানি।"

"বল দেখি।"

“ভুলিয়া গিয়াছি।—জানিতাম, দেখিয়াছিলাম, এখনও হৃদয়দর্পণে অহরহ দর্শন করি, কিন্তু ভুলিয়া গিয়াছি।”

“আমার নাম জান?”

“জানি।”

“বল দেখি।”

“মিহিরা।”

“কাহার জন্য কয়েদ হইয়াছিলে জান?”

“জানি।”

“বল দেখি।”

“রেজিয়া।”

“আমি রেজিয়ার সহচরী মিহিরা।”

“কর্ণ পর্যন্ত নয়ন বিস্ফারিত করিয়া রজপুত কহিলেন, “তুমি এখানে কি জন্য?”

“প্রয়োজন আছে।”

“আমার নিকটে তোমার কি প্রয়োজন?”

“রেজিয়া বেগমের প্রেরিতা কিঙ্করী।”

“রেজিয়া রাক্ষসী।”

“দূর হতভাগা! রেজিয়া তোমাকে ভালবাসে না।”

যুবা একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

হাস্য করিয়া মিহিরা কহিল, “রেজিয়া গর্ভবতী।”

আবার একটী নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া রাজপুত্র কহিলেন, “আমার কি তাহাতে?”

“তোমার কিছুই না, কিন্তু তুমি কি আমাকে ভালবাসিতে পার?”

“দূর সর্ব্বনাশি! ভালবাসা আমি ভুলিয়া গিয়াছি। একদিন একজনকে আমি ভালবাসিয়াছিলাম। তাহার পর——”

“কি বলিতেছিলে, বল। তাহার পর আবার কি কাহাকেও ভালবাসিয়াছিলে?”

“হাঁ।”

"কাহাকে ?" হাস্য করিয়া মিহিরা জিজ্ঞাসা করিল, "একজনকে তুমি ভালবাসিয়াছিলে, বুঝিয়াছি, কিন্তু কাহাকে ?"

"রেজিয়াকে।"

"এখনও কি ভালবাস ?"

"হুঁ। দেখিতে ইচ্ছা করে। যদি অসাধ্য না হয়।"

"কিন্তু রেজিয়া গর্ভবতী।"

"গর্ভবতীকে দেখিবার আমার অভিলাষ আছে।"

"কিন্তু রেজিয়া তোমাকে দেখিবে না।"

"তবে এ প্রবঞ্চনা কি জন্য ?"

"আমার জন্য।"

"সে কিরূপ ?"

"আমি তোমাকে বরণ করিব, আমি তোমাকে মুসলমান করিব।"

"আমি মুসলমান হইব না।"

"তবে রেজিয়াকে কলঙ্কিনী করিলে কেন ?"

কপালে করাঘাত করিয়া রাজকুমার কহিলেন, "রাক্ষসীকে আমি গ্রহণ করিতে আসি নাই। রূপের আগুনে আমি ঝাঁপ দিতে আসি নাই, কেন যে ঝাঁপ দিয়াছিলাম, তাহাও আমি জানি না, আমার মনে জাগে সেই মিহিরমোহিনী। তুমি সহচরী মিহিরা! তোমার নামের সঙ্গে আমার সেই মিহিরমোহিনীর নামের মিল আছে। যদি পার, যদি সাধ্য থাকে, নিয়ে চল, নিয়ে চল, আমি সেই মিহিরমোহিনীকে দেখিব, রেজিয়াকে আর আমি দেখিব না।"

"তবে ত তুমি বড় কৃতঘ্ন!"

"কেন ?"

"কেন ? যাহাকে ভালবাসিয়াছিলে, যে তোমাকে ভালবাসিয়াছিল, তাহার প্রতি অশ্রদ্ধা ?"

"রেজিয়া কোথায় ?"

"গৃহে।"

"আসিতে বল।"

'"আসিবে না ।"—কিঞ্চিৎ বিদ্রূপে, কিঞ্চিৎ গম্ভীরে, মিহিরা কহিল, "কাহাকে আসিতে বলিব ? তুমি যাহাকে উদ্দেশ করিয়া কহিতেছ, সে আসিবে না ।"

"তবে কাহার জন্য ?"

"আমার জন্য ।"

"তুই কে ?"

"আমি রেজিয়ার প্রতিনিধি ।—আমি তোমারে——"

প্রাণে প্রাণে বাঁধিয়াছি সেই নিশাকালে,
দারুণ শৃঙ্খল দিয়া যুগল চরণে
প্রহরী রূপেতে আমি সঁপিয়াছি প্রাণ,
বিকায়েছি ওই পদে, ভুলিতে নারিব ।
হয়েছি জনম মত, চরণের দাসী,
ত্যজিও না প্রাণকান্ত ! এই ভিক্ষা করি ।
কিঙ্করী তোমার এই কিঙ্করী মিহিরা ।
রাজপুত্রী রেজিয়ার প্রতিনিধি আমি ।"

"প্রতিনিধি ?"

"হ্যাঁ ।"

"আমি প্রতিনিধি গ্রাহ্য করি না ।"

"কর না ?" হাস্য করিয়া মিহিরা কহিল, "তুমি প্রতিনিধি গ্রাহ্য কর না ? তবে মনলমানের গৃহে প্রেমের ভিখারী হইয়া——"

রাজপুত্র চমকিতভাবে চমকিতস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আবার তুই ? আবার রাক্ষসী তুই ? আবার এখানে আমার নয়নে ধাঁধা দিতে এসেছিস্ ? দূর পাপীয়সি !

চাহি না হেরিতে তোর, বিষমাখা মুখ,
দূর হও সর্ব্বনাশী, অবিশ্বাসী, নারী !"

ম্লান বদনে মিহিরা উত্তর করিল, "না ত প্রাণেশ্বর! আমি ত তোমার কাছে অবিশ্বাসিনী নই।"

"অবিশ্বাসিনী নও? তবে কে তুমি?"

অবগুণ্ঠনবতী ঈষৎ হাস্য করিয়া উত্তর করিল, "তুমি কি আমারে চিনিতে পার?"

"জন্মে আর ভুলিব না।"

"কে বল দেখি।"

"গর্ভবতী বেজিয়া।—গর্ভবতী? এ কথা কি সত্য? আমি হিন্দু, তুমি যবনী। এ কলঙ্ক তুমি রাখিবে কোথায়?"

"হৃদয়ে।"

"হৃদয়ে তোমার তত স্থান নাই।"

"আছে।"

"তোমার হৃদয় নাই।"

"কেন হৃদয়েশ্বর?"

"ও নামে আমারে সম্ভাষণ করিও না। আমার হৃদয় আছে। তোমার যদি হৃদয় থাকিত, তাহা হইলে বোধ করি অনন্ত বিচ্ছেদ হইত না।"

"বিচ্ছেদ হয় নাই।"

"তোমার মনে না হইতে পারে, আমার মনেও না হইতে পারে, কিন্তু যিনি এই বিশ্বসংসারের বিধাতা, তিনি যেন বলিয়া দিতেছেন, তোমাতে আমাতে অনন্ত বিচ্ছেদ।"

"আচ্ছা! যিনি সে কথা বলিয়া দিতে পারেন, তিনি কি আমাদের যুগল প্রণয় অবিচ্ছেদে থাকিবার উপদেশ দিতে পারেন না?"

"পারেন, কিন্তু তোমার হৃদয়ে কি,—যদি হৃদয় থাকে,—সেই হৃদয়ে কি পবিত্র প্রণয় রাখিবার স্থান আছে?"

"অপ্রতুল নাই।"

"কেন তুমি আমাকে ভালবাসিয়াছিলে?"

"ভালবাসার উপদেশ এই।"

"কিন্তু এখন?"

"তোমার মনে হয় তাহাই, কিন্তু আমি রেজিয়া নই, রেজিয়ার কিঙ্করী মিহিরা।"

"ভুলিয়া যাইতেছিলাম।"

কথা হইতেছে, এমন সময়ে দুইজন চোপ্‌দার অকস্মাৎ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া ঘনগম্ভীর গর্জ্জনে জিজ্ঞাসা করিল, "কয়েদী শৃঙ্খলে বাঁধা ছিল, খালাস করিয়া দিল কে?"

অবগুণ্ঠনবতী মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকেও ত তোমরা কয়েদ করিয়া রাখিয়াছিলে, আমাকেই বা খালাস করিয়া দিল কে?"

চোপ্‌দারেরা স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

"রেজিয়া! তুমি কি আমাকে ছলনা করিতে আসিয়াছিলে? আবার তুমি কি আমাকে ছলনা করিতে আসিয়াছ?"

"ছলনা আমি শিখি নাই। চাতুরী আমার হৃদয়ে স্থান পায় না।"

"তবে বল দেখি কেন?"

"কেন? সে কথায় উত্তর আমি জানি না।"

ভাবভঙ্গী দর্শন করিয়া চোপ্‌দারেরা গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় মিহিরা কহিল, "বাদসাহের অনুমতি, আমি—আমি স্বয়ং এই হিন্দুকে এই রাজ্যের রাজা করিব। চোপ্‌দারেরা চলিয়া গেল। মিহিরা মৃদু হাসি হাসিয়া সেই যুবাপুরুষকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি এই যবনরাজ্যের রাজা হইবে? জীবিতেশ্বর! আমাকে কি তুমি চিনিতে পার? কে আমি জান?"

"জানি তোমাকে। তুমি বেগম, তুমি রেজিয়া, তুমি গর্ভবতী, আর আমি তোমাকে গ্রহণ করিতে পারি না।"

আবার হাস্য করিয়া মিহিরা কহিল, "আমি রেজিয়া নই; আর কোথাও কি তুমি আমারে দেখিয়াছিলে?"

"মনে হয় না।"

"ভাল করিয়া মনে কর।"

"রেজিয়া কোথায়?"

"হৃদয়েশ্বর! এত ভুল কেন তোমার? জানি—

হৃদয়ের রাজা তুমি, হৃদিসিংহাসন—
পাতিয়া রেখেছি নাথ! কর আরোহণ॥
তোমারি আশ্রিতা দাসী, ডাকিছে তোমায়।
কৃপা করি পদাশ্রয় দাওহে আমায়॥
চিনিতে নারিছ মোরে, মুগ্ধ মায়াঘোরে।
মায়া আর থাকিবে না ভবমায়াঘোরে॥
আমি হে তোমারি দাসী, মিহিরমোহিনী,
চিনিতে কি পার মোরে? নব সরোজিনী—
যে দিন ফুটিয়াছিল পুকুরের নীরে,
উভয়ে বসিয়াছিনু, স্রোতস্বতী-তীরে॥
আকাশে উঠিয়াছিল, শত শত তারা।
আমাদের ভাব দেখে ডুবে ছিল তারা॥
সেই আমি সেই তুমি মিলেছি আবার,
যবনী নহি ত আমি, তুমি হে আমার॥
ছল করি সেজেছিনু কিঙ্করী মিহিরা,
ছলিবারে এসেছিল, ছদ্ম প্রহরীরা॥
ছলে ছলে করেছিল শৃঙ্খলে বন্ধন।
শৃঙ্খলেতে বাঁধা ছিনু দু ঘরে দুজন॥
কেহই কিছুই নহে, তুমি আর আমি।
চরণের দাসী আমি, তুমি মোর স্বামী॥
যবনতনয়া নই, মিছে সে কাহিনী।
তোমারি কিঙ্করী আমি মিহিরমোহিনী॥"

"কিসে বিশ্বাস হইবে?"

সুন্দরী একটু গ্রীবাভঙ্গী করিয়া উত্তর করিল, "বিশ্বাসের নিদর্শন দেখিতে কে ইচ্ছা করে?"

"হৃদয়।"

"হৃদয়ে কি কেহ প্রবেশ করিতে পারে?"

"কেহ পারে না, কিন্তু তুমি পার।"

"কৃতার্থ হইলাম!"

"তবে কি সত্যই তুমি মিহিরমোহিনী?"

"হুঁ।"

"তবে তুমি গর্ব্ববতী কেন?"

"তোমাকে ঠকাইবার জন্য।"

"আমাকে ঠকাইয়া তোমার কি লাভ?"

"আছে কিছু।"

"বল।"

"বলিতে পারিব না।"

"তবে কিরূপে বুঝিব?"

"অনুভবে।"

"অনুভব অধিক দূরে যায় না।"

যায় না? তবে শুন। তুমি হয় ত মনে মনে জানিতে, মিহিরমোহিনী তোমাকে ভালবাসে। মিহিরমোহিনী হয় ত মনে মনে জানিত, তুমি তাহাকে ভালবাস, কিন্তু বিচ্ছেদ হইয়াছিল কি জন্য, সে কথা তুমিও জান না, মিহিরমোহিনীও জানে না। বিচ্ছেদে বড় সুখ আছে। যাহারা বিচ্ছেদ জানে না, যাহারা বিচ্ছেদকে ঘৃণা করে, বিচ্ছেদকে নিন্দা করে, তাহারা প্রণয়ের মর্ম্ম জানে না। বিচ্ছেদ বড় সুখের বস্তু। বিচ্ছেদে প্রণয়ের পরীক্ষা হয়। কবির উপদেশে যে বিরহিণী বিরহ-বেদনায় কহিয়াছিলেন,

"আয়রে বিচ্ছেদ রাখি তোরে, যতনে হৃদিমাঝারে,
জনমের মত তোরে সে সঁপে গেছে আমারে।"

সে বিরহিণী ধন্যা। তাঁহার হৃদয়ে অকপট প্রণয় ছিল। পবিত্র প্রেম ভিন্ন সে বিরহিণী আর কিছুই জানিতেন না। কিন্তু এখন যে দুষ্ট কবি বলেন,—

"গেল গেল প্রেম গেল, তাহাতে কি ক্ষতি আছে।
তাহারে ছাড়িলে পরে আমার জীবন বাঁচে॥"

সে কবির মস্তকে বামাচরণের বামাঙ্গুলী স্পর্শ হয়। প্রণয় যে কি বস্তু, সে কবি তাহা জানিতেন না। এই জন্যে দেখা হইয়াছে। রূপসী পদ্মা, সহচরী চন্দ্রা, প্রহরী দল, আর সেই যে বেদিয়া বেগম, সেও হয় ত ছদ্মরূপিণী।

"আবার তুই?" বন্দী বাদল তিরস্কারস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যবনি! আবার তুই?"

যবনী উত্তর করিল, "না প্রাণেশ্বর! আমি প্রবঞ্চনা করিতেছি না। যবনের আশ্রমে আমি আশ্রয় লইয়াছি, অপবিত্র হই নাই, যবনকে প্রণয় দান করি নাই। প্রাণ তাহা পারিবে না। যবন,—যবন দূরে থাকুক, দিবসের সূর্য্য, নিশাকালের চন্দ্র আকাশের পবন, অনায়াসে আমাকে স্পর্শ করিতে পান না। যদি করেন, যদি পান, পবিত্র হইবেন। সে স্পর্শে আমি কলঙ্কিত,—অপবিত্র হইব না। আমি কেবল তোমারই জন্যে। বেশ দেখিয়া আমাকে তুমি চিনিতে পারিতেছ না, কিন্তু আমিই সেই চিত্তির-মোহিনী। তুমি আমাকে ভুলিতে পার, তুমি, আমার প্রতি সন্দেহ করিতে পার, কিন্তু আমি তোমারে ভুলি নাই, আমি তোমার প্রতি সন্দেহ করি নাই। কিন্তু একটী কথা।"

"বল।"

"কারাগার হইতে তোমারে উদ্ধার করিল কে?"

"জানি না রূপসি! আমি ঘুমাই নাই, জাগিয়া ছিলাম। হাতে পায়ে নিগড় বন্ধন ছিল, একটী স্বর্গীয় দেবী আকাশ হইতে নামিয়া আসিয়া আমারে অভয়দান করিলেন। আহা! কি অপূর্ব্ব রূপ! কি অপূর্ব্ব মাধুরী! তেমন চমৎকার রূপ আমি স্বপ্নেও আর কখনও দর্শন করি নাই।"

"দেবী তোমারে বলিলেন কি?"

"সব কথা মনে নাই। কেবল এই কথা মনে আছে, তিনি কহিলেন, জাগ্রত স্বপ্নে তিনি কহিলেন,—ভয় নাই! যাহারে ভাবনা কর, তাহারে পাইবে।"

"দেবীর নাম কি বলিতে পার?"

"অভয়া।"

"রূপ কি বলিতে পার?"

"অভয়া।"

"আমিও সেই রূপ স্বপ্ন দেখিয়াছি। টুক্‌টুকে রাঙা হস্তে তিনি যেন আমারে অভয় দান করিতেছিলেন। তুমিও যাহা দেখিয়াছ, আমিও তাহা দেখিয়াছি। তোমাতে আমাতে অনন্ত বিচ্ছেদ হইবার আশঙ্কা ছিল, সে আশঙ্কা আর থাকিল না। আমি যবনকন্যা নই, যবনের পত্নীও নই, তোমারই চরণের চিরদাসী।"

"যদি তাই, তবে এতক্ষণ এত ছলনা করিতেছিলে কেন?"

"পরীক্ষার জন্য।"

"কিসের পরীক্ষা?"

"প্রণয় পরীক্ষা।"

"তাহার জন্য এতদূর চাতুরী?"

"চাতুরী ত আমি জানি না প্রাণেশ্বর! আমিঃ——

জীবিতেশ!

তোমারি কিঙ্করী এই, অবিশ্বাসী নারী।
হৃদয়ে রেখেছি গেঁথে ভুলিতে কি পারি?
কাহারে বিশ্বাস বলে, কিছু জানি নাই।
তথাপি বিশ্বাস রাখি, প্রেমগীত গাই॥
গাই বটে প্রাণেশ্বর! যাহা আসে মনে।
উদয় যখন হও হৃদয় গগনে॥

তখন কাহারে আর নাহি পড়ে মনে ।
বেঁধে রাখি তোমা ধনে জীবনে জীবনে ॥
অবলা সরলা নারী, তোমারি এ দাসী ।
মনে মনে তোমা ধনে বড় ভালবাসি !"

"দূর সর্ব্বনাশি ! তোর ধিক্ ভালবাসা ।
বেসেছিলে সত্য বটে, ফুরায়েছে আশা ॥
আগে বেসেছিলে বটে, এখন তা নাই ।
কোথায় প্রণয় তব, খুঁজিয়া না পাই ॥
ভালবাসিয়াছ সতি ! দাসের সন্তানে ।
তবু সতি ! গাঁথা আছ মম প্রাণে প্রাণে ।
আর ভালবাসিব না করিয়াছি পণ ।
জগতের ভালবাসা করি বিসর্জ্জন ॥"

কাঁদিয়া কাঁদিয়া মিহিরমোহিনী উত্তর করিল, "কত দিনের জন্য ? ইহারে পরিত্যাগ করিয়া এক পক্ষ পরে আমি বৃন্দাবনবাসিনী হইব ; তোমাতে আমাতে কখনই——"

"তাহা ত বুঝিলাম, এক পক্ষ আমার পক্ষে যদি এক যুগ হয়, তাহা হইলে সেই কুকুর ত তত দিন আমার রাজ্য অধিকার করিবে ?"

মিহিরমোহিনী হাসিয়া কহিল, "তাহা কি কখনও সম্ভব হইতে পারে ; আমার ভুল আছে, তোমার ভুল আছে, যিনি পৃথিবীতে প্রেম প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহারও হয় ত ভুল আছে।"

"ভুল নাই। আমি যেন বুঝিতেছি, তুমি পরের।"

আবার একটু মৃদু মৃদু হাসিয়া মিহিরমোহিনী কহিল :——

"সে কি কথা প্রাণেশ্বর ! পর তুমি মম ?
তুমি যদি পর, তবে নিহারি কাহারে,
জুড়াইবে এ দাসীর জ্বলন্ত হৃদয় ?"

"তোর কি হৃদয় আছে ? পাপিনী সাপিনী !
ক্ষীরসুধা দিয়ে আমি পালিয়াছি তোরে,
তারি প্রতিফল তুই দিয়াছিস্ ভাল।
আশীর্ব্বাদ করি সতি ! সুখে থাক তুমি।"

"ক্ষমা কর প্রাণনাথ ! অধিনী দাসীরে,
বহু পাপী হইয়াছি চরণে তোমার।
পাপের কি ক্ষমা নাই, ক্ষমা ভিক্ষা করি,
কৃপা কর কৃপাময়, ধরি শ্রীচরণে।
আশ্রিতা এ দাসী তব, চিরদিন তরে,
রহিয়াছে পদসেবা করিবার হেতু।
বঞ্চিও না প্রাণেশ্বর ! এই অভাগীরে।
কৃপণতা করিও না প্রার্থনা আমার।"

"তুই সর্ব্বনাশী আবার কেন এখানে ? জানিয়াছি, তুই যবনকন্যা। হয় ত তুই কাহারও মুখে শুনিয়াছিলি, সেই নাম।"

"সেই নাম। সেই নাম। সেই নাম ত আমার। তুমি আমারে মিথ্যা-বাদিনী মনে করিও না, তুমি আমারে অবিশ্বাসিনী ভাবিও না, আমি তোমারে প্রাণমন সমস্তই সমর্পণ করিয়াছি। প্রাণ তোমারই,—আমিই তোমার সেই মিহিরমোহিনী।"

"জানি তা, যদি তুমি মিহিরমোহিনী হও, মিহিরমোহিনী থাক, আমারে বঞ্চনা করিয়া,—কিন্তু প্রাণেশ্বরি ! কেন তুমি যবনকুমারী ?"

"তোমারি জন্য।"

"আমার জন্য ?"

"হুঁ।"

"তুমি না কি গর্ভবতী ?"

যুবতী একটু হাস্য করিলেন। সেই হাস্যের ভাবে প্রকাশ পাইল, পরিহাস। যুবা কহিলেন, "উত্তর করিতেছ না কেন?"

"কেন? উত্তর ত করিয়াছি।"

"সে উত্তরের অর্থ আমি কিছু বুঝিতে পারি নাই।"

"সে অপরাধ কাহার?"

"তুমি তাহা বুঝিতে পার না।"

"কেন বল দেখি।"

"সময়ে উত্তর করিব।"

"আমাকে তবে কি তুমি অবিশ্বাস কর?"

"বিশ্বাস অবিশ্বাস বুঝিতে পারি না, কিন্তু কেন তুই এখানে?

যারে আমি হারায়েছি জনমের মত,
ভুলিয়া গিয়াছি যারে, ভুলিবার নয়—
যে ধন, সে ধন কেন নিকটে আমার?"

"কেন প্রাণাধার! কেন ভুলিলে আমায়?
কোন্ দোষে দুষী দাসী তব শ্রীচরণে"

"দুষী না প্রেয়সি তুমি! অদৃষ্টের দোষে—
হারায়েছি তোমা ধনে যাও বিধুমুখি!"

"কোথা যাব জীবেশ্বর! ছাড়িয়ে তোমায়?"

"যথা ইচ্ছা যাও তুমি, সুধায়োনা মোরে।
বুঝিয়াছি মন তব কলঙ্কিনী তুমি।"

"পুনরায় সেই কথা, কলঙ্ক আমার?
তোমার কথায় নাথ কলঙ্কের হার—
উঠিয়া বসেছে শিরে! শিরোচূড়াসম।

রাণী যদি হইতাম, শোভিত মস্তকে,—
সেই তিরস্কাররাশি, মিহির-জ্যোতিতে,
রতন কিরীট সম শোভিত উজ্জ্বল।”

“খোষামোদ নাহি ভালবাসি——
সুখে থাক সুরেশ্বরি! প্রণয়ে তোমার
উদাসী হইব আমি, যাব বনবাসে,
তীর্থে তীর্থে বিচরিব সন্ন্যাসী হইয়া।”

“সে কি! সে কি! সে কি প্রাণেশ্বর! আমার জন্য তুমি সন্ন্যাসী হইবে? আমার জন্য তুমি বনবাসী হইয়া বনতীর্থে বিচরণ কবিবে? তাহা ত আমি সহিতে পারিব না। লোকে যদি বলে, তাহা ত আমি শুনিতে পারিব না। প্রহরী আসিয়াছিল, বীরপুরুষ আসিয়াছিল, তোমারে আমারে লোহার শৃঙ্খলে বন্ধন করিয়াছিল, সে বন্ধন প্রেমবন্ধন। তাহারা আমার অনুচরী কিঙ্করী। ছদ্মবেশে ছলনা। মিহিরা আসিয়াছিল, আমার নামের সঙ্গে তাহার নামেব মিল আছে, সে আমার প্রাণপ্রিয় সহচরী। তাহাকে দেখিয়া তোমার ভয় কি? প্রহরী দেখিয়া তোমার ভয় কি? আমারই জন্য,— তোমারই জন্য,—এই রাজপুরীতে এত ছলনা হইতেছিল।”

“সত্য কি তুমি মিহিরমোহিনী? তবে কি তোমার জাতি গিয়াছে? তবে কি তুমি যবনপত্নী হইয়াছ? প্রতারণা কর কেন? সত্য করিয়া বল, তুমি কি সেই রেজিয়া?”

“আমি বেজিয়া নই, আমি যবনকুমারী নই, আমি তোমারই চরণের দাসী মিহিবমোহিনী।”

“বিশ্বাস ত হয় না!”

“কিসে অবিশ্বাস জীবিতেশ্বর!”

“অবিশ্বাস? এখনও জিজ্ঞাসা করিতেছ, কিসে অবিশ্বাস? আর অবিশ্বাসের অবশিষ্ট কি আছে? পুনঃ পুন জিজ্ঞাসা করিতেছি, আবার তুই?”

"কেন হৃদয়েশ্বর! এত আমারে তিরস্কার কর কেন? তুমি ভিন্ন আমার গতি নাই, তুমি ভিন্ন আমার মতি নাই, তোমাকে ছাড়িয়া পৃথিবীতে যদি বাঁচিয়া থাকিতে হয়, তাহা হইলে জানিব,—নিশ্চয় জানিব, ধর্ম্মরাজ নাম কেবল নাম মাত্র, কথা মাত্র।"

"দূর বিশ্বাসঘাতিনি! দূর মিষ্টভাষিণি! দূর কালসাপিনি! নারী-জাতির মিষ্টবাক্যে যাহারা প্রতারিত হয়, তাহারা বর্ব্বর, তাহারা গর্দ্দভ। লোকে এ কথা বলে বটে, কিন্তু আমি বলিতে পারি না। তোরে আমি এক দিন প্রাণের সঙ্গে ভালবাসিতাম, এখন তুই,—পাপীয়সী রাক্ষসি! পরের হইয়াছিস্, দেখা হইলে মধুর হাসি হাসিয়া মধুর বচনে কথা কহিস্, আমাকে ভিন্ন আর কাহাকেও যেন জগৎসংসারে দেখিতে পাস্ না, এই ভাণ জানাস্, কিন্তু আমি জানিয়াছি।"

"কি তুমি জানিয়াছ প্রাণেশ্বর?"

"প্রাণেশ্বর কাহাকে বল?"

"কেন প্রাণেশ্বর?"

"তোমার কি প্রাণ আছে?"

"প্রাণ আমারে ত পরিত্যাগ করিয়া যায় নাই, তুমি পরিত্যাগ করিয়াছ, প্রাণ যদি পরিত্যাগ করিয়া যায়, তাহা হইলে ত বাঁচি। জলে ডুবিয়া পারি, বিষ খাইয়া পারি, গলায় ছুরি দিয়া পারি, আগুনে পুড়িয়া পারি, প্রাণ আমি বাহির করিব। হৃদয় দগ্ধ হয়, কিন্তু প্রাণ বাহির হয় না, বুক ফাটিয়া যায়, বুক চড় চড় করে, তথাপি প্রাণ বাহির হয় না। হৃদয় আমার তোমারি হৃদয়ে সমর্পণ করিয়াছি, হয় ত সেই জন্য।"

"হৃদয়? পাপীয়সি! তোর কি হৃদয় আছে? হৃদয় থাকিলে পরের প্রাণ পরের হইত না। আমার হৃদয় আছে, সেই কারণে তোরে এখনও ভালবাসি। যবনপত্নি! যবনপুত্রের কামিনি! তুই কেন এখানে? কেন আমি বার বার জিজ্ঞাসা করি, আবার তুই? আমি তোরে—

প্রেমফুলে মালা গেঁথে গলে পরিতাম।
প্রাণে প্রাণে আমি তোরে ভালবাসিতাম॥

সে দিন গিয়াছে সখি! কুদিন উদয়।
আর কি তোমার সাথে ভালবাসা হয়?
হয়েছ পরের প্রাণ, যবনের নারী।
আমি কি তোমারে ভালবাসিবারে পারি?"

"কেন প্রাণেশ্বর! তুমি আমাকে ভালবাসিতে পার না কেন? পরীক্ষা করিবার জন্য আমি এই যবনরাজ্যে যবনকন্যা সাজিয়াছিলাম, তাহা বলিয়া তুমি কি আমারে পরিত্যাগ করিবে? আমি কি তোমারে পরিত্যাগ করিব?"

"তুমি পরিত্যাগ করিবে কি না, তুমি জান, কিন্তু যবনপত্নীকে আমি স্পর্শ করিব না। হলাহল পান করিলে প্রাণ যায়, তাহা স্পর্শ করিতেও ভয় আছে।"

"ভয়? খড়্গখর্পরধারিণী অভয়া সে রাত্রে না কি তোমাকে অভয়দান করিয়া গিয়াছেন?"

"আবার তুই?—অভয়ার অভয়দান তুই কিরূপে জানিলি রাক্ষসি?"

"যুগলেরই স্বপ্ন হয়েছিল।"

চমকিত হইয়া যুবাপুরুষ কহিলেন, "সত্য?"

"সত্য।"

"তবে তুই কেন এখানে?"

"ভুলিতে পারি না।"

"কাহাকে?"

"প্রাণ যাহাকে ভালবাসে, তাহাকে।"

"তোর প্রাণ কাহাকে ভালবাসে?"

"যাহাকে ভালবাসে, সেই জানে।"

"আবার তুই?"

"হুঁ।"

"কেন আর অন্বেষণ করিস্?"

"পাখীকে বড় ভালবাসি।"

"পাখী ত বনবাসী।"—নিশ্বাস ফেলিয়া নবাগত যুবাপুরুষ নৈরাশ্য-ব্যঞ্জক স্বরে ধীরে ধীরে কহিলেন, "পাখী ত বনবাসী!"

"হুঁ।"

"তবে?"

"তবে, আমার হৃদয়ে একটী পিঞ্জর আছে, সেই পিঞ্জরে একটী পাখী থাকে, সেই পাখী কোথায় উড়িয়া গিয়াছে, কোথায় কে ধরিয়া রাখিয়াছে, হৃদয়মাঝে শূন্য পিঞ্জর পড়িয়া রহিয়াছে।"

"তাহাতে কি বুঝিব?"

"তুমি বুঝিতে না পার, আমার অন্তরাত্মা বুঝিতে পারেন।"

"আবার তুই?"

"হুঁ।"

"আমার সম্মুখে তুই কি জন্য?"

"জন্য—জন্য আমি জানি না।"

"আচ্ছা, যদি জান না, তবে বল দেখি, আমরা কয়েদী ছিলাম, তুমি আর আমি দুজনেই কয়েদী, আমাদের মুক্ত করিল কে?"

"দয়া।"

"না ত! দয়া ত নিকটে ছিলেন না।"

"তবে কে?"

"অভয়া।"

"অভয়া! কে সেই অভয়া?"

"কে সেই অভয়া? স্বপ্নে কি তিনি তোমারে দর্শন দেন নাই? সেই দুঃখেই বলি, আবার তুই? আমারে যিনি দর্শন দিয়াছিলেন, তাঁহারে কি তুমি দেখিতে পাও নাই? তবে তুমি মিহিরমোহিনী নও, পিশাচী নিশাচরী যবনকুমারী।"

"না প্রাণেশ্বর! আমি যবনী নই, আমি মিহিরমোহিনী।"

"যদি মিহিরমোহিনী হও তবে স্বপ্নে সেই শিবমোহিনীকে দেখিতে পাও নাই কেন?"

"অদৃষ্ট।"

"ঠিক কথা, অদৃষ্টে যাহা থাকে, কপালে বিধাতা যাহা লিখিয়াছেন, কেহ তাহা খণ্ডন করিতে পারে না।"

"তুমি কি দেখিয়াছিলে ?"

"কি জিজ্ঞাসা করিতেছ ?"

"স্বপ্নে যিনি দর্শন দিয়াছিলেন, তাঁহারে কি তুমি দেখিয়াছিলে ?"

"হুঁ !"

"নাম জান ?"

"অভয়া।"

"রূপ কেমন ?"

"রূপ অতি চমৎকার ! ঠিক যেন :—

শরতের সৌদামিনী পশ্চিম গগনে।
মধুর মধুর হাসি বিকাশে বদনে॥
চাঁচর চিকণ কেশ পৃষ্ঠদেশে দোলে।
নীলকৃষ্ণ মেঘ যেন চপলার কোলে॥
স্বর্ণবরণা সতী রক্তবস্ত্র পরা।
এলোকেশী মহেশ্বরী ভীম খড়্গধরা॥
পদতলে বিরাজিছে দুর্জ্জয় কেশরী।
হাসিমুখী মহাদেবী ত্রিপুরাসুন্দরী॥
এক হস্তে বরদান করেন বরদা।
যে হস্তেতে অন্ন দান করেন অন্নদা॥
এক হস্তে দেখিলাম অভয় অভয়।
রূপ দেখি ভুলে গেছি, হয়েছি অভয়॥"

"আমিও স্বপ্নে সেই মূর্ত্তি দেখিয়াছি।"

"যবনকন্যাকে কি তিনি দেখা দেন ?"

"অনুমান কর।"

"আমি আর অনুমান করিব কি? আপনাব মুখে তুমি আপনিই বলিয়াছ, তুমি যবনকুমারী, যবনপত্নী।"

"সে কেবল পরীক্ষার জন্য।"

"কাহাকে পরীক্ষা কর?"

"যে আমার প্রাণের প্রাণ, হৃদয়ের হৃদয, তাহাকে।"

"সে পরীক্ষার কি ফল?"

"দেখ।"

"তবে কি তুমি দেবী অভয়াকে দর্শন করিযাছ?"

"হুঁ!"

"দেবী তোমারে কি বলিয়াছেন?"

"বলিয়াছেন,—শুনিতে চাও, শোন তবে। দেবী বলিয়াছেন :——

পাবি তারে যারে তুই ভাবিস্ সুন্দরী।
অভয়া রূপেতে আমি আশীর্ব্বাদ করি॥
সে আমার বরপুত্র, তুই বরাঙ্গনা।
যুগলে মিলন হবে নলিন নয়না॥
বহু দিন বিচ্ছেদের হবে অবসান।
সুদিন উদয় হবে, দূরে যাবে মান॥
অভিমানে সতি তোর অস্তগত শশী।
আবার হাসিবে আসি, হৃদাকাশে বসি॥
শশীর উদয়ে যথা জলে কুমুদিনী।
হাসি মুখে নৃত্য করে হয়ে প্রমোদিনী॥
তেমনি হাসিবি তুই হেরি শশধরে।
যথা কুমুদিনী হাসে স্বচ্ছ সরোবরে॥

আমি ঘুমাইতেছিলাম, দেবী আমাকে এই সকল কথা বলিয়া মুক্ত-কেশী বেশে স্বপ্নে দেখা দিয়া কোথায় লুকায়ে গেলেন, আর দেখিতে পাইলাম না।"

"আবার তুই? সত্যই কি তুই মিহিরমোহিনী? তবে ত তোমার প্রণয়ে সংশয় করিয়া আমি প্রণয়দেবের নিকটে অপরাধী হইয়াছি। তুমি যবনকন্যা নও,—তাহা হইলে দেবী অভয়া তোমাকে দর্শন দিতেন না,—দূর সর্ব্বনাশি! তুই যবনী। তাহা না হইলে আমাকে এত যন্ত্রণা পাইতে হইবে কেন?"

উভয়েই পাগল।—সত্য না হইতে পারে, কিন্তু অবস্থার গতিকে উভয়েই ঠিক যেন পাগল।—এক কথাই বারম্বার তুলিতেছে;—এক কথাই বারম্বার বলিতেছে। পাঠক মহাশয় ইহাদের কথোপকথনে কতই পুনরুক্তি দেখিতেছেন, কতই অসম্বদ্ধ ভাষা পাঠ করিতেছেন, তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না। অভয়ার কথা দুই তিনবার হইয়া গেল। অবশেষে সেই উত্তেজিতা উন্মাদিনী রমণী বলিয়া উঠিল, "তুমি যন্ত্রণা পাইতেছ, সে কেবল তোমার মনের দোষে!"

"মনের দোষ কি প্রকার?"

"তা কি তুমি জান না?"

"না।"

"আমারে অবিশ্বাস করিয়াছিলে কেন? আমার প্রণয়ে সন্দেহ জন্মিয়াছিল কেন? পবিত্র অকপট, অকৃত্রিম যে প্রণয়, যথার্থ প্রেমিকের হৃদয়ে সে প্রণয় চিরদিনের জন্য স্থান পায়, কিন্তু আমি:—

সব হারাইয়ে গেছি, অভাগিনী আমি।
জানেন আমার দশা ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী॥
এক দিন যদি আমি ভালবাসিতাম।
এক দিন ওই পদে দাসী হইতাম॥
তবে তুমি ভুলিতে না এবে ভুলিয়াছ!
অভাগীর ভাগ্যদোষে ভাল করিয়াছ॥
ভুলেছ করেছ ভাল, পাপীয়সী দাসী।
কেন হয়েছিল তব প্রেম অভিলাষী?

সাগর ছেঁচিয়া লোকে লভয়ে রতন !
আমিও তেমনি করি, করিয়ে যতন ॥
তোমারে পাইয়াছিনু হৃদয় রতন।
হারাইয়ে গেলে কোথা হৃদয়ের ধন ?
এই না নিকটে ছিলে ? দেখা নাই আর।
যদ্যপি কপালে থাকে দেখিব আবার ॥
বড় পাপীয়সী আমি তেয়াগি তোমারে।
ভজিয়াছি অকারণে দাসীর কুমারে ॥
ছাড়ি ছাড়ি মনে করি, ছাড়িতে না পারি।
তবু হে একান্ত কান্ত আমি হে তোমারি ॥
মনে মনে আমি তব গুণ গান করি।
মানসে শ্রীপাদপদ্ম নিত্য পূজা করি ॥
তথাপি কেমন রাহু গ্রাসিয়াছে মোরে।
ভুলাইয়া দেয় সব, মায়ামন্ত্রঘোরে ॥
মোহিয়াছে মায়ামন্ত্রে শনি রাহু কলি।
কিছু আর মনে নাই. কারে বা কি বলি !!"

"এই না বলিতেছিলে, আমি যবনকন্যা নই ?"

"না ত।"

"তবে এমন কথা বলিতেছ কেন ?"

"ভ্রান্তি।"

"ভ্রান্তি কি আর তোমারে পরিত্যাগ করিবে না ?"

"করিবে।"

"কত দিনে ?"

"যে দিনে সুদিন মম উদয় হইবে।
সে দিনে আমারে ভ্রান্তি ছাড়িয়া যাইবে ॥

আমার হৃদয়-ধন আমারি হইবে।
মনে মনে মানসের আঁধার ঘুচিবে॥”

“বুঝিলাম না।”

“অভিধান অন্বেষণ কর।”

“অভিধান আমার হৃদয়ে।”

“তবে আর কি করিয়া বুঝাইব?”

“বুঝাইবার ত আর সাধ্য নাই।”

“কেন জীবিতেশ্বর!”

“তুমিই বিবেচনা কব।”

“আমার বিবেচনা এখন তোমাব হাতে।”

“তবে সত্য কি তুমি মিহিরমোহিনী?”

“সত্য।”

“তুমি কি তবে রেজিয়া?”

“হুঁ।”

“আমি তবে অবিশ্বাসী?”

“অন্তরাত্মাকে জিজ্ঞাসা কব।”

“আমি প্রতারক?”

“অবশ্য।”

“আমি বিশ্বাসঘাতক?”

“অবশ্য।”

“আমি রেজিয়াকে ভালবাসি?”

“হ্যাঁ।”

“মিহিরমোহিনীকে ভালবাসি না?”

“না।”

“যদি রেজিয়া আর মিহিরমোহিনী এক, তবে মিহিরমোহিনীকে ভাল না বাসিবাব কারণ কি?”

“অনুমান কর না।”

রহস্যপ্রিয় প্রণয়বিমুগ্ধ যুবা প্রণয়ী সংশয়ে কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া রহস্যচ্ছলে সুদৃঢ়স্বরে উত্তর করিলেন, "অনুমানে আমি অসমর্থ।"

"তবে ভালবাসাতেও তুমি তাই।"

"সে কি প্রাণেশ্বরি?"

"ঐ যবন আসিতেছে।"

"যবনে আমার কি ভয়?"

"তুমি ভালবাসিতে জান না, সেই জন্য যবনে আমি প্রাণ দিয়াছি।"

"দিয়াছ?"

"না।"

"তবে এ কথা বল কেন?"

"দিব।"

"আমাকে পরিত্যাগ করিবে?"

"না।"

"তবে যবনকে প্রাণ দিবে কিরূপে?"

"তুমি ভালবাসিতে জান না।"

"তবে সত্যই আমাকে পরিত্যাগ করিবে? সত্যই যবনকে প্রাণ দিবে? মিহিরমোহিনি! আঃ! প্রাণাধিকে! প্রিয়তমে! হৃদয়েশ্বরি! হৃদয় যে বিদীর্ণ হইয়া যায় প্রাণেশ্বরি! সত্যই তুমি যবনের হইবে?"

হাস্য করিয়া মিহিরমোহিনী কহিলেন,—"প্রাণেশ্বর! প্রাণ কি আমার আর আমার আছে? জীবিতেশ্বর! আমি তোমারেই প্রাণ সমর্পণ করিয়াছি। দরহারী হইব না, যবনকে প্রাণ সমর্পণ করিতে পারিব না, কিন্তু তোমার প্রাণ কোথায় কাহারে সমর্পণ করিয়াছ প্রাণেশ্বর? সে কথা কি তুমি আমারে বলিতে পার? আমার একটীমাত্র প্রাণ। সকল মানুষেরই একটীমাত্র প্রাণ। এবং হৃদয়ে একাধারে দুটী প্রাণ থাকিতে পারে না। আমার সেই একটী প্রাণ অনেক দিন পূর্ব্বে তোমারে সমর্পণ করিয়াছি। প্রত্যয় যদি না কর,—বুক চিরিয়া দেখাইবার হইলে দেখাইতাম, কিন্তু দেখাইবার নয়, সে প্রাণ তোমারই কাছে আছে। আমি তোমারই। কিন্তু তোমার প্রাণ কোথায়?"

অশ্রু মার্জ্জন করিয়া শশিকুমার কহিলেন, "প্রাণ আমার কোথাও যাইতে পারে না। আমার প্রাণ তোমারি কাছে।"

"আচ্ছা, যদি সেই কথা সত্য হয়, তবে বল দেখি প্রাণেশ্বর! আমি যবনের আশ্রয়ে আসিয়াছিলাম কেন?"

কথার অবসরে একজন অস্ত্রধারী পুরুষ সদন্তে মধ্যবর্ত্তী হইয়া রুক্ষ রুক্ষ কর্কশ স্বরে কহিল, "পাপিষ্ঠ দুষ্ট কাফের। আবার তুই?"

স্থির প্রশান্তভাবে শশিকুমার উত্তর করিলেন, "এখন আর আমি তোরে ভয় করি না, এতক্ষণ অচেতনে ছিলাম;—এতক্ষণ অন্ধকারে ছিলাম, তোরে দেখিয়া আমার ক্ষণে ক্ষণে ভয় হইতেছিল, কিন্তু এখন আর তা নয়, এখন আমি জানিয়াছি, নিঃসংশয়ে বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছি, মিহিরমোহিনী আমার মিহিরমোহিনী।"

বীরপুরুষ ভূমিতলে তরবারি নিক্ষেপ করিয়া শশিকুমারের চরণ ধারণ পূর্ব্বক করপুটে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া কহিল, "রাজকুমার! আমি তোমার কিঙ্করী; রাজকন্যার আদেশে এই ছদ্মবেশে দুইবার তিনবার আমি তোমার সম্মুখে আসিয়াছিলাম, তুমি আমারে চিনিতে পার নাই, বেজিয়া বেগম তোমারই বাগদত্তা রাজকুমারী মিহিরমোহিনী, আর আমি আর আমরা তোমারই অনুগত কিঙ্করী, শ্রীচরণের দাসী, রাজকন্যার নিদেশে এতক্ষণ তোমাকে ছলনা করিতেছিলাম।"

রাজকন্যা একটু হাস্য করিলেন; শশিকুমারও একটু হাস্য করিলেন। হাস্য করিয়া কহিলেন:—

"এত কি ছলনা তুমি জান লো সুন্দরি!
ছলনার পায়ে আমি নমস্কার করি॥
প্রণয় কাহাকে বলে আমি তাহা জানি।
প্রণয়িনী বোলে তোরে প্রাণে প্রাণে মানি॥
ছলনা বঞ্চনা প্রিয়ে! তব অলঙ্কার।
লাঞ্ছনা, লাঞ্ছনা সতি! লাঞ্ছনা আমার॥

ভালবাসা চির দুঃখ রহিয়াছে মনে।
বাসিব না ভাল আর এ ছার জীবনে॥
যারে ভাল বাসিয়াছি, সেই ভালবাসা।
যত দিন প্রাণ রবে, ফুরাবে না আশা॥
আশায় আশায় আমি হেরিব তাহারে।
প্রতারণা কোরে যাব আশা চপলারে॥"

"তবে না কি তুমি সত্যবাদী?"

"কেন না?"

"ভালবাসাকে বঞ্চনা করিবে কি জন্য?"

"আমাকে বঞ্চনা করিয়াছিলে কি জন্য?"

"না ত।"

"তবে মুসলমানী হইয়াছিলে কি জন্য?"

"না ত! ভাল করিয়া চাহিয়া দেখদেখি।"

"এই ত দেখিতেছি, আবার তুই?"

"হুঁ! আবার আমি।"

"আমার সম্মুখে কি নিমিত্ত?"—প্রণয়ী পুরুষ যেন আবার আত্মবিস্মৃত হইয়া গম্ভীরস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "বিশ্বাসঘাতিনি। আবার তুই?"

"হুঁ।"

"কি নিমিত্ত?"

"সেই কথার অনুরোধে। যে কথায়——

যে কথায় তোমাধনে সঁপিয়াছি প্রাণ।
যে কথায় পাপদেহ হবে সমাধান॥
সেই কথা রাখিয়াছি, জপিতেছি মনে।
হারাব না, হারাব না তোমা হেন ধনে॥

তুমি যে জপের মন্ত্র হৃদয়ের সার।
রুদ্রাক্ষ তুলসীমালা তুমি রে আমার॥
শাক্ত কি বৈষ্ণব হই, যাহা ভাবি মনে।
সকলি অর্পণ করি তোমারি চরণে॥
যতক্ষণ পূজা করি, চাহি চাঁদ মুখ।
ইষ্টদেব ভাবনায় তুমি মম সুখ॥
কারে ভাবি, কে বা বলে, মালা দোলে গলে।
তুমি মম কণ্ঠমালা হৃদয় কমলে॥
ইহা কি জান না তুমি? কত সাধিয়াছি।
কত সাধনেরি ধনে বুকে পাইয়াছি॥
উহু! সে বৈশাখ মাসে বেলা দ্বিপ্রহর।
খরতর প্রভাকর, খরতর কর॥
ঝঙ্কারে কোকিল পাখী পঞ্চমের স্বরে।
কান্তারে থাকিয়ে মম হৃদি দগ্ধ করে॥
সে দিন কি দিন সখে! ভুলে কি গিয়াছ?
ধিক্ তোরে কুলাঙ্গার! আজো বেঁচে আছ?
অগ্নি বৃষ্টি হয় যেন অনন্ত আকাশে।
আগুনের কণা আসে উড়িয়ে বাতাসে॥
সে আগুনে আমি পুড়ি, তুমি কোথা থাক।
দেখা হোলে মায়া ছলে প্রিয়া বোলে ডাক॥
সে ছলাতে আমি আর ভুলিব না ভাই।
তোমারে আমার বোলে ডাকিতে না চাই॥
কে আমি, কাহার তুমি, ভালবাসা চাও।
চাহি না সে ভালবাসা, দূর হয়ে যাও॥

"এই কি তোমার সতি অনন্ত প্রণয় ?
হৃদে হৃদে গাঁথা হোলে এই দশা হয়॥
যে দশা আমার হলো কভু ভুলিব না।
যারা যারা ভালবাসে ফুটে বলিব না॥
তাহাদের তবু কিন্তু শিখাইয়া দিব।
ভালবাসা কি যাতনা চক্ষে নিহারিব॥
জগতেরে শিখাইব ভালবাসা কথা।
যারে ভালবাসি তারে হেরি যথা তথা॥
কিন্তু কোথা ? হৃদিমাঝে নিহারি তাহারে।
রয়েছে দর্পণ এক হৃদয় মাঝারে॥
হৃদয় দর্পণে আমি হেরি সেই রূপ।
যে রূপ বিরাজ করে তেজে বিশ্বরূপ॥
সেই রূপ বিরাজিছে অন্তরে আমার।
রূপের আগুন জ্যোতি অন্তরের সার॥
তাই ত তাহার ভাবে পতঙ্গ হইয়ে।
পড়ি তার রূপানলে আনন্দে ঝাঁপিয়ে॥
কিন্তু ছি ! ছি ! আমি কি রে রূপের পিপাসী ?
রূপাগুনে ঝাঁপি বোলে রূপ ভালবাসি ?
তা ত নয়, তা ত নয়, অখণ্ড প্রণয়।
ভুলিবার নয় প্রিয়ে ! ভুলিবার নয়॥
কলিযুগে দানধর্ম্ম বড় ধর্ম্ম জানি।
পরাশর বাক্য আমি নিত্য বোলে মানি॥
তোমারে সঁপেছি প্রাণ, তুমি মম প্রাণ।
প্রাণ মন ধন সব করিয়াছি দান॥

দান করি প্রতিগ্রহ করিতে নারিব।
রসনা বলেছে যাহা তাহাই রাখিব॥
দত্তহারী হতে প্রিয়ে! কভু না পারিব।
রণে যদি জিনি আমি, তথাপি হারিব॥
তুমি রে আমার ছিলে, আমি রে তোমার।
পর হয়ে গেছ সতি! তথাচ আমার॥
ভালবাসিয়াছ তুমি দাসের সন্তানে।
নিদারুণ শেলাঘাত বাজিয়াছে প্রাণে॥
তা বোলে কি ভুলে যাব অখণ্ড প্রণয়?
ভুলিবার নয় প্রিয়ে! ভুলিবার নয়॥
থাক তুমি সুখে থাক আশীর্ব্বাদ করি।
চিরদিন রবে তুমি মম প্রাণেশ্বরী॥
প্রাণেরে বিদায় দিব, তথাপি নবীন!
হৃদয়ে জাগিবে তুমি দিন দিন দিন॥
সংসারের ভালবাসা যদিও ফুরায়।
তথাপি প্রাণেশি! ভাল বাসিব তোমায়॥
আশা-চপলার খেলা জাগিছে হৃদয়ে।
জাগ্রত স্বপনে প্রিয়ে অনন্ত প্রণয়ে॥
অনন্ত প্রলয়ে যদি বিশ্ব নাশ হয়।
তথাপি জাগিবে হৃদে অনন্ত প্রণয়॥
বুঝেছি প্রণয় তোর, তুই মায়াবিনী।
এ সংসারে শান্তি হরা বিশ্বাসঘাতিনী।
জগতে শিখায়ে দিব বাতাসে বাতাসে।
কেহ যেন কারে আর নাহি ভাল বাসে॥

ভালবাসা কথা মাত্র ভালবাসা নাই।
কেবল ছলনা সার হেরিবারে পাই।।
ছলনা যে ভালবাসা, যদি ভালবাসা!
তবে কেন করে লোক ভালবাসা আশা?
জানি ত চপলা-আশা বিশ্ববিমোহিনী।
ভাল খেলা খেলিতেছ মিহিরমোহিনী।।"

যবনের গৃহে যিনি প্রবেশ করিয়াছেন, যিনি বন্দী হইয়াছেন, তিনি যে শশিকুমার, পাঠকমহাশয় হয় ত তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে পাবেন নাই। এখন আমরা সাদা কথায় বলিয়া দিলাম, সেই যুবা পুরুষ আপনাদের পূর্ব্ব পরিচিত শশিকুমার। কামিনীকে সম্বোধন করিয়া তিনি আবার বলিতেছেন,——

"তোমাতে আমাতে সতি হবে না বিচ্ছেদ।
হয় যদি, মনে রবে নিদারুণ খেদ।।
প্রেমের ভিকারী শিব কৈলাস অচলে।
প্রেমের ভিকারী বিষ্ণু বটপত্রদলে।।
প্রেমের ভিকারী সব যোগীঋষিগণ।
নিত্য প্রেমে ধ্যানমগ্ন মুদ্রিত নয়ন।।
নয়ন মুদিলে কভু প্রেম ভুলা যায়?
যারা বলে, পদাঘাত তাদের মাথায়।।
চক্ষে চক্ষে প্রেম থাকে, যারা ইহা বলে।
প্রণয় কি বস্তু, তারা জানে না সকলে।।
নয়নে প্রণয় নাই, মানসে প্রণয়॥
মানসে মানসে তার হয় বিনিময়।।

চক্ষে যদি প্রেম থাকে, অন্ধ কমলিনী।
কেন সে মুদিতা হয় আসিলে যামিনী ?
যামিনীতে পদ্মফুল নাহি ফুটে জলে।
তাই তরে কবি তারে সূর্য্যকান্তা বলে ।।
নিশাগমে প্রমোদিনী কুমুদিনী সতী।
কবির বচন সত্য, শশী তার পতি ।।
সত্য বটে, কিন্তু প্রিয়ে! অমাবস্যানিশা।
অন্ধকারে আবরিত যবে দশ দিশা ।।
চাঁদ হারা তারাকুল অনন্ত গগনে।
ফুটিয়া ছুটিয়া যায় পতি অন্বেষণে ।।
সে রাত্রে কি কুমুদিনী ফুটে না সলিলে ?
মিথ্যা হবে কবিবাক্য, সে কথা বলিলে ॥
কুমুদী চাঁদের বধূ, এ কথা নিশ্চয়।
অমাবস্যা নিশাকালে সেটী মিথ্যা হয় ॥
প্রকৃতির কিবা খেলা, বিশ্বমনোহারী।
তুমি আমি কি বুঝিব মহিমা তাঁহারি ॥
কত কথা বলিতেছি, শুনিতেছি কত।
তোমারে জানাব আরো মনে আছে যত ।।
তুমি প্রাণেশ্বরী মম হৃদয়ের ধন।
তব করে সঁপিয়াছি দেহপ্রাণ মন।।
তবু কি পাব না তোরে ? প্রাণের প্রেয়সি!
না পাই যদ্যপি, তোরে ছাড়িব রাক্ষসী ॥
আবার রাক্ষসী মোরে প্রবঞ্চনা কর ?
ইচ্ছাময়ী, ইচ্ছা করি ইচ্ছাপথে চর ?

স্বেচ্ছাচারী নারী তুই, অবিশ্বাসী নারী।
জানি, তবু কেন তোরে ভুলিতে না পারি?
নিকটে আবার তুই, কেন সর্ব্বনাশী?
বুঝিতে না পারি আমি কেন ভালবাসি?"

ঊনচত্বারিংশ প্রবাহ।

সেই কি তুমি?

যাঁরে আমি দেখিয়াছি জলধি-সলিলে,
গগনে নিহারি যাঁরে কমলা রূপেতে,
বৈকুণ্ঠে বৈকুণ্ঠনাথ যাঁহার আশ্রয়ে,
সতত থাকেন সুখে, সেই তুমি সতি!

আর্য্যাবর্ত্ত।

বহুদিন অতীত হইয়াছে। এত দিন কোথায় ছিলে? যে প্রতিমা হৃদয়ে হৃদয়ে আমি দিবানিশি নিরীক্ষণ করি, যে প্রতিমা আমি সুবর্ণ অক্ষরে চিত্তপটে আঁকিয়া রাখিয়াছি, সে প্রতিমার কি বিসর্জ্জন হইয়াছিল? দেবীমন্দির হইতে যে রাত্রে তুমি মুক্তকেশীরূপে জীবন ত্যাগ সংকল্পে বহির্গত হইয়াছিলে, সেই রাত্রি অবধি আমি উদাসী। যদিও সময়ে সময়ে দূরদেশে নানা বিপদসময়ে তুমি আমার সহচরী ছিলে, তথাপি সেই শেষের রাত্রি। সেই রাত্রি আর এই রাত্রি। জানি না জীবিতেশ্বরি! তোমার হৃদয় কত কঠিন। বহুদিনের পর আজ দেখিতে পাইয়াছি, আমাকে হয়ত তুমি চিনিতে পারিবে না, কিন্তু আমার মন,—আমার

হৃদয় তোমাকে ভিন্ন আর কাহাকেও জানে না। চক্ষে আমার জল ছিল না, চক্ষু যেন পাষাণ হইয়াছিল, হৃদয় যেন পাষাণ হইয়াছিল, কিন্তু আজ অকস্মাৎ তোমারে দর্শন করিয়া নূতন জীবন প্রাপ্ত হইয়াছি, পাষাণে যেন জল আসিয়াছে। করযোড়ে জিজ্ঞাসা করি, সেই কি তুমি?

যে নায়িকাকে সম্বোধন করিয়া প্রেমের উদাসীন এই কথাগুলি বলিলেন, সেই নায়িকা মৌনবতী। বারম্বার প্রশ্ন হইল, কিন্তু উত্তর হইল না। কিছুই কি না? হাঁ; কিছু আছে। চক্ষের জল। মৌনবতী যুবতীর দুটী পদ্মনয়নে অবিরত দর দর ধারে জলধারা। উদাসী প্রেমিক পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "চামুণ্ডার মন্দিরে যাঁহাকে আমি দেখিয়াছিলাম, মহামহা বিপদে যে দেবীমূর্ত্তি আমার সহায় হইয়াছিলেন, নলিননয়নে! অকারণ বিরহিণী! সেই কি তুমি?"

মৌনবতীর মৌন ভঙ্গ হইল। নারীজাতির অনেক অস্ত্র আছে। সে সকল অস্ত্র রণবেশী বীরপুরুষের মত কটিবন্ধে থাকে না। হস্তে থাকে না, স্কন্ধে থাকে না, পৃষ্ঠে ঝোলে না; চক্ষে থাকে। সে অস্ত্রের,—সেই সকল অস্ত্রের নাম কি? বিশাল কটাক্ষ। সেই কটাক্ষশর সন্ধান করিয়া নবরঙ্গবাসিনী, হাবভাববিলাসিনী, আমাদের বহুদিনের পরিচিতা ভাবমোহিনী কহিলেন, "আমার কাছে তোমার কি প্রয়োজন?"

"যদি প্রয়োজন নাই, তবে কাহার কাছে প্রয়োজন থাকিবে?"

"যেখানে এতদিন ছিলে।"

"কোথায়, কাহার কাছে ছিলাম?"

"তাহা আমি জানি না।"

"তবে বলিতেছিলে কেন?"

"আমি বলি না, আমার মন বলে।"

"তোমার মন কি আমারে চিনিতে পারে?"

"হয় ত পারে।"

"তবে কি তুমি আমার প্রতি সন্দেহ কর?"

"তোমাকে আমি চিনি না।"

"চেন না প্রাণেশ্বরি?"

"রসনা সঙ্কোচ কর। পবিত্র কুমারীকে প্রাণেশ্বরী বলিয়া সম্ভাষণ করিও না।"

"সত্য কি আমাকে তুমি চিনিতে পারিতেছ না?"

"চিনিয়াছি।"

"তবে অমন কথা বলিতেছিলে কেন?"

"সংসারে আর আমার অভিলাষ নাই।"

"কিসে তবে অভিলাষ?"

"তাহা আমি জানি না, আমার মনঃ——

কোথায় উড়িয়া যায়, বুঝিতে না পারি।
ধরি ধরি মনে করি ধরিবারে নারি॥
কোথা ভালবাসা ছিল, কোথা হারায়েছি!
মনে মনে দিনে দিনে তাই ভাবিতেছি॥
এক, এক, একবার, ভাবি আর বার।
মানস সরসে হেরি ঘোর অন্ধকার।"

"কথা বুঝিতে পারিলাম না।"

"এত কথা বুঝিতে পারিলে না?"

"মন।"

"মন? তোমার না আমার?"

"বিনিময়ে, দুই সমান।"

"এখনও প্রেমের কথা কও?"

"তবে আমি কি কথা কহিতে জানি?"

"যদি জান না, তবে আমার সম্মুখে বীরবেশে উপস্থিত হইয়াছ কেন?"

"কেন? রজপুতবংশের রাজপুত্রেরা চিরদিন এই বেশ পরিধান করে।"

"তবে কি তুমি রজপুতসন্তান?"

"চাহিয়া দেখ না।"

উদাসিনী রমণী আবার সেই বীরবেশের প্রতি তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ সুতীক্ষ্ণ কটাক্ষশর সন্ধান করিয়া ভঙ্গীভাবে কহিলেন, "বীরবর! এতদিন কোথায় ছিলে? আমি অপরাধিনী; আমিঃ——

চরণের দাসী আছি, থাকিব চরণে।
দিবানিশি তুমি মম জাগিতেছ মনে॥
ঘুমায়ে না সুখ পাই, স্বপনে উদয়—
হও আসি হৃদাকাশে তুমি প্রাণময়!"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া কামিনী একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, "বীরেন্দ্র! অকপট প্রণয়ের কি এই প্রতিশোধ?"

"না ত প্রিয়ে! প্রণয়ের প্রতিশোধ নাই!
মরিতে যদ্যপি বল, তাহে না ডরাই॥
আমি রে তোমার পাখি! তুমি রে আমার।
হৃদয়-পিঞ্জর মাঝে বসতি তোমার!

প্রাণেশ্বরি! তোমারে আমি অন্তরে অন্তরে ভালবাসি।"

"বাস?"—হাস্য করিয়া কামিনী কমনীয় বদনে কমলনয়নে নায়কের মুখপানে চাহিয়া সুমধুর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাস?"

"কেন অবিশ্বাস হয়?"

"অবিশ্বাস হয় না, একটু একটু সন্দেহ হয়।"

"সন্দেহের কারণ?"

"এত দিনের পর তুমি চিনিতে পার কি না?"

"আমারও সেই সন্দেহ।"

"তোমারও?—ও হরি! অগ্রেই ত পরিচয় দিয়াছি। জীবনের জীবন! অঙ্গীকার করিয়াছি, ইহ সংসারে এই দাসী তোমারই। এখনও সন্দেহ রাখ কেন প্রাণেশ্বর?"

"রাখি কেন? অনেক দিন দেখাসাক্ষাৎ ছিল না। আমাকে আগে চিনিতে, এখন যদি আর কাহাকেও চিনিয়া থাক, সেই ভয়।"

বিস্ফারিত লোচনে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া পদ্মপলাসনয়না প্রফুল্লবদনা কামিনী সতেজস্বরে কহিলেনঃ—

"সেই ভয় প্রাণেশ্বর? এসেছি জগতে,
জগতের জীব হয়ে রব যত দিন,—
কখনো না, কখনো না, কভু ভুলিব না,
যত দিন ভবধামে রবে এ জীবন,
যত দিন স্মৃতিনেত্র না হবে বিনাশ,
তত দিন দাসী, নাথ! চিনিবে তোমারে।"

"সে কথা যেন সত্য হইতে পারে, কিন্তু নারীজাতির চরিত্র বুঝা মানুষের সাধ্য নয়, দেবতারাও জানিতে পারেন না। মনে অনেক কথা আছে।"

"বল।"

"কাহাকে বলি?"

"দাসীকে।"

"তুমি আমার দাসী? যদি তাই, তবে চাম্পান মন্দির হইতে আমারে জন্মের শোধ পরিত্যাগ করিয়া জীবন বিসর্জ্জন করিতে গিয়াছিলে কি জন্য?"

ভঙ্গীক্রমে ব্যঙ্গহাসি হাসিয়া সুন্দরী কহিলেন, "তুমি অতি কুপণ্ডিত। ব্যাকরণ জান না, অভিধানের মর্য্যাদা রাখ না, তোমার সঙ্গে কথা কহাতেও বোধ হয়, পাপ আছে। বিসর্জ্জন জীবিতেশ্বর? কাননে আমি জীবন বিসর্জ্জন করিতে গিয়াছিলাম? নদীর জলে আমি জীবন বিসর্জ্জন করিতে গিয়াছিলাম? সেই বিসর্জ্জনের ঐ অর্থ কি তুমি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছ? না জীবিতেশ্বর! তোমারি চরণে আমি জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছি। তোমারে আমি চিনিতে পারি না? নিঠুর! এই কি তোমার ধারণা? আমি

রাক্ষসী নই, দানবী নই, পিশাচী নই, প্রাণে আমার মায়া আছে। বাঁচিয়া থাকিবার জন্য যে মায়া, সে মায়াকে আমি দূরে পরিহার করি। আমি ত মায়াবিনী না, সে মায়া আমার হৃদয়ে কেন থাকিবে? আমার মায়াদয়া সকলি তোমার চরণে। জীবনে আমার যে মায়া, জীবনেশ্বর! সে মায়া কেবল তোমারি জন্য। এতক্ষণ তুমি কি কথা বলিতেছিলে? আমি তোমাকে ভুলিয়া গিয়াছিলাম? আমি তোমাকে চিনিতে পারি নাই? হৃদয়বল্লভ! সকল কষ্ট, সকল যন্ত্রণা, আমি সহ্য করিতে জানি, কিন্তু হা জীবিতেশ্বর! তোমার মুখে,—হা হৃদয়বল্লভ! তোমার মুখে অভাগিনীকে আজ এই কথা শুনিতে হইল? জান তুমি:—

জাগিতেছ অহরহ হ�ৃদয়ে আমার।
আঁকা আছে তব রূপ মম চিত্তপটে।
ভুলিবার নয় কভু, ভুলিবার নয়।
যুগ যুগ অদর্শনে ও সুচারু ছবি—
উজলিবে মম হৃদে; চিনিতে নারিব—
সেই মম প্রাণেশ্বরে? ধিক্ এ জীবনে!
বুকে আঁকা আছ তুমি। জাগ্রত স্বপনে,
নিহারি মোহন মূর্ত্তি, যে দিকেতে চাই।
কথা কই, হাসি খেলি সঙ্গিনীর সহ,
সর্ব্বক্ষণ মনে হয় তুমি আছ কাছে।"

রাজপুত্র কহিতে লাগিলেন:—

"নমি আমি মহাদেবি! তব পদাম্বুজে।
চিনিয়াছি তুমি দেবি! সৃষ্টি সংহারিণী।
খর্পরধারিণী তুমি চামুণ্ডা রূপিণী।
নৃত্য কর শম্ভুহৃদে মহাকালী রূপে।'

"সে কি প্রভু? তুমি মম হৃদয় ঈশ্বর।
রহস্য ছলনে আমি পরীক্ষার তরে,
কহিলাম এত্ বাক্য। ক্ষমা ভিক্ষা চাই।"

"ক্ষমা চাও সুরেশ্বরি! ক্ষেমঙ্করী তুমি।
তোমারে করিতে ক্ষমা কি সাধ্য আমার?"

"কেন নাথ! ক্ষমা কি হে নাহি তব মনে?
মাস বর্ষ যুগ যায়, যাক্ যত আছে,
পবিত্র, পবিত্র প্রেম অন্তরে অন্তরে—
মালা করি গাঁথিয়াছি, পরিয়াছি গলে;
চরণে বিকায়ে আছি কভু ভুলিব না।"

"সত্য সত্য সতী সাধ্বি! দেবী তুমি সতি!
তোমার চরণে আমি প্রণিপাত করি।
হেরিয়াছি সেই দিন চামুণ্ডা মন্দিরে,
উগ্রচণ্ডা রূপে তোমা, ভীম খড়্গধরা।"

"আমি ত চামুণ্ডা নই, চামুণ্ডার দাসী;
তোমারি চরণদাসী অপ্সরাসুন্দরী।
তব পাদপদ্মে বাঁধা রবে এ কিঙ্করী;
জীবনকিঙ্করী তব অপ্সরাসুন্দরী।"

রাজকুমার মৃদু হাস্য করিয়া অপ্সরাসুন্দরীর দক্ষিণ পার্শ্বে উপবেশন করিলেন।

প্রবাহ নাই।

* * * * * *

যোগিনীর মত ধ্যানমগ্ন হইয়া চিন্তা করিতে করিতে অপ্সরাসুন্দরী কহিলেন, "গত কথা ভুলিয়া যাও।"

ভূপেশচন্দ্রের বক্ষঃস্থল কম্পিত হইল। রোমাঞ্চিত কলেবরে অর্দ্ধস্ফুট বাক্যে তিনি কহিলেন, "তাহা পারিব না।"

ঈষৎ হাস্য করিয়া মৃদু মধুর বচনে অপ্সরা কহিলেন, "তুমি হয় ত আমার কথা বুঝিতে পার নাই।"

ভূপেশচন্দ্র ক্ষণকাল নির্ব্বাক হইয়া স্তম্ভিতভাবে অপ্সরাসুন্দরীর মুখ পানে চাহিয়া রহিলেন। অনন্তর চমকিতভাবে বলিয়া উঠিলেন, "দেবি! সত্যই আমি তোমার কথা বুঝিতে পারি নাই। তোমার অভিপ্রায় কি? সেই নির্ঘাত বাক্যটীর যথার্থ মর্ম্মই বা কি?"

অপ্সরা উত্তর করিলেন, "বহু দিনের পর দর্শন, এতক্ষণ যে সকল রহস্য করা গেল, তাহাকেই আমি গত কথা মনে করিতেছি।"

একটী নিশ্বাস ফেলিয়া ভূপেশচন্দ্র কহিলেন, "এই এতক্ষণে তোমার মনের কথা বুঝিতে পারিলাম। ভাবিতেছিলাম, যে শুভদিনে আমাদের প্রথম দর্শন, তাহার পর যে যে স্থানে শুভ সাক্ষাৎ, পরস্পর প্রিয়সম্ভাষণে কথোপকথন, তুমি হয় ত তাহাকেই গত কথা মনে করিতেছ।"

পুনরায় হাস্য করিয়া অপ্সরা কহিলেন, "তাহাও কি কখনও সম্ভব হইতে পারে? সে সকল কথা যদি গত কথা হয়, তাহা হইলে জীবন!--জীবন ধারণের অবলম্বন কি থাকিবে?"

"আমিও তাহাই ভাবিতেছিলাম।"

প্রণয়প্রসঙ্গে প্রণয়ীযুগলের মনে যে কত আনন্দ জন্মে, যাহারা যথার্থ প্রণয়ী, তাঁহারাই তাহা অনুভব করিতে সমর্থ। নায়ক আমাদের রাজকুমার ভূপেশচন্দ্র। তিনি যথার্থ প্রণয়ের অধিকারী কি না, আমরা সেটী বলিতে পারিতেছি না। কুরঙ্গিণীর ন্যায় সজল চক্ষু বিস্তার করিয়া

ভূপেশচন্দ্রের দিকে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক অপ্সরা কহিলেন, "ভূপেশচন্দ্র! আবার কি তুমি আমারে পরিত্যাগ করিয়া যাইবে?"

"না যাইয়া কি করি?"

"এত শীঘ্র?"

"রাজ্যে বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত। সংগ্রাম অনিবার্য্য।"

অপ্সরাসুন্দরী পুনর্ব্বার আকর্ণবিস্তৃত নয়নে ভূপেশচন্দ্রকে দর্শন করিলেন। বোধ হইল যেন, আকাশে মেঘ ছিল, বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। উপর্য্যুপরি তিনটী নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক অভাগিনী ভগ্নস্বরে কহিলেন, "তবে যাও!"

ভূপেশচন্দ্রেরও নেত্রদ্বয় বাষ্পপূর্ণ হইয়া আসিল। গম্ভীরস্বরে কহিলেন, "বীরপুরুষদিগের প্রাণ বড় কঠিন হয়। যুদ্ধে ব্রতী, তাহা না হইলে কি এই হৃদয়-প্রতিমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতাম?"

অপ্সরাসুন্দরী তৃতীয় বার সজল লোচনে ভূপেশচন্দ্রের বদন নিরীক্ষণ করিয়া গদ্‌গদ কণ্ঠে কহিলেন, "ভূপেশচন্দ্র!"

ভূপেশচন্দ্র সে আহ্বানের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পারিলেন না। অপ্সরাসুন্দরী পুনরায় ডাকিলেন, "ভূপেশচন্দ্র!"

ভূপেশচন্দ্র ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সম্মুখভাগে একটু সরিয়া বসিলেন। অপ্সরাসুন্দরী কহিলেন, "ভূপেশচন্দ্র! বীরপুরুষের হৃদয় সত্য সত্যই কি কঠিন হয়? তুমি প্রণয়ের ধর্ম্ম জান না; বীরপুরুষের হৃদয় কেমন পবিত্র প্রণয়ের আধার, তাহা তুমি ভাবিতেও পার না। তোমার বীরপুরুষ নাম ধারণ করাই বিড়ম্বনা। আচ্ছা, যদি বীরপুরুষের হৃদয় কঠিন হয়, তবে বীরাঙ্গনার হৃদয়ও ত কঠিন?"

"আমি সে কথা বলিতেছি না।"

"আগে আমার কথার উত্তর কর, তাহার পর অন্য কথা।"

ভূপেশচন্দ্র অপ্রতিভ হইলেন, অপ্রস্তুতভাবে ধীরে ধীরে কহিলেন, "সেরূপ কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নহে। কথা এই যে, যাহাকে প্রাণের সঙ্গে ভালবাসা যায়, যে বস্তু প্রাণপুতুলী; কিম্বা প্রাণপুতলী অপেক্ষাও

অধিক প্রিয়তর, সে বস্তুকে ছাড়িয়া দূর দূরান্তরে গমন করিতে হয়, ইহা কি সাধারণ কঠিন হৃদয়ের কার্য্য ?''

"যুদ্ধে গমন করিতে আমি নিষেধ করিতেছি না। বীরকন্যারা বীর-পুরুষগণকে যুদ্ধযাত্রায় নিষেধ করে না। আমাদের বীরজননীরা প্রাণাধিক পুত্রগণকে আশীর্ব্বাদ করিয়া যুদ্ধে পাঠাইতেন।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া অভিমানিনী অপ্সরাসুন্দরী যুগল হস্তে যুগল নয়ন পরিমার্জ্জন করিয়া পদ্মমুখখানি আচ্ছাদন করিলেন। সন্ধ্যাকালে যেমন সরসী-সলিলে পদ্মফুল মুদিত হয়, অকস্মাৎ মেঘে নিশাকালে যেমন পূর্ণচন্দ্র ঢাকা পড়ে, সহসা বসনাবরণে এই পদ্মমুখী অপ্সরাসুন্দরীর পদ্মমুখখানি সেইরূপে ঢাকা পড়িল।

অপরাধী ভূপেশচন্দ্র কিয়ৎ ক্ষণ ইতস্তত করিয়া পরিশেষে কাতর বচনে কহিলেন, ''আমার অপরাধ হইয়াছে, কৃপা করিয়া এই সামান্য অপরাধ ক্ষমা কর।"

করপদ্ম সঞ্চালনে বদনাবরণ উন্মোচন করিয়া অপ্সরাসুন্দরী কহিলেন, "ভূপেশ !''

"আজ্ঞে।"

"রহস্য ত্যাগ কর।''

"রহস্য করিতেছি না। আমি অপরাধী। অপরাধীর শিষ্টাচার আবশ্যক। তাহাতে প্রায়শ্চিত্ত হয়।''

অপ্সরার আরক্ত বদনে বিদ্যুতের মত একটু হাস্যরেখা দেখা দিল। সেইরূপ সহাস্য আননে পুনর্ব্বার ডাকিলেন, "ভূপেশ !"

"আজ্ঞা।"

"আচ্ছা, ভূপেশ ! তুমি যাহাকে সামান্য অপরাধ বিবেচনা কর, আমি তাহাকে গুরুতর জ্ঞান করি।"

"আমি তবে গুরুতর অপরাধে অপরাধী ?"

"অবশ্য !"

"গুরু অপরাধেরও ক্ষমা আছে।"

"আমি ক্ষমা করিতে জানি।''

"তবে আমার প্রতি কৃপণতা কেন? যদি এত দয়া তোমার হৃদয়ে আছে, তবে আমার প্রতি কৃপণতা কেন?"

"না।"

"আমি তবে ক্ষমা পাইলাম?"

"হাঁ।"

"এখন তবে বিদায় হইতে পারি?"

"একটু বিলম্ব আছে। আর একটী মাত্র কথা।"

"অনুমতি কর।"

"আচ্ছা, তুমি যখন যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিবে, তখন যদি আমারে মনে পড়ে, তখন কি তোমার চিত্ত বিচলিত হইবে?"

"কখন মনে না পড়ে?"

"তাহাতে কি বুঝিব?"

"এই বুঝিবে যে, সর্ব্বদাই তুমি আমার মনে জাগো।"

"জাগি, ইহা সত্য হইতে পারে, কিন্তু রণস্থলে স্ত্রীলোককে স্মরণ করিলে যুদ্ধের উৎসাহ কমিয়া যায়।"

"এই কথাটী ঠিক হইল না।"

"কি হইলে ঠিক হয়?"

"উৎসাহ বৃদ্ধি হয়।"

"আচ্ছা, "যদি তাহাই সত্য, তবে যে দিন মন্দোদরীর নিবারণ না শুনিয়া লঙ্কানাথ দশানন রণক্ষেত্রে প্রবেশ করেন, সে দিন কি দশা হইয়াছিল? প্রমীলার নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া মেঘনাদ যে দিন যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন, সে দিন তাহার কি দশা হইয়াছিল?"

"আচ্ছা, তুমি যেমন দৃষ্টান্ত দেখাইলে, আমিও তেমনি জিজ্ঞাসা করিতে পারি, যে রাত্রে বিরাট রাজার রন্ধনগৃহে পাঞ্চালীর সরোদন অনুরোধে বল্লভরূপী ভীমসেন নাট্যশালায় প্রবেশ করেন, সে দিন তাঁহার কতদূর শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছিল!"

"আমি তোমাকে ঠকাইব মনে করিয়া ঐরূপ প্রশ্ন করি নাই। মন পরীক্ষা করিতেছিলাম।"

"পরীক্ষা করা হইয়াছে? সতি! তুমি চপলা,—আশাও চপলা,—তোমাদের খেলাও চপলা।—পরীক্ষা কি হইয়াছে?"

"হইয়াছে।"

"তবে এখন বিদায় হইতে পারি?"

অপ্সরাসুন্দরী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আকাশে হস্ত তুলিয়া সজল নয়নে ভক্তিভাবে সকরুণস্বরে কহিতে লাগিলেন,——

"যাও যুদ্ধে বীরবর! মহেশ-মহিষী,
রক্ষিবেন রণক্ষেত্রে পদছায়া দানে,
সতত তোমারে তথা। হবে রণজয়ী।"

সময়োচিত যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিয়া ভূপেশচন্দ্র বিদায় গ্রহণ করিলেন। অপ্সরাসুন্দরীও বিরামকক্ষে প্রবেশিলেন।

চত্বারিংশ প্রবাহ।

সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনী।

"বড় সাধ করি সাগর ছেঁচিনু
মাণিকো পাবারি আশে।
সাগর শুকালো, মাণিক লুকালো,
অভাগী কপাল দোষে॥
কহে চণ্ডীদাস, কালার পিরীতি,
কহিতে পরাণ ফাটে।
শঙ্খবণিকার করাত যেমতি,
যাইতে আসিতে কাটে॥"

চণ্ডীদাস।

কাশীধামের চৌষট্টী যোগিনীর ঘাটের নিকটে একটী প্রস্তরনিবাস, সেই নিবাসে একজন দীর্ঘ শ্মশ্রুধারী সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসীরা জপ করেন, তপস্যা করেন, এক মনে দিবারাত্রি জগৎপিতার আরাধনা করেন, কিন্তু এ সন্ন্যাসী কপোলদেশে কর বিন্যাস করিয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। নেত্রের উন্মেষ আছে, কিন্তু সর্ব্বক্ষণ তাহা অনুভব হয় না। মৌন সন্ন্যাসী থাকিয়া থাকিয়া এক একবার এক একটী কথা উচ্চারণ করিতেছেন, অর্থ বুঝা যাইতেছে না, একটী কথা স্পষ্ট শুনা গেল।

"লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু,
তবু হিয়া জুড়ন না গেল।
লাখ লাখ যুগ রূপ নিহারিনু,
নয়ন না তিরপিত ভেল ॥"

এই কথার পর আবার এক দণ্ড মৌন। এক দণ্ড পরে আবার একটী স্বর শুনা গেল।——

"বিদ্যাপতি কহে প্রাণ জুড়াইতে,
লাখে না মিলিল এক ॥"

সন্ন্যাসী এ প্রকার কথা কেন কহিতেছেন, আমরা সংসারী লোক, তাহা উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। সন্ন্যাসী, নবীন সন্ন্যাসী। চুলে জটা বাঁধে নাই, ললাটে ত্রিবলী বিগলিত হয় নাই, কৃষ্ণবর্ণ রুক্ষ দীর্ঘ কেশ, কৃষ্ণবর্ণ দীর্ঘ শ্মশ্রু, বক্ষঃস্থলে রোমাবলী, কলেবর ভস্মমাখা। ভাল করিয়া দেখিলে দেখা যায়, পর্ব্বতনির্ঝরের ন্যায় নয়নে অবিরল জলধারা। থাকিয়া থাকিয়া সন্ন্যাসীর শরীর কম্পিত হইতেছে। রাত্রি এক প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। গৃহে একটী প্রদীপ আছে। গবাক্ষদ্বার উদ্‌ঘাটিত। সেই উদ্‌ঘাটিত দ্বারপথে ক্ষণেক্ষণে পবন প্রবেশ করিতেছেন, দীপশিখা ধীরে ধীরে কাঁপিতেছে। জগতে দুর্ব্বলের গৌরব কোথাও নাই। বহু জনাকীর্ণ জনপদে বহু ব্যবসায়ীপূর্ণ গঞ্জে যখন অগ্নিকাণ্ড হয়,

তখন পবনের প্রতাপ বাড়ে, পবন তখন হুতাশনের সখা হন, হুতাশন তখন বায়ুসখানামে গৌরবান্বিত হন, আগুন ধুধু করিয়া জ্বলিয়া উঠে। কিন্তু ক্ষুদ্র প্রদীপ গৃহস্থ লোকের উপকার করে, শিখাও ক্ষুদ্র; প্রচণ্ড পবন তখন তাহার সাহায্য করিতে আসেন না, শত্রু হইতে আসেন। অথচ অগ্নিক্ষেত্রে যে অগ্নি, প্রদীপেও সেই অগ্নি। বায়ুদেব হুতাশনের সখা, কিন্তু আমাদের ভাগ্যদোষে, ক্ষীণপ্রভ প্রদীপের ভাগ্যদোষে তিনি তখন হুতাশনের বৈরী হন। অল্পে অল্পে কাঁপাইয়া ছোট আলোটী নিবাইয়া দেন। সন্ন্যাসীর গৃহের ছোট আলোটী নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। স্বার্থ সিদ্ধি হইল, পবনদেব আর সে গৃহে প্রবেশ করিলেন না। সন্ন্যাসী যেমন নির্ব্বাক, নিস্তব্ধ, তাঁহার আবাসগৃহটীও সেইরূপ নির্ব্বাত নিস্তব্ধ হইল।

সন্ন্যাসীরা ত কুটীরে বাস করেন, তাঁহাদের আশ্রমের নাম পর্ণকুটীর; কিন্তু আমাদের এ নবীন সন্ন্যাসী প্রস্তরগৃহে বাস করিতেছেন। বারাণসী-ধামে প্রস্তরগৃহই অধিক। হয় ত ঋষিসন্ন্যাসীর আবাস-কুটীর অল্প। সেই কারণে এই নবীন সন্ন্যাসীকে অগত্যা পাষাণগৃহে বাস করিতে হইতেছে।

রজনী ক্রমশই অগ্রসর। গৃহ অন্ধকার; কিন্তু প্রকৃতির কেমন চমৎকার খেলা,—যে হৃদয়ে প্রণয় থাকে, সে হৃদয়ে চক্ষু বিকাশ পায়। ঘুমের সময় চক্ষু মুদ্রিত থাকে, কিন্তু হৃদয়ের চক্ষু সর্ব্বদাই সুপ্রকাশ। সন্ন্যাসী যেন দেখিতেছেন, পার্শ্বগৃহের একটী দ্বার অর্দ্ধমুক্ত। সেই দ্বারপথে এক ভৈরবীমূর্ত্তি। এলো চুল। পদ্মমুখে ভস্মমাখা, ললাটে সুদীর্ঘ সিন্দুরের ফোঁটা, হস্তে ত্রিশূল, পরিধান গেরুয়া।

সেই ভৈরবীকে দেখিয়া সন্ন্যাসী কাঁপিয়া উঠিলেন। একবার চাহিয়া দেখিলেন, একবার চক্ষু বুজিলেন। আবার চাহিয়া দেখিলেন, আবার চক্ষু বুজিলেন। ভৈরবী মূর্ত্তি ধীরে ধীরে মৃদুপদসঞ্চারে নিকটে সমুপস্থিত। গম্ভীর বদনে গম্ভীরস্বরে প্রশ্ন করিলেন, "সন্ন্যাসি! চাহিয়া দেখ, চিনিতে পার? তুমি যবনীপ্রেমে বিমুগ্ধ হইয়াছিলে; চাহিয়া দেখ, আমি গর্ভবতী, আমি যবনী, আমাকে তুমি কলঙ্কিনী করিয়া পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছ। তুমি সন্ন্যাসী; তোমার সন্ন্যাসধর্ম্মে ধিক্! এই দেখ, আমি সন্ন্যাসিনী।"

ঘরে একটু একটু চাঁদের আলো আসিতেছিল, সন্ন্যাসিনীর বদনে আবরণ ছিল না। সন্ন্যাসী সেই মুখ দেখিলেন, ভয়ে শিহরিয়া উঠিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "নিশাকালে আমার শান্তিতে বিঘ্ন জন্মাইতে আসিয়াছ, কিম্বা শান্তি প্রদান করিতে আসিয়াছ, জানিতে পারিতেছি না। সংসারের মহাতাপে সন্তাপিত হইয়া আমি এই বিশ্বেশ্বরধামে, আনন্দকাননে একটু জুড়াইতে আসিয়াছি; এখানেও কি তুমি আমার সঙ্গ ছাড়িবে না?"

ভৈরবী হাসিয়া কহিলেন, "যে দিন তোমার সঙ্গ ছাড়িব, সে দিন পৃথিবীতে কেবল এই ভৈরবীর নাম মাত্র থাকিবে।"

"কেন যন্ত্রণা দাও? রূপে দেখি ভৈরবী, হৃদয়ে ভাবি ভৈরবী, স্বপ্নে দেখি ভৈরবী; কিন্তু চিনিতে পারি কই? বলিতেছ যবনী, বলিতেছ গর্ভবতী, কিন্তু কিছুই ত বুঝিতে পারিতেছি না।"

"বুঝিবার শক্তি তোমার ফুরাইয়া গিয়াছে। সত্য প্রেম পরিত্যাগ করিয়া তুমি অসত্য অনিত্য যবনীপ্রেমে বিমোহিত হইয়াছিলে, তবে আর সত্য প্রেমে বিশ্বাস হইবে কি জন্য?"

"সত্য করিয়া বল দেখি, কে তুমি?"

"আবার কি নূতন সত্য কিছু আছে? যদি ভাব আমি ভৈরবী, তবে আমি তাই; যদি ভাব যবনী, তবে নিশ্চয়ই আমি কলঙ্কিনী; যদি ভাব আর কিছু, তবে তাহাও আমি হইতে পারি।"

এই শেষ কথাটী উচ্চারণ করিয়া ভূতলে জানু ও ত্রিশূল সংস্থাপনপূর্ব্বক মুক্তকেশী সন্ন্যাসিনী নবীন সন্ন্যাসীর অদূরে আসিয়া উপবেশন করিলেন। ক্ষণকালের জন্য রসনাকে বিশ্রামের অবসর দিয়া, কেবল সেই সুবিশাল আরক্ত নয়নকে সন্ন্যাসীবদনে প্রহরী করিয়া রাখিলেন, সন্ন্যাসীও নিস্তব্ধ; কিন্তু ভৈরবীর ন্যায় তাঁহার চক্ষু প্রস্ফুটিত ছিল না, মুকুলিত। ভৈরবী বোধ হয় রাত্রিকালে সূর্য্য দর্শন করিতেছিলেন; তাহাতেই তাঁহার কমল বদনে কমল নয়ন প্রস্ফুটিত; কিন্তু সন্ন্যাসীর হৃদয় তখন অন্ধকার। আর কোন কারণে অন্ধকার না হইতে পারে, সন্দেহদোলায় দোলায়মান অন্তরে এক সম্ভাবিত আশঙ্কার আবির্ভাব, সেই আশঙ্কাতেই নয়ন দুটী মুকুলিত। যোগী সন্ন্যাসীরা চক্ষু মুদিত করিয়া অনাদিনাথ ভগবানের ধ্যান করেন;

কিন্তু যে সন্ন্যাসী আমাদের সম্মুখে, তিনি হয় ত সে ধ্যান করিতেছিলেন না। ধ্যান অনেক প্রকার আছে। অভিধান অন্বেষণ করিলে ধ্যানের এক অর্থে ছলনাকে পাওয়া যায়। এ সন্ন্যাসী তাহাও জানেন। যাঁহাকে দেখিয়া ভয় হইতেছে, সে ভৈরবীও হয় ত তাহা জানেন, উভয়ের মনে তখন ভিন্ন ভিন্ন ভাবের উদয়। বদনে নয়ন প্রহরী রাখিয়াছেন সত্য, কিন্তু সেই প্রহরীরা মাঝে মাঝে এক একবার প্রবেশদ্বারের দিকে বিবর্ত্তিত, বিঘূর্ণিত হইতেছে। কে যেন আশু প্রবেশ করিবে, তাহারই প্রতীক্ষা।

এই স্থানে আর একটী কথা।—ভৈরবীর চক্ষু আরক্তবর্ণ কেন? সংসারে যাহারা উদাসীন হয়, সংসার ত্যাগ করিয়া যে সকল কামিনী উদাসিনী হয়,—কি কারণে, জানা যায় না,—তাহারা ভক্তিভাবে ভবপ্রসাদী গঞ্জিকাধূম সেবন করিয়া থাকে; সেই ধূমঘোরে চক্ষু সর্ব্বদাই রক্তবর্ণ হয়। ভৈরবী কি গাঁজা খান? ধর্ম্মাশ্রমে এ কথা জিজ্ঞাসা করিতে নাই; কিন্তু ভৈরবীর চক্ষু আরক্তবর্ণ।

সন্ন্যাসী এতক্ষণ এক একবার চাহিয়া দেখিতেছিলেন, ক্রমে ক্রমে নেত্র দুটী সম্পূর্ণরূপে নিমীলিত। গৃহ নিস্তব্ধ। বায়ু সঞ্চার না থাকিলে গভীর নিস্তব্ধ বোধ হইত, কিন্তু পবন অতিশয় রমণীপ্রিয়। যেখানে রমণী বিদ্যমান, কোথাও বাতাস না থাকিলেও সুরসিক পবন সেখানে সাধ করিয়া বাতাস দেন। প্রকৃতির পরিচয়ে পাঠক মহাশয়েরা অনেক সময়ে দেখিয়া থাকিবেন, কিম্বা হয় ত সর্ব্বদাই দেখিয়া থাকেন, দিবসে সরোবরে প্রফুল্ল নলিনী সমস্ত দিন বায়ুহিল্লোলে কাঁপেন, নিশাগমে প্রফুল্ল কুমুদিনী সমস্ত রজনী পবনহিল্লোলে মাথা নাড়েন, পবনের সঙ্গে তাঁদের শত্রুতা কি মিত্রতা, চন্দ্রসূর্য্য ছাড়া সে কথা হয় ত আর কেহ বলিতে পারিবেন না। সন্ন্যাসীর গৃহে ভৈরবী রমণী। গবাক্ষপথে টিপি টিপি আসিয়া চঞ্চল পবনদেব সেই ভৈরবীর গাত্রবস্ত্র কাঁপাইতেছেন; তাহাতেই যাহা কিছু অস্ফুট শব্দ; তদ্ভিন্ন গৃহ এককালেই নিস্তব্ধ।

নিস্তব্ধভাবে এক দণ্ড অতীত। সন্ন্যাসীর হৃদয়ে কত প্রকার চিন্তাতরঙ্গ, শঙ্কাতরঙ্গ, সংশয়তরঙ্গ, তরঙ্গিত হইয়া ক্রীড়া করিতেছে, নিস্তব্ধ গৃহধ্য তাঁহার হৃদয়সমুদ্রে কি বিভীষণ ঝড় বহিতেছে, আমরা তাহা গণনা

করিতে জানি না। সেই ভাবে আরও এক দণ্ড অতীত। কি মনে করিয়া সন্ন্যাসী একবার সম্মুখ দিকে চাহিয়া দেখিলেন। আশ্চর্য্য! ভৈরবী নাই! কখন উঠিয়া বাহির হইয়া গিয়াছেন, কেন আসিয়াছিলেন, কেনই বা গিয়াছেন, সন্ন্যাসী তাহার কিছুই জানেন না, অনুভব করিতেও পারেন নাই।—আমরাও না।

যে দ্বারপথে ভৈরবী প্রথমে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তখনও সে দ্বার অনাবৃত। সন্ন্যাসী সংশয়াকুল নয়নে সেই দিকে চাহিলেন, নয়নে যেন ছায়া পড়িতে লাগিল, সিন্দূর, ভস্ম, মুক্ত কেশ, গেরুয়া বস্ত্র, আর ত্রিশূল। কেবল ছায়ামাত্র। সন্ন্যাসীর মনের খেলা,—চক্ষের খেলা,—কেবল সেই খেলাই নয়,—সংসারে মায়ার খেলা আর আশার খেলা, প্রায় সর্ব্বত্রই এই রূপ। কোথাও কেহ নাই, দ্বার অনাবৃত, সম্মুখদ্বার নহে, পার্শ্বদ্বার, সে দ্বারের নিকটে কেহই নাই; শঙ্কিত, সন্দিগ্ধভাবে নবীন সন্ন্যাসী নির্নিমেষে সেই দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন; হঠাৎ সেই অনাবৃত দ্বারপথে বিদ্যুৎগতিতে এক নারীমূর্ত্তি সেই গৃহে উপস্থিত। দিব্য গৌরবর্ণ, কিঞ্চিৎ দীর্ঘাকার, কিঞ্চিৎ স্থূলাকার, পৃষ্ঠদেশে বেণী, পরিধান নীলাম্বর, গলদেশে মুক্তামালা, কর্ণমূলে মুক্তার দুল, হস্তে কঙ্কণ, মুখখানি হাসি হাসি, বয়স অনুমান পঞ্চবিংশতি বর্ষ।

সেই রমণীকে দর্শন করিয়া সন্ন্যাসীর বিস্ময় জন্মিল। সে মূর্ত্তি আর কখনও তাঁহার নয়নগোচর হয় নাই। যে গৃহে তিনি বাস করিতেছেন, সে গৃহে স্ত্রীলোকের সম্পর্কমাত্র নাই;—প্রবেশেরও সম্ভাবনা নাই; তবে ভৈরবী যে কিরূপে, কি ভাবে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাঁহারা দেবতাসিদ্ধ, তাঁহাদের প্রবেশ অপ্রবেশ স্বতন্ত্র কথা; কিন্তু এই বিলাসিনী নারী কিরূপে প্রবেশ করিল? কিয়ৎক্ষণ ভাবিলেন, সেই দিকে সুস্থির নয়ন সমর্পণ করিয়া একমনে অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন, মীমাংসাপথে কিছুই আসিল না;—জিজ্ঞাসা করিবেন মনে করিতেছেন, ইত্যবসরে সেই সহাস্যমুখী ললনার বদনের সেই সহাস্যভাব অকস্মাৎ বিদূরিত হইয়া গেল। গম্ভীর বদনে, গম্ভীর ভাবে, গম্ভীরস্বরে সন্ন্যাসীকে সম্বোধন করিয়া সেই রমণী জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি সন্ন্যাসী?"

সন্ন্যাসী তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন, কথার উত্তর করিলেন না। প্রবেশকারিণী প্রশ্নকারিণী সেই ভাবে পুনরায় প্রশ্ন করিল, "তুমি কি সন্ন্যাসী ?"

সন্ন্যাসী মৌন।

তৃতীয় বার সেই প্রশ্ন।

তৃতীয় বারে সন্ন্যাসী কথা কহিলেন। কথা কহিলেন বটে, কিন্তু প্রশ্নের উত্তর দিলেন না। কিঞ্চিৎ রুক্ষস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কথা জিজ্ঞাসা করিবার তোমার কি অধিকার ?"

"অধিকার না থাকিলে কেহ কাহাকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারে না।"

"জিজ্ঞাসার কথা দূরে থাকুক, আমি ত জানি, এ গৃহে প্রবেশ করিবারও তোমার অধিকার নাই।"

"প্রয়োজনের নিকটে অধিকার পরাভব মানে।"

"তাহা মানিতে পারে, কিন্তু এখানে তোমার কি প্রয়োজন ?"

"আমার নিজের কোন প্রয়োজন নাই।"

"তবে কাহার ?"

"রেজিয়া বেগমের।"

সন্ন্যাসী এক দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। চাহিয়া ছিলেন, চক্ষু বুজিলেন। বক্ষঃস্থলে ঘন ঘন কম্পের আবির্ভাব হইল। কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে থাকিয়া আবার সেই রমণীর মুখপানে চাহিলেন; পূর্ব্ববৎ রুক্ষস্বরে প্রশ্ন করিলেন, "রেজিয়া বেগমের কে তুমি ?"

"তাঁহার সখী আমি।"

"তোমার নাম কি মিহিরা ?"

"ও নামে রেজিয়ার কোন সহচরী নাই।"

"তবে তুমি কে ?"

"রেজিয়া বেগমের সখী।"

"এখানে আসিয়াছ কেন ?"

"তিনি প্রেরণ করিয়াছেন।"

"কি জন্য?" মহাসন্দেহদোলায় দুলিতে দুলিতে বিস্মিত,—শঙ্কিতভাবে দূতীর প্রতি চাহিয়া শঙ্কিতস্বরে সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি জন্য?"

"পরে বলিতেছি। আগে আমার কথার উত্তর কর।"

"কি কথা তোমার?"

"তুমি কি সন্ন্যাসী?"

"তুমি কে?"

"কত বার বলিব? রেজিয়া বেগমের সখী।"

"সখীর নিকটে আশ্রমের পরিচয় দিতে হইবে, গুরুদেবের তেমন উপদেশ নাই।"

একটু হাস্য করিয়া সহচরী কহিল, "আমি ত শুনিয়াছি, রেজিয়াই তোমার গুরুদেব।"

"আমি রেজিয়াকে চিনি না।"

"বিশ্বাসঘাতক! কাফের! ভণ্ডতপস্বী! রেজিয়াকে তুমি চেন না? এই কাফেরের সংস্পর্শে রেজিয়া কলঙ্কিনী, এই কাফেরের সংস্পর্শে রেজিয়া গর্ভিণী, রেজিয়াকে তুমি চেন না?"

যুবা সন্ন্যাসী আবার নিরুত্তর হইলেন। আবার তাঁহার মানসে কত প্রকার শঙ্কা, সন্দেহ, ক্ষণে ক্ষণে দুলিতে লাগিল। অল্পক্ষণ পরে মৌন ভঙ্গ করিয়া কিঞ্চিৎ বিনম্র,—কিঞ্চিৎ উৎকণ্ঠিতস্বরে সহচরীকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "সত্য কি রেজিয়া তোমাকে এখানে প্রেরণ করিয়াছেন?"

"না।"

"তবে কেন আসিয়াছ?"

"তিনি প্রেরণ করিয়াছেন।"

"তিনি কি রেজিয়া ছাড়া আর একজন?"

"হ্যাঁ।"

সন্ন্যাসী আবার কি চিন্তা করিলেন। এই বারে তাঁহার মনে আরও কিছু অধিক ভয়ের সঞ্চার হইল। ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সত্য কি তিনি রেজিয়া ছাড়া আর এক জন?"

"হ্যাঁ।"

"তাঁহার নাম কি?" কথা বুঝিতে পারিলেন না, অথচ ভয় হইল। রেজিয়ার স্বামী আছে, রেজিয়ার সব কথাই মিথ্যা। সমস্তই ছলনা।— মনে মনে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাঁহার নাম কি?"

"নবাব।"

"নবাব কে?" ভীষণ সন্দেহে, ভীষণ আশঙ্কায় কম্পিতহৃদয় হইয়া সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কোন্ নবাব?"

"রেজিয়ার স্বামী।"

"তোমার নাম কি?"

"আমার নামে তোমার প্রয়োজন নাই।"

"আছে।"

"না।"

"প্রয়োজন না থাকিলে জিজ্ঞাসা করিব কেন?"

"বিশ্বাসঘাতক ভণ্ড সন্ন্যাসীর নিকটে আমি পরিচয় দিই না।"

"আমি বিশ্বাসঘাতক নই, আমি ভণ্ড সন্ন্যাসী নই, মিনতি করি, সত্য পরিচয় দাও; সহচরীর নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করি, ক্ষমা কর, আমার শঙ্কানল, আমার চিন্তানল, আমার সন্দেহানল নির্ব্বাণ কর, সত্য করিয়া বল, তোমার নাম কি?"

"লতিফা।"

"হাঁ, এ নাম নূতন বটে!"

"এখন নূতন পুরাতনে বিতণ্ডা হইতেছে না। তিনি আমাকে তোমার নিকটে প্রেরণ করিয়াছেন।"

"রেজিয়া ইহা জানেন?"

"আমি কিরূপে জানিব?"

"আচ্ছা লতিফা।"

"অ্যাঁ!"

"আমি যে এখানে আছি, রেজিয়ার পতি তাহা কিরূপে জানিলেন?"

"রেজিয়া বলিয়া দিয়াছেন।"

"রেজিয়া কিরূপে জানিলেন ? রেজিয়া ত এখানে আইসেন নাই। আমি এখানে আছি, সে সংবাদ ত রেজিয়া জানেন না, তবে তিনি কিরূপে জানিলেন ?"

"দেখিয়া গিয়াছেন।"

"তিনি ত এখানে আইসেন নাই।"

"প্রভাতে কেহ কি এখানে আইসেন নাই ?"

"আসিয়াছিলেন এক ভৈরবী।"

"সেই ভৈরবীই রেজিয়া বেগম! তুমি সন্ন্যাসী হইয়াছ ছলে, তিনিও ভৈরবী সাজিয়াছেন ছলে।"

সন্ন্যাসী আবার চিন্তানিমগ্ন। চিন্তা তাঁহার হৃদয় হইতে দূরে যাইতেছে না, চিন্তা এক মহাসর্ব্বনাশী রাক্ষসী। এক উচ্চারণে দুটী নাম আছে। চিতা আর চিন্তা। চিতা শবদেহ দাহ করে, আর চিন্তা সজীব জীবকে দাহ করে। সন্ন্যাসী সেই চিন্তানলে দগ্ধ হইতেছেন। অন্যমনস্কভাবে সহচরীকে সম্বোধনপূর্ব্বক তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা লতিফা!"

"অ্যাঁ!"

"রেজিয়ার পতি নবাব।—নবাব তোমাকে আমার কাছে কেন প্রেরণ করিয়াছেন ?"

"তুমি তাঁহার কুলকে কলঙ্কিত করিয়াছ, অন্য লোক হয় ত এখানে প্রবেশ করিতে পারিবে না, সন্ন্যাসীবেশে ভস্ম মাখিয়া তুমি এখানে লুকাইয়া রহিয়াছ, সেই কারণেই লতিফা তাঁহার দূতী।"

"আমাকে কি তাহার নিকটে যাইতে হইবে ?"

"অনুমতি সেইরূপ।"

"যদি আমি না যাই ?"

"যাহারা লইয়া যাইতে পারে, তাহারা আসিবে।"

"সন্ন্যাসীর অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল। স্থির, প্রশান্ত, অচঞ্চল দৃষ্টিতে লতিফার বদন নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, "লতিফা!"

"অ্যাঁ!"

"তোমাকে আমি যেন চিনিতে পারিতেছি। দুই রাত্রে তোমার স্বর যেন শ্রবণ করিয়াছি।"

"রহস্য ছাড়।—এখন যাইবে কি না, বল।"

"যা থাকে অদৃষ্টে, আমি যাইব না!" কৃত্রিম ভাব গোপন করিয়া, একটু ছলের হাসি হাসিয়া লতিফা কহিল, "আমি যখন দূতী, তখন তোমাদের একটী হিন্দুগীত তোমার মনে করিয়া দিতে পারি।"

"দাও।"

লতিফা সুমোহনস্বরে একটী গীত ধরিল।

গীত।

"ব্রজ হতে তোমায় নিতে পাঠায়েছেন রাই।
আমি সেই বৃন্দেদূতী প্রণাম জানাই॥
তুমি যাবে কি না যাবে ও শ্যাম, জান্তে এলেম তাই।"

"লতিফা!"

"অ্যাঁ!"

"তুমি ত বেশ গাইতে জান!"

"চল আগে সেখানে, তার পর জানাশুনা।"

"লতিফা!"

"আজ্ঞে!"

"তুমি কি এখনও রহস্য পরিত্যাগ করিবে না?"

"আমি ত রহস্য করিতে আসি নাই।"

"জানি তা, কিন্তু সত্য কি আমাকে যাইতে হইবে?"

"ইচ্ছা তোমার। অবলার সঙ্গে যাইতে ইচ্ছা না কর, প্রবলের সঙ্গে যাইতে হইবে।"

"তবে চল।"

কতক উৎসাহে, কতক আশ্বাসে, কতক সন্দেহে, কতক আতঙ্কে নবীন সন্ন্যাসী লতিফার সঙ্গে সেই গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন।

একচত্বারিংশ প্রবাহ।

নবাবের দরবার।—মশান।

"লুটিলি সকল দেশ, মোর পুরী ছিল শেষ,
তাহে চুরি করিলি আরম্ভ।
জানবাচ্ছা এক খাদে, গাড়িব হারামজাদে,
তবে সে জানিবি মোর দম্ভ॥"

ভারতচন্দ্র।

খাস দরবারে নবাব সাহেব বার দিয়াছেন। সহচরীরা চামর ঢুলাইতেছে, বুকে ঢাল তলোয়ার বাঁধিয়া চোপ্‌দারেরা পাহারা দিতেছে। পাত্রমিত্র পারিষদবর্গ বামে দক্ষিণে উপবিষ্ট আছেন, সম্মুখে সন্ন্যাসী যোড় হস্তে দাঁড়াইয়া। নবাবসাহেবের পরিধান পীতাম্বর, মস্তকে হীরা-কাঞ্চনবিমণ্ডিত সমুজ্জ্বল উষ্ণীষ। কণ্ঠে মতিহার, কর্ণে বীরবৌলী, পেস-বন্ধে কিরীচ, মূর্ত্তি সুগম্ভীর। গোঁফদাড়ী নাই। সন্ন্যাসীকে দেখিয়া ভ্রূকুটী ভঙ্গী করিয়া নবাব কহিলেন, "হিন্দুরা দস্যু হয়, দুঃসাহসে পরস্ব অপহরণ করে, শীঘ্র ধরা পড়ে না, কিন্তু ধরা পড়িলে নিস্তার নাই। ভারতে পূর্ব্বে বর্গির হাঙ্গাম ছিল, রাজশাসনের তাদৃশ প্রতাপ ছিল না, কিন্তু সন্ন্যাসি! বর্গির হাঙ্গামার দিন আর নাই, যে যাহা মনে করে, সে এখন আর তাহা করিতে পারে না। আমার অন্তঃপুরের অঙ্গনাকে তুই কুপথে লইয়া গিয়াছিস, সেই পাপের প্রতিফল, সেই পাপের শাস্তি আজ তোরে ভোগ করিতে হইবে।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "আমি সংসারবিরাগী সন্ন্যাসী, আপনি খোদাবন্দ নবাব, স্বইচ্ছায় আমি পাপী হই নাই। আমার দুরন্ত মন আমাকে বিপথে লইয়া গিয়াছিল, রেজিয়ার রূপের আগুনে আমি পতঙ্গ হইয়া ঝাঁপ দিয়াছিলাম। মিথ্যা কথা কহিব না, রেজিয়ার কোন অপরাধ নাই, রূপ দেখিয়া

আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম। জগদীশ সাক্ষী, রেজিয়ার কাছে আমি বসিয়াছি, রেজিয়ার সঙ্গে আমি কথা কহিয়াছি, রেজিয়ার বদনাবগুণ্ঠন মোচন করিয়া দিয়াছি, কিন্তু কুৎসিত প্রেমভাবে রেজিয়াকে আমি স্পর্শ করি নাই।"

"অগ্রাহ্য কথা।"

"আপনি হাকিম, আপনি মালিক, আপনি রাজ্যেশ্বর সর্ব্বেশ্বর, আমার সত্য কথা যদি অগ্রাহ্য করেন, তবে অগত্যাই স্বীকার করি, আমি অপরাধী, দণ্ডাজ্ঞা শিরোধার্য্য।"

"জল্লাদ!"

জল্লাদ আসিয়া উপস্থিত হইল। নবাবসাহেব হুকুম দিলেন, "এই দুষ্ট কাফেরের মস্তক আনয়ন করিয়া শীঘ্র আমাকে দেখাও।"

এই একটী ছোট কথার যে কি ভাব, জল্লাদ তাহা বুঝিতে পারিল না। এক রাত্রে যাহাদের বন্ধন হইয়াছিল, কোথা হইতে কে আসিয়া তাহাদের যে মুক্ত করিয়া দিয়াছিল, জল্লাদ তাহা জানে না, জানিল না, জানিতে পারিলও না। নবাব সাহেবও না।

সন্ন্যাসী কাঁপিতে লাগিলেন। দুটী চক্ষে দর দর ধারে জলধারা পড়িতে লাগিল, কাঁপিতে কাঁপিতে নবাবকে কহিলেন, "জাঁহাপনা! আমি ত চলিলাম, আমি ত মরিতে চলিলাম, রেজিয়ার যেন কোন অনিষ্ট হয় না, রেজিয়া নিরপরাধিনী, রেজিয়া নিষ্কলঙ্কিনী, আমার অপরাধে রেজিয়াকে যেন অকারণ মৃত্যুযন্ত্রণা সহ্য করিতে না হয়।"

নবাব সে কথায় কর্ণ দিলেন না। পুনঃপুন জল্লাদকে সন্ন্যাসীনিধনে আদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসী,—পাঠক মহাশয় হয় ত বুঝিয়া থাকিতে পারিবেন, কে এই সন্ন্যাসী? যত গোপন করিবার চেষ্টা করা যায়, ততই আরও সত্য প্রকাশ হইয়া পড়ে। তবে সে কথায় আর প্রয়োজন নাই। সন্ন্যাসীর নির্ভয় অন্তরে প্রাণের ভয় দর্শন দিল। প্রাণের ভয়ে ভীত না হয়, সংসারে তেমন জীব অতি কম। এমন কি, সামান্য মশামাছীরও প্রাণের ভয় আছে। সন্ন্যাসীর প্রাণের ভয় হইল। বন্ধনগ্রস্ত হইয়া তিনি ঊর্দ্ধমুখে চাহিয়া কাতরবচনে সকরুণস্বরে জগৎপিতাকে ডাকিতে লাগিলেন;—

"জীবনে আমার কিছু নাহি প্রয়োজন।
তবু বাঁচিবার ইচ্ছা দেব ত্রিলোচন॥
যার তরে পড়িয়াছি এ মহা সঙ্কটে।
সে আমার প্রিয়তমা নাহিক নিকটে॥
বিদায় জনমশোধ নিকটে তাহার,
লইবার ইচ্ছা আছে, নাহি যদি আর,
দেখা হয় বিশ্বধামে, কেমনে ভুলিব?
পরলোকে দেখা হোলে কি কথা বলিব?
যে কামিনী বুকে জাগে দিবস যামিনী,
মম দোষে দুখী যদি হয় সে কামিনী,
তবে ত আমার প্রাণে প্রায়শ্চিত্ত নাই।
তাই তারে মৃত্যুকালে হেরিবারে চাই॥
কোথা হে কৈলাসপতি শুভঙ্কর হর!
করুণা নয়নে হেরি এ সঙ্কট হর॥
বিনা পাপে মারা যাই যবন প্রতাপে!
পাপহর! পাপ হর, তার মহাপাপে॥
বিনা পাপে মহাপাপ, পাপনিবারণ।
অভাগা পাপীর শিরে দেহ শ্রীচরণ॥
মহেশ্বর! তব পদে কোটি নমস্কার।
নিরাপদে থাকে যেন রেজিয়া আমার॥"

নবাব সাহেব সেই স্তুতি শ্রবণ করিলেন। নিষ্ঠুর জল্লাদ সে স্তুতি শ্রবণ করিল না। দৃঢ়বন্ধন করিয়া নিষ্ঠুর প্রহার করিতে করিতে সন্ন্যাসীকে বধ্যভূমিতে লইয়া গেল।

মশানে উপস্থিত হইয়া নবীন সন্ন্যাসী,—আর নবীন সন্ন্যাসী না বলিয়া প্রেমিক সন্ন্যাসী বলিলেই ভাল হয়,—প্রেমিক সন্ন্যাসী করুণবচনে কহিলেন, "মহেশ্বর! তোমার নাম আশুতোষ, কিন্তু মহাদেব! কিন্তু দয়াময়! আমার প্রতি কি দয়া হইল না? আচ্ছা, কিন্তু দেখি দেখি, দয়াময়ীর দয়া হয় কি না!

গীত।

রাগিণী ললিত—আড়া ঠেকা।

বিপদবারিণী শিবে! নিস্তার মা এ বিপদে।
কাতরে করুণা ভিক্ষা করি মা তব শ্রীপদে॥
জানি না কোন চাতুরী, সুপথে ভ্রমণ করি,
তবে কেন শুভঙ্করি! এ বিপদ পদে পদে!"

এই স্তুতিগীত সমাপ্ত করিয়া সন্ন্যাসী যেন শরীরে শতগুণ বল প্রাপ্ত হইলেন। মনে যেন শতগুণ শক্তি সঞ্চারিল। যবনের বধ্যভূমি। সেখানে কোন দেবদেবীর প্রতিমা ছিল না, কেবল সাংঘাতিক তরবারিহস্তে দুই জন ঘাতক বিদ্যমান, অকস্মাৎ তিনি দেখিতে পাইলেন, দূরে সেই এলোকেশী ভৈরবীমূর্ত্তি। মৃদুপদে সেই মূর্ত্তি সমীপবর্ত্তিনী হইয়া অভয়স্বরে কহিলেন, "রাজপুত্র! তোমার অকপট প্রণয়ের মহিমা আমি বুঝিয়াছি। যাহার জন্য তুমি সন্ন্যাসী হইয়াছ, কত দিন দেখিতে পাও নাই, কাশীতে আসিয়া নির্জ্জনে যাহার সাধনা করিতেছ, সেই আমি। আমি তোমারে বঞ্চনা করি নাই।"

সমুদ্রে যখন তরণী মগ্ন হয়, সেই সময় নিকটে এক খণ্ড কাষ্ঠফলক কিম্বা একগাছি ক্ষুদ্র তৃণ ভাসিতে দেখিলে মগ্নপ্রায় বিপন্ন লোকের মনে যেমন আশার সঞ্চার হইয়া থাকে, ভৈরবীকে সম্মুখে দেখিয়া সেই সন্ন্যাসীর মনে সেইরূপ আশার সঞ্চার হইল, কিন্তু আশাতে আর বিদ্যুতে বড় অধিক প্রভেদ নাই। আশা সম্মুখে আসে আর যায়, বিদ্যুৎ সম্মুখে আসে আর যায়। ভৈরবীকে দেখিয়া আশা জন্মিবার কোন হেতু ছিল না, ভৈরবী তাঁহাকে, বরং বিপদে ফেলিতে আসিয়াছিল, আশ্বাস প্রদান করিতে

আসে নাই, তথাপি কেমন বিধাতার খেলা, হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইল, আশা-চপলা। আশা কখনই স্থির হইয়া থাকিতে পারে না, মানুষকেও কখনও স্থির করিতে পারে না, তথাপি সন্ন্যাসী একটু স্থির হইলেন, স্থির-নেত্রে, ত্রিশূলধারিণী যোগিনীর কৃপাপূর্ণ প্রসন্নবদন অবলোকন করিতে লাগিলেন।

আদেশস্বরে ঘাতুকদিগকে সম্বোধন করিয়া ভৈরবী অনুমতি করিলেন, "বন্ধন মোচন করিয়া দাও।"

ঘাতুকেরা সন্ন্যাসীকে রজ্জুমুক্ত করিয়া কিঞ্চিৎ অন্তরে দাঁড়াইল। ভৈরবীর প্রতি সাশ্রুনেত্র নিক্ষেপ করিয়া সন্ন্যাসী কহিলেন,——

"দেবি!
এবারে তোমারে আমি চিনিতে পেরেছি।
কত বার কত রূপে ও রূপ হেরেছি॥
কত বার কৃপা তুমি করেছ আমায়।
নমস্কার করি সতি! তব রাঙা পায়॥"

ভৈরবী কিঞ্চিৎ জানু নত করিয়া ত্রিশূলশোভিত হস্ত অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া সুধীর মৃদুস্বরে কহিলেন, "ও কথা কহিতে নাই, আমি তোমার দাসী। অনেক বার সত্য পরিচয় দিয়াছি, তুমি বিশ্বাস করিতে পার নাই।"

"বিশ্বাস করি করি মনে করিয়া ভ্রান্ত হইয়া গিয়াছি। আমাদের দেশে ধর্ম্মের বন্ধন অত্যন্ত দৃঢ়, জাতীয় বন্ধন অত্যন্ত সুকঠিন, সত্য যদি তুমি নবাবপত্নী হও, তোমার সঙ্গে আমার দেখা না হওয়াই ভাল ছিল, গোপন সাক্ষাতে,——গোপন দর্শনে পদে পদে ভয়। পদে পদে তুমি আমাকে রক্ষা করিতেছ, সে জন্য আমি চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকিব, যদি ভুলিয়া যাইতে হয়, ভুলিতে ইচ্ছা কর, সে ইচ্ছা তোমার।"

"তোমার সঙ্গে গোপনে আমার একটী কথা আছে। এই শ্মশান-ভূমিতে সে কথা হইতে পারে না।"

সন্ন্যাসীর বন্ধন খুলিয়া দিয়া ঘাতুকেরা বিদায় হইয়া গেল।

দ্বিচত্বারিংশ প্রবাহ।

বিরলে বিরলে !

এত কি তোমার মনে ছিল কৃপাবতি !
এত প্রতারণা তুমি জানিতে কি সতী ?
হা ধিক্ ! হা ধিক্ মোরে ! নারিনু চিনিতে ।
দেবরাজরাণী তুমি, আজি অবনীতে ।

ভারতরত্ন ।

ভৈরবীর সঙ্গে নবীন সন্ন্যাসী প্রফুল্লভাবে আপনার সেই পূর্ব্ববর্ণিত বিজন গৃহে উপস্থিত হইলেন। গৃহে প্রবেশমাত্র ভৈরবী স্বয়ং দুই দিকের দ্বার অবরুদ্ধ করিয়া দিলেন। সন্ন্যাসী আপনার শয্যায়, ভৈরবী স্বতন্ত্র আসনে। নবাব-দরবারে আর মশানে সূর্য্যদেব সাক্ষী ছিলেন, এখন তিনি অস্তাচলে, এইমাত্র না, চারি দণ্ড পূর্ব্বে তিনি অস্তাচলশায়ী হইয়াছেন। সূর্য্যদেব অস্তগত হইলে পৃথিবীতে জোনাকিরা রাজত্ব করে, গৃহস্থের গৃহে গৃহে প্রদীপেরা রাজা।—সন্ন্যাসীর গৃহে একটী প্রদীপ জ্বলিল। প্রদীপ কথা কহিতে পারে না। আকাশে ঝড় নাই, বৃষ্টি নাই, সমুদ্রে তুফান নাই, নদীতে প্রবল তরঙ্গ নাই, জগতে কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকার নাই, সমস্তই পরিষ্কার। প্রকৃতি সুস্থির। প্রদীপ কথা কহিতেছে।—কহিতেছে, "আজ তোমরা একত্র হইয়াছ, অনেক দিনের পর দুষ্ট ছলনাকে বিদায় করিয়া দিয়াছ, এখনও দিয়াছ কি না, দুই মন সমান না হইলে তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না, কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি, দুই মন কি তোমরা সমান করিতে পার ? অকপট প্রণয়।—যেখানে অকপট প্রণয়, সেইখানে দুই মন সমান হয়। যেখানে এক দিকে কপট, এক দিকে অকপট, সেখানে মিল হয় না।"

বাতাস নাই, হেতু নাই, চাঞ্চল্য নাই, তথাপি মহাশব্দে একটী গবাক্ষের দ্বার খুলিয়া গেল। বাতাস প্রবেশ করিল। দুই জনেই চমকিয়া

উঠিলেন। প্রদীপ নিবিয়া গেল। কোথায় গেল, কেহই বলিতে পারে না। এই ছিল, কোথায় গেল, তর্কশাস্ত্রে ইহার মীমাংসা হয় না। প্রদীপ আর কথা কহিল না। নিঃশব্দে গৃহমধ্যে উভয়েই ঘোর অন্ধকারে। মনে আশা আছে, পরিচয় হইবে, কিন্তু আশা চপলা।

* * * * * *

তোমরাই কি তারা ?

গাঁথা ছিলে প্রেমসূত্রে আশার ছলনে।
কে কোথা লুকায়ে ছিলে, নাহি ছিল মনে॥
কত রূপে কত বার দেখা করিয়াছ॥
কত স্থানে, কত ভাবে, খেলা খেলিয়াছ॥
এখন পূর্ব্বের ভাব হবে কি আবার ?
পূরিবে কি মনো আশা আশাচপলার ?

বঙ্গরত্ন।

রাত্রি প্রায় দুই দণ্ড হইয়াছে। এলোকেশী ভৈরবী বারম্বার মস্তক সঞ্চালন করিয়া চক্ষু ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া কহিলেন, "রাজকুমার!"

রাজকুমার শিহরিয়া উঠিলেন। মনে মনে ভাবিলেন, এ পরিচয় ত আর কেহ জানে না।

ভৈরবী পুনরায় ডাকিলেন, "রাজকুমার!"

রাজকুমার কহিলেন, "এ সম্বোধন তোমারে কে শিখাইল দেবি ?"

"আমি শিখাইয়াছি। আমি সব জানি।"

বিস্মিতভাবে রাজকুমার কহিলেন, "মহাজনবাক্যপ্রমাণে আর আমাদের শাস্ত্রপ্রমাণে ভৈরবীরা এক প্রকার ধরাধামের দেবতা, তুমি ভৈরবী, তুমি যে সব জানিতে পার না, ইহা মনে করাই আমার ভুল।"

বসনাঞ্চলে ওষ্ঠ আবৃত করিয়া ভৈরবী একটু হাসিলেন। মৃদুস্বরে কহিলেন, "কি বলিয়াছিলাম মনে আছে?"

"কখন?"

"শ্মশানে।"

"একটী গোপনীয় কথা।"

"সেই গোপনীয় কথা বলিবার নিমিত্তই আমি এই রাত্রে এখানে আসিয়াছি।"

"অনুমতি কর।"

"শশিকুমার!"

আবার শশিকুমার চমকিত। এ নামও ভৈরবীর জানা!

অন্যমনস্ক দেখিয়া ভৈরবী পুনরায় ডাকিলেন, "শশিকুমার!"

"আজ্ঞে।"

"আজ্ঞে বলিতে নাই। আমি অপরাধিনী হইব।"

"দেবতারা মানুষের কাছে অপরাধিনী হন, এটী নূতন কথা। যে মানব কর্ণ ইহা শ্রবণ করে, সে কর্ণ দূষিত হয়, সে মানব পাপী হয়।"

"আমি দেবতা, ইহা তুমি কিরূপে জানিলে?"

"আমি রাজপুত্র, আমি শশিকুমার, ইহা তুমি কিরূপে জানিলে?"

পুনর্ব্বার সেইরূপে হাস্য করিয়া ভৈরবী কহিলেন, "জানিবার অবশ্য কিছু সম্পর্ক আছে।"

"তুমি সর্ব্বজ্ঞ।"

"এক প্রকারে তাহাই বটে।"

"আমি অধিক আড়ম্বর ভালবাসি না, অনুমতি কর, তোমার গোপনীয় কথা কি?"

"আমার গোপনীয় কথা একটী না,—অনেকগুলি।"

"নবাব যদি আবার ক্রুদ্ধ হন?"

"ভয় নাই, আমি এখানে উপস্থিত থাকিতে নবাবের ক্রোধ তোমার কিছুই করিতে পারিবে না।"

"তবে একে একে আরম্ভ কর।"

"শোন।"—নেত্র বিকম্পিত করিয়া অল্প অল্প হাস্য করিতে করিতে ছদ্মবেশিনী ভৈরবী মৃদুস্বরে কহিলেন, "তবে শোন।"

"আজ্ঞে কর।"

"বল দেখি, এ ভৈরবী কে?"

"ভৈরবী।"

"বল দেখি, রেজিয়া কে?"

"রেজিয়া।"

"বল দেখি, মিহিরা কে?"

"মিহিরা।"

"বল দেখি, নবাব কে?"

"নবাব।"

"বল দেখি, মিহিরমোহিনী কে?"

রোমাঞ্চিত কলেবরে শশিকুমার উত্তর করিলেন, "সে নাম আবার তোমার মুখে কেন?"

"আমি জানি, তাই।"

"তবে ত রেজিয়াকে আর আমি দেখিতে পাইব না!"

"কাহার প্রতি তোমার অধিক অনুরাগ? কাহার প্রতি তোমার অধিক ভালবাসা? কাহার প্রতি তোমার অধিক বিশ্বাস?"

"রেজিয়ার প্রতি।"

"মিহিরমোহিনীকে তবে তুমি বিশ্বাস কর না?"

"না।—মিহিরমোহিনী অবিশ্বাসিনী!"

"সে কথা নয়, এখন তুমি মিহিরমোহিনীকে বিশ্বাস কর না?"

"না।"

"কখনও বিশ্বাস ছিল?"

"ছিল।"

"গেল কিসে?"

"প্রমাণে।"

"কিসের প্রমাণ?"

"লোকের রসনায়।"—কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া কপট সন্ন্যাসী বেশ-ধারী শশিকুমার মস্তক সঞ্চালনপূর্ব্বক কহিলেন, "লোকের রসনায়।"

"চক্ষের রসনায় নয় ?"

"এখনও নয়।"

"তবে কি জনরবে ?"

"তাহাই।"

"জনরবের সহস্র রসনা।"

"জানি।"

"তবে অবিশ্বাস হয় কিসে ?—জান যদি, তবে মিহিরমোহিনীকে অবিশ্বাস হয় কিসে ?"

"জনরব যাহা বলে, তাহা সর্ব্বদা মিথ্যা হয় না।"

"শশিকুমার !"

"আজ্ঞে।"

"তুমি না হিন্দুসন্তান ?"

"সত্য।"

"তুমি না শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ?"

"শাস্ত্র দর্শন করিয়াছি।"

"তুমি না বীরকুমার ?"

"অসত্য নহে।"

"তথাপি জনরবে তোমার এতদূর বিশ্বাস ? রজকের অপবাদে গর্ভবতী জানকীদেবীরে রামচন্দ্র বনবাস দিয়াছিলেন।"

"তাহার সঙ্গে এ কথার কি সম্বন্ধ ?"

"মিহিরমোহিনীর অপবাদ যদি সীতাদেবীর অপবাদের মত হয় ?"

"অসম্ভব।"

"কি প্রমাণে ?"

"মিহিরমোহিনীর নিজের বাক্যপ্রমাণে।—ও কথা থাকুক, আচ্ছা ! আচ্ছা, ভৈরবি ! তুমি কে ? ছলনা ছাড়িয়া সত্য কথা বল দেখি, আমি কে ? আর মিহিরমোহিনীই বা কে ?"

হাস্য করিয়া ভৈরবী কহিলেন, "তাহা আমি জানি না। জানি যদি, বলিব না।"

"আচ্ছা, মিহিরমোহিনী তোমারে কি বলিয়াছে?"

"মিহিরমোহিনী বলিয়াছে :—

প্রাণ, প্রাণ, প্রাণসখা প্রাণ যারে চায়।
হবে না কি দেখা আর তাহায় আমায়?
সে বা কোথা? আমি কোথা? নিরূপণ নাই।
সেই ত আমার পতি যত দিনে পাই।।

ইহার অধিক আর কি প্রমাণ চাও?"

"মিহিরমোহিনী অবিশ্বাসিনী, মিহিরমোহিনী রাক্ষসী, তুমি ভৈরবী দেবী, কি করি, নির্লজ্জ হইয়া বলিতে হইল, মিহিরমোহিনী বেশ্যা।— যাহারে আমি প্রাণের সঙ্গে গাঁথিয়া প্রাণের সঙ্গে ভালবাসিয়াছিলাম, তাহার নিজের মুখে যখন ঐ কথা, তখন আর অবিশ্বাসের প্রমাণ পাইতে বাকী কি?"

"এ কথা তুমি বলিতে পার; কিন্তু শশিকুমার!"

"আজ্ঞে।"

"সে কথা যদি রহস্য হয়?"

"তুমি দেবী ভৈরবী, তুমি যদি এমন স্পষ্ট কথাকে রহস্য বিবেচনা কর, শীঘ্র আমি তাহার খণ্ডন করিতে পারি না, কিন্তু লজ্জা যাহাদিগের অলঙ্কার, সেই হিন্দুকুলকন্যা রহস্য করিয়া কখনও তেমন কথা বলিতে পারে না।"

"রহস্যের পাত্রাপাত্র আছে। তোমার কাছে আমি যদি রহস্য করিতে না পারি, আমার কাছে তুমি যদি রহস্য করিতে না পার, তাহা একদিন সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু যাহার সঙ্গে জীবনের বিনিময়, তাহার জিহ্বায় সেরূপ রহস্য উচ্চারিত হইতে পারে না কেন, আমি ত তাহা বুঝিলাম না।"

"তুমি যদি ঠাকুর না হইতে, তাহা হইলে এ কথার সমুচিত উত্তর অবশ্যই আমি প্রদান করিতে পারিতাম। এই মাত্র তুমি আমাকে বলিয়াছ,

বীরকুমার।—যথার্থই আমি বীরকুমার।—যদিও সন্ন্যাসীবেশ, তথাপি কুল-প্রথায় তরবারি আমি পরিত্যাগ করি নাই, তোমার সিন্দুরমণ্ডিত ত্রিশূলকে আমি ভয় করি না, তোমার সিন্দূরমণ্ডিত ললাটকে আমি ভয় করি না, তোমার অগ্নিবর্ণ প্রজ্জলিত বিশাল কটাক্ষকেও আমি ভয় করি না; কিন্তু দুটী কারণ ;—এক পক্ষে স্ত্রীজাতি, অন্য পক্ষে ঠাকুর, সেই দুই কারণে আমার এই সুতীক্ষ্ণ অসি এখনও কোষমুক্ত হইল না।"

ভৈরবী একটু সঙ্কুচিত হইয়া,—বসিয়া ছিলেন, একটু অন্তরে গিয়া দাঁড়াইলেন। প্রশান্ত গম্ভীরস্বরে কহিলেন, "বীরকুমার! বীরকুমারের উপযুক্ত বাক্যই এই। তোমার প্রণয় পরীক্ষা করিতে আসিয়া আমি পরাজয় স্বীকার করিলাম।—

ক্ষমা কর রাজপুত্র! মাগি পরিহার।
জানিলাম, বুঝিলাম, অন্তর তোমার॥
বিষধরী ভুজঙ্গিনী মিহিরমোহিনী।
হইতে পারে না তব প্রণয় ভাগিনী॥
নিজমুখে নিজপাপ যে করে স্বীকার।
কেমন কামিনী সেই, বুঝা অতি ভার॥"

"জান ত দেবি! প্রণয়ে কত যন্ত্রণা! জানিয়া শুনিয়া আমারে ভর্ৎসনা করিতেছিলে কি জন্য? মশানক্ষেত্রে বলিয়াছিলে, গোপনীয় কথা, ঘরে আসিয়া বলিয়াছিলে, একটী নয়, অনেকগুলি. কিন্তু সেই বিশ্বাসঘাতিনীর বিদগ্ধ প্রণয় কি তোমার সেই গোপনীয় কথা? নিদারুণ অন্তর্যাতনা! সে কথা ছাড়িয়া দাও, আর কিছু থাকে, জিজ্ঞাসা কর।"

"আরও কিছু আছে। বল দেখি, আমি কে?"

"তুমি ত্রিশূলধারিণী, এলোকেশী, ভস্মমাখা ভৈরবী।"

"কিন্তু না ত!"

"যদি না হও, তবে আর কিছু জানি না।"

"বেঞ্জিয়া বেগমকে জান?"

"এই পবিত্র আশ্রমে পবিত্র নিবাসে সেই যবনীর কথা আবার কেন?"

"জিজ্ঞাসা করিলেই উত্তর দিতে হয়। একটু পূর্ব্বেই তুমি স্বীকার করিয়াছিলে, যে কথা আমি জিজ্ঞাসা করিব, সে কথার তুমি উত্তর দান করিবে। এখন অস্বীকার করিলে চলিবে না।"

"তবে জিজ্ঞাসা কর।"

"কত বার জিজ্ঞাসা করিতে হইবে? রেজিয়া বেগমকে মনে হয়?"

"একটু একটু মনে হয়। কিন্তু নবাবের ভয়ে আর সে নাম মনে করিতে ইচ্ছা করে না।"

"ভয় ভুলিয়া যাও, আমিই রেজিয়া বেগম।"

"আমারে রহস্য করিতে নিষেধ করিতেছিলে, কিন্তু মুসলমানের কন্যা, মুসলমানের পত্নী কি ভৈরবী হইতে পারে?"

"তবে তুমি কেন সন্ন্যাসী হইয়াছ?"

"আমি হিন্দু।"

হাস্য করিয়া ভৈরবী কহিলেন, "তোমারে ভালবাসিয়া আমার প্রাণ হইয়াছে হিন্দু।"

"ভৈরবি! এ বড় তোমার চমৎকার রহস্য! দেবি! কবে তুমি আমারে ভালবাসিয়াছিলে? কেন তুমি আমারে ভালবাসিয়াছিলে? তুমি কত দিনের ভৈরবী, তাহা আমি জানি না, কিন্তু আমি নবীন সন্ন্যাসী।"

"জানি তা, কিন্তু তোমার জন্যই আমি ভৈরবী।"

"ভৈরবী হইবার পূর্ব্বে কি ছিলে? কে ছিলে?"

"রেজিয়া বেগম।"

"তবে হয় ত তখন সেলাম করিয়াছিলাম, এখন নমস্কার করিতে হইতেছে।"

"আমি তোমার দাসী।—সেলাম নাই, নমস্কার নাই, কিন্তু মিহিরাকে তুমি জান?"

"দেখিয়াছি।"

"চিনিতে পারিয়াছিলে?"

"পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই, নূতন আসিয়াছিল।"

"কেন আসিয়াছিল, জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে?"

সন্ন্যাসীর লজ্জা হইল। লজ্জাকে অগত্যা কিঞ্চিৎ দূরে রাখিয়া তিনি কহিলেন, "বরণ করিতে চায়, প্রেম ভিক্ষা চায়!"

"ইহা বড় হাসির কথা। কিন্তু আমিই সেই মিহিরা।"

"তুমি? ভৈরবীবেশে তোমার এতখানি ছলনা?"

"কি করি? প্রাণের জন্য সকলি করিতে হয়। প্রাণে প্রাণে যাহারে গাঁথিয়া রাখিয়াছি, এক বেশে, এক রূপে সর্ব্বদা যদি তাহারে দেখিতে না পাই, কাজে কাজেই নূতন বেশ, নূতন রূপ, ধারণ করিতে হয়। সেই জন্যই আমি মিহিরা হইয়াছিলাম।"

"বেস করিয়াছিলে! এখন অধিক রাত্রি হইতেছে, সন্ধান জানিতে পারিলে নবাবের লোকেরা আবার এখানে আসিবে, আবার বাঁধিয়া রাখিবে, আবার দরবারে হাজির করিবে, আবার মশানে লইয়া যাইবে, তুমি রক্ষা না করিলে হয় ত মস্তক পর্য্যন্তও শরীরে থাকিবে না। তুমি বিদায় হও!"

"হইতেছি। চিন্তা নাই। কিন্তু নবাব কে, তাহা কি তুমি জান?"

"নবাব।"

"কে নবাব?"

"রেজিয়ার স্বামী।"

"না।"

"তবে কে?"

"আমি।"

"তুমি? তুমি নবাব?"

"হ্যাঁ। আমি রেজিয়া, আমি মিহিরা, আমি নবাব, আমি ভৈরবী।"

"তবে যে চোপ্‌দারেরা আসিয়াছিল, তাহারা কে?"

"তাহারা আমার কিঙ্করী।"

"আর লতিফা?"

"লতিফা আমার সহচরী।"

"এত খেলা তুমি জান?"

"না জানিয়া করি কি?"

"কেন?"—সন্দিগ্ধভাবে অন্য দিকে নয়ন-নিক্ষেপ করিয়া ক্ষণকাল যেন কি চিন্তার পর আবার ভৈরবীর দিকে চঞ্চল নয়ন ফিরাইয়া নবীন-সন্ন্যাসী প্রশ্ন করিলেন, "কেন?"

"তুমি আমারে অবিশ্বাস করিয়াছ।"

"কবে?"

"এ বেশে নয়, অন্য বেশে, অন্য রূপে, অন্য নামে।"

"বুঝিতে পারিলাম না, স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দাও।"

"আমি ভৈরবী।"

"তাহা ত দেখিতেছি।"

"তবে কেন জিজ্ঞাসা?—চিনিতে পার না কেন?"

"চিনিতে ত পারিলাম। তোমার কথায় বিশ্বাস করিয়া তোমাকে ত এখন চিনিতে পারিলাম। তুমি ভৈরবী, তুমি রেজিয়া, তুমি মিহিরা, তুমি নবাব।"

"কেবল এই পর্য্যন্ত চিনিয়াছ?"

"তবে আর কি চিনিব?"

"কি চিনিবে বল দেখি?"

"তুমি বহুরূপী।"

বদনে অঞ্চল দিয়া অবলাসুলভ হাস্য করিয়া ভৈরবী কহিলেন, "আরও কিছু আছে;—

"প্রাণেশ্বর! আমি তব চরণের দাসী।
চিরদিন আছি তব প্রেমের পিপাসী॥
ভৈরবী রূপেতে এসে করি দরশন।
রেজিয়া রূপেতে করি প্রেম সম্ভাষণ॥
মিহিরা রূপেতে আসি ছলিতে তোমায়।
জীবেশ্বর! চিনিতে কি পার না আমায়?
সকলি আমার বাজী ভোজবাজী প্রায়।
ভানুমতী রূপে আমি ভুলাই তোমায়॥

কখনো নবাব হই, কখনো কিঙ্করী।
কখনো প্রণয়ভাবে নিজরূপ ধরি ॥
কখনো ভৈরবী হয়ে দেখা দিতে আসি।
মনে মনে মনোময়! বড় ভালবাসি ॥
আর কিছু শুনিবে কি? সংসার উদাসী!
আছ তুমি কাশীধামে, নবীন সন্ন্যাসী ॥
কাশীতে তোমার, নাথ! কি বা প্রয়োজন?
খুঁজে দেখ কোথা তব আছে প্রিয় জন?
যার প্রেমে সাজিয়াছ বিবাগী সন্ন্যাসী।
যার প্রেমে প্রাণেশ্বর! আজি কাশীবাসী ॥
সেই তব প্রাণেশ্বরী, বেঁচে আছে ভবে।
উদাসী সন্ন্যাসী তুমি কেন আজি তবে?"

"তুমি ভৈরবী, তুমি কি সাদা কথা কহিতে জান না? যোগাশ্রমে এত কি কপটতা থাকে? কাহার কথা মনে করিয়া তুমি এত কথা কহিতেছ? ভাল করিয়া আমি একটীও বুঝিতে পারিতেছি না।"

"পারিতেছ না?—শোন না বলি,—

ভৈরবী নহি ত আমি, নহি ত রেজিয়া,
নহি ত মিহিরা দাসী, নহি ত নবাব;
তোমারি চরণদাসী মিহিরমোহিনী।"

"ভৈরবি! তুমি কি তবে মিহিরমোহিনী? নানা রূপে তুমি কি তবে এই প্রকারে আমাকে ছলনা করিতেছ? আমি সন্ন্যাসী হইয়া কাশীবাসী হইয়াছি, রেজিয়া বেগমের জন্য, মিহিরমোহিনীর জন্য নয়, তবে মিহির-মোহিনীকে কেন স্মরণ করাইয়া দাও? যাহাকে ভুলিয়া যাইবার আশা করি, যাহাকে ভুলিয়া যাইবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহাকে আমার চক্ষের কাছে, মনের কাছে কেন আন?"

মাথা নাড়িয়া, হাত নাড়িয়া, মৃদু মৃদু হাস্য করিতে করিতে নবীন সন্ন্যাসিনী কহিলেন, "আমি আনি-না, আশা আনে।"

"আশাকে আমার বড় ভয় করে। আশা একবার আসে, একবার যায়। আকাশে যেমন মেঘের সঙ্গে সৌদামীনির খেলা, পৃথিবীতে তেমনি মানুষের হৃদয়ের সঙ্গে আশাদেবীর খেলা। আশা চপলা।"

"চপলাই হোক্, আর যাই হোক্, তোমার সঙ্গে আমার একটী শেষ কথা আছে।"

"এত কথার পরেও কি শেষ কথা ফুরায় না?"

"না প্রাণেশ্বর! জীবনে তোমার সঙ্গে আমার কথা ফুরাইবে না। তুমি সন্ন্যাসী হইয়াছ, তাহা বলিয়া আমার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক ফুরায় নাই। যখন সম্পর্ক ফুরায় নাই, তখন কথাও ফুরাইবে না। আজ রাত্রের মত আমার একটী শেষ কথা।"

যেন কিছু বিরক্ত হইয়া শশিকুমার কহিলেন, "যদি কিছু থাকে, সংক্ষেপে প্রকাশ কর।"

ভৈরবী কহিলেন, "যদি নাই।—আমি তোমারে ছলনা করিয়াছি, অভিপ্রায় ছিল না ছলনা করা, সত্য অভিপ্রায় প্রণয় পরীক্ষা। রাজকুমার! আমার প্রতি যদি সন্দেহ জন্মিয়া থাকে, ভুলিয়া যাও, সে সন্দেহ নিষ্কারণ। আমি তোমার চিরপ্রেমাভিলাষিণী মিহিরমোহিনী।"

অন্যমনস্কভাবে ক্ষণকাল কি ভাবনা করিয়া উগ্রস্বরে শশিকুমার কহিলেন, "আমার চৈতন্য হইয়াছে, তোমার ছলনা আমি বুঝিতে পারিয়াছি; আমাকে ছলনা করিবার নিমিত্ত তুমি নানা সময়ে নানা রূপে দেখা দিয়াছ। কিঙ্করীদলকে চোপদার সাজাইয়া অকারণে আমাকে বন্দী করিয়াছ, নবাবরূপ ধারণ করিয়া আমার প্রাণ বিনাশের আদেশ প্রদান করিয়াছ, ভৈরবীবেশে ছলনা করিয়াছ, আবার এখন প্রণয়ভাব জানাইয়া মিনতি করিতে আসিয়াছ, তোমার চাতুরী বুঝিতে আমার আর বাকী নাই। যে যাহাকে প্রাণ সমর্পণ করে, তাহারই সমক্ষে চক্ষে চক্ষে যে রাক্ষসী পরপ্রেমের উল্লেখ করিতে পারে, তাহার তুল্য কপটাচারিণী, বিশ্বাসঘাতিনী, নিষ্ঠুরা মায়াবিনী পৃথিবীতে অতি অল্পই আছে। সংসারে

ব্যভিচারিণী অনেক থাকিতে পারে, গোপনেও থাকিতে পারে, প্রকাশ্যেও থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে অনেকেই সুকৌশলে ব্যভিচার গোপন করিবার চেষ্টা পায়, কিন্তু তুই,—তুই বিষধরি! আমারই সাক্ষাতে মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছিস্, ভ্রম!—তোর আবার ভ্রম কোথায়? ব্যভিচারিণীর কি ভ্রম থাকে? মন!—তোর আবার মন কোথায়? ব্যভিচারিণীদের কি মন আছে? এত দিন আমার সে জ্ঞান ছিল না কাল-সাপিনি! আমি বরং মনোভ্রমে তোরে ভালবাসিয়া জগৎসংসারে প্রেমের উপদেশ শিক্ষা করিলাম। এখন অবধি গুরুমহাশয় হইয়া জগৎকে শিখাইব, অগ্রে মন না জানিয়া কেহ কাহাকেও ভালবাসিও না। কবির কথায় উপদেশ দিতে পারিব,—"পরীক্ষা বিহনে কারেও দিব না রে মন।" আমি ভ্রান্ত ছিলাম, ভ্রান্তি দূর হইল। যাহা দেখিবার, তাহা দেখিলাম, যাহা শুনিবার, তাহা শুনিলাম, এখন আশীর্ব্বাদ করি, ভাল থাক। আমি বিদায় হইলাম,—জন্মশোধ বিদায়:—

থাক তুমি প্রেমময়ি! থাক তুমি সুখে।
শুনিব না প্রেমকথা তব সুধামুখে॥
আর আমি শুনিব না, আর আসিব না।
তোমারে হেরিয়া আর সুখে ভাসিব না॥"

ভৈরবী যেন নিতান্ত কাতরা হইয়া সন্ন্যাসীর মুখপানে চাহিয়া কাতর-স্বরে কহিতে লাগিলেন;—

"কেন প্রাণেশ্বর! তুমি বঞ্চিছ আমারে?
সত্য পরিচয় আমি দিয়াছি তোমারে॥
যবনী রেজিয়া আমি, মিহিরা কিঙ্করী।
লতিফা আমার সেই প্রিয় সহচরী॥
আমিই নবাব, নাথ! ভৈরবীও আমি।
ধর্ম্ম সাক্ষী, তুমি মম, জীবনের স্বামী॥

আমারে করুন কৃপা ভুবনমোহিনী।
সত্য আমি তব দাসী, মিহিরমোহিনী ॥"

"তুমি না ভৈরবী ?"

"না।"

"তবে এ বেশ কেন ?"

"মনের দুঃখে।"

"এখনও প্রতারণা ?"

"আমি প্রতারণা জানি না।"

হাস্য করিয়া সন্ন্যাসী কহিলেন, "জান আর না জান, আমি তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি না। কাশীবাস আমি পরিত্যাগ করিলাম, তুমি যাহাকে লইয়া সুখে আছ, তাহাকে লইয়াই সুখে থাক। আমি চলিলাম, আমি বিদায় হইলাম।"

উত্তর শুনিবার প্রতীক্ষা না করিয়াই নবীন সন্ন্যাসী শশিকুমার সে গৃহ হইতে ত্বরিতপদে বিনিষ্ক্রান্ত হইলেন। "কোথায় যাও, কোথায় যাও!" বলিতে বলিতে ভৈরবী পশ্চাতে পশ্চাতে বহিস্তোরণ পর্য্যন্ত ধাবিত হইলেন; কিন্তু দেখিতে পাইলেন না।

ত্রিচত্বারিংশ প্রবাহ।

কোথাও কি দেখিয়াছি ?

"দেখে এলেম শ্যাম, তোমার বৃন্দাবন ধাম,
কেবল নাম আছে !
তথায় বসন্ত ঋতু নাই, কোকিল নাই, ভ্রমর নাই,
জলে কমল নাই :——
কেবল রাইকমল ধূলায় পোড়ে রয়েছে ।।"

নীলু ঠাকুর।

আর সে সন্ন্যাসী নাই। শশিকুমার এখন রাজকুমার। এখন তিনি পিতৃরাজ্যে অধিষ্ঠিত।—রাজবেশ পরিধান করিয়া কাশীধামের সেই সন্ন্যাসী, রাজকুমার শশিকুমার রাজপ্রাসাদের একটী সুসজ্জিত রমণীয় কক্ষে একাকী উপবেশন করিয়া আছেন। অন্তরসাগরে চিন্তা খেলা করিতেছে। সে সাগরে তখন কত যে কি চিন্তা, তাহার সীমা হয় না। একটী চিন্তার কথা আমাদের শ্রবণে প্রবেশ করিল। রাজপুত্র কহিতেছেন,—নাটকের স্বগত বাক্যের ন্যায় আপন মনে আপনা আপনি বলিতেছেন, কাহারে ভালবাসিয়াছিলাম? যাহারে ভালবাসিয়াছিলাম, সে এখন কোথায় গেল? সে এখন কোথায় রহিল? দুবিনীতা বনিতা সংসারের পরমশত্রু। তেমন শত্রুকে যাহারা হৃদয়ে স্থান দেয়, আপনাদের মৃত্যুকে তাহারা আপনারাই আহ্বান করে। ভালবাসা ভাল। কিন্তু ভালবাসা অপেক্ষা বিরহ আরও ভাল। অবিশ্বাসিনী নারীর ভালবাসা অপেক্ষা বিরহে অনেক সুখ আছে। বিচ্ছেদে প্রাণে শান্তি আছে। দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জ্জনের পর ভট্টাচার্য্যেরা আমাদের মাথায় শান্তিজল প্রদান করেন। শান্তি মানে বুঝি শুধু জল? অভিধান তাহা বলে না। কিন্তু আমার বুকে এক অভিধান লেখা আছে, সে অভিধান সুস্পষ্ট সুবর্ণ অক্ষরে আমারে দেখায়, শান্তি মানে সুবাসিত সুশীতল জল। সেই জলে এখন আমি স্নান করিতেছি। যদি শান্তিজলে স্নান করিতেছি, তবে হৃদয় শীতল হয় না কেন? সুশীতল শান্তিসলিলে বারংবার আমার হৃদয় দগ্ধ হয় কেন? তুষানলের মত সেই শান্তিসলিল স্তরে স্তরে আমার হৃদয়কে পুড়াইয়া দেয় কেন? বিরহী রাজকুমার মনে মনে এই প্রকার কত কি ভাবিতেছেন, দূরে একটী গীত উঠিল।—সেই গীত তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল, অন্তর সাগরে তরঙ্গের মত মিশাইয়া সেই গীত শ্রবণে শ্রবণে প্রবাহিত হইয়া চলিল। বায়ুসাগরে মিশাইয়া সেই গীত পক্ষীপথ অতিক্রম করিয়া অনন্ত আকাশপথে সমুত্থিত হইল। গীত বলিতেছে কি? এমন কি মধুর সঙ্গীত আছে, যাহা সাগরে, আকাশে, বাতাসে মিশাইতে পারে? তেমন গীত আছে। যে গীত শশিকুমারের কর্ণে প্রবেশ করিল, সে গীত মর্ম্মভেদী। রাজপুত্র সব কথা শুনিতে পাইলেন না, কেবল এই কটী কথামাত্র কর্ণে প্রবেশ করিল;——

"আছে খৎ নে পথে বোসে, কে রমণী সে,
শ্যাম কি ধারো কিছু তার ?"

গীত শ্রবণ করিয়া শশিকুমার চমকিয়া উঠিলেন। কিঞ্চিৎ পরে এক জন দ্বারপালের সঙ্গে একটী স্ত্রীলোক আসিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত। শশিকুমার তাহাকে চিনিতে পারিলেন। ঘৃণিত কম্পিতস্বরে চকিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, " তুমি কেন এখানে ?"

"একটী কথা বলিতে আসিয়াছি।"

" এখানে আমি কথা শুনিতে পারি না।"

" না শুনিলে আমি ছাড়িব না।"

" তুমি এখান হইতে চলিয়া যাও।"

" আমি তোমার হুকুমের দাসী নই।"

"কিন্তু আজ তুমি আমার গৃহে ; —অবশ্যই হুকুমের দাসী হইতে হইবে।"

" আমি যাঁহার হুকুমে আসিয়াছি, তাঁহার হুকুম অপেক্ষা তোমার হুকুম বলবান হইতে পারে না।"

" কি বলিতে চাও বল, শীঘ্র বল।"

" শীঘ্র বলিবার কার্য্য নয়। তোমার পিতার সঙ্গে আমি সাক্ষাৎ করিব। "

" বলিস্ কি কিঙ্করী ? রাজা ইন্দ্রসিংহের সহিত যবনকিঙ্করীর সাক্ষাৎ ?"

" হাঁ ! অবশ্য।"

" মস্তকের ভয় করিস্ না ?"

" তোমার মস্তক আমাদের পদতলে।"

" এতদূর স্পর্দ্ধা ?"

" স্পর্দ্ধা নয়, তাঁহার আদেশ !"

" কাহার আদেশ ?"

" তুমি যাঁহার গোলাম হইয়াছিলে !"

শঙ্কিতভাবে, নম্রস্বরে শশিকুমার কহিলেন, "উচ্চকণ্ঠে কথা কহিও না, আমি এখন স্থানান্তরে নই, পিতার প্রাসাদে ;—সম্ভ্রমের ভয় রাখি।"

"সেই জন্যই ত আমি এখানে আসিয়াছি, আমাকে তুমি চিনিতে পারিয়াছ ?"

"চিনিতে না পারিলে সতর্ক করিবার প্রয়োজন ?"

"তবে সম্ভ্রমের কথা বলিতেছ কেন ?"

"রাজপুত্রেরা রাজভবনে সম্ভ্রমের ভয় করে, সেই জন্য।"

"তোমার সম্ভ্রমকে আমি নষ্ট করিতে আসিয়াছি।"

"কি অপরাধে ?"

"ও কি রাজকুমার! আমার কাছে অপরাধের কথা বলিতে নাই, সত্য যাঁহার কাছে অপরাধী আছ, তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে অপরাধভঞ্জনের পালা আরম্ভ করিও।"

"আচ্ছা লতিকা!"

"হুকুম হয়!"

"হুকুম নয়, মিনতি করিয়া বলি, বল দেখি এখানে কেন আসিয়াছ ?"

প্রশ্নটী সমাপ্ত হইতে না হইতে একজন শ্মশ্রুধারী, তরবারিধারী, যুবা যবনপুরুষ গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট। প্রবিষ্ট হইয়াই অর্দ্ধবিকশিত দন্তে ব্যঙ্গ হাস্য করিয়া দক্ষিণ হস্তে রাজপুত্রকে অভিবাদন করিল।

প্রতিনমস্কার না করিয়া রাজকুমার কহিলেন, "তুমি কি চাও? এরূপ অনধিকারপ্রবেশের হেতু কি? যখন জানিতেছ, গৃহে স্ত্রীলোক, তখন অগ্রে সংবাদ না দিয়া সহসা প্রবেশ করার নাম অবশ্যই অনধিকার-প্রবেশ।"

"খাতকের গৃহে প্রবেশ করিতে আমরা অত দূর আদব-কায়দা রাখি না।"

"খাতক ?"

"অবশ্য।"

"নাম কর।"

"রাজকুমার শশিকুমার।"

"শশিকুমার তোমার কাছে ঋণী কিসে ?"

"রেজিয়া বেগমকে মনে পড়ে ?"

রাজপুত্র চমকিত হইয়া লতিফার দিকে চাহিলেন। লতিফা কহিল, "সত্য কথা। আমার কাছে খৎ আছে।"

"কত মুদ্রা?"

"মুদ্রার সংখ্যা জানি না, কিন্তু রাজকুমার! আমরা তিন জনে সাক্ষী আছি, তুমি একখানি খৎ লিখিয়া দিয়াছিলে।"

স্বগত-বাক্যে অস্ফুট স্বরে দুটী চারিটী অস্পষ্ট কথা উচ্চারণ করিয়া শশি-কুমার কহিলেন, "সে খতের সম্পর্ক ত ফুরাইয়াছে।"

"ফুরায় নাই।—তুমি যদি অস্বীকার কর, রাজাকে জানাইব।"

শ্মশ্রুধারী কহিল, "আমিও লতিফার বাক্যে প্রতিধ্বনি করি। রাজ-কুমার যদি অস্বীকার করেন, রাজাকে জানাইব।"

"জানাইতে হইবে না, রাজা জানেন, শশিকুমার কাহারও নিকট ঋণী হয় না।"

"আমরা কি তবে পরিহাস করিতে আসিয়াছি?"

"তাহা ত বলিতেছি না, অতিথি সবাকার গুরু।"

"আমরা কি রাজা ইন্দ্রসিংহের গৃহে অতিথি?"

"তাহাও ত বলিতেছি না।"

"তবে ও কথায় তাৎপর্য্য?"

"আমার নিকটে অতিথি।"

লতিফা একটু হাস্য করিয়া কহিল, "আমরা জানিতাম, রাজপুত্রেরা চাতুরি ছলনা জানেন না, কাহাকেও প্রবঞ্চনা করেন না, কিন্তু এই রাজ-পুত্র চতুরের চূড়ামণি।"

"কেন আর তিরস্কার কর?"

"রাজকুমার! তোমার পক্ষে ইহা তিরস্কার নহে, কার্য্যের উপযুক্ত পুরস্কার। কিন্তু বেগমের অনুমতি আছে, তুমি অস্বীকার করিলে এ কথা রাজকর্ণে তুলিতে হইবে।"

"লতিফা!"

"আজ্ঞে।"

"তোমার হাতে ধরি, রাজাকে এ কথা জানাইও না।

"আমার হাতে ধরিবে কি রাজপুত্র ; আমি কিসে অপরাধিনী ? আমি দাসী, আমার হাতে ধরিয়া অপরাধিনী করা রাজপুত্রের ধর্ম্ম নয়।"

রাজপুত্র মাথায় হাত দিয়া বসিলেন। কি কথা কহিবেন, কি উত্তর দিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না।

লতিফা হাস্য করিয়া পুনর্ব্বার কহিল, "ও কি রাজপুত্র! চুপ করিয়া রহিলে যে ? তোমার সন্ন্যাসধর্ম্ম কোথায় গেল ? যবনবধূর ধর্ম্ম নষ্ট করিয়াছ, হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া মুসলমান হইয়াছ, বেগমের সঙ্গে, একাসনে, এক পাত্রে খানা খাইয়াছ, এখন শুদ্ধসত্ত্ব হইয়া চুপ করিয়া থাকিলে চলিবে কেন ? দেশে আসিয়া ছদ্ম হিন্দুবেশে লুকাইয়া রহিয়াছ, কেহই কিছু জানে না, আমরা জানাইয়া দিব। তুমি হয় ত ভাবিয়াছিলে, আমরা তোমার সন্ধান করিতে পারিব না, কিন্তু রাজকুমার! রণে, অরণ্যে, পর্ব্বতে, সাগরে, প্রাসাদে, যেখানেই কেন তুমি থাক না, আমরা সন্ধান করিয়া তোমারে ধরিতে পারিবই পারিব।"

শ্মশ্রুধারী কহিল, "লতিফা ঠিক কথা বলিতেছে। হিন্দু রাজপুত্র মুসলমান। মুসলমান-কামিনীর ধর্ম্মনাশকারী। মহা অপরাধে অপরাধী, সে অপরাধীকে কি আমরা ধরিতে পারিব না? অবশ্যই পারিব। বিশেষতঃ রেজিয়া গর্ভবতী।"

শশিকুমার এতক্ষণ অন্যমনস্ক হইয়া কি ভাবিতেছিলেন, হৃদয়ে যেন চৈতন্য ছিল না, অকস্মাৎ যেন চৈতন্যের উদয়। সহসা যেন তাঁহার সর্ব্ব শরীরে চপলা চমকিয়া গেল। চঞ্চলভাবে আসন হইতে উত্থিত হইয়া তিনি তীরবেগে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। হাঁ! হাঁ করিয়া লতিফা আর সেই অস্ত্রধারী বীরপুরুষ পুনঃপুন নিবারণ করিল, কোথায় যাও! কোথায় যাও। বারংবার এই কথা বলিতে বলিতে সঙ্গে সঙ্গে ছুটিল। কিন্তু রাজপুত্রের তখন যেরূপ দ্রুতবেগ, দ্রুতগতি, তাহাতে তাহারা কেহই বাধা দিতে পারিল না। রাজপুত্র কিছুই শুনিলেন না। ঊর্দ্ধশ্বাসে বিদ্যুৎ-গতিতে এককালে সদর ফটক পার। রাজপথে উপস্থিত হইয়া উদাস মনে উন্মত্তের ন্যায় তিনি পূর্ব্বমুখে ছুটিয়া যাইতেছেন, সম্মুখে নবাবের এক চোপ্‌দার তাঁহার পথরোধ করিল।

"চোপ্‌দার! চোপদার! ছুঁইও না, ধরিও না, পথ ছাড়িয়া দাও, আমার জাতি গিয়াছে, আমি মুসলমান হইয়াছি। লতিফা বলিল, আমি বেগমের সঙ্গে খানা খাইয়াছি। ছুঁইও না, আমি প্রায়শ্চিত্ত করিব। স্রোতস্বতী-প্রবাহে ঝাঁপ দিয়া মরিব।" উদাসভাবে এই কথা বলিতে বলিতে অন্য পথ দিয়া তিনি অদৃশ্য হইয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিন জন।

চতুশ্চত্বারিংশ প্রবাহ।

মথুরাপুরী।

"কোরে দুকুল ধ্বংস, কোল্লে যদি প্রেমের অংশ,
তবে কলঙ্ক অংশ কর শ্যামরায়।
পেয়ে মথুরায় রাজ্যভার, যদি হলে হে কুবুজার,
কৃষ্ণকলঙ্কহার,—প্যারী আর কেন পোর্‌বে গলে,
আর কেন মোর্‌বে জ্বোলে,
সেই হার দাও কুব্জার গলে, মথুরায়॥"

হরুঠাকুর।

প্রায় এক বৎসর অতিক্রান্ত। মথুরার যমুনাতীরে একটী যুবতী কামিনী উপবিষ্ট। তাহার পদতলে এক যুবাপুরুষ বিষণ্ণ বদনে বসিয়া আছেন। উভয়েই নীরব। যমুনায় তরঙ্গ বহিতেছে, অল্প বাতাসে নীল জলে মৃদু মৃদু হিল্লোল হইতেছে। নদীতীরে জনমানবের সঞ্চার নাই। সময় অপরাহ্ন। সূর্য্যের অস্তগমনের পূর্ব্বে গগনমণ্ডল যেন স্বর্ণবর্ণ ধারণ করে। সেই স্বর্ণবর্ণের আভা যমুনাসলিলে নিপতিত হওয়াতে বোধ হইতেছে যেন, যমুনা স্বর্ণালঙ্কার পরিধান করিয়া ঝক্ ঝক্ জ্যোতিতে সহাস্য-মুখে নৃত্য করিতেছেন। দূর কুঞ্জে সুস্বরবিশিষ্ট পাখীরা এক একবার স্খলিত স্বরে গান করিতেছে। সময়টী অতি রমণীয়। স্থানটীও রমণীয়। রমণীয়, অথচ নির্জ্জন। দুই দিকে সারিসারি বৃক্ষরাজী, সুশীতল ছায়া; সম্মুখে

যমুনা। অতি রমণীয় শোভা, অতি রমণীয় স্থান। যুবক-যুবতী নিঃশব্দে বিমর্ষভাবে বসিয়া রহিয়াছেন। কাহারও মুখে বাক্য নাই। দূরে এক বৈষ্ণবী অতি সুকোমলকণ্ঠে একটী গীত ধরিয়াছে।ঃ—

"এ কি দেখ্‌তে পাই, আর্জ তোরে রাই,
নবীন নীলপদ্মে পূজা কে কোরেছে।
ছিল যে পদ্মের নাভিপদ্মে ব্রহ্মাস্থিতি,
পাদপদ্মে জন্মেছেন যাঁর ভাগীরথী,
ধ্যান কোরে যে পাদপদ্মে, শিব রাখেন হৃদিপদ্মে,
সেই পদ্ম তোর পাদপদ্মে আজ কে দিয়েছে।
ও রাই, কে এমন রাধাভক্ত ব্রজে আছে।"

নীলু ঠাকুর।

গীত শুনিয়া রমণী যেন চমকিত হইয়া উঠিল। যে দিক হইতে সেই সুস্বর আসিতেছিল, তাহার কুরঙ্গনেত্র সেই দিকে বিবর্ত্তিত হইল। চকিত ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইয়া এক দৃষ্টে সেই দিক নিরীক্ষণ করিয়া চঞ্চল কর-সঞ্চালনে সেই বৈষ্ণবীকে নিকটে আহ্বান করিল। বৈষ্ণবী মন্থরপদে নিকটবর্ত্তিনী হইল। তাহার আকৃতি খর্ব্ব, মুখ, চক্ষু, নাসিকা অতি সুন্দর, মস্তকে আলুলায়িত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুঞ্চিত কুন্তল। গলদেশে বনফুলের মালা; মস্তকেও এক ছড়া মালা; হস্তে ফুলের কঙ্কণ। বর্ণ শ্যাম, সেই শ্যাম-বর্ণের উপর কিঞ্চিৎ সমুজ্জ্বল জ্যোতি। বয়স অনুমান অষ্টাদশ কি উন-বিংশতি বর্ষ।

উভয়ে উপবেশন করিলে নদীতীরবর্ত্তিনী কামিনী বৈষ্ণবীকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বৈষ্ণবি! তুমি থাক কোথায়?"

"বনে।"

"কেন;—বনে থাক কেন?"

"তবে কোথায় থাকিব?"

"কেন? তোমার কি গৃহ নাই?"

প্রশ্নকারিণীর মুখের দিকে নয়ন ঘুরাইয়া বনবাসিনী বৈষ্ণবী উত্তর করিল, "বৈষ্ণবীদের গৃহে প্রয়োজন কি?"

"তবে সকল বৈষ্ণবীই কি বনে বাস করে?"

"তাহা আমি কি করিয়া বলিব? আমি বনে থাকি, কেবল ইহাই জানি, অপরের কথা আমি কিরূপে জানিব?"

"তোমার আর কে আছে?"

"কেউ না।"

"কেন? তোমার কি বিবাহ হয় নাই?"

"হইয়াছিল।"

"তবে কেউ না বলিতেছ কেন?"

"স্বামী বাঁচিয়া নাই।"

"তবে তুমি বিধবা?"

"হ্যাঁ।"

"কেন? স্বামীর মৃত্যু হইলে ত আবার তোমাদের বিবাহ হইতে আছে।"

"আমার সে প্রবৃত্তি হয় না।"

"আচ্ছা, তুমি কোন্ বনে থাক?"

"বৃন্দাবনে।"

"রৌদ্র, বৃষ্টি, হিম, সকলই তবে তোমার মাথার উপর দিয়া যায়?"

"না। একখানি ক্ষুদ্র কুটীর আছে। বনফল ভক্ষণ করি, যমুনা আমার পিপাসা শান্তি করেন, এক এক দিন দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া যাহা কিছু পাই, তাহাতেও ক্ষুধা নিবারণ হয়।"

"তবে ত তুমি বেস সুখী।"

"সুখদুঃখ বুঝি না, এই রকমেই দিন কাটে।"

"যাহারা দুঃখ বুঝে না, তাহারাই ত সুখী।"

"তবে তাই।"

"আচ্ছা, এই মথুরাপুরীতে তুমি কবে আসিয়াছ?"

"আজ।"

"কি অভিপ্রায়ে ?" কি যেন মনে পড়িল, ঠিক সেই ভাব জানাইয়া যমুনাকূলবাসিনী কামিনী জিজ্ঞাসা করিল, "কি অভিপ্রায়ে ?"

"ভিক্ষার জন্য।"

"কি বলিয়া ভিক্ষা চাও ?"

"কিছুই বলি না।"

"তবে ?"

"একটী একটী গীত গাই।"

"তুমি কি অনেক গীত জান ?"

"তাহা কিরূপে বলিব ?"

"আচ্ছা, আর একটী গাও দেখি।"

বৈষ্ণবী একটী নূতন গীত ধরিল ;—

গীত।

"জেনেছি মায়া তোমারো !
তুমি দর্পহারী হয়ে দর্প হরো ॥
গিরি লঙ্ঘিবারে, পারে পঙ্গু নরে,
যদি ইচ্ছাময়, তুমি ইচ্ছা করো ॥"

নদীকূলবর্ত্তিনী কামিনী গম্ভীরবদনে কহিল, "এই গীতটী আরও চমৎকার। আর একটী গাও দেখি।"

"আর কি গাইব ?"

"তুমি বৈষ্ণবী, বিষ্ণুর মহিমা জান, একটী ব্রজের বাৎসল্যভাব গাও।"

"আচ্ছা।"

বৈষ্ণবী আবার সুমধুর স্বরে আরম্ভ করিল ;—

গীত।

"রতনমণি রে ! আজ, পূরাও মা বোলে নন্দরাণীর বাসনা।
তোর বেদন বৃন্দাবনে, যশোদা যেমন জানে,
তেমন আর ত্রিভুবনে, কেউ জানে না ।।"

গীতটী সমাপ্ত হইতে না হইতে বিমর্ষ মৌন যুবা অশ্রুপ্রবাহে প্লাবিত হইয়া বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, "বৈষ্ণবি! আর না! তোমার গানের অর্থ আমি বুঝিয়াছি।" "তেমন আর ত্রিভুবনে কেউ জানে না।" এই পদটী পুনরুক্তি করিয়া যুবাপুরুষ উভয় হস্তে নয়ন আচ্ছাদন করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। পার্শ্ববর্ত্তিনী কামিনী সে রোদনের নিগূঢ় তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না।

বৈষ্ণবী অপ্রস্তত হইয়া কুণ্ঠিতভাবে সেই যুবাকে বলিল, "আপনি কাঁদেন কেন? আমি কি আপনার কাছে অপরাধিনী হইলাম?"

"না।"—নয়ন মার্জ্জন করিয়া যুবা কহিলেন, "না।—তুমি অপরাধিনী হইবে কেন? বৈষ্ণবি! তুমি যথার্থ প্রেমের ভাব জান। তোমার শেষের গীতটী শ্রবণ করিয়া একটা পুরাতন দুঃখ আমার মনে পড়িয়াছে। সেই জন্যই চক্ষে জল আসিয়াছে। তুমি অপরাধিনী হইবে কেন? নন্দরাণী যশোমতী বাৎসল্যভাবে শ্রীকৃষ্ণকে স্নেহ করিতেন, আমি,— হতভাগ্য আমি, প্রেমভাবে একটী রমণীকে ভালবাসিতাম, এত ভালবাসিতাম যে, তেমন আর ত্রিভুবনে কেউ বাসে না। কিন্তু সেই কুটিলা রমণী কালসর্পিণীরূপিণী হইয়া আমারে দংশন করিয়াছে। আমার নিকট অবিশ্বাসিনী হইয়াছে। বিশ্বাস নষ্ট করিয়া বিশ্বাসঘাতিনী হইয়াছে। সেই দুঃখে শান্তিকামনায় আমি এই মথুরাপুরীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। কাশীধামে গমন করিয়াছিলাম, সেখানে শান্তি পাই নাই। সেই মায়াবিনী সেখানে পর্য্যন্ত আমার শান্তি নষ্ট করিতে গিয়াছিল। মথুরায় আসিয়াছি, এখানেও সেই ভুজঙ্গিনী আমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছে। এখন তুমি আমার রোদনের কারণ বুঝিতে পারিলে? এখন তুমি আমার কথার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিলে?"

"পারিয়াছি।" ঈষৎ হাস্য করিয়া বৈষ্ণবী কহিল, "পারিয়াছি!"

বৈষ্ণবীর মুখপানে চাহিয়া বিষাদিত যুবা সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৈষ্ণবি!"

"আজ্ঞে।"

"আমার কথা শুনিয়া তুমি হাস্য করিলে কেন?"

আবার ঈষৎ হাস্য করিয়া বৈষ্ণবী উত্তর করিল, " কারণ না থাকিলে কি কাহারও মুখে হাসি আইসে?"

"এস্থানে তোমার হাস্যের কি কারণ আছে, বল।"

"অনুমান করুন না।"—প্রশ্নকর্ত্তার নয়নে বিশালকটাক্ষ বর্ষণ করিয়া সহাস্য শরসন্ধানে বৈষ্ণবী কহিল, "অনুমান করুন না।"

সমীপবর্ত্তিনী কামিনী সবিস্ময়ে বৈষ্ণবীর মুখপানে চাহিয়া সাদর-সম্ভাষণে ডাকিলেন, "বৈষ্ণবি!"

"আজ্ঞে।"

"যাঁহাকে তুমি অনুমান করিতে অনুরোধ করিতেছ, তাঁহার অনুমান করিবার শক্তি নাই। যাহাকে উদ্দেশ করিয়া তিনি দুঃখের কথাগুলি কহিলেন, তাহাকে স্মরণ করিবারও তাঁহার শক্তি নাই।"

বৈষ্ণবী কথা কহিল না। কেবল পুনঃপুন কটাক্ষভঙ্গীতে সেই যুবার বিষণ্ণ বদন অবলোকন করিতে লাগিল।

বিলাসিনী কামিনী যেন স্বগতবাক্যে কহিলেন, "এ বৈষ্ণবী বড় রসিকা।"

কথাটী বৈষ্ণবীর কর্ণে প্রবেশ করিল। করতালি দিয়া কহিল, "আমি বিদায় হইলাম।" শুদ্ধ এই কটী কথা বলিয়াই উচ্চহাস্য করিতে করিতে দ্রুতপদে বনের দিকে ছুটিয়া চলিল। পশ্চাতে মুখ ফিরাইয়া একবার যুবাকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, "রাজকুমার! চিনেছি তোমাকে! থাক তুমি মথুরায়!"

"কোরে দুকুল ধ্বংস,
কোল্লে যদি প্রেমের অংশ,
কলঙ্ক অংশ কর শ্যামরায়।

তোমাকে ধরিবার জন্য দুদিন আমি দুই স্থানে চোপ্‌দার সাজিয়াছিলাম!"

বৈষ্ণবী চলিয়া গেল। যুবা মহাসংশয়ে বিস্ময়াপন্ন।

সূর্য্যদেব অস্তশিখরে গমন করিলেন। তাহার পর কি হইল, অন্ধকারে কিছুই দেখা গেল না।

পঞ্চচত্বারিংশ প্রবাহ।

চিন্তা।—পাপী।—উপদ্রব।

"মনে রৈল সই মনের বেদনা।
সে দিন প্রবাসে, যখন যায় গো সে,
তারে বলি বলি আর বলা হলো না।
সরমে মরমের কথা বলা গেলো না;—
যখন হাসি হাসি সে আসি বলে,
সে হাসি দেখিয়ে ভাসি নয়নজলে,
তারে পারি কি ছেড়ে দিতে, মন চায় ধরিতে,
লজ্জা বলে ছিছি ছুঁও না!"

রাম বসু।

অনেক দিন গিয়াছে। নূতন শিশিরকাল সমাগত। অল্পক্ষণ পূর্ব্বে প্রভাকর অস্তশৈলে বিশ্রাম করিতে গমন করিয়াছেন। সন্ধ্যাগগনের মেঘমালা তখনও পর্য্যন্ত অল্প অল্প লোহিতরাগে সুরঞ্জিত। আকাশে নক্ষত্রপুঞ্জ প্রিয়তম শশাঙ্কবিরহে মিট্ মিট্ করিয়া চারিদিক নিরীক্ষণ করিতেছে। সুন্দরী বিরহিণী অপ্সরাসুন্দরী ম্লানবদনে একটী কক্ষ-বাতায়নে বসিয়া আছেন। দূরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বতশ্রেণী, অদূরে মৃদুপ্রবাহিণী স্রোতস্বতী, উভয় পার্শ্বে মনোহর হরিদ্বর্ণ শস্যক্ষেত্র। স্থির প্রশান্তনয়নে অন্ধকারেও অপ্সরাসুন্দরী তাহা দর্শন করিতেছেন। মনে কিছুমাত্র প্রফুল্লতা নাই, অবিরত চিন্তাতরঙ্গের খেলা। তথাপি সেই সুদৃশ্য দৃশ্যদর্শনে ক্ষণে ক্ষণে মানস পটে পুলক-চিহ্ন চিত্রিত হইতেছে। চিত্ত যেন এক একবার বিমলানন্দে উৎসাহিত হইয়া নৃত্য করিতেছে। প্রকৃতিকে সম্বোধন করিয়া তিনি মৃদুস্বরে কহিতেছেন, আহা! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গিরিশ্রেণি! আহা! আমার চক্ষে তোমরা কি সুন্দর দেখাইতেছ! আহা! মৃদুগুঞ্জনবতী ক্ষুদ্র নদি!

তুমি কি মধুরস্বরে গান করিতে করিতে ছুটিয়া যাইতেছ! আহা! সুমোহন শস্যক্ষেত্র! তোমাদেরই বা কি চিত্তচমৎকারিণী শোভা! আহা! অনন্ত নীলাকাশ! জ্যোতির্ম্ময় নক্ষত্রহার পরিধান করিয়া আমার নয়নে তুমি কি পরমানন্দ বিতরণ করিতেছ! আহা! নক্ষত্রমালা! তোমরা এই স্রোতস্বতীসলিলে ঝাঁপ দিয়া গিরিনন্দিনীকে হীরামুক্তা অলঙ্কারে ভূষিত করিয়াছ! তাহারই বা কি শোভা! হা আমার হৃদয়! এ হৃদয়ে আর কি অমন সুন্দর শোভা খেলা করিতে আসিবে?

স্বভাবের শোভা দর্শনে অপ্সরাসুন্দরীর মনে অকস্মাৎ আর এক ভাবের আবির্ভাব হইল। অনেকক্ষণের পর বিমর্ষবদনে মৃদুস্বর ফুটিয়াছিল, অকস্মাৎ নীরব। বাম কপোলে বামকর বিন্যস্ত করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, কেন বিদায় দিলাম? বিদায়ের সময় কত কি বলিব মনে করিয়াছিলাম, লজ্জায় বলিতে পারিলাম না। আমি বীরকুমারী, তাহাকে যুদ্ধে বিদায় দিয়াছি, কার্য্য কিছু অন্যায় করি নাই, তবে প্রাণ এমন করে কেন? যুদ্ধে জয় পরাজয় উভয়ই সম্ভাবনা; তাহাতে এ ত রণ নহে, বিদ্রোহ;—বিদ্রোহীদলের সঙ্গে ভীষণ সংগ্রাম। সেই জন্যই প্রাণ কাঁদিতেছে। যখন বলিলাম, যাও, তখনও প্রাণ কাঁদিয়াছিল, ক্ষত্রিয় বীরবালা বীরাঙ্গনার সাহসের উপমা দিয়া যখন বিদায় দিলাম, তখন প্রাণ এমন কাঁদে নাই; এখন ভয়ে কাঁদে কেন? যিনি হৃদয়ের কর্ত্তা, প্রাণের ঈশ্বর, সেই পরমেশ্বরই এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন। এক ভরসা আছে। যখন বিদায় দিই, তখন তাহাকে দেবতার চরণে সমর্পণ করিয়াছি। এখনও আর একবার সেই দয়া ভিক্ষা করি।

মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া যোড়করে আকাশপানে চাহিয়া অপ্সরাসুন্দরী করুণস্বরে এইরূপ স্তব করিতে লাগিলেন :—

কোথা হে করুণাময়! দীনবন্ধু হরি।
যুড়ি হাত, দীননাথ, প্রণিপাত করি॥
কি জানি ভজন স্তুতি, হীনবুদ্ধি নারী।
বিপত্ত ভঞ্জন তুমি বিপত্ত-কাণ্ডারী॥

সঙ্কটে যাহারা যাচে, ও পদ আশ্রয়।
রণে, বনে, মহার্ণবে, নাহি থাকে ভয়॥
ভক্তেরে অভয় দাও, ভয় নিবারণ!
ভকত-বৎসল নাম, তাহারি কারণ॥
ভক্তিভাবে ডাকি নাথ! পড়িয়ে বিপদে।
রণভূমে ভূপেশেরে রাখিও শ্রীপদে॥
দয়ার আশ্রিত তব জীব সমুদয়।
সমভাবে সবে দয়া কর দয়াময়॥
দাসীরে করিও দয়া, পাইয়াছি ভয়।
দয়াময় নামে যেন কলঙ্ক না রয়॥
করপুটে শ্রীচরণে করি নমস্কার।
রণক্ষেত্রে রক্ষা কর ভূপেশে আমার॥

ভবেশ্বরের স্তব করিয়া অপ্সরার দুর্ব্বল হৃদয়ে যেন সহস্র গুণ বলের সঞ্চার হইল। অবলাহৃদয় যেন বিশ্বময়ের কৃপাবারিতে অভিষিক্ত হইয়া পরম প্রেমানন্দে পুলকিত হইয়া উঠিল। গবাক্ষ হইতে উত্থিত হইয়া বীরবালা অপ্সরাসুন্দরী সানন্দ হৃদয়ে গৃহের ইতস্ততঃ পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন।

বর্ষাকালে আকাশের মেঘের গতিক্রিয়া যেরূপ বিচিত্র, পৃথিবীর নর-নারীগণের আকস্মিক আনন্দ-নিরানন্দের স্থায়িত্ব ও অস্থায়িত্ব সেইরূপ বিচিত্র। ঈশ্বরের আরাধনা করিয়া অপ্সরাসুন্দরীর মানসে আনন্দোদয় হইয়াছিল; অল্প বাতাসে গৃহস্থ-গৃহের প্রদীপ যেমন নিবিয়া যায়, সহসা এক উপস্থিত কারণে অপ্সরা হৃদয়ের আনন্দ দীপ সেইরূপে নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। গৃহমধ্যে তিনি পাদ বিহার করিতেছেন, ইত্যবসরে তাঁহার একজন কিঙ্করী আসিয়া তাঁহার হস্তে একখানি পত্র প্রদান করিল। শিরো-নামে যাহা তিনি দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল।

নিস্তব্ধ! শঙ্কায়, সংশয়ে মহাবিস্ময়াপন্ন: স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। যেন একখানি পাষাণময়ী প্রতিমা, কিম্বা একখানি আলেখ্য—চিত্রিত ছবি। সর্ব্বাঙ্গ অস্পন্দ, নেত্রদ্বয় বিনম্র, বদন পাণ্ডুবর্ণ। হস্ত বিকম্পিত হইতে লাগিল। পত্রখানি খুলিতে পারিলেন না, সাহস হইল না। দাঁড়াইয়া ছিলেন, রোমাঞ্চিত কলেবরে একখানি ক্ষুদ্র কৌচের উপর বসিয়া পড়িলেন। ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম দেখা দিল। বিজন চিন্তা তৎকালে যেন পূর্ব্বাপেক্ষা আরও প্রবল হইয়া উঠিল। যে অবস্থায় সেই গৃহে তিনি অবস্থান করিতেছিলেন, তাহা হয় ত এতক্ষণ মনে ছিল না; এখন মনে পড়িল। কতদিন সে গৃহে রহিয়াছেন, কেন রহিয়াছেন, তাহাও হয় ত এতক্ষণ মনে ছিল না, এখন মনে পড়িল। ব্যগ্রভাবে কিঙ্করীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "চপলা! এ পত্র তোমাকে কে দিলে? এ পত্র তুমি এখানে কেন আনিলে?"

চপলা উত্তর করিল, "আমরা এখন পরাধীন।"

অপ্সরাসুন্দরীর সুকোমল শরীরে সহসা যেন বিদ্যুৎ চমকিল। তাঁহার জীবনে অনেকানেক বিপদ,—অনেকানেক দুর্ভাগ্য সংঘটিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তিনি যেন তখন ভাবিলেন, জীবনে তাদৃশ যন্ত্রণা আর কখনও অনুভব করেন নাই। চক্ষে জল আসিল না; ঘৃণাব্যঞ্জক স্বরে পরিচারিকাকে কহিলেন, "চপলা! সত্য আমরা পরাধীন, কিন্তু তুমি আমার আদেশ পালন করিবে কি না?"

চপল স্বরে চপলা উত্তর করিল, "দেবি! চপলা কি কখনও অপনার অবাধ্য হইয়াছে?"

দেবী কহিলেন, "তর্কবিতর্কের সময় নাই, তুমি এই পত্র ফিরাইয়া লইয়া যাও, যাঁহার হস্তে পাইয়াছ, তাঁহাকে গিয়া ফিরাইয়া দাও।"

এই কথা বলিয়া পত্রখানি চপলার হস্তে প্রদান করিলেন। কম্পিত হস্তে পত্র গ্রহণ করিয়া চপলা চলিয়া যায়, দ্বারাভিমুখে দুই চারি পদ অগ্রসর হইয়াছে, এমন সময় অপ্সরা পুনরায় কহিলেন, "চপলা! দাঁড়াও! যেও না! পত্রে কি লেখা আছে, একবার আমি দেখিতে চাই।"

চপলা ফিরিল। স্থিরনেত্রে অপসরার নেত্র দর্শন করিয়া পত্রিকাখানি পুনর্ব্বার তাঁহার হস্তে অর্পণ করিল। পত্রের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া

অপ্সরাসুন্দরী চপলার চপল নয়নে বিশাল কটাক্ষ বিনিক্ষেপপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ উগ্রস্বরে কহিলেন, " চপলা ! দেখিতেছ কি ? অমন কট্‌মট্‌ করিয়া আমার চক্ষে চক্ষু প্রদান করিতেছ কি জন্য ? আমার চক্ষু এখন বজ্র হইয়াছে। এ চক্ষে এখন আর জল আইসে না। তুমি জান, পূর্ব্বে আমার এই চক্ষু পাষাণ ছিল ; আমি মনে করিতাম, পাষাণে জল থাকে না ; কিন্তু একজন ব্রহ্মচারী আমাকে জ্ঞান দিয়া গিয়াছেন। আমার পাষাণচক্ষে তখন অতি অল্প কারণেই জল আসিত। ব্রহ্মচারী কহিয়াছিলেন, পাষাণেই জল থাকে, পাষাণেই যত নদনদীর উৎপত্তি ; পাষাণচক্ষু কখনই নির্জ্জল থাকিতে পারে না। তাহাই আমি সত্য স্থির করি ; তদবধি আমার চক্ষু বজ্র ; এই বজ্র-নেত্র হইতে এখন অহরহ অগ্নি নির্গত হয়।"

চপলা কহিল, " তাহাই ত দেখিতেছি। কিন্তু অদৃষ্ট আমাদের প্রতারণা করিতেছে।"

অপ্সরা একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন ; কথা কহিলেন না। অন্যমনস্কভাবে পত্রখানি উন্মোচন করিয়া বামহস্তে ধারণ করিলেন। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দুই তিন পংক্তি পাঠ করিয়াই ক্রোধে, ঘৃণায়, তাচ্ছিল্যভাবে পত্রখানা দূরে নিক্ষেপ করিলেন। যেখানে বসিয়া ছিলেন, সেখান হইতে উঠিয়া পূর্ব্বের উপবেশনস্থান সেই গবাক্ষে গিয়া বিষণ্ণভাবে উপবিষ্ট হইলেন। চপলার দিকে না চাহিয়াই চঞ্চলভাবে কহিলেন, "চপলা ! আমি উন্মাদিনী ! তুমি আর আমার নিকটে থাকিও না, চলিয়া যাও। আমি একাকিনী থাকিতে ভালবাসি, আমাকে একাকিনী থাকিতে দাও।"

উদাস নয়নে অপ্সরার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া অস্থিরচিত্তে মন্থরপদে চপলা চলিয়া যাইতেছিল, হঠাৎ পশ্চাদ্দিকে মুখ ফিরাইয়া অপ্সরাসুন্দরী ডাকিলেন, "চপলা !"

"আজ্ঞে !"

"তোমার কাছে আগুন আছে ?"

সবিস্ময়ে চমকিতা হইয়া চপলা জিজ্ঞাসিল, " আগুন ?—আগুনে কি হইবে ?"

"কালকূট হলাহল বিষ দগ্ধ করিব।"

পুনরায় বিস্ময় প্রকাশ করিয়া চপলা কহিল, "বিষ?—বিষ এখানে কোথায়?"

"ঐ ঘৃণিত পত্র!"

"পত্র আমি লইয়া যাইতেছি। তুমি ফিরাইয়া দিতে বলিয়াছিলে, অবশ্যই আমি সে আদেশ পালন করিব।"

এই কথা বলিয়া চপলা ত্বরিতহস্তে পত্রখানি গৃহতল হইতে কুড়াইয়া লইল।

গৃহ অন্ধকার। রাত্রি প্রায় চারি দণ্ড অগ্রসর। চপলা আশ্বাসবচনে অপ্সরাসুন্দরীকে প্রবোধ দান করিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় অকস্মাৎ গৃহমধ্যে আলোকের সঞ্চার। বোধ হইল, আলো দূরে আছে, গৃহে তাহারই স্তিমিত দীপ্তি। দেখিতে দেখিতে সেই আলো নিকটবর্ত্তী। নিকটে মানবের পদসঞ্চারশব্দ। একটী প্রজ্জ্বলিত বর্ত্তিকাহস্তে একজন রূপবান যুবাপুরুষ দ্রুতবেগে কক্ষমধ্যে আশু প্রবিষ্ট। চপলা সেই মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া সভয়-চকিতভাবে শশব্যস্তে পত্রখানি আপন বস্ত্রমধ্যে লুকাইল। অপ্সরাসুন্দরী সে দিকে লক্ষ্য করিলেন না। প্রবেশকারী বীরবেশে উপস্থিত হইয়াছেন। বর্ম্মাবৃত দেহ, মস্তকে সমুজ্জ্বল উষ্ণীষ, কটিবন্ধে রজতকোষবদ্ধ সুদীর্ঘ তরবারি। রুক্ষস্বরে চপলাকে সম্বোধন করিয়া সেই বীরপুরুষ কহিলেন, "চপলা! তুই এতক্ষণ এখানে কি করিতেছিস্? আমি তোকে লিপির প্রত্যুত্তর লইয়া যাইতে আদেশ করিয়াছিলাম, তুই এখানে বিলম্ব করিয়া গোপনে গোপনে পলায়নের পরামর্শ করিতেছিস্! কল্য প্রাতঃকালেই এ বিশ্বাসঘাতকতার উচিত প্রতিফল প্রাপ্ত হইবি। হয় ত, এমনও হইতে পারে, কল্যকার সূর্য্য তোর ঐ দেহে তোর ঐ কুচক্রী মস্তক আর দেখিতে পাইবেন না। ক্রীতদাসীর এতদূর যোগ্যতা! দূর হ!—এই মুহূর্ত্তেই তুই আমার সম্মুখ হইতে দূর হ!"

চপলা-বেগে কাঁপিতে কাঁপিতে চপলা সে গৃহ হইতে পলায়ন করিল।

অপ্সরাসুন্দরী গবাক্ষে বসিয়া অন্য দিকে চাহিয়াছিলেন, "ক্রীতদাসী" বাক্যটী কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র মর্দ্দিত-লাঙ্গূল ভুজঙ্গিনীর ন্যায় গৃহের

দিকে মুখ ফিরাইয়া গর্জ্জনস্বরে কহিলেন, "কে তুই পাপিষ্ঠ! অবলার অবরোধ-গৃহে নিশাকালে অনধিকার-প্রবেশ? চপলা তোর ক্রীতদাসী! এতদূর দর্প,—এতদূর অহঙ্কার তোর? দেখ্, সেই ক্রীতদাসীর হস্তে তোর কি দশা হয়! হস্তেই বা কেন বলি, সেই ক্রীতদাসীর বাম পদাঘাতে তোর ঐ পাপ-রসনা-যুক্ত পাপ-মস্তক চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে!"

হস্তস্থিত বর্ত্তিকাটী দূরস্থিত একটী আধারের উপর সংস্থাপিত করিয়া সেই বীরপুরুষ সহাস্য আস্যে সদম্ভ পদ-বিক্ষেপে শনৈঃশনৈ অপ্সরাসুন্দরীর উপবেশ গবাক্ষসমীপে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া অপ্সরা-সুন্দরী আকর্ণবিশ্রান্ত সতেজ সমুজ্জ্বল নয়নে আগন্তুকের সর্ব্বাবয়ব নিরীক্ষণ করিয়া এক লম্ফে গবাক্ষ হইতে গৃহতলে অবরোহণ করিলেন। বলদর্পিত, কটুভাষী প্রবেশকারী যে স্থলে দাঁড়াইয়া ছিলেন, তেজস্বিনী বীরাঙ্গনা তাহার দশ হস্ত দূরে গিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার সেই যুগল বজ্রনয়ন হইতে যেন প্রজ্জ্বলিত পাবক-শিখা বহির্গত হইতে লাগিল। সহসা নিকটবর্ত্তী হইতে আগন্তুকের সাহস হইল না। কেবল সেই একমাত্র আগন্তুকের বলিয়াই বা কেন, সে মূর্ত্তির সম্মুখবর্ত্তী হইতে মহাবল মহাপ্রতাপ শত শত অসম সাহসিক বীরপুরুষেরও সাহস হয় না।

আগন্তুক ধীরে ধীরে কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া সহাস্যবদনে বিনম্র বিনীত বচনে অপ্সরাকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, "সুন্দরি! আমি তোমার আজ্ঞাবহ কিঙ্কর, দাসের প্রতি ক্রুদ্ধ হওয়া তোমার মত দেব-কুমারীর উচিত হয় না।"

বক্রভাবে গ্রীবাভঙ্গী করিয়া সেইরূপ সতেজ নয়নে অস্ত্রধারীর মুখ পানে চাহিয়া বীরকুমারী অপ্সরাসুন্দরী সদর্পে কহিলেন, "যদি দাস হও, সাবধান! আর এক পদও অগ্রসর হইও না। যদি দাস হও, দূরে অবস্থান কর। যদি দাস হও, এই দণ্ডেই গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাও। যদি আজ্ঞাবহ কিঙ্কর হও, আজ্ঞাবহন কর; দ্বিরুক্তি করিও না।"

পূর্ব্বাপেক্ষা আরও বিনম্রস্বরে আগন্তুক কহিলেন, "প্রাণময়ি! ইহা আমার পক্ষে তিরস্কার নহে, এরূপ তিরস্কারকে আমি মহামূল্য পুরস্কার জ্ঞানে মস্তকে ধারণ করি।"

"ক্ষত্রিয়কুমারী তোমার মত নরাধমের তোষামোদবাক্যে প্রতারিত হয় না। তোমার পাপ-রসনা এই মাত্র আমারে যে সম্বোধনে সম্ভাষণ করিল, সে সম্বোধন অন্য কোন দুঃসাহসিক রাক্ষস-রসনাও উচ্চারণ করিতে সমর্থ নয়। কৌশলে,—মায়াজাল বিস্তারে,—নিদারুণ কপট ছলনায়, তুমি আমারে আপন গৃহে বন্দী করিয়া রাখিয়াছ সত্য, পদে পদে প্রতারণা করিয়া নানা প্রলোভনে তুমি আমারে ভুলাইবার চেষ্টা করিতেছ সত্য, কিন্তু জান, আমি তোমারে তৃণ জ্ঞানও করি না।"

কাকুতি মিনতি করিয়া যোড়করে নির্ভীক বীরপুরুষ পুনঃপুন সবিনয়ে কহিতে লাগিলেন, "দেবি! আমাকে ক্ষমা কর! আমার ইচ্ছা, তুমি আমাকে তৃণ জ্ঞান কর। তুমি বন্দিনী নও, আমার সর্ব্বময়ী কর্ত্রী। আমি তোমার প্রেমের ভিকারী। তোমার জন্য আমি সমস্ত রাজ্যসম্পদ পরিত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া জীবন ধারণ করিতে পারি না।"

ভয়ঙ্কর উত্তেজিতা হইয়া সদর্প উত্তেজিতস্বরে বীরাঙ্গনা কহিলেন, "পাপিষ্ঠ! রসনা দমন কর্! পুনঃপুন আমি তোর ধৃষ্টতা সহ্য করিয়া আসিতেছি; পুনঃ পুন আমি তোরে ক্ষমা করিতেছি, এখনও তোর চৈতন্য হইতেছে না? তুই রাজা? তোর রাজ্যসম্পদ্? এ গরিমা কাহার নিকটে প্রকাশ করিতেছিস্? এখনও বলিতেছি, গৃহ হইতে বাহির হইয়া যা! প্রাণে যদি মায়া থাকে, এই মুহূর্ত্তেই এখান হইতে বাহির হইয়া যা!"

"প্রাণের মায়া।" এই মর্ম্মভেদী কথাটী শ্রবণ করিবামাত্র প্রেমিকের প্রেমভাব ক্ষণকালের জন্য তিরোহিত হইয়া ক্রোধভাবে পরিণত হইল। কুটিল বক্র-দৃষ্টিতে বীরাঙ্গনার প্রতি আরক্ত কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া আগন্তুক বীরপুরুষ সক্রোধে কহিলেন, "অবলা স্ত্রীজাতি বলিয়া এতদূর স্পর্দ্ধা আমি ক্ষমা করিলাম। নতুবা এই অসিস্পর্শ করিয়া বলিতে পারি, পৃথিবীতে কেহই সশস্ত্র ক্ষত্রিয়কুমারকে প্রাণের ভয় দেখাইতে পারে না।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া সেই যুবা প্রেমিক বীরপুরুষ আরক্তলোচনে কটিবন্ধের অর্দ্ধমুক্ত তরবারির মূলদেশ স্পর্শ করিলেন।

ব্যঙ্গচ্ছলে হাস্য করিয়া অপ্সরাসুন্দরী কহিলেন, "তুমি ক্ষত্রিয়কুমার?

ক্ষত্রিয়কুমারেরা কি অবলা কুলকামিনীর প্রতি দৌরাত্ম্য করিয়া থাকেন? আমি অবিবাহিতা পবিত্র কুমারী। আমার প্রতি উপদ্রব করিয়া তুমি কি ক্ষত্রিয়কুমার নামের গৌরব বৃদ্ধি করিতে চাও? পবিত্র কুমারীর সতীত্বনাশ চেষ্টায় যে আত্মা কলুষিত হয়, সে আত্মা কি ক্ষণকালের জন্যও ক্ষত্রিয় শরীরে বাস করে? এইরূপ পাপকার্য্যেই কি ক্ষত্রিয়ের পরাক্রম প্রকাশ পায়? এইরূপ কাপুরুষতাই কি চন্দ্রসূর্য্যবংশীয় বীরেন্দ্র ক্ষত্রিয়কুমার-গণের কুলধর্ম্ম? তুমি অসিস্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছ? কি কুলকলঙ্ক তুমি! যাহারা শপথ করিতে পারে, সে সকল পামরের দ্বারা যে, কি কি দুষ্কর্ম্ম অসম্পাদিত থাকে, ত্রিভুবনের লোকে তাহা বলিতে পারেন না। আমি স্ত্রীজাতি না হইলে, তুমি আমারে "প্রাণের মায়া" উচ্চারণের উচিত দণ্ড প্রদান করিতে, তাহা বুঝিয়াছি; কেন না, তোমার তলোয়ার আছে। হা নির্লজ্জ! তুমি ক্ষত্রিয় বীরাঙ্গনার কিছুমাত্র মর্য্যাদা জান না। তুমি ক্ষত্রিয়কুলের কলঙ্ক,—ক্ষত্রিয়কুলের কুলাঙ্গার! আমি এতক্ষণ নির্ভয়ে এই নির্জ্জন গৃহে তোমার সহিত কথা কহিতেছি, তুমি কি বিবেচনা কর, আমি নিরস্ত্র? সতীব্রত-পরায়ণা ক্ষত্রিয় বীরাঙ্গনারা কখনও কি অস্ত্রশূন্য হইয়া অবস্থান করে? যুগল অস্ত্র তাহাদের সহায়। এক অস্ত্র সতীত্ব, দ্বিতীয় অস্ত্র কৃপাণ!"

ভর্ৎসনা-বচনে এই সকল কথা বলিয়া অপ্সরাসুন্দরী আপন অঙ্গবস্ত্র হইতে একখানি তীক্ষ্ণধার কৃপাণ বাহির করিয়া উগ্রচণ্ডাবেশে গর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

ক্ষত্রিয়ের নির্ভয় হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার। ক্রোধ দূরে গেল। ক্ষণকাল স্তম্ভিতভাবে নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া পুনর্ব্বার উপাসনাবাক্যে হৃদয়-সঞ্জাত পূর্ব্বভাব পরিব্যক্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রথমে কহিলেন, "দেবি! আমি তোমাকে চিনিয়াছি। তুমি যে একটী মহামূল্য রত্ন, ইহা বুঝিতে না পারিলে এত যত্ন করিয়া তোমাকে আমি হৃদয়-রাজ্যে আসন প্রদান করিয়া যত্ন-সঞ্চিত প্রেম ভক্তি চন্দনে পূজা করিব কেন?"

সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমে ক্রমে রজনীর গাঢ় অন্ধকারে রূপান্তরিত হইতে লাগিল; রাত্রি প্রায় দুই প্রহরের সীমায় উপস্থিত। এ সময় জীবকুল

মাত্রেই বিরামদায়িনী নিদ্রার ক্রোড়ে শয়ন করিয়া সুখময়ী শান্তির আশ্রয় লাভ করে। নিশীথসময়ে প্রকৃতিদেবী শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়া দিবাশ্রান্ত জীবকুলকে শান্তি প্রদান করেন। ধরাধাম নিস্তব্ধ হয়। বিশ্বেশ্বরের বিশ্ব-রাজ্য যেন প্রাণীশূন্য,—প্রজাশূন্য বোধ হইতে থাকে। কিন্তু যে বাটীর নিভৃত কক্ষে একজন বীরপুরুষ আর একটী বীরাঙ্গনার কথোপকথন চলিতেছে, সে বাটীর আর আর সকলেই কি নিদ্রাগত? প্রকৃতি নিস্তব্ধ। পৃথিবী অন্ধকার,—এখন এ নিগূঢ় প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান করা সহজ নহে।

যুবা প্রেমিক তাঁহার যত্ন-সঞ্চিত প্রেম-ভক্তি-চন্দনে উপাস্য দেবতার পূজা করিলেন। হাস্য করিয়া দেবী কহিলেন, "যথার্থই তুমি সত্যবাদী। পূজা করিবার এত উপকরণ থাকিতে তুমি যে কোথা হইতে কি জঘন্য উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছ, এখনও পর্য্যন্ত তাহা তুমি বুঝিতে পারিতেছ না।"

"পূজার উপকরণ ভক্তের রুচির উপর নির্ভর করে; দেবতারা কি তাহা অগ্রাহ্য করেন?"—এইরূপ ভূমিকা করিয়া প্রেমোন্মত্ত বীরবর বীরোচিত সভক্তি সুকোমল স্বরে কহিতে লাগিলেন:——

"যতনে তোমারে আমি পূজা করি দেবি!
প্রেম-পুষ্পে মাখাইয়া ভকতি-চন্দন,—
হৃদয় আসন পাতি, পরম যতনে,
ইহাগচ্ছ বলি, করি আহ্বান তোমায়।
মানস-প্রতিমা তুমি———"

স্থিরকর্ণে অপ্সরাসুন্দরী এই কথাগুলি শুনিলেন। শেষের কথা আর শুনিতে পারিলেন না। বাধা দিয়া মনে মনে হাস্য করিয়া, প্রফুল্লবদনে সেই প্রেমাকাঙ্ক্ষী বীরপুরুষকে কহিলেন, "তুমি রাজা, তোমার কথার উপরে কথা কহে, তেমন লোক সংসারে অতি কম; কিন্তু এই দেখ, আমি স্ত্রীজাতি,—এই দেখ, আমার হস্তে এই সুতীক্ষ্ণ বিরাট কৃপাণ, ইচ্ছা করিলে এই মুহূর্ত্তেই আমি হাতে হাতে তোমার পূজার ফল প্রদান

করিতে পারি। কিন্তু তাহা এখন করিব না। আমার একটী ব্রত আছে, সেই ব্রত উদ্‌যাপনের পূর্ব্বে জীবহিংসা করিতে নাই। তুমি আর কিছু-দিন এই মায়াময় ভবসংসারে দেবদেবীর আরাধনা কর।”

বীরবেশী রাজা এই ইঙ্গিতবাক্যের,-সূক্ষ্ম না হউক, স্থূল তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন। নিরাশা আসিয়া তাঁহার কর্ণে কর্ণে যেন কহিয়া গেল, "এ কামিনী অতি তেজস্বিনী।”

রাজা তখন ত্রিশঙ্কুর স্বর্গের ন্যায় উভয় জগতের মধ্যবর্ত্তী হইলেন। মনে মনে ভাবিলেন, জগৎ কত? জগতের উপর জগৎ, তাহার উপর জগৎ, উপর্য্যুপরি কতই জগৎ! অগণনীয়, অসংখ্য! কিন্তু মৌন থাকা ত ভাল দেখায় না; স্ত্রীজাতি জিতিয়া যাইবে, ইহাও ত সহ্য হয় না। আমি যখন ইহাকে আয়ত্ত করিয়া,—ছলেই হউক, বলেই হউক, অথবা অন্য কোন প্রলোভন-প্ররোচনাবাক্যেই হউক, আমি যখন ইহাকে আপন দুর্গমধ্যে আনিয়া অবরুদ্ধ করিয়াছি, তখন আর কোথায় পলাইবে? উত্তর করিতে হইল। মনে মনে এইরূপ আলোচনা করিয়া হাস্যসহকারে কহিলেন, "বীরকুমারি! অন্তরে অন্তরে যাহার প্রতি তুমি অনুরাগিণী, বিদ্রোহীসমরে তোমার সেই অনুরাগপাত্রের জীবনের অবসান হইয়াছে। তোমার প্রেমাস্পদ ভূপেশচন্দ্র আর পৃথিবীতে নাই।”

"কি!”—কালসর্পিণীর মত তর্জ্জনগর্জ্জন করিয়া,—বচনেশ্বরী সরস্বতীদেবীর মত গ্রীবাভঙ্গী করিয়া, তেজস্বিনী বিরহিণী অপ্সরাসুন্দরী কহিলেন, "কি! ভূপেশচন্দ্র পৃথিবীতে নাই? অপ্সরাসুন্দরী এখনও বাঁচিয়া রহিয়াছে! তুই ভাবিয়াছিস্,—পাপিষ্ঠ! নরাধম! দস্যু! তুই ভাবিয়াছিস্, তোর পাপপ্রবৃত্তি চরিতার্থ হইবে! তোর পাপবাসনা পরি-পূর্ণ হইবে! না,—কখনই না,—কখনই না! এই দেখ্, ক্ষত্রিয়কুমারী কিরূপে সতীত্ব রক্ষা করে!”

ভ্রূকুটীভঙ্গীতে এইরূপ তেজোগর্ভ সদর্পবাক্য উচ্চারণ করিয়া কৃপাণ-পাণি অপ্সরাসুন্দরী দক্ষিণ হস্তের কৃপাণ বামহস্তে গ্রহণ করিয়া মহাশ্মশানে নৃত্যকালীর ন্যায় যেন নৃত্য করিতে লাগিলেন।

এই স্থলে প্রকৃতির একটী চমৎকার খেলা প্রকাশ পাইল। ইতিপূর্ব্বে

আমরা যে প্রশ্নের উত্তর প্রদানে সমর্থ হই নাই, স্বয়ং প্রকৃতিসতী তাহার সদুত্তর প্রদান করিলেন। সে গৃহের সকলেই কি নিদ্রাগত? না,—তাহা নহে। কৃপাণপাণি হইয়া রাজকুমারী অপ্সরাসুন্দরী যেইমাত্র দুরাকাঙ্ক্ষী রাজার দুর্ব্যবহারে মহাক্রোধে গর্জ্জন করিতেছিলেন, তৎক্ষণাৎ চপলা আসিয়া দ্রুতবেগে সেই বীরাঙ্গনার অসিশোভিত হস্ত ধারণ করিল। চপলা এতক্ষণ দ্বারের অন্তরালে দাঁড়াইয়া প্রচ্ছন্নভাবে উভয়ের কথোপকথন উপকর্ণন করিতেছিল; প্রকৃত অবসরেই প্রবেশ করিয়াছে।

সহসা বাধা পাইয়া ক্রোধমুখী অপ্সরাসুন্দরী আরক্তনয়নে জিজ্ঞাসা করিলেন, "চপলা! তুমি এখানে এ সময়ে কি জন্য প্রবেশ করিলে? কেন আমারে ধরিলে?"

চপলা উত্তর করিল, "তুমি যে ভয় দেখাইলে! তাহাতে কাজেই অসময়ে আমারে আসিতে হইল।"

অপ্সরা কহিলেন, "কাহাকে ভয় দেখাইলাম?"

"আমাকে।"

"সে কিরূপ?"

"হস্তে অসি ধারণ করিয়া।"

"তাহাতে তোমার কি ভয়?"

"যদি কাহাকেও তুমি খুন কর!"

"কাহাকে?"

"যিনি আমাদের বন্দী করিয়া রাখিয়াছেন, সেই রাজাকে।"

রাজার দিকে কটাক্ষ বিস্তার করিয়া অপ্সরা কহিলেন, "রাজাকে? কে সে রাজা? ঐ বর্ব্বর? ঐ বর্ব্বরের রক্তে আমার এই অসিকে কলঙ্কিত করিব? না,—কখনই না।"

"আর যদি আত্মহত্যা কর?"

"চপলা! তোর মুখে এমন কথা? আমি বীরকন্যা বীরাঙ্গনা। একটা পতঙ্গের ভয়ে আত্মহত্যাপাপে বীরাঙ্গনার আত্মা কলুষিত হইবে? না,—কখনই না। চপলা! তুই আমায় ছেড়ে দে।"

আকারে, ইঙ্গিতে, কথার ভাবে, সাহস পাইয়া দূরবর্ত্তী নির্ব্বাক রাজা সেই বীরাঙ্গনাবাক্যে প্রতিধ্বনি করিলেন, "ছেড়ে দে!"

চপলা চঞ্চলভঙ্গীতে রাজার দিকে মুখ ফিরাইয়া দম্ভভরে কহিল, "তুমি রাজা চুপ কর। আমারে সামান্য কিঙ্করী ভাবিও না, আমি দুরন্ত বিষধরী। মনে করিলেই তোমাকে দংশন করিতে পারি।"

রাজা কিছু প্রচণ্ডস্বরে আদেশ করিলেন, "চপলা! আমি তোদের প্রভু, আমি অনুমতি করিতেছি, তুই এখান হইতে চলিয়া যা!"

দম্ভ করিয়া চপলা কহিল, "তোমার অনুমতি এখন আমি গ্রাহ্য করি না। আমাদের এই দেবী রাজসংসারের সতীলক্ষ্মী। রাজাধিরাজ, রাজরাজেন্দ্রের প্রাণাধিকা প্রিয়তমা কুমারী। ইঁহার কোন বিপদ হইলে আমাদের রাজসংসার লক্ষ্মীহারা হইবে। ইঁহার কোন অমঙ্গল আমি স্বচক্ষে দর্শন করিব না। প্রাণ দিয়া পারি, ধন দিয়া পারি, সংসারের যথাসর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া পারি, যেরূপে পারি, ইঁহাকে আমি রক্ষা করিবই করিব। তুমি কে?"

বক্র দৃষ্টিতে চাহিয়া অপ্সরাসুন্দরী কহিলেন, "চপলা! কাহার সঙ্গে কথা কহিতেছ? ইচ্ছা করিলে নিমেষমধ্যে যে পাপাত্মাকে আমি নিপাত করিতে পারি, তাহাকে দেখিয়া তোমার ভয় কি? দেখিতেছ না, পূর্ব্ব-গগন পরিষ্কার হইয়া আসিতেছে। রক্তবর্ণ বস্ত্র পরিধান করিয়া, রক্ত-সিন্দূরের ফোঁটা কপালে দিয়া, জীবমঙ্গলা উষাদেবী ধরাতলে অবতীর্ণা হইতেছেন। সকল কথা ছাড়িয়া দিয়া তুমি এখন উষাদেবীর শুভাগমনের আগমনী গাও। শুনিতেছ না, শাখায় শাখায় বিহঙ্গবিহঙ্গীরা প্রভাতী গীত ধরিয়াছে। ললিত রাগিণীতে, বিভাস রাগিণীতে, সুমধুরস্বরে প্রভাতী গাইতেছে। প্রভাত হইতে আর বিলম্ব নাই। শঙ্কা পরিহার কর। ঐ বর্ব্বরকে বিদায় করিয়া দাও। আমার লৌহখড়্গাকে যেমন নিবারণ করিয়াছ, তেমনি উহার রসনা-খড়্গাকে চরণাঘাতে নিস্তেজ করিয়া ফেল। একটী প্রভাতী গাও।"

কোন দিকে না চাহিয়া চপলাসুন্দরী অপ্সরার আদেশে সুললিত ললিতে একটী প্রভাতী ধরিল।

রাগিণী ললিত—তাল আড়া ঠেকা।

জাগ মা প্রভাতী সতি! ভারতেরি বনে বনে।
স্বরে স্বরে গাও দেবী, জাগাইয়ে পাখীগণে॥
তোমারি আশ্রিত হয়ে, তোমারি শরণ লয়ে,
বিপদে পড়ি না যেন, এই মিনতি চরণে॥
তুমি গো মা শুভঙ্করী, বিশ্বধাম-তম-অরি,
তোমারে প্রণতি করি, সভয় হৃদয়ে;——
দয়া কর দয়াবতি! এই দুষ্ট নরপতি,
শাসিছে অবলা প্রতি, ঠেল না মা শ্রীচরণে॥

গীত সমাপ্ত হইবার অগ্রে প্রভাতী পাখীরা, যাহার যেরূপ স্বর, যাহার যেরূপ সুর, সে সেইরূপ স্বরে, সেইরূপ সুরে দুটী তিনটী গান করিল। যাহারা শিস্ দিতে জানে, বিনা যন্ত্রে তাহারা মধুর স্বরে শিস্ দিল। ভ্রমর-ভ্রমরীরা গুঞ্জরিয়া উড়িয়া গেল। কিন্তু কোথায়? কুমুদিনী হইতে পদ্মিনীতে। মধুলোভী অলিকুল ফুলছাড়া থাকে না, মধুছাড়া থাকে না। পদ্মভ্রমে এক জোড়া ভ্রমর বারংবার অপ্সরাসুন্দরীর মুখের কাছে উড়িতে লাগিল। বাম হস্ত সঞ্চালনে, দক্ষিণ হস্ত সঞ্চালনে, বসনাঞ্চল সঞ্চালনে, তিনি তাহাদের নিবারণ করিতে লাগিলেন। শুনিল না। কিন্তু প্রকৃতিসতীর জগতের এই এক নূতন সৃষ্টি। প্রকৃতি পুরাতন। তিনি কাহারও উপরোধ অগ্রাহ্য করেন না, কাহারও উপরোধ গ্রাহ্যও করেন না। সমভাবে স্থির। তথাপি যামিনী প্রভাত হইয়া আসিতেছে, চাঁদকে ছি ছি বলিয়া পাখীরা উড়িয়া যাইতেছে, প্রকৃতি কিছুই বলিতেছেন না। তথাপি এক দিক অন্ধকার করিয়া অন্য দিক আলো করিতেছেন। এক দিকে কুমুদিনী মুদিত হইতেছে, হয় ত কাঁদিতেছে, শিশিরে। অন্য দিকে কমলিনী প্রস্ফুটিত হইতেছে, হাসিতেছে, হয় ত মিহিরে। কিন্তু দুটীই আমাদের ভুল। শিশির-কালে কমলিনীর বড় অভিমান হয়। ডুবিয়া মরিবার জন্য জলের ভিতর লুকাইয়া থাকে। সূর্য্য আসিতেছেন, সে কথা তখন তাহার মনে থাকে না।

সূর্য্য আসিলেই, তাহাকে ...করিতে হইবে, কমলিনী সে কথা ভুলিয়া যান। কিন্তু প্রভাত ত সে কথা জানে না। প্রভাকর ত সে কথা মনে করেন না। শেষে আসিয়া দেখেন, সরোবর অন্ধকার। ভ্রমর উড়িতেছে, তাহাদের মধুলোভ আছে, কিন্তু জলে কমলিনী নাই। কাক-পাখী কা কা রবে উড়িয়া গেল।

কাকেরা অন্ধকারের মত কৃষ্ণবর্ণ। অন্ধকার দূর হইয়াছে, সূর্য্যদেব পাছে কালো বলিয়া তাহাদেরও বিনাশ করেন, সেই ভয়ে কাকেরা পলায়ন করে। প্রকৃতিদেবীর এ সম্বন্ধ কি চমৎকার। কাকে আর অন্ধকারে কত ভেদ, বিশ্ব-কবি তাহা জানেন, সংসার-কবি তাহা জানেন, কিন্তু ধূর্ত্ত কাক তাহা জানে না। এখন অন্ধকার নাই, আমরা এখন এ ক্ষেত্র হইতে বিদায় হইলাম। কমলিনী জলে ডুবিয়াছে।

অপ্সরাসুন্দরী কহিলেন, "চপলা। আমাদেরও তাই হোক্। আয়! প্রভাতে আমরাও জলে ডুবি। মধুলোভে মধুলোভা ভ্রমর গুঞ্জরবে জলের উপর উড়ুক। আমারে দেখিতে পাইবে না। চপলা! আয়, আমরাও জলে ডুবিয়া যাই।"

ষট্‌চত্বারিংশ প্রবাহ।

রজনী প্রভাত।

প্রভাত গগনে সখি! উদিল মিহির,
অরুণে সারথি করি, অষ্ট অশ্ব-রথে,
রক্তবর্ণ দিবাকর জগতের ছবি,
ঘুচাইলা জগতের মহা অন্ধকার।

ভারতরত্ন।

রজনী প্রভাত। সমুদ্রের জলে মুক্তা থাকে। ছোট ছোট বালিকারা ছোট ছোট নাসিকায় ছোট ছোট মুক্তার নোলক পরে। ছোট ছোট ফুল-গাছেরা ফুলদলে, ফুলমুকুলে শিশিরবিন্দুর নোলক পরিয়া মুক্তার মত শোভা দেখায়। মল্লিকাফুল হাসে, বেলফুল সুগন্ধ বিতরণ করে, অভিমানে বকুল, শেফালিকা বৃক্ষতলে ঝরিয়া পড়ে। ধূলায় গড়াগড়ি যায়। কিন্তু প্রভাত কাহারও কোন শব্দ, কোন কথা গ্রাহ্য করে না। হাসিমুখে ধরাতলে উদয় হয়। দূর নিকুঞ্জে, বকুলপত্রের অন্তরালে, একটী কোকিলা বসিয়া ছিল, পঞ্চমে ঝঙ্কার দিয়া উঠিল। সহকারশাখে এক কোকিল বসিয়া ছিল, সে পাখী পঞ্চমে ডাকিয়া উঠিল, কু-উ-উ। কোকিল কোকিলা উভয়েই পঞ্চমে গায়, কিন্তু স্বরে আর ঝঙ্কারে লোকে বুঝিতে পারে,—পারুক আর না পারুক, বিচারে সিদ্ধান্ত করিয়া লয়, কোকিল আর কোকিলা।

আমরা সে সিদ্ধান্তের আদর করি না। আমরা বুঝি, যাহারা প্রেমিক, তাহারা প্রেমের মর্ম্ম জানিবে, যাহারা অপ্রেমিক, তাহারা অগাধ কালিন্দী-সলিলে পরমরত্ন ডুবাইয়া দিয়া আপনারা কেবল বিষহ্রদে ভাসিবে। কিন্তু সে কথা আর কতক্ষণ কহিব, রজনী প্রভাত। পূর্ব্বাকাশে সূর্য্যদেব সুপ্রকাশ। ঘোমটা দিয়া উষা সতী পলাইয়া গিয়াছে। শিশিরের ভয়ে কমলিনী জলে ডুবিয়া মরিয়াছে।—মরিয়াছে, মরুক। সকলেই মরিতে আসিয়াছে। সকলেই মরিবে। যে আসিয়াছে, সেই মরিবে। শিশিরের ভয়ে কমলিনী মরিয়াছে বলিয়া কি প্রভাকর মরিয়া যাইবেন? শীতকালে জলে কমলিনী ভাসে না বলিয়াই কি আকাশে সর্ব্বজীবসহায় সূর্য্যদেবের উদয় হইবে না? ধিক্ তবে সূর্য্যদেবকে। নবীন রমণীপ্রেমে এত অনু-রাগ? প্রভাকর! তোমার উদয়ে বিশ্ববিধাতার জীবসৃষ্টি রক্ষা হয়। শস্যশালী শস্যক্ষেত্র মুঞ্জরিত হইয়া শস্যশালী হয়। ছোট ছোট [illegible]ছেরা তোমার আলোতে সঞ্জীবিত হইয়া পল্লবিত হইয়া [illegible] জীবেরা তোমার প্রভাতে নবপ্রভা প্রাপ্ত [illegible]দান করে। পাণ্ডুবর্ণ তৃণলতা তোমার প্রভা[illegible] প্রাপ্ত হইয়া স্বাভাবিক সবুজবর্ণ ধারণ করে [illegible] বড় হই। আমাদের জল

লইয়া তুমি আগুন দাও। কিন্তু দেব! তোমারে প্রণাম করি, তুমি বড় পরোপকারনিষ্ঠ, শিষ্টশান্ত। সে আগুনে আমাদের দগ্ধ কর না; পরের উপকার ব্রতে ব্রতী হইয়া তুমি সলিল বিনিময়ে অনল বর্ষণ করিয়া জগতের জীবলোককে সুশীতল কর। তুমি বুঝি কাণা? তোমার রথের অশ্বেরা বুঝি কাণা? তোমার সারথি অরুন বুঝি কাণা? হও কাণা, হউক কাণা, ক্ষতি নাই। আগাগোড়া অরুন বিশ্ববিধাতার বিশ্বসংসারের উপকারের জন্য তোমার সারথি। দিননাথ! অরুণ তোমাকে বর্ষচক্রের পরিবর্ত্তনে ঋতুভেদে সকল পথেই লইয়া যায়। তুমি কিন্তু স্বভাবদোষে জগৎসংসারকে দগ্ধ করিতে ছাড় না, তবু কিন্তু আমরা তোমাকে ধ্যান করি। "ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং" ইতি মন্ত্রে নিত্য প্রভাতে তোমার পূজা করি।

যাও কোথা? একচক্র রথে চড়িয়া, রক্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়া, ভবঘোরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াও। তোমারে নমস্কার।

অনেকক্ষণ প্রভাত হইয়াছে। যিনি প্রভাতের আদি দেবতা আদিত্য, তিনি রক্তবর্ণ পরিত্যাগ করিয়া, কাঞ্চনবর্ণ,—কাঞ্চনবর্ণ পরিত্যাগ করিয়া, রজতবর্ণ।—প্রভাকর! তুমি কত বর্ণ ধারণ করিতে জান? তিন বৈ ত না। লোহিতবর্ণ, পীতবর্ণ আর শুভ্রবর্ণ। এই তিন বর্ণে কি সমস্ত বর্ণকে তুমি প্রতারণা করিতে পার? পার না। সকালে তোমাকে আমরা বড় দেখি, তখন তুমি রাঙা থাক কি সোণা থাক, বেস দেখিতে পাই। কিন্তু দেব! যখন যখন তুমি যত দূরে উঠ, তখন তখন তুমি তত ছোট হও। তোমার সোণার বর্ণ রূপা হয়। পরাক্রমে তেজ বাড়ে। মানবচক্ষু সে তেজের নিকটে স্থির থাকিতে পারে না। জানি তা, কিন্তু ভাস্কর! লোকসংসারে অত নিষ্ঠুর হইতে নাই। মানবেরা তোমার কোন অপকার করে না। শিশিরঋতুতে তোমার জলপ্রণয়িনী কমলিনী মনের দুঃখে জলে ডুবিয়া মরিতে যায়: সেই জন্য দোষী কি মানুষ? নলিনীকান্ত! নলিনীবিরহে তুমিও কি জলে ডুবিয়া মরিয়াছ? একবার ভাসিয়া উঠিয়া দেখ দেখি,—কমলিনীকে একবার ডাকিয়া দেখ দেখি,—জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ দেখি, মানুষের দোষে কি কমলিনী জলে ডুবিয়া

মরে? তুমি সূর্য্য। জগতের চক্ষু। তোমার কমলিনীকে মানুষে ডুবাইয়া মারে না। তোমার বিরহে সে আপনিই জলে ডুবিয়া মরে। সহস্র-রশ্মি ভগবান মরীচিমালি! তোমারই সংসারে আমি সংসারী, তোমার কমলিনী আপনা আপনি জলে ডুবিয়া আত্মহত্যা করে, কেবল তোমারই বিরহে। সে বিরহের কি শান্তি নাই? এক ঋতুর পর অন্য ঋতুর আগমন। শিশিরঋতুর পর বসন্তঋতুর আগমন। জান কি তা?

জান কি তা দিবাকর? নলিনী তোমার,
তোমার বিরহে হেরে ভব অন্ধকার॥
অভিমানে মানময়ী ঝাঁপ দেয় জলে।
বিরহ অনল তার হৃদয়েতে জ্বলে॥
লুকাইয়ে জলে থাকে, দেখিতে না পায়।
লুকাইয়ে মধুকর, অন্য মধু খায়॥

সূর্য্যের রথ আকাশে ছুটিয়া যাইতেছে। সলিলে কমলিনী ভাসিতেছে না। প্রণয়ের কোন কথা তাহার কর্ণে পশিতেছে না। রথ ছুটিয়া যাইতেছে। উত্তরায়ণ, দক্ষিণায়ণ দুই দিকেই সূর্য্যরথের গতি। কমল কখন ফোটে, কখন ফোটে না, তুমি আমি জানিতে না পারি, সূর্য্য তাহা জানেন। ভ্রমরেরাও জানে। ভ্রমর এতক্ষণ কোথায় ছিল? কুমুদিনীর কাছে। যাইবে কোথায়? কমলিনীর কাছে। কিন্তু কমলিনী ত ফুটিল না। জল মাথা নাড়িতেছে, ভ্রমরকে তাড়াইবার জন্য, কিন্তু ভ্রমর যাইবে কোথায়? কমল ত ভাসে না। কমল ত ফোটে না। শীতকালের প্রভাত। জলতল হইতে কমল মাথা নাড়িতেছে। সূর্য্যকে দেখিতেছে না, সূর্য্য তাহাকে দেখিতে পাইতেছেন না। জল নির্ম্মল। তবে দুই [illegible] বেড়ায় কেন? লোভে। লোভের বস্তু দেখিতে না [illegible] দেখে, সংসারে তাহারা কে? পদ্মিনী যদি [illegible], ঠিক্ উত্তর হইত, এখন উত্তর নাই।

রজনী প্রভাত। শুধু [illegible] গেল। শুধু শুধু প্রহর

আসিল, আর গেল। শুধু শুধু দ্বিপ্রহর সংসারকে জ্বালাইয়া দিল। যত-ক্ষণ বাকী, ততক্ষণ কে কাহারে দেখে? জলে আকাশে সম্পর্ক নাই। সূর্য্যকান্তমণি সূর্য্যকে দেখিয়া উজ্জ্বল জ্যোতি ধারণ করে। সে কেবল কথার কথা। সূর্য্যমুখীফুল সূর্য্যকে দেখিয়া প্রস্ফুটিত হয়, সে কেবল কথার কথা। জলের কমলিনী সূর্য্যকে দেখিয়া আমোদিনী হয়, সেটী সত্য, স্বভাবের কথা। কিন্তু শিশিরের ভয়ে কমলিনী সলিলে। তবে আর সূর্য্যদেব আকাশে অধিকক্ষণ থাকিবেন কেন? শীঘ্র শীঘ্র অস্তাচলে। সূর্য্যবিরহে শীতকালে দিনমান ছোট। আবার সন্ধ্যা হইল; আবার রাত্রি আসিল; আবার উষাসতী দেখা দিলেন। কিন্তু সূর্য্য যাহাকে ভাল-বাসেন, তিনি দেখা দিলেন না। এই রকমে তিন দিনের বিরহী সূর্য্য অস্তা-চলশায়ী হইলেন; অপ্সরার চক্ষে নিদ্রা নাই। তাঁহার অন্তরে কি চিন্তা, চন্দ্রসূর্য্য তাহা জানেন না। নক্ষত্রেরা সমস্ত রজনীর সাক্ষী, তাহারাও তাহা জানে না। তিন দিন, তিন রাত্রি অতিবাহিত হইয়া গেল। অপ্সরা-সুন্দরী বন্দিনী। কেহ তত্ত্ব লয় না,—কেহ আসিয়া জিজ্ঞাসাও করে না,—শান্তিপ্রবোধের জন্য কেহ একটী কথাও কহে না। কেবল মাঝে মাঝে প্রলোভন দেখাইতে,—প্রেমভিক্ষা করিতে, আবশ্যকমত ভয় প্রদর্শন করিতে দুর্গস্বামী রাজা আসেন। তাহাতে বরং আরও যন্ত্রণা বাড়ে। নিত্য প্রদোষে নক্ষত্রমালার সঙ্গে সঙ্গে অবরোধগৃহে চপলা আসে, আশা দেয়। কিন্তু সে আশা চপলা। সংসারের গতিই এই প্রকার।—মানুষের যখন দুঃসময় উপস্থিত হয়, তখন ঠিক এমনি দশাই হইয়া থাকে। আপনার লোক পর হয়, বন্ধুলোকে শত্রু হইয়া যায়, দুরবস্থার সময় কেহই নিকটে ঘেঁসিতে চায় না। দৈবাৎ দেখা হইলে অন্য ধার দিয়া মুখ ফিরা-ইয়া [illegible] যায়। অপ্সরাসুন্দরীর অবস্থা তাহা অপেক্ষাও শোচনীয়। [illegible] দিন যাইতেছে, অপ্সরাসুন্দরীর দুঃখের দিন শীঘ্র শীঘ্র [illegible] না [illegible] ত্রিশ সূর্য্য চক্ষের সমীপে এলেন আর গেলেন; [illegible]বোধ কেবল এই [illegible] আশা চপলা।

সপ্তচত্বারিংশ প্রবাহ।

তোমাকেই ভাবি।

"Innumerous, o'er their human prey,
Grim errors hang the hoarded sorrow:
Thro, vapour gleams the present day,
And darkness wraps the morrow."

Paraphrase.

"আঃ! আজি কিবা শুভ দিন! প্রাণেশ্বর! তুমি আসিয়াছ? যুদ্ধে কি জয়লাভ হইয়াছে? এক দুরন্ত দস্যু মায়াপ্রভাবে আমারে এই দুর্গনিবাসে বন্দিনী করিয়া রাখিয়াছে, ভয় দেখাইয়া বলিয়া গিয়াছে, ভূপেশচন্দ্র পৃথিবীতে নাই। হৃদয়নাথ! ইহা কি আমার স্বপ্ন? যদি পূর্ব্বে বিবাহ হইয়া থাকিত, কণ্ঠবেষ্টন করিয়া শোকাশ্রুধারে,—প্রেমাশ্রুধারে আমি তোমারে অভিষেক করিতে পারিতাম! কিন্তু ভূপেশ! মনে বড় খেদ রহিয়া গেল, আমি তোমারে মনের কথা বলিতে পারিলাম না।"

"কি তোমার মনের কথা মনোময়ি?"

"অনেক।"

"একটী বল।"

"কে যেন বাধা দেয়।"

"কে সে? লজ্জা?"

"না, তোমার কাছে লজ্জা আসিতে পারিবে কেন?"

"তবে বাধা দিবার কাহার অধিকার?"

"জানি না।"

"তবে তুমি কি পাগলিনী?"

"হ্যাঁ।"

"কেন জীবিতেশ্বরী? তুমি পাগলিনী কিসের জন্য?"

প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া অপ্সরাসুন্দরীর বক্ষঃস্থল যেন কাঁপিয়া উঠিল।—কষ্টে অশ্রুবেগ সম্বরণ করিয়া উত্তর করিলেন, "তোমারি জন্য।"

"আমার জন্য তোমার যন্ত্রণা?"

"দিবানিশি ভাবি।"

"আমি ত আসিয়াছি।"

"স্বপ্ন না সত্য?"

"সত্য।"

"কিসে প্রত্যয় হইবে?"

"দেখ না, আমি সম্মুখে।"

"তাহা ত দেখিলাম, কিন্তু যুদ্ধে কি জয় হইয়াছে?"

"যুদ্ধ হয় নাই।"

"হইবে না?"

"হইবে, কিন্তু ছয় মাস পরে।"

"তবে তুমি ছয় মাস আমার কাছে থাকিবে?—ছয় মাস আমারে রক্ষা করিবে?"

"যতদূর সাধ্য,—যতদূর শক্তি,——"

বাধা দিয়া অপ্সরাসুন্দরী কহিলেন, "শক্তি তোমার আমি। গিরিধারী শ্যামসুন্দর বামহস্তের অঙ্গুলীতে গোবর্দ্ধনগিরি ধারণ করিয়া দেবরাজের রোষে গোকুলপুরী রক্ষা করিয়াছিলেন।—আদ্যাশক্তি রাধা ভাগবত-শাস্ত্রপ্রমাণে বৈকুণ্ঠনাথের অর্দ্ধদেহের অধীশ্বরী। দক্ষিণে নয়, বামে। সেই কারণে ব্রজনাথ দক্ষিণহস্তে গোবর্দ্ধন ধারণ করেন নাই। দক্ষিণ হস্তে তাঁহার শক্তি ছিল না। বামভাগে শক্তির আবির্ভাব, সেই জন্য বাম হস্তের অঙ্গুলীতে গিরিধারী রাধানাথ গিরিগোবর্দ্ধন ধারণ করেন। এটী ভা[illegible]া।"

[illegible] আমার কি ফল?"

"তবে [illegible]?"

"ছেলেবেলার কথা।

"সে সকল কথা কি তোমার ম[illegible]

"একটীও ভুলি নাই। কাঁচা হাঁড়ীতে দাগ দিলে তাহা লুকায় না;—বরং আরও ফোটে। ছেলেবেলার কথা ঠিক সেই রকম।"

"একটী বল দেখি।"

"নমাতা, নপিতা, নৈব বান্ধবা।"

চক্ষের জলে ভাসিয়া অপ্সরাসুন্দরী কহিলেন; "জীবিতেশ! ও কথা শুনিয়া আমি কি বুঝিলাম?"

"তোমার পিতা আমাদের দম্পতী-প্রণয়ে বিঘ্নদাতা, তিনি জানেন, আমি ইতরবংশজাত, আর তুমি,—তুমি সতীলক্ষ্মী,—তুমি রাজচক্রবর্ত্তী রাজার কুমারী; তোমার সঙ্গে আমার বিবাহ কিরূপে সম্ভবে?"

হাস্য করিয়া অপ্সরাসুন্দরী কহিলেন, "তাহাই বুঝি?—তাহাই বুঝি তুমি মনে করিয়া রাখিয়াছ?"

"না রাখিয়া কি করি? শুনিয়াছি আমি রাজপুত্র। কিন্তু কে মাতা, কে পিতা, কিছুই জানি না। এক বিধবা আমাকে পালন করিয়াছিল। পুত্রের মত স্নেহ করিয়া,—শিক্ষালয়ে প্রেরণ করিয়া অষ্টাদশবর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত পরমযত্নে আমাকে রাখিয়াছিল; আমি রাজপুত্র, কেবল ইহাই আমি জানিতাম; তাহারই মুখে শুনিয়াছিলাম, কিন্তু কোন্ দেশের কোন্ রাজার পুত্র, তাহা জানিতাম না। হঠাৎ একদিন, কিরূপে জানি না,—আমার শিক্ষকের মৃত্যু হয়, আমার পড়াশুনা বন্ধ হইয়া যায়। যে অনাথা বিধবা স্ত্রীলোকের আশ্রয়ে আমি ছিলাম, তাহার সাময়িক যথোচিত সাহায্যের নিমিত্ত একবার দূরগ্রামে আমি গমন করিয়াছি, দৈববশে সেই সময় একদিন সন্ধ্যাকালে তাহার গৃহে আগুন লাগে। যথাসর্ব্বস্বের সঙ্গে আমার আশ্রয়দায়িনীর প্রাণপর্য্যন্ত ভস্ম হইয়া যায়। মনে ছিল, তাহারই কাছে আমার জন্মবৃত্তান্ত জানিব, কিন্তু সে আশা ফুরাইয়া গেল। আশা সর্ব্বদা সত্য কথা বলে না,—আশা সর্ব্বদা সমান পথে চলে না, আশা চপলা।"

"অত কথা শুনিয়া আমি কি করিব? ছেলেবেলা এক সঙ্গে ছেলেখেলা করিয়াছি, দুজনে এক সঙ্গে এক গৃহে বাস করিয়াছি, বয়সের সঙ্গে প্রণয়ের বৃদ্ধি। সে প্রণয় চিরস্থায়ী। সরল, অকপট, প্রগাঢ় প্রেমানুরাগ! ভূপেশ! সে কথা কি তোমার মনে আছে?"

"আমার মনে সব আছে। কিন্তু অপ্সরা! তোমার পিতা একজন দেশমান্য সমাদৃত রাজা, তিনি যে আমারে তোমা হেন কন্যাধন অর্পণ করিবেন, এমন আশা ছিল না, এখনও নাই। সত্য কথা! বড় ঘরের তনয়া বড় ঘরেই যাইবে। অপরিচিত বিদেশীয় সঙ্গে কখনই বিবাহ হইতে পারে না।"

হস্তে নয়নাচ্ছাদন করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে অপ্সরা কহিলেন, "আমার চক্ষে মেঘ ছিল, বজ্র ছিল, এখন জল আসিতেছে। আমার মা নাই, ভাই-ভগ্নী কেহই নাই, তুমি,—তুমি প্রাণেশ্বর! আমারে পরিত্যাগ করিয়া যাইবে? সে দিনের কথা মনে কর, যখন ছোট ছিলাম, দুজনে একত্র হইয়া ছায়াময় বৃক্ষতলে,—সুশীতল ছায়াময় বৃক্ষতলে ধূলাখেলা করিতাম। সন্ধ্যাকালে একটী নদীর সেতুতে বসিয়া আকাশের বাতাসের সঙ্গে জলের বাতাস খাইতাম। সে দিনের কথা কি মনে পড়ে? সূর্য্য অস্তের কিছু-পূর্ব্বে কাঞ্চনবরণী নদী, সাগরসঙ্গমের আশায় যেমন ছুটিয়া ছুটিয়া চলে, আমাদের দুজনের মন সেই নদী-স্রোতকে ধরিবার জন্য তেমনি ছুটিয়া ছুটিয়া চলিত। তুমি হাসিতে না, আমি হাসিতাম। মনে এক উৎসাহ ছিল,—মনে এক আনন্দ ছিল, এখন তাহা ফুরাইয়া গিয়াছে।"

"যদি ফুরাইয়া গিয়াছে, তবে আর আমাকে আশাবন্ধনে বাঁধিয়া রাখিবার প্রয়োজন?"

"প্রয়োজন আছে। বড় লোকের উপদ্রব।"

"বড় লোক কাহারা?"

"যাহাদের অর্থবল আছে।"

"তাহারা তোমাকে কি বলে?"

"ভালবাসিতে।"

"ভালবাসিতে পার?"

"জগতে যদি ভালবাসা না থাকে, তাহাও ভাল, তবু তোমারে ছাড়া আর কাহারেও ভালবাসিতে পারিব না।"

"অসময়ে এখন যদি আমি ফিরিয়া না আসিতাম, তাহা হইলে কাহাকে তুমি ভালবাসিতে?"

"ভালবাসা।" আকর্ণবিস্তৃত সজল নয়নে প্রশ্নকর্ত্তার মুখের দিকে চাহিয়া অপ্সরাসুন্দরী উত্তর করিলেন,—"ভালবাসা।"

"নাম কর।"

"ভালবাসা।"

"কে তোমার ভালবাসা?"

"ভালবাসা।—ভালবাসার নাম ভালবাসা।"

"আমি যদি আবার বঙ্গে যাই?"

"যাইতে পার।"

"তবে ভালবাসা কোথায় থাকিবে?"

"সঙ্গে।"

"জীবিতেশ্বরি! তোমার উপর দৌরাত্ম্য করে কাহারা?—সতীত্বধর্ম্ম নষ্ট করিতে চায়, তাহারা কাহারা?"

"বড় লোক।"

"বুঝিলাম না। বুঝাইয়া দাও।"

"যাহাদের অধিক অর্থ আছে, তাহারাই বড় লোক।"

"অর্থলোভে তুমি কি তাহাদের ভালবাস?"

"পরমেশ্বর ক্ষমা করুন। আমিই আমার শত্রু। অপর কাহাকেও ভয় করি না, নিজে আপনাকেই আমি ভয় করি।"

"এ কথায় ভালবাসার তারতম্য কি বুঝিব?"

"আমি আছি।"

"থাকিতে হয় আছ, যতদিন থাকিতে হয়, থাকিবে, কিন্তু অর্থলোভে আর কাহাকেও যে ভালবাসিবে না, সে কথা আমাকে কে বুঝাইয়া দিবে?"

"আমি।"—বক্ষে করাঘাত করিয়া অপ্সরাসুন্দরী কহিলেন, "আমি! ভূপেশ! একবার তোমার কথা শুনিয়া মনে করিয়াছিলাম, হয় ত তুমি রহস্য করিতেছ। কিন্তু—কিন্তু দ্বিতীয় বার,—দ্বিতীয় বার যখন তুমি সেই কথা উচ্চারণ করিলে তখন আমার অন্তরে নিদারুণ আঘাত লাগিল। অর্থলোভ?—অর্থলোভে আমি পবিত্র প্রণয়ধনের বিসর্জ্জন করিব?

ধিক্ অর্থ। যাহারা তুচ্ছ অর্থলোভে হৃদয়ের আরাধ্যবস্তুকে হৃদয় হইতে অন্তর করিতে পারে, তাহাদের যে হৃদয় আছে, এ কথায় কে বিশ্বাস করে? আমি অবলা, আমার হৃদয়ে পবিত্র প্রণয় বাস করে। কতবার বলিয়াছি, ভগ্ন কুটীরে বাস করিয়া, ভিক্ষা করিয়া উদরপোষণ করিয়া যদি জীবন ধারণ করিতে হয়, তাহাও স্বীকার, তথাপি জীবনের জীবন প্রণয়ধনকে কদাচ আমি স্থানচ্যুত করিব না। ধনলোভ আর প্রণয়, এই উভয়ে যে কত অন্তর, অবলা স্ত্রীজাতি হইয়াও তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি। আমি—"

"আমি ধৈর্য্যহারা হইয়াছি! কিছুতেই অদমনীয় মনকে দমন করিতে পারিতেছি না। মতমর্ত্ত শঙ্কা হইতেছে, তুমি অবিশ্বাসিনী।"- সকল কথা না শুনিয়া ভ্রূভঙ্গীক্রমে ভূপেশচন্দ্র কহিলেন, "আমার শঙ্কা হইতেছে, তুমি অবিশ্বাসিনী।"

"সে কি প্রাণেশ্বর! আমি অবিশ্বাসিনী? তোমার পদতলের ভূমি চুম্বন করিয়া জগৎপিতার নামে আমি শপথ করিতেছি,—যে ভূমিতে জন্ম হইয়াছিল, সেই ভূমিতে জানু নত করিয়া তোমার ঐ চরণে আমি কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিতেছি। তুমি ভিন্ন ত্রিসংসারে এ অভাগিনীর আর কেহই নাই।"

"আর তোমার পিতা?"

"পায়ে পড়িব, তোমাকে ভালবাসি, এ কথা স্পষ্ট করিয়া বলিব, তথাপি কি তিনি সদয় হইবেন না?" মনের সত্যভাব গোপন করিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া একটু হাসিয়া অপসরা পুনর্ব্বার কহিলেন, "পিতার পায়ে ধরিব।"

"না অপ্সরা! বলিও না; তিনি আমাকে ঘৃণা করেন, তাঁহার কাছে আমার নাম উচ্চারণ করিও না। যদি জগতের জন্য এ নামের কখনও কোন প্রয়োজন হয়, তাহার জন্য আমি দায়ী রহিলাম, কিন্তু যিনি আমাকে ঘৃণা করেন,—যিনি আমাকে অবিশ্বাস করেন, তাঁহার নাম আমি শুনিতে ইচ্ছা করি না। ক্ষমা কর অপ্সরা! তোমাতে আমাতে বিচ্ছেদ হইবে না। যত দিন জগতে থাকিব, হৃদয়ে তোমাকেই ভাবিব। যদি অপরের হও, তুমি হইতে পার, কিন্তু আমার অন্তর হইতে কখনও অন্তরে যাইবে না। আমার দুর্ভাগ্য, ললাটের লিখন, সে দুর্ভাগ্য আমি চিরদিন বহন করিব। কিন্তু

জীবিতেশ্বরি! তুমি পরের হইলেও আমি এ জীবনে তোমাকে ভুলিতে পারিব না। প্রণয়-স্বপ্ন হইতে আমি জাগিয়া উঠিয়াছি, আর কি ঘুমাইতে পারি? বিরহের সঙ্গে নিদ্রার একটা কুসম্পর্ক আছে, সে সম্পর্ক সাধারণ লোকে জানে না। তুমি প্রাণময়ী অপ্সরা। তুমি আমার হৃদয়প্রতিমা অপ্সরা! তুমি হয় ত সে তত্ত্ব জানিতে পার, কিন্তু অপর সাধারণে তাহা জানে না। ভালবাসিয়াছিলাম, ভুলিতে পারিব না, তুমি যদি ভুলিতে পার, ভুলিয়া যাইও। অপরকে যদি ভালবাসিতে ইচ্ছা কর, ভালবাস। কিন্তু আমি,—আমি তোমাকে হৃদয়রাজ্যের সিংহাসনে রাণী করিয়া রাখিয়াছি। তুমি অপ্সরাঃ—

জাগিতেছ অহরহ হৃদি-সরোবরে।
ভাসিতেছ, খেলিতেছ প্রেমানন্দভরে॥
ভুলি ভুলি করি আমি, ঘুরি ভবঘোরে।
প্রাণের প্রতিমা তুই, ভুলিব না তোরে॥
পাখী হয়ে উড়ে যাস্, অনন্ত আকাশে।
আমিও উড়িয়া যাব ধরিবার আশে॥
আশার প্রতিমা তুই, অপ্সরাসুন্দরী।
আমার হৃদয়রাজ্যে রাজরাজেশ্বরী॥
কতই কল্পনা আসে ভুলাইতে তোরে।
কে তারা কল্পনা? নিধি হরে নিবে চোরে?
চোরে আমি চিনি না ত, হয়েছি পাষাণ।
তোমারে হারায়ে প্রিয়ে! রহিবে না প্রাণ॥
হৃদয় ঈশ্বরী তুমি, অপ্সরাসুন্দরি!
তোমারি সহায়ে আমি ভবধামে চরি॥
ছলনা আমার নাই পবিত্র হৃদয়।
বুঝি আমি কারে বলে পবিত্র প্রণয়॥

তুমি সতী গুণবতী ভালবাস তারে।
আমারে ভুলিয়ে ভাল বাসিয়াছ যারে ॥"

অপ্সরাসুন্দরী হাসিয়া কহিলেন, "সে কি প্রাণেশ্বর! তোমার কি মতিভ্রম হইয়াছে? দাসীর প্রতি এমন অনুমতি কেন?"

"কেন, তাহা জানি না। কিন্তু শুনিয়াছি, তুমি পরপ্রেমে, নবপ্রেমে নবরসিকা।"

"ভুল।"

"যাহারা বলিয়াছে, তাহাদের ভুল হইতে পারে, কিন্তু তোমার ভুল নয়। আমারও না।"

"তোমারি ভুল।"

"অসম্ভব।"

"কাহাতে তবে সম্ভব?"

"বিবেচনা করিয়া দেখ।"

"বিবেচনা আমার তোমাতে।"

"তোমার চরিত্রচর্য্যা পর্য্যালোচনা করিয়া তদবধি আমার আর বিবেচনাশক্তি নাই।"

"শক্তি নাই?"

"না।"

"কেন জীবেশ্বর! আমি ত তোমার শক্তি, আমি ত আছি।"

"তুমি কাহার?"

"আমি তোমার।"

"মিথ্যা কথা।"

"আমি মিথ্যা কথা জানি না।"

"আচ্ছা, তবে সত্য বল দেখি, আমারে অত অবজ্ঞা কর কেন?"

"যুদ্ধযাত্রা করিতে চাহিয়াছিলে, ক্ষত্রিয়বীরধর্ম্মে আমি যুদ্ধযাত্রায় অনুমতি দিয়াছিলাম, তাহাকে কি তুমি বল অবজ্ঞা?"

"না, তাহা আমি বলি না, তুমি অন্য প্রেমের অভিলাষিণী। শুনিয়াছি,

পুরাতন প্রেম অপেক্ষা নূতন প্রেম,—নবীন প্রেম তোমার বড় আদরের সামগ্রী।"

"মাথায় আমার বজ্রপাত হউক! নূতন প্রেমকে এ জন্মে এ হৃদয়ে স্থান দিব না।"

"প্রেম কাহাকে বলে জান?"

"কিছু কিছু জানি।"

"বল দেখি।"

"যদি তুমি শুনিতে ইচ্ছা কর, জানিতে না পারি,—বুঝিতে না পারি,—বুঝাইতে না পারি, কিন্তু আমি নিজে যত দূর বুঝিয়াছি, বলিয়া যাই, শেষ মীমাংসা তোমার হাতে:—

প্রাণে প্রাণে গাঁথিয়াছি প্রেম-হেম-হার।
গলে পরি সেই হার, বাসনা আমার॥
ছিঁড়ে কি ফেলিতে পারি মুখের কথায়?
না ত, না ত, প্রাণনাথ! বুক্ ফেটে যায়॥
বনের নন্দিনী আমি, বনে করি বাস।
তোমা ধনে পাই যদি পূরাইব আশ॥
গেঁথেছি দু ছড়া মালা বনফুল তুলে।
তোমারে পরাব বোলে, রাখিয়াছি তুলে॥
হৃদয়ের রাজা তুমি, হৃদিসিংহাসনে।
বসো এসে হৃদীশ্বর! হৃদয় আসনে॥"

"মুখের কথাগুলি ত বেশ শুনিলাম। কিন্তু ইহা ছাড়া তোমার কি হৃদয়ের আর কোন কথা আছে? অসম্ভব! বহুদর্শনে আমি জানিয়াছি, অবিশ্বাসিনী নারীজাতির হৃদয় নাই।"

"তবে অভিসম্পাত কর না কেন?"

"শিখি নাই।"

"তবে আমারে কি শিখাইয়া দিতে হইবে? সম্পর্ক—"

অসম্পূর্ণ বাক্যে বাধা দিয়া, শেষ পর্য্যন্ত না শুনিয়াই ভূপেশচন্দ্র কহিলেন, "সম্পর্ক থাকিলে একটু সরলতা শিখাইতাম।"

" সম্পর্ক কি ফুরাইয়াছে ?"

" বোধ করি।"

" তবে প্রাণ তোমাকে এত ভালবাসে কেন ? আর তোমার জন্যে প্রাণই বা এত কাঁদে কেন ?"

" মায়ার ছলনে। মায়াকে আমি বিসর্জ্জন দিব দিব মনে করি, কিন্তু বিধাতার কেমন বন্ধন, মায়ার হস্ত এড়াইতে পারি না।"

" তোমার হৃদয়ে কি মায়া আছে ?"

" ত্রিসংসারে কাহার হৃদয়ে নাই ? মায়া না থাকিলে শান্তিশতকের পাঠ সার্থক হইত,—তুমি কার, কে তোমার !—"

" উঃ ! তুমি অত দূর গিয়াছ ? "

" অত দূর কি ? আমি আরও অনেক দূর যাইতে পারি।"

" তাহা হইলে আমি কোথায় থাকিব ?"

বক্ষে হস্ত প্রদান করিয়া বীরকুমার কহিলেন, " এই স্থানে।"

শিহরিত কলেবরে, অপ্সরাসুন্দরী কহিলেন, " ঐ স্থানে কি স্থান আছে ?"

"আছে কি না আছে প্রিয়ে ! দেখ দেখি আসি।
প্রেমের যতনে পাতা রত্ন-সিংহাসন,
আরোহণ কর আসি ত্রিলোক-মোহিনী,
তোমারে হৃদয়ে রেখে সুখী হব আমি।"

" কেন প্রাণেশ্বর ! চরণেই ত আমি আছি।"

" আমি জানিয়াছি, তুমি বিশ্বাস রাখিতে জানিতে, এখন আর জান না, এখন আর আমার বিশ্বাস কি ?"

" বিশ্বাস করিতে না পার, চরণে স্থান দিও ;——

চরণের দাসী আমি, রয়েছি চরণে।
লয়ে যাও, যথা ইচ্ছা, রণে কিম্বা বনে ॥

তোমার চরণ ছাড়া রহিবে না দাসী।
চরণপিপাসী দাসী, চরণপিপাসী॥
জীবনবল্লভ! আমি জীবন-কিঙ্করী।
চির-জীবনের তরে আছি সহচরী॥
আমারে ত্যজিয়ে নাথ! যাইবে কোথায়?
যথা যাবে, এ কিঙ্করী যাইবে তথায়॥

জীবিতেশ্বর! কুমারসম্ভবের রতি বিলাপ কি তোমার মনে পড়ে না?"

"তাহা মনে পড়িলে কি হইবে?"

"আমাকে চিনিতে পারিবে।"

"রতিবিলাপ মনে পড়িলে তোমাকে চিনিতে পারিব, এ বড় হাসির কথা।"

"কেন নাথ! হাসির কথা কেন?

"নয় কেন?"

"রতিদেবী বলিয়াছিলেন, কন্দর্পকে হারাইয়া যদি আমি পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকি, তাহা হইলে মানুষেরা আর দম্পতীপ্রেম শিক্ষা করিবে না।"

"যদি এমন, তবে রতিদেবী অনুমৃতা হইয়া যান নাই কেন?"

"দেবতার কৃপায় কন্দর্প পুনর্বার জীবন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই জন্য।"

"তুমি কি কুমারসম্ভবের রতিবিলাপ জান?"

একজন বাঙ্গালী কবি বাঙ্গালা করিয়া যাহা বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, তাহার একটু একটু মনে আছে।"

"বল দেখি।"

"সব বলিতে পারিব না, ভুলিয়া গিয়াছি। কিন্তু মনে আছে পাহাড়ী,—

অর্দ্ধ-গীত।

চিতায় প্রবেশ করি, ছার দেহ পরিহরি,
আর কার তরে ধরি, এ ছার জীবন।

হারাইয়ে প্রাণপতি, বাঁচিয়ে রহিল সতি,
এ কথা আমার প্রাণে, সবে না কখন।"

"তবে তুমি কি তাই?"

"না। তত দূর সাধ্য আমার নাই।"

"তবে কেন এত আকিঞ্চন?"

"প্রাণের নিমিত্ত।"

"প্রাণকে কি তুমি এতই ভালবাস?"

"না। প্রাণকে আমি একটুও ভালবাসি না।"

হাস্য করিয়া ভূপেশচন্দ্র কহিলেন, "তোমাকে ভালবাস না, আমাকে ভালবাস না, প্রাণকে ভালবাস না, তবে কাহাকে ভালবাস?"

গম্ভীরভাবে অপ্সরাসুন্দরী কহিলেন, "একটী বস্তু আছে।"

"সে বস্তুর নাম কর।"

"ভুলিয়া যাই।"

"যে যাহাকে ভালবাসে, সে কি তাহাকে ভুলিয়া যায়?"

"না, ভুলিয়া যাই নাই।"

"তবে বলিতেছিলে কেন?"

"শোক, দুঃখ, কষ্ট, লাঞ্ছনা, যন্ত্রণা, সমস্তই একত্র। বনে যখন অনেক পাখী অনেক সুরে গান গায়, তখন মহাদেবের রাগরাগিণী ধরা যায় না। আমি দুঃখিনী, অভাগিনী দাসী, সংসারবনে প্রবেশ করিয়াছি, কি বলিতে কি বলি, কখন কি কথা মনে করি, সংসার কোলাহলে সমস্তই ভুলিয়া যাই।"

"যদি এত ভুলিতে পার, তবে আমাকে কি ভুলিতে পার না?"

"না প্রাণেশ্বর! প্রাণ থাকিতে তোমাকে ভুলিতে পারিব না।"

"তবে বহুদিনের পর আজ আমি তোমাকে প্রাণেশ্বরী বলিয়া ডাকি?"

অপ্সরাসুন্দরী লজ্জায় অধোমুখী হইলেন। আর কি দেখিবেন, আর কি শুনিবেন, অন্তরে অন্তরে উল্লাস, কিন্তু বাহিরে গাত্রকম্প, নিমীলিত নেত্র, লজ্জায় জড়-সড়।

ভূপেশচন্দ্র কহিলেন, "যুদ্ধ হয় নাই।"

অপ্সরা কহিলেন, "যুদ্ধে কাজ নাই। যতক্ষণ দেখি, ততক্ষণ ভাল। বিবাহ হয় নাই, তুমি আমার পতি হও নাই, তথাপি একটী সম্পর্ক বন্ধন হইয়াছে। আমার নিরুদ্দিষ্ট পিতা তোমার হাতে হাতে আমারে সঁপিয়া দিয়াছেন। তুমি যেমন রমণীকে জননী বলিতে পার, রমণীকে রমণী বলিতে পার, তোমার তলোয়ার আছে, মনে করিলে স্বজনকেই কাটিয়া ফেলিতে পার, আমিও তেমনি অবলা স্ত্রীজাতি, পতিকে পিতা বলিতে পারি, পতিকে পতি বলিতে পারি, পতিকে পুত্র বলিতেও পারি। পতি স্ত্রীলোকের একমাত্র গুরু, গুরু যখন কর্ণে মন্ত্র দান করেন, তখন তিনি গুরু। আমি যখন তাঁহারে ঠাকুর বলিয়া সম্ভাষণ করি, তখন তিনি গুরু। সর্ব্বস্ব গুরুকে দিলাম;—আমি নারী, এ কথা যখন গুরুকে বলি, তখন তিনি পতি। গুরু যখন স্নেহ করিয়া আমাকে মা বলিয়া ডাকেন, তখন তিনি আমার পুত্র।"

"বুঝিলাম। কিন্তু যখন তুমি আমাকে বার বার বঞ্চনা করিতেছ, তখন তোমার প্রতি বিশ্বাস হয় কিসে?"

"বিশ্বাস কি বাহিরে দেখা যায়? বিশ্বাস গোপনীয় সামগ্রী। হৃদয়ের অন্তরন্তলে বিশ্বাস লুকাইয়া থাকে।"

"তোমার বিশ্বাস কি সেইরূপ?"

"হইতে পারিত, কিন্তু সেই রাজা—"

"কোন্ রাজা?"

"তুমি কি তাহা জানিতে পারিতেছ না?"

"অল্প।"

"তোমার পক্ষে অল্প, কিন্তু আমার পক্ষে অধিক।"

"আমি মহাহবে ব্রতী!"

"তাহাতে কি হইল?"

"এখানে আমি বিলম্ব করিতে পারিব না।"

"বিলম্বের প্রয়োজন?"

"রাজাকে দেখিতাম।"

"তুমি চপলাকে দেখিয়াছ?"

বিস্মিত হইয়া রাজপুত্র কহিলেন, "চপলাও কি এখানে?—আমি তোমার সকল কথা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছি না। পথে যাহা শ্রবণ করিলাম, তাহার সহিত এ ঘটনার ঐক্য আছে; কিন্তু চপলাও কি এখানে?"

রাজকন্যা কহিলেন, "তুমি কি প্রলাপবাক্য বলিতেছ? বল দেখি, আমি কোথায়?"

"রাজা দুর্জ্জয় সিংহের দুর্গে।"

"বল দেখি আমি কে?"

"রাজা দুর্জ্জয় সিংহের বন্দিনী।"

যথার্থই অনুমান করিয়াছ। তবে কি রাজা দুর্জ্জয় সিংহের প্রায়শ্চিত্ত হইবে না?

"হইতে পারে। যুদ্ধের অবসানে।"

"কেন, এখানে ত যুদ্ধ নাই? অপ্সরাসুন্দরী আর কত দিন বন্দিনী থাকিবে?"

ভুপেশচন্দ্রের অটল হৃদয়ে অকস্মাৎ যেন তাড়িতক্রিয়ার গতিবিধি হইল। সবিস্ময়ে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "চপলা কোথায়?"

রাজকুমারী ঠিক উত্তর দিতে পারিলেন না। দ্বারের পার্শ্বে চপলা লুকাইয়া ছিল, এই রকমে লুকাইয়া থাকা তাহার অভ্যাস, চপলাগতিতে চপলা আসিয়া গৃহমধ্যে দেখা দিল।

রাজপুত্র কহিলেন, "চপলা! এই যে চপলা, ঠিক হইয়াছে। আর বিলম্ব নাই, যে বেশে চপলা তুমি থাক, সেই বেশ পরিধান কর। আর তুমি, অপ্সরাসুন্দরি! তুমিও আমার মত বীরবেশ ধারণ কর। দেখি দেখি, এই বৈরীদুর্গে আজ কে তোমাদের আটক্ রাখিতে পারে?"

বেশভূষা পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। হুহুঙ্কার গর্জ্জনে দুর্জ্জয় সিংহ প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, তিন বীর-মূর্ত্তি একত্র; কাহাকে কি বলিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। হতভম্বা হইয়া দ্বারসমীপে দাঁড়াইয়া রহিলেন। আদেশস্বরে, কুমার ভূপেশচন্দ্র তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কুক্কুর! তুই ক্ষত্রিয়কুলাধম্! তুই কি এই দুর্গের অধীশ্বর? স্ত্রীজাতিকে কয়েদ করা কি ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম? রথীতে রথীতে যুদ্ধ হইলেও নিরস্ত্র রথীকে

কেহ প্রহার করে না। অবরুদ্ধ করিয়াও রাখে না। নিকুম্ভিলাযজ্ঞগৃহের দ্বারে মহাবীর মেঘনাদ খুল্লতাত বিভীষণকে কহিয়াছিলেন,

"নিরস্ত্র যে রথী, তারে প্রহারে সমরে,
কহ মহারথি! এ কি মহারথি-প্রথা?"

তুমি বীরপুরুষ নও, তুমি কাপুরুষ। অবলা কুলবালাকে বন্দিনী করিয়া রাখিয়াছ। দুষ্প্রবৃত্তি সাধনের অভিসন্ধি স্থির করিতেছ! ধিক ক্ষত্রিয়নামে! ধিক্ ক্ষত্রিয়কুলে! ধিক্ ক্ষত্রিয় অস্ত্রে! এখনি আমি তোমার মস্তকচ্ছেদন করিতে পারিতাম, কিন্তু কাপুরুষের মস্তকচ্ছেদনে কোন পৌরুষ নাই। আমি তোমার জীবন ভিক্ষা দিলাম; যাহাকে তুমি কিঙ্করী চপলা বলিয়া জানিতে, সে আজ আমার প্রধান সেনাপতি, চম্প সিংহ! চম্প সিংহ! শীঘ্র এই বর্ব্বর শূকর শাবককে বন্ধন কর। মর্ম্মবেদনা দিও না। বন্ধন করিয়া আমাদের যুদ্ধ ক্ষেত্রে লইয়া চল।"

অপ্সরাসুন্দরী কহিলেন, "ভূপেশচন্দ্র! আর একটা কথা। এই পাপিষ্ঠ দুর্জ্জয় সিংহ আমার চপলাকে ক্রীত দাসী বলিয়াছিল, অবসর পাইলে আমারেও হয় ত ক্রীত দাসী বলিত। আমি ক্ষমা করিয়াছি, তুমি ইহারে ক্ষমা কর। বন্ধন করিও না। জগতের,—জগতের,—ত্রিজগতের সাক্ষী উপরে একজন আছেন, তিনিই বিচার করিবেন। তুমি আমি বিচার-কর্ত্তা নই, বন্ধন করিও না। যুদ্ধক্ষেত্রে লইয়া যাইবারও প্রয়োজন করে না। যাহার রাজত্ব, সেই ভোগ করুক্। আমাদের তুমি মুক্ত করিয়াছ, সাধু তুমি! যিনি ত্রিজগতের সাক্ষী, তিনি তোমার মঙ্গল করিবেন। আমরা তোমার সঙ্গে যাইব। এই যে দেখিতেছ রাজা, ইহার সৈন্যবল আছে। কিন্তু তাহা থাকিলে কি হইবে? বনে একটা শৃগাল ডাকিলে দূরে নিকটে শত শত শৃগাল সমস্বরে প্রতিধ্বনি করে; কিন্তু তাহারা শৃগাল ভিন্ন আর কিছুই নয়। এই দুরাচার রাজা দুর্জ্জয় সিংহও তাই। আমি ইহারে শৃগালের দলে গণনা করি। ইহার হৃদয়ে ক্ষত্রিয়শোণিত নাই। তুমি ভূপেশচন্দ্র, তোমার শরীরে ক্ষত্রিয়শোণিত বহমান। তুমি কি একটা সামান্য শৃগালের প্রতিযোগী হইবে? আমি তাহা কখনই হইতে দিব না।

বন্ধন করিও না, সঙ্গে লইও না, পাপের যদি প্রায়শ্চিত্ত থাকে, এই রাজ্যেই ইহার সে প্রায়শ্চিত্তের চরম হইবে। চল, আমরা যাই।"

ভূপেশচন্দ্র অপ্সরাসুন্দরীর বাক্যে শত সহস্রগুণ সাহস ও উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়া দুরাত্মা দুর্জ্জয় সিংহকে অব্যাহতি দিলেন। তাহার পর তিন জনেই রণবেশে গৃহ হইতে বিনিষ্ক্রান্ত।--ভূপেশচন্দ্র,—অপ্সরা-সুন্দরী,—আর চপলা।

অষ্টচত্বারিংশ প্রবাহ।

নূতন রাণী।

"পৃথিব্যাং সাগরান্তায়াং যৎকিঞ্চিদধিগম্যতে।
তৎ সর্ব্বম্ তব দাস্যামি মা ত্বং মে মৃত্যুমাবিশ ॥"

রামায়ণম্।

স্বর্গভূষণ ছুটী লইয়া বাটী আসিয়াছেন। তাঁহার চেহারা পূর্ব্বে যেরূপ ছিল, সৈনিকদলে উচ্চপদ প্রাপ্ত হইয়াও তাহার কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই। ঠিক সেইরূপই আছে। তাঁহার মাতাপিতার পুণ্যে কেবল এই মাত্র বলিতে পারা যায়, পূর্ব্বাপেক্ষা অপকৃষ্ট অবস্থা ঘটে নাই। ঘটে নাই সত্য, কিন্তু নূতন লোকে তাঁহাকে দেখিলে নিশ্চয়ই মনে করিবে, পৃথিবীর ভোগ তাঁহার ভাগ্যে অতি অল্প দিন মাত্র অবশিষ্ট।

এক মাস গেল। রাণী এক দিন সস্নেহবচনে পুত্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "স্বর্গভূষণ! যুদ্ধক্ষেত্রের লাল পোষাক পরিলে তোমাকে কেমন দেখায়, তাহা দেখিতে আমার বড় ইচ্ছা হইতেছে। বৎস! একবার সেই পোষাকটী পরিধান কর।"

স্বর্গভূষণ জননীর আজ্ঞা পালন করিলেন। সামরিক পরিচ্ছদে যথার্থই

তাঁহাকে অতি সুন্দর দেখাইল। যে পাখীর পালক সুন্দর, সে পাখীকে সুন্দর দেখায়। একটা কাক একবার ময়ূর সাজিয়াছিল। এত কুৎসিত কাক, তথাপিও ময়ূরপুচ্ছে তাহার শোভা হইয়াছিল। স্বর্গভূষণ জীর্ণশীর্ণ রুগ্ন হইলেও রণবেশে যেন তাঁহার রূপ বাড়িল। রাজমহিষী সানন্দমানসে সন্তানের চিবুক স্পর্শ করিয়া দক্ষিণ হস্তে একটী চুম্বন করিলেন।

আর এক সপ্তাহ অতীত হইল। রাজা আর রাণী উভয়ে একটী নির্জ্জন কক্ষে উপবেশন করিয়া কি কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। চুপি চুপি কথা। সকল কথা শুনিতে পাওয়া গেল না। মধ্য অবসরে কর্ণে প্রবেশ করিল, রাজা কহিলেন, "মহিষি। স্বর্গভূষণের গতিক তুমি কেমন বিবেচনা কর?"

"কেন, কেন, রাজা। তুমি আমারে ভয় দেখাও কেন? সত্যই তোমার কথা শুনিয়া আমার ভয় হইতেছে। তুমি অমন কথা জিজ্ঞাসা করিলে কেন মহারাজ?"

"কেন? তুমি কি দেখিতেছ না, উহার স্বভাবের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই। কুসঙ্গে বাস, কুখাদ্য ভক্ষণ, কুপানীয় পান, কুকার্য্যে প্রবৃত্তি আর অনবরত নিশাজাগরণে উহার শরীর নিতান্ত ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে। মনে হয় যেন, মুখে চক্ষে রক্তবিন্দু নাই।"

"কেন রাজা? তুমি হয় ত ভাল করিয়া দেখ নাই। আমি সে দিন ভোজনের পূর্ব্বে উহারে যুদ্ধক্ষেত্রের লাল পোষাক পরাইয়া অনেকক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া দেখিয়াছি। বাছার আমার যেন কতখানি রূপ বাড়িয়াছে। তুমি তাহা দেখ নাই,—মায়ের প্রাণ কি না,—তাহা দেখিয়া আমার মনে যে কতখানি আনন্দ, তুমি পতি, পৃথিবীর দেবতা, অন্তরাত্মার গুরু, তোমার সাক্ষাতে মিথ্যা কথা বলিতেছি না। রাঙা পোষাকে আমার স্বর্গভূষণের যে কতদূর সৌন্দর্য্য আমি দর্শন করিয়াছি, তাহা তোমারে আর কি বলিব! তুমি অমন কথা বলিতেছ কি জন্য? বাছার যে অকল্যাণ হইবে!"

মুখ ফিরাইয়া একটু হাসিয়া রাজা কহিলেন, "তোমার বাছার আমি কল্যাণকামনাই করি। কান্তিপুষ্টি বৃদ্ধি হইয়াছে, সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হইয়াছে,

আহ্লাদের কথা। কিন্তু কি করিলে যথার্থ কল্যাণ করা হয়, তাহা কি তুমি জান রাণী ?”

“আমি ত জানি, তোমার আমার আশীর্ব্বাদ, আর সেই মঙ্গলময় পরমেশ্বরের অনুগ্রহ।”

“এ কথা সত্য, কিন্তু আরও কিছু আছে।”

“আরও আছে? তাহা ত আমি জানি না।”

“যাহাতে জানিতে পার, তাহা আমি বলিয়া দিতেছি।”

“বল।”

“স্বর্গভূষণের বিবাহ দিতে হইবে।”

“বল কি তুমি রাজা ? এত অল্পবয়সে বিবাহ ?”

“তোমার ইচ্ছা আর আমার ইচ্ছা, এক প্রকার হইতে পারে, কিন্তু আমি বুঝিতেছি, বিবাহ ভিন্ন উহার চরিত্রশোধনের আর অন্য উপায় নাই। চরিত্রশোধন হইলেই উহার দেহরক্ষা হইবে, ভগবানের ইচ্ছায় দীর্ঘজীবীও হইতে পারিবে, নতুবা নহে।”

“চরিত্র শোধনের জন্য আরও ত অন্য উপায় আছে।”

“না রাণি! আমি ত অন্য উপায় দেখিতেছি না। পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পাঠশালার বালকের মত শাসন করা মাতাপিতার কার্য্য নয়। তাহাতে বরং বিপরীত ফল ফলিতে পারে। দশ বৎসর আমি দেখিতেছি, স্বর্গভূষণ নিয়তই অসৎসঙ্গে অনুরক্ত। সেই অনুরক্তি উহাকে ক্রমে ক্রমে অধিক হইতে অধিকতর অসৎপথে লইয়া যাইতেছে। সে প্রবৃত্তির দমন করা তোমার আমার সাধ্য নয়। সেই জন্যই বলিতেছি, শীঘ্র শীঘ্র বিবাহ দেওয়াই কর্ত্তব্য।”

রাণী কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিলেন। চিন্তা করিয়া বড় একটী নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, “এতক্ষণে আমি তোমার কথা বুঝিলাম। মনে করিয়াছিলাম, আরও দুই এক বৎসর পরে স্বর্গভূষণের বিবাহ দিব। বুদ্ধি পরিপক্ক হইলে, দম্পতীপ্রণয়ের যে কি মহিমা, মানুষে তাহা বুঝিতে পারে। তাহা কি তুমি জান রাজা ?”

“জানি। কিন্তু তোমার পুত্রের সুবুদ্ধি পরিপক্ক হইবার অগ্রেই দুর্ব্বুদ্ধির

তাঁহাকে অতি সুন্দর দেখাইল। যে পাখীর পালক সুন্দর, সে পাখীকে সুন্দর দেখায়। একটা কাক একবার ময়ূর সাজিয়াছিল। এত কুৎসিত কাক, তথাপিও ময়ূরপুচ্ছে তাহার শোভা হইয়াছিল। স্বর্গভূষণ জীর্ণশীর্ণ রুগ্ন হইলেও রণবেশে যেন তাঁহার রূপ বাড়িল। রাজমহিষী সানন্দমানসে সন্তানের চিবুক স্পর্শ করিয়া দক্ষিণ হস্তে একটা চুম্বন করিলেন।

আর এক সপ্তাহ অতীত হইল। রাজা আর রাণী উভয়ে একটী নির্জ্জন কক্ষে উপবেশন করিয়া কি কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। চুপি চুপি কথা। সকল কথা শুনিতে পাওয়া গেল না। মধ্য অবসরে কর্ণে প্রবেশ করিল, রাজা কহিলেন, "মহিষি! স্বর্গভূষণের গতিক তুমি কেমন বিবেচনা কর?"

"কেন, কেন, রাজা! তুমি আমারে ভয় দেখাও কেন? সত্যই তোমার কথা শুনিয়া আমার ভয় হইতেছে। তুমি অমন কথা জিজ্ঞাসা করিলে কেন মহারাজ?"

"কেন? তুমি কি দেখিতেছ না, উহার স্বভাবের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই। কুসঙ্গে বাস, কুখাদ্য ভক্ষণ, কুপানীয় পান, কুকার্য্যে প্রবৃত্তি আর অনবরত নিশাজাগরণে উহার শরীর নিতান্ত ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে। মনে হয় যেন, মুখে চক্ষে রক্তবিন্দু নাই।"

"কেন রাজা? তুমি হয় ত ভাল করিয়া দেখ নাই। আমি সে দিন ভোজনের পূর্ব্বে উহারে যুদ্ধক্ষেত্রের লাল পোষাক পরাইয়া অনেকক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া দেখিয়াছি। বাছার আমার যেন কতখানি রূপ বাড়িয়াছে। তুমি তাহা দেখ নাই,—মায়ের প্রাণ কি না,—তাহা দেখিয়া আমার মনে যে কতখানি আনন্দ, তুমি পতি, পৃথিবীর দেবতা, অন্তরাত্মার গুরু, তোমার সাক্ষাতে মিথ্যা কথা বলিতেছি না। রাঙা পোষাকে আমার স্বর্গভূষণের যে কতদূর সৌন্দর্য্য আমি দর্শন করিয়াছি, তাহা তোমারে আর কি বলিব! তুমি অমন কথা বলিতেছ কি জন্য? বাছার যে অকল্যাণ হইবে!"

মুখ ফিরাইয়া একটু হাসিয়া রাজা কহিলেন, "তোমার বাছার আমি কল্যাণকামনাই করি। কান্তিপুষ্টি বৃদ্ধি হইয়াছে, সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হইয়াছে,

আহ্লাদের কথা। কিন্তু কি করিলে যথার্থ কল্যাণ করা হয়, তাহা কি তুমি জান রাণী?"

"আমি ত জানি, তোমার আমার আশীর্ব্বাদ, আর সেই মঙ্গলময় পরমেশ্বরের অনুগ্রহ।"

"এ কথা সত্য, কিন্তু আরও কিছু আছে।"

"আরও আছে? তাহা ত আমি জানি না।"

"যাহাতে জানিতে পার, তাহা আমি বলিয়া দিতেছি।"

"বল।"

"স্বর্গভূষণের বিবাহ দিতে হইবে।"

"বল কি তুমি রাজা? এত অল্পবয়সে বিবাহ?"

"তোমার ইচ্ছা আর আমার ইচ্ছা, এক প্রকার হইতে পারে, কিন্তু আমি বুঝিতেছি, বিবাহ ভিন্ন উহার চরিত্রশোধনের আর অন্য উপায় নাই। চরিত্রশোধন হইলেই উহার দেহরক্ষা হইবে, ভগবানের ইচ্ছায় দীর্ঘজীবীও হইতে পারিবে, নতুবা নহে।"

"চরিত্র শোধনের জন্য আরও ত অন্য উপায় আছে।"

"না রাণি! আমি ত অন্য উপায় দেখিতেছি না। পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পাঠশালার বালকের মত শাসন করা মাতাপিতার কার্য্য নয়। তাহাতে বরং বিপরীত ফল ফলিতে পারে। দশ বৎসর আমি দেখিতেছি, স্বর্গভূষণ নিয়তই অসৎসঙ্গে অনুরক্ত। সেই অনুরক্তি উহাকে ক্রমে ক্রমে অধিক হইতে অধিকতর অসৎপথে লইয়া যাইতেছে। সে প্রবৃত্তির দমন করা তোমার আমার সাধ্য নয়। সেই জন্যই বলিতেছি, শীঘ্র শীঘ্র বিবাহ দেওয়াই কর্ত্তব্য।"

রাণী কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিলেন। চিন্তা করিয়া বড় একটী নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "এতক্ষণে আমি তোমার কথা বুঝিলাম। মনে করিয়াছিলাম, আরও দুই এক বৎসর পরে স্বর্গভূষণের বিবাহ দিব। বুদ্ধি পরিপক্ক হইলে, দম্পতীপ্রণয়ের যে কি মাহাত্ম্য, মানুষে তাহা বুঝিতে পারে। তাহা কি তুমি জান রাজা?"

"জানি। কিন্তু তোমার পুত্রের সুবুদ্ধি পরিপক্ক হইবার অগ্রেই দুর্ব্বুদ্ধির

সমস্ত কার্য্য আসিয়া জুটিয়াছে। উৎপাত, উপদ্রব, উপসর্গ, যাহা কিছু সংসারে থাকিতে পারে, তোমার স্বর্গভূষণের বুদ্ধিতে সকলগুলিই একত্রিত হইয়াছে। সেই জন্য।"

"কতদূর সত্য, কতদূর মিথ্যা, তাহা আমি ঠিক জানি না, কিন্তু তোমার যাহা ইচ্ছা হইয়াছে, তাহাতে অমত করিবার আমার স্বাধীনতা নাই।"

"আচ্ছা! এখন বিবেচনা করিয়া বল দেখি, কোথায় সম্বন্ধ স্থির করা যায়?"

আর একটী নিশ্বাস ফেলিয়া রাজমহিষী উত্তর করিলেন, "ঐ কথাই বড় শক্ত কথা। রাজপুত্রের বিবাহসম্বন্ধ সোজা কথা নয়। রাজার ছেলেরা রাজার ঘরেই বিবাহ করে। অন্য ঘরে বিবাহ করিলে মাথা হেঁট্ হয়। অন্য দেশে যদি অন্য ব্যবহার থাকে, থাকুক্; কিন্তু আমাদের দেশের এই রীতি।"

"আমি তাহা বুঝি,—আমি তাহা মানি, কিন্তু চিন্তা করিয়া বল দেখি, কোথায় বিবাহ দিলে ভাল হয়?"

"চিন্তা আমারে অনেক কথা বলিতেছে। এক কথা, রাজা বিজয়কৃষ্ণের কনিষ্ঠা কুমারী।—কন্যাটী দেখিতে বেস সুশ্রী। কিন্তু চুলগুলি কটা। জান রাজা! আমি কটা চুল ভালবাসি না।"

"তবে ও কথা ছাড়িয়া দাও। আর একটী নাম কর।"

"রাজা হরপ্রসাদের তৃতীয়া দুহিতা সুরবালা।—মেয়েটী বেস্ সুন্দরী, সর্ব্বাঙ্গে খুঁত নাই,—তা ছাড়া আরও তাহার পিসী মৃত্যুকালে তাহাকে তিন লক্ষ টাকা দিয়া গিয়াছে। কিন্তু না,—তাহার সঙ্গে স্বর্গভূষণের বিবাহ হইতে পারে না, স্বর্গভূষণ গীতবাদ্য ভালবাসে। সে মেয়ে গান জানে না। কোন যন্ত্র বাজাইতেও শিখে নাই। নাচিতেও পারে না। স্বর্গভূষণ তাহাকে পছন্দ করিবে না।"

"তবে ও কথাও ছাড়িয়া দাও। আর কোন পাত্রীর অন্বেষণ কর।"

"অন্বেষণ করা আছে, রাজা ভীমসিংহের ভগ্নী।—সে মেয়েটীও পরমসুন্দরী। মাথায় মিস কালো একমাথা চুল, বেণীবদ্ধ হইলে সেই বেণী যেন ভুজঙ্গিনীর ন্যায় জানু স্পর্শ করে। চক্ষুদুটী যেন নীলপদ্মের মত

উজ্জ্বল। রং যেন রসান করা সোণা। সেই মেয়েটীই ভাল। না,—না, না,—না রাজা! তাহা হইবে না, মেয়েটা খাঁদা,—খাঁদা মেয়ে কখনও আমার স্বর্ণভূষণের ঘরণী হইতে পারিবে না।"

"তুমি রাণী আমাকে পাগল করিয়া তুলিতেছ! যে নাম করিতেছ, তাহাতেই একটু একটু খুঁত বাহির করিতেছ। কখনও তবে কি পাত্রী মিলিবে না?"

"আরও আছে। রাজা উদয় সিংহের ছয় কন্যা। সেই ছয়ের মধ্যে চতুর্থ যেটী, সেটী অতি চমৎকার। বয়সও অষ্টাদশ অতিক্রম করে নাই। সেই মেয়েটীর সঙ্গেই,—না রাজা, তাহাও হইবে না, আমি বলিতে ভুলিয়াছি, ঋণে ঋণে উদয় সিংহের মাথার চুল পর্য্যন্ত বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। ঋণীর কন্যাকে বধূ করিয়া কখনই আমরা সুখী হইতে পারিব না।"

"তবে তোমার পুত্রের বিবাহ হইবে না।"

"হইবে না কেন? অবশ্য আমি, সকল কথা মনে করিয়া সকল সময় বলিতে জানি না, কিন্তু আরও আছে।"

"নাম কর। বৃথা সময় নষ্ট করিতেছ, নাম কর।"

"নাম করিতে আমার ঘৃণা হয়।"

"নাম কর! ঘৃণা আমি বুঝিতে পারিব।"

"পারিবে?—পারিবে?—পারিবে তুমি রাজা? শোন তবে।—রাজা বিরাটকেতুর কন্যা অপ্সরাসুন্দরী।"

"বল কি রাণী? বিরাটকেতু কি রাজা? সে এক জন পেয়াদা। তাহার কন্যার সহিত আমার পুত্রের বিবাহ? উঃ! মহিষি! তুমি এমন কথা উচ্চারণ করিলে আমার কাছে? সংসারে তুমি ছাড়া আর কেহ যদি এমন অপমানের,—এমন কলঙ্কের কথা বলিত, আমি তাহার রসনা ছেদন করিতাম!"

"আর যদি স্বর্ণভূষণ উচ্চারণ করে?"

কথার উত্তর করিবার আর অবসর হইল না। স্বর্ণভূষণ যেন উন্মত্তের ন্যায় সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। মাতাপিতার কথা বন্ধ হইয়া গেল। বুঝিতে হইবে, প্রচ্ছন্নভাবে দাঁড়াইয়া স্বর্ণভূষণ উত্তেজিত-

ভাবে মাতাপিতার বাক্য উপকর্ণন করিতেছিলেন। প্রবেশ করিয়াই তীরবেগে বাহির হইয়া গেলেন।

পথে একটী পর্ব্বত। সেই পর্ব্বতের সম্মুখে একজন লোক দাঁড়াইয়া। সঙ্গে তিনটী কুকুর। যাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল, তিনি ঘন ঘন হাই তুলিতে-ছিলেন, ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতেছিলেন। দিন কি রাত্রি, উভয়েরই তাহা মনে ছিল না। আমি কি মনে করিয়া দিতে পারি? পারি, কিন্তু দিব না। দুই জনে সাক্ষাৎ হইল। যাহার সঙ্গে কুকুর, তিনি দ্রুতপদে পশ্চিম দিকে চলিয়া যাইতেছিলেন, বাধা দিয়া দর্শনকারী ডাকিলেন, ''রাজা বিরাটকেতু! কোথা যাও? দাঁড়াও, একটী কথা আছে।''

যিনি চলিয়া যাইতেছিলেন, সত্যই তিনি বিরাটকেতু। একটু পরেই দুই জনের চক্ষে চক্ষে মিলন হইল। ইনি নমস্কার করিলেন, তিনি নমস্কার করিলেন। একজনের মুখে হাসি, আর একজনের মুখ বিষণ্ণ।

পাঠকমহাশয়! আমাকে ক্ষমা করিবেন, পরিচয় দিবার অগ্রে নূতন নূতন লোকের সহিত আপনাকে দেখা করাইয়া দিই। এ অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। আশা চপলা আখ্যায়িকার জন্মই এইরূপে। শরৎ-কালের মেঘ, কোথায় মেঘ কোথায় বৃষ্টি, নির্ণয় করিতে গেলেই মহাগোল। যে দুই মূর্ত্তির সহিত শৈলপথে সাক্ষাৎ, তাঁহাদের একজন অপ্সরাসুন্দরীর পিতা বিরাটকেতু, আর একজন নবীন সেনানী স্বর্ণভূষণ।

স্বর্ণভূষণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজা! তুমি কোথায় যাইতেছ?"

ভয়ে কাঁপিয়া রাজা উত্তর করিলেন, "গৃহে যাইতেছি।"

"আমাকে দেখিতে পাইয়া কথা কহিলে না, সম্ভাষণ করিলে না, কোথায় যাইতেছ?"

"রাজকুমার! তোমাকে দেখিয়া আমার বড় লজ্জা হয়। আমি নিজে স্বইচ্ছায় তোমার অপমান করি নাই। তুমি——"

"পুনরায় দেখা হবে নাহি ছিল মনে।
ঈশ্বরীর ইচ্ছাবশে দেখা তব সনে॥
জাতশত্রু তুমি মম, দুরন্ত পামর!
পার যদি কর এবে, কপটতা কর॥

ছলনাতে ভুলিব না থাকিব স্ববশে।
দেখিব কেমনে কেবা অন্তরে নিবশে॥
শত্রু মিত্র জ্ঞান নাই, হেন জ্ঞান যার।
তাহার মাথায় করি পাদুকা প্রহার॥"

"তুমি রাজকুমার স্বর্গভূষণ! এত ক্রোধ প্রকাশ করিতেছ কেন?—আমি তোমার কাছে অপরাধী হইয়াছি।"

"তোমার কন্যার সহিত আমার যে বিবাহ দিতে পার নাই, সে জন্যে না, তুমি সেই অপ্সরাসুন্দরীর পিতা, সেই কারণে,—শুদ্ধ সেই কারণে।"

"আমি অপরাধী।"

"তাই বুঝি রাজা তুমি দেখিয়ে আমারে।
ছুটে ছুটে পলাইছ? হা ধিক্ তোমারে!
ভয় নাহি মহারাজ! কোন ভয় নাই।
বারেক তোমারে আমি হেরিবারে চাই॥
বিশ্বাসঘাতক তুমি জানিয়াছি মনে।
বিবাহ হবে না মম অপ্সরার সনে॥

রাজা! তুমি কাহার সঙ্গে অপ্সরাসুন্দরীর বিবাহ দিবে?"

"রাজকুমার! আমরা ক্ষত্রিয়সন্তান। আমাদের কন্যারা স্বয়ম্বরা হয়। আমার অপ্সরা যে কাহার গলায় বরমালা দিবে, তাহা আমি কিরূপে জানিব?"

"রাজা! স্বয়ম্বরপ্রথা ত অনেক দিন লোপ পাইয়া গিয়াছে। তুমি কি কন্যার উপর প্রভুত্ব করিতে পার না?"

"পারি, কিন্তু পারিলাম না। তুমি স্বর্গভূষণ, মাতাপিতার তুমি একমাত্র সন্তান, আমার অপ্সরাসুন্দরীও আমার একমাত্র কন্যা। সে যে কোথায়, তাহার আমি অন্বেষণ পাইতেছি না। তাহার ইচ্ছার বিরোধে আমি তাহার বিবাহ দিতে পারিব না। জান তুমি রাজকুমার! স্নেহের বন্ধন

বড় শক্ত। দিবারাত্রি আমার চক্ষে জল পড়ে। তোমার জন্য অপ্সরা আমার পলাইয়া গিয়াছে। ধরিয়াছিলাম, পাইয়াছিলাম, দেখিয়াছিলাম, এখন যে কোথায় পলাইয়া গিয়াছে, আর সন্ধান পাই না। উঃ! আমি পাগল! অপ্সরা! অপ্সরা! অপ্সরা! মা! কোথায় তুই! তুমি রাজকুমার কি বলিয়া দিতে পার, আমার অপ্সরা কোথায়?"—পাগলের কথায় স্বর্গভূষণ উত্তর দিলেন না; মুখ ভারী করিয়া চলিয়া গেলেন।

অনেক পাখী এক বারে ডাকিয়া উঠিল। দিবা ছিল কি নিশা ছিল, আমাদের জানা ছিল না, কিন্তু অনেক পাখী ডাকিতেছে, নক্ষত্রেরা ম্লান হইয়া আসিতেছে। চন্দ্র অস্তগত। কোন্ তিথি, এ সময় মনে হয় না। আকাশে চন্দ্র নাই, উষা আসিয়া দেখা দিযাছে। এ ছুঁড়ী বড় দুষ্ট। রজনীর ভোগ শেষ হইতে না হইতে উষা আসিয়া পক্ষিকুলকে জাগাইয়া দেয়। পক্ষীরা জগৎপিতার গুণ গান করে। তবে উষা দুষ্ট কেন? সে কথা আমার মনে আছে। একবার দুষ্ট বলি, একবার পূজা করি। আর তুমিও উষা, জগৎকে জাগাইয়া দিয়া নিত্য নিত্য মধুরস্বরে একটী গীত গাও। সেই গীত আমার মনে পড়েঃ——

বিভাস,—আড়াঠেকা।

জাগো জাগো জীবকুল! প্রভাত হলো যামিনী।
নব নলিনীর দলে হাসে নলিনী কামিনী॥
মৃণালে ফোটে কমল, বায়ুভরে টল টল,
সুরবে উছলে জল, তরঙ্গিত তরঙ্গিণী।
দুটী পদ্মচক্ষু মেলি, কত খেল, কত খেলি,
পদ্মিনী আমারে ফেলি, লুকাইয়ে গেলিঃ—
আমি তোরে ভালবাসি, সদা দেখিবারে আসি,
তুই সতী সর্ব্বনাশী, কেন হলি অভিমানী।

ঐ বুঝি প্রভাত হইয়া গেল। উষা বুঝি অভিমান করিয়া চলিয়া গেল। উষাকে আমি শাপ দিব। সুখনিশি সমাপ্ত হইতে না হইতে,—সুখস্বপ্ন

ভঙ্গ হইতে না হইতে তুই সর্ব্বনাশী কেন রজনীকে বিদায় করিয়া দিস্? রজনীকে আমি বড় ভালবাসি। রজনীর সঙ্গে লক্ষ্মীসরস্বতী আমার হৃদয়ে ক্রীড়া করেন।

রজনী প্রভাত। প্রভাতে রাজা বিরাটকেতু প্রভাতভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন, একটী পর্ব্বত হইতে একটী নূতন নদী নির্ঝরের সঙ্গে সঙ্গে প্রবাহিত হইতেছে, অপূর্ব্ব শোভা! পর্ব্বত কি নদী প্রসব করে? স্ত্রীজাতিই ত প্রসব করিয়া থাকে, পর্ব্বত স্ত্রীজাতি নহে, তবে বুঝি পাষাণী আছে। না থাকিলে প্রসূতি হইবে কে? নূতন নদীর জলে সূর্য্যের ছায়া পড়িয়াছে, নদীকে যেন স্বর্ণবর্ণ দেখাইতেছে. প্রভাতের সূর্য্য রক্তবর্ণ হয়, সেই রক্তবর্ণের ছায়া জলে পড়ে, স্থলে পড়ে, বৃক্ষে পড়ে পর্ব্বতে পড়ে, সমস্ত জগৎসংসার স্বর্ণবর্ণ দেখায়। আমি তাহা দেখি না, আমার হৃদয়ে একটী চক্ষু আছে, সে চক্ষু চন্দ্রসূর্য্য দেখে না, বৃক্ষলতা দেখে না, গ্রহনক্ষত্র দেখে না, মর্ত্ত্যধামের মানুষ পর্য্যন্তও দেখে না, দেখে কেবল প্রকৃতিসতীকে। সতি! সতি! সতি! প্রকৃতি! প্রকৃতি! প্রকৃতি! আমার হৃদয়ে আসিয়া বিরাজ কর! তোমার শ্রীপাদপদ্মে আমি প্রণিপাত করি। ভুলিয়া কি যাবি মা? না ত! ছাড়িয়া ত দিব না! একবার;——

এসো মা প্রকৃতি সতি! মম হৃদয় আকাশে।
প্রাণ যেন উড়িতেছে তব অনন্ত বাতাসে॥
বাতাসে বাতাসে যেন উড়িতেছে মন।
তবু দরশন করি তব শ্রীচরণ॥
প্রকৃতি! প্রকৃতি তুমি, প্রকৃতিই আছ।
কত কাল মায়ারূপে বিশ্ব ছলিয়াছ॥
আমারে ছলিতে তুমি পার না সুন্দরি!
ভক্তিভরে পাদপদ্মে প্রণিপাত করি॥
ওই যে কাঞ্চন আভা বিকাশে গগনে।
মোহিত ভবের লোক যাহা দরশনে॥

আমি তাহে মোহিব না থাকিব নিশ্চল।
তোমার করুণা শুধু আমারি সম্বল॥
এসো মা হৃদয়রাজ্যে, রাজরাজেশ্বরী।
বার বার তব পদে নমস্কার করি॥

বেলা হইয়াছে। কত বেলা, মনে নাই। রাজা বিরাটকেতু নদীতীরে পরিভ্রমণ করিতেছেন। আবার কুক্কুরসমভিব্যাহারী।—স্বর্গভূষণের সহিত সাক্ষাৎ। স্বর্গভূষণও কুক্কুর লইয়া ভ্রমণ করেন; কিন্তু আমি যেন মনশ্চক্ষে দেখি, তিনিও একটী কুক্কুর। দুরাচার, নরপিশাচ,—সংসারের যত ঘৃণিত কার্য্য তিনি আদর করিয়া মানেন। সেই সকল ঘৃণিত কার্য্যের জন্যই তাঁহার ততদূর দুর্দ্দশা,—তাহা যদি না হইত, রাজপুত্র হইয়া ততদূর দুরবস্থার দাস হইতে হইবে কেন?

রাজা বিরাটকেতু ব্যস্তপদে গৃহাভিমুখে ধাবিত হইতেছেন, স্বর্গভূষণ পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া বারম্বার ডাকিলেন, "রাজা! রাজা! কোথায় যাও? তুমি অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়াছ, তাহা আমার মনে আছে, তোমার কন্যাকে ভিকারীর হস্তে সম্প্রদান করিতে তুমি কৃতসংকল্প, জানি তা, কিন্তু রাজা, তোমার কন্যা অপ্সরাসুন্দরী——"

"ওঃ! না, না, সে নাম আর আমার কর্ণে উচ্চারণ করিও না। অপসরাসুন্দরী জগতে আমার সর্ব্বস্ব ছিল। অপ্সরাসুন্দরী আমার দেহের জীবনপ্রদীপ ছিল। অপসরা ত আমার নাই। কেন রাজকুমার তুমি সে নাম উচ্চারণ কর? সে নাম আমি আর শুনিতে পারি না. মাতৃহারা বালিকা, কত যত্নে আমি যে তাহাকে পালন করিয়াছিলাম; উঃ!—"

রাজা আর কথা কহিতে পারিলেন না। দরদরধারে তাঁহার যুগল নেত্রে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল।

স্বর্গভূষণ কহিলেন, "রাজা! তুমি ইচ্ছা করিয়া অন্ধ হইয়াছ। পাশ্চাত্যের একজন মহাকবি কি জন্য অন্ধ হইয়াছিলেন, তাহা হয় ত তুমি জান, জানিয়া শুনিয়া যে অগ্নিতে তুমি চক্ষু আহুতি দিয়াছ, সে অগ্নি আমাকেও দগ্ধ করিতেছে। আমাদের আর্য্য দেশের আদি কবি, মহাকবি বাল্মীকি,

পাশ্চাত্যের আদি কবি, মহাকবি হোমার, ইংলণ্ডের মহাকবি মিল্টন, কিন্তু রাজা! আজিকার কালে আমার মত কবি নাই, আমি তোমার কন্যাকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলাম, প্রতারণা করিয়াছ, অগ্রাহ্য করিয়াছ, তাহার প্রায়শ্চিত্ত কর।"

"কি পাপের প্রায়শ্চিত্ত রাজপুত্র?"

"অঙ্গীকার ভঙ্গ।"

"আমি ত অঙ্গীকার ভঙ্গ করি নাই। অপ্সরা পলায়ন করিয়াছে, আমার অজ্ঞাতে, তোমার অজ্ঞাতে, অভাগিনী দুহিতা স্বইচ্ছায় পলায়ন করিয়াছে। আছে কি নাই;—"

"আছে, আমি তাহাকে দেখিয়াছি, সেই দরিদ্র শূকরসন্তানের সহিত তোমার অপ্সরা লুকাইয়া লুকাইয়া বেড়াইতেছে, আমাকে প্রহার করিয়াছে, ধাক্কা মারিয়া ফেলিয়া দিয়াছে। রাজা! বলিতে লজ্জা হয়, তোমার অপ্সরা এখন ব্যভিচারিণী। আমি রাজপুত্র, তোমার অপ্সরা এখন আমাকে গ্রাহ্য করে না। আমি;—"

বাধা দিয়া রাজা বিরাটকেতু কহিলেন, "বল কি রাজকুমার! তুমি বল কি? আমার কর্ণ আমাকে প্রতারণা করিতেছে। সব কথা আমি শুনিতে পাইতেছি না। অপ্সরা কি এখনও পৃথিবীতে আছে? জীবনসর্ব্বস্ব আমার,—সংসারের একমাত্র সার,—অপুত্রক অভাগার একমাত্র দুহিতা; সেই জীবননন্দিনী অপ্সরা কি আজিও পৃথিবীতে বাঁচিয়া আছে?"

"আছে রাজা! আমি দেখিয়াছি, কিন্তু তোমার অপ্সরা আর সে অপ্সরা নাই।"

"নাই? তবে কি আছে? তুমি রাজকুমার আমাকে পাগল করিয়া দিলে! আমার অপ্সরা বাঁচিয়া আছে, কিন্তু সে অপ্সরা নাই, ইহাতে আমি কি বুঝিব? অপ্সরা আমার কি হইয়াছে?"

"ভিকারী-প্রণয়ে উন্মাদিনী।"

"উন্মাদিনী? আমার স্বর্গসুন্দরী অপ্সরাসুন্দরী উন্মাদিনী? হাঃ! হাঃ! হাঃ! আমি পাগল হইলাম, সত্যই আমি পাগল হইলাম! স্বর্গভূষণ! রাজকুমার! তুমি যাও। এখনও আমি তোমাকে চিনিতে পারিতেছি, একটু

পরে আর হয় ত চিনিতে পারিব না, তুমি যাও।" ভূমে পদাঘাত করিয়া পুনঃপুন কহিলেন, "তুমি যাও! দূর হও! রিপুর উপর আর আমি আধিপত্য রাখিতে পারিব না। তুমি আমার প্রাণাধিকা অপ্সরাসুন্দরীকে উন্মাদিনী বল?"

"স্থির হও রাজা, স্থির হও। তোমার অপ্সরাসুন্দরী ভূপেশচন্দ্রের প্রতি অনুরাগিণী।"

যুগল হস্তে যুগল নেত্র আবৃত করিয়া রাজা বিরাটকেতু নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। কথা কহিলেন না। ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতে লাগিল।

ঔষধ ধরিয়াছে। শিরায় শিরায়, ধমনীতে ধমনীতে, সেই ঔষধের বীর্য্য আপনার প্রতাপ প্রকাশ করিয়া স্বর্ণভূষণকে আরও অধিকতর উত্তেজিত, উৎসাহিত করিয়া দিল। যে লোক ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত পাপকর্ম্মের দাস, তাহাকে উত্তেজিত করা কতক্ষণের কার্য্য? সত্য প্রনয় পাপীলোকের হৃদয়ে ক্ষণমাত্র বাস করিবার উপযুক্ত একটুও স্থান পায় না। পাঠক মহাশয় হয় ত মনে করিয়া থাকিবেন, অপ্সরাসুন্দরীর প্রতি স্বর্ণভূষণের অনুরাগ আছে, বড় হাস্যকর কথা। কপটের কপট অনুরাগ যদি অভিধানে দেখিতে হয়, দেখিবেন, তাহার অর্থ শুদ্ধ কপটতা। সে অভিধান আমরা পাঠ করি নাই, ভূপেশচন্দ্রও পাঠ করেন নাই, অপ্সরাসুন্দরীও পাঠ করেন নাই। যাহারা ভবধামে কেবল ভোজবাজী দেখাইতে আইসে, সে অভিধান কেবল তাহাদেরই জন্য।

স্বর্ণভূষণ অনেক ক্ষণ মৌন হইয়া ছিলেন। অনেক ক্ষণের পর মৌন-ভঙ্গ করিয়া দীর্ঘ দীর্ঘ দুটী তিনটী নিশ্বাস ফেলিয়া মৃদু কম্পিতস্বরে ছোট ছোট কথায় কহিলেন, "রাজা! একবার আমি তোমার আবাসভবনে গমন করিতে ইচ্ছা করি।"

রাজা যেন পাগল হইয়াছিলেন। পূর্ব্বের কথা কিছুই মনে ছিল না। স্বর্ণভূষণের নূতন কথা শুনিয়া তিনি যেন অন্যমনস্কভাবে উত্তর করিলেন,—উত্তর করিলেন কি প্রশ্ন করিলেন, আমরা তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম না। পাঠক মহাশয় যদি বুঝিতে পারেন, পারুন, রাজা বিরাটকেতু কহিলেন, "রাজপুত্র! তুমি কি আমাকে অবিশ্বাস কর?"

"করিতাম না, কিন্তু তোমার কার্য্য যেন অবিশ্বাসকে ডাকিয়া দিতেছে। তুমি স্বীকার করিয়াছিলে, কন্যাদান করিবে, কিন্তু সে অঙ্গীকার রক্ষা করিতে পার নাই।"

"রাজকুমার! তুমি কি ক্ষমা করিতে জান?"

"জানিলে কি হইবে?"

"আমাকে ক্ষমা করিতে পারিবে।"

"তোমাকে ত আমি ক্ষমা করিয়াছি।"

"যদি করিয়াছ, তবে অমন নূতন নূতন কথা বল কেন?"

"ভুলিয়া যাও রাজা, ভুলিয়া যাও। তোমার অপ্সরাসুন্দরী এখন আমার হইল না, সময়ে হইতে পারে। আমি ক্ষত্রিয়কুমার, ধনুখড়্গ ধারণ করিয়া বিপক্ষসমক্ষে বীরদর্পে দণ্ডায়মান হইতে জানি, ভূপেশচন্দ্র কাপুরুষ, তাহাকে নিপাত করিতে কতক্ষণ? আমি আগুন, সে পতঙ্গ, তাহাকে দগ্ধ করিতে আমার তিলমাত্রও বিলম্ব হয় না।"

"তুমি আগুন? উঃ! জগদীশ্বর! আমার জীবন কেন আগুনে দগ্ধ না হয়! উঃ! যন্ত্রণা! মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা! কি বলিতে কি বলিলাম! জীবন কি কখনও দগ্ধ হইতে পারে? আমার যন্ত্রণা দগ্ধ হইবে? তাহাই বা কি রূপে? যন্ত্রণা! তুমিও যে একটী আগুন, আগুন কি আগুনে দগ্ধ হয়? না ত! স্বর্গ-ভূষণ! তুমি আগুন? ঐ আগুনে আমার দেহ দগ্ধ কর! আমি অপ্সরাকে ভুলিয়া যাই। না ত! অপ্সরাকে ত আমি ভুলিয়া যাইতে পারিব না। জীবনের যষ্টি, অন্ধকারের দীপ আমার সেই অপ্সরা। তাহাকে ভুলিয়া আগুনে পুড়িলেও আমার শান্তি নাই। স্বর্গভূষণ! রাজকুমার! তুমি কি বলিতেছিলে?"

"কি তুমি প্রলাপ বকিতেছ রাজা?"

"প্রলাপ? প্রলাপ! নিষেধ করি! তুমিও নিষেধ কর। প্রলাপ যেন আমার চক্ষের কাছে, কর্ণের কাছে না আসে।"

"রাজা!"

"কি স্বর্গভূষণ!"

"প্রলাপ চক্ষে কর্ণে আসে না,—ওষ্ঠবসনায় খেলা করে।"

"উঃ! উঃ! তবেই ত অনর্থ বাধাইলে! মিথ্যা কথা। প্রলাপ আমার চক্ষের সমীপে নৃত্য করিতেছে! ঐ বুঝি অপ্সরাসুন্দরী? আয় মা আয়! কোলে আয়! রাঙ্গা কাপড়!—তুই বুঝি মা বাঙ্‌লা কথা জানিস্ না?—রক্তিম, রক্তিম, লোহিত বসনে তোর যে মা আজ অপরূপ শ্রী!—না, মা! তুই রাক্ষসী! দেয়ালে দেয়ালে ছিদ্র;—ঐ ছিদ্রপথে তুই বুঝি প্রবেশ করিয়াছিস্?—অপ্সরা! তোর মা এমন মূর্ত্তি কখনো ত আমি দেখি নাই! কে সাজাইয়া দিল? সেই স্বর্গভূষণ।—না না, স্বর্গভূষণ ত আমার কাছে। মা! একটু জল,—কিন্তু কৈ! না ত!—অপ্সরা ত আমার এখানে নাই।—তবে কে?—স্বর্গভূষণ! স্বর্গভূষণ! কি বলিতেছিলে?"

"আবার প্রলাপ বকিতেছ রাজা!"

"ভুলিয়া গিয়াছি। তোমাকে নিকটে দেখিতেছি। মনে হইতেছিল যেন অপ্সরাসুন্দরী?"

"তোমার অপ্সরাসুন্দরী তোমার মনেও জাগে, আমার মনেও জাগে। কিন্তু রাজা! আমার একান্ত ইচ্ছা, তোমার শান্তিপ্রাসাদে একবার প্রবেশ করি।"

"সৌভাগ্য! সৌভাগ্য! সৌভাগ্য আমার।"

"তবে আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই।"

মায়া বড় চমৎকার পদার্থ। চমৎকার বলিয়াই লোকে ইহাকে বলে মোহিনী। মায়াবিনী মোহিনী মায়া মানুষের মনে যেমন মোহ দিতে পারে, তেমন আর কেহই না। সংসারের লোকেরা,—পৃথিবীর কবিরা, এই অনন্ত বিশ্বসংসারকে মায়াধাম বলিয়া বর্ণনা করেন। সন্তানসন্ততির প্রতি যে স্নেহ, মাতাপিতার প্রতি যে ভক্তি, আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের প্রতি যে অনুরাগ, কথা ভিন্ন ভিন্ন হইলেও সেই স্নেহের নাম মায়া, সেই ভক্তির নাম মায়া, সেই অনুরাগের নাম মায়া। রাজা বিরাটকেতু সেই মায়ার হস্ত অতিক্রম করিতে পারেন নাই। অপ্সরাসুন্দরী গৃহত্যাগিনী হইবার পর রাজা এক প্রকার যেন পাগল হইয়াছেন। অপ্সরাসুন্দরীর নিমিত্ত নয়, অপ্সরাকে রাজা রঘুবরের পুত্রবধূ করিয়া দিতে পারিলে যে রাশীকৃত অর্থ তাঁহার হস্তগত হইত, সেটী হস্তভ্রষ্ট হইয়াছে। সে আশা সাগরের

জলে ভাসিয়া গিয়াছে। সেই শোকেই বিরাটকেতু যেন পাগল। ধূর্ত্ত, ফন্দী-বাজ বিতাস্থর সহিত তাঁহার সখ্যভাব জন্মিয়াছিল। কি রকম সখ্য, তাহা তিনিই জানিতেন, আর বিতাস্থই জানিত। সেই সখ্যবন্ধনের ফল, জগৎ-কুমারীর সহিত তাঁহার বিবাহ।—পাঠক মহাশয়ের স্মরণ আছে, বিতাস্থর মুখেই ভূপেশচন্দ্র এই বিবাহের আভাস পাইয়াছিলেন। বস্তুতঃ বিতাস্থই এই বিবাহের ঘটক। পাঠক মহাশয়কে আরও স্মরণ করিতে হইবে, মথুরা-পুরীর যমুনাকূলে সেই যুবকযুবতীর সম্মুখে এক যবতী বৈষ্ণবী চমৎকার চমৎকার গীত গাইয়াছিল, তাহার পর তাহারা কে কোথায় গেল, আপনি তাহা জানিতে পারেন নাই, কিন্তু সেই ঘটনার এক মাস পরেই রাজা বিরাট-কেতুর বিবাহ।—শ্রীমতী জগৎকুমারী নূতন রাণী।—কুমার স্বর্গভূষণ কথা কহিতে কহিতে রাজা বিরাটকেতুর ভবনে গমন করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। বিনা বাক্যব্যয়ে রাজা তৎক্ষণাৎ তাহাতে সম্মত হইলেন।

উভয়ে রাজভবনে প্রবেশ করিলেন। অভ্যর্থনাগৃহে অনেকগুলি ছবি ছিল, তাহা দেখিয়া দেখিয়া স্বর্গভূষণ কহিলেন, "রাজা! আরও কত দিন,—মনে পড়ে না, আরও কত দিন, আমি এই গৃহে অতিথি হইয়াছি, অপ্সরা নাই, মন যেন উদাস উদাস বোধ হইতেছে, কিন্তু রাজা! এই সকল ছবি কি অপ্সরার?"

স্বর্গভূষণ গণ্ডমূর্খ। তাহার আকৃতিতেও যেরূপ রুগ্নভাব দৃষ্ট হয়, হৃদয়ও সেইরূপ রুগ্ন। লোকে হয় ত মনে করিতে পারে, অপ্সরার অনুরাগে স্বর্গভূষণের চক্ষু সমস্ত পদার্থেই অপ্সরা দেখে, কিন্তু তাহা ত না। দেয়ালে অনেক দেবদেবীর ছবি, স্বর্গভূষণ সে সকল ছবি চিনিতে পারিলেন না। রাজা বিরাটকেতু এক প্রকার পাগল, তিনিও উপযুক্ত অবসরে ছবি-গুলির মর্ম্ম বুঝাইয়া দিতে পারিলেন না। উন্মত্তভাবে কহিলেন, "স্বর্গভূষণ! না, অপ্সরাসুন্দরী নাই, রাণী আছে। তোমাকে আমি সন্তানের মত ভালবাসি; রাণী এখানে আসিতে পারেন।"

যেন কিছুই জানেন না, ঠিক্ সেইভাবে ভাণ করিয়া স্বর্গভূষণ কহিলেন, "সে কি রাজা! রাণী ত অনেক দিন হইল, স্বর্গবাসিনী হইয়াছেন। তবে তুমি রাণীর কথা—"

"আমি আবার বিবাহ করিয়াছি। নূতন মহিষী গৃহে আসিয়াছেন, তুমি কি তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা কর না?"

স্বর্গভূষণ কহিলেন, "তিনি যদি সম্মত না হন?"

"তুমি সন্তান, তোমার কাছে আসিতে তাঁহার অসম্মতি হইবে কেন?"

উৎসাহপ্রমোদে মস্তক সঞ্চালন করিয়া কুৎসিত প্রমোদবিলাসী স্বর্গভূষণ ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "তুমি যদি রাজা আমাকে সন্তানের মত স্নেহ কর, তাহা হইলে রাণীর এখানে আগমনে কোন বাধা নাই, আমি কৃতার্থ হইব, চরিতার্থ হইব।"

রাজা বাহির হইয়া গেলেন, স্বর্গভূষণ একাকী, সহচরী সেই ছবিগুলি। এক একখানি ছবির নিকটে যাইয়া অঙ্গুলী স্পর্শ করিয়া স্বর্গভূষণ কহিতেছেন, "এই একটী অশোক ফুলের গাছ। আহা! কি সুন্দর কচি কচি পাতা, কি সুন্দর কচি কচি ফুল! আমার চক্ষু আজ যেন স্বর্গে আসিয়াছে। এ আবার কি? গাছের তলায় একটী মেয়ে,—মেয়েটী যেন কাঁদিতেছে। এখানে আর দাঁড়াইতে নাই, ও ছবিতে ওরা কারা? সমুদ্রের তরঙ্গে যেন একখানি নৌকা ভাসিয়া যাইতেছে, নৌকার উপর অনেক নারী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, কাণ্ডারী একজন কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ, দর্শনকারী তাহার নির্ঘণ্ট করিতে পারিলেন না। আর একখানি ছবির কাছে গেলেন, সে ছবিতে একটী কন্যা শুইয়া ঘুমাইতেছে, পার্শ্বে একজন অর্দ্ধ উলঙ্গ রূপবান সুপুরুষ; কে তাহারা, স্বর্গভূষণ বুঝিলেন না। একে একে অনেকগুলি ছবি দেখিলেন, কিন্তু ভাবার্থ তাৎপর্য্য বুঝিতে তাঁহার শক্তি হইল না।

দুই দণ্ড অতীত। রাজা বিরাটকেতুর সহিত নূতন রাণী প্রবেশ করিলেন। স্বর্গভূষণের সহিত চক্ষে চক্ষে নূতন রাণীর পরিচয় হইল। মিলন হইল বলিব না;—অগ্রে পরিচয়, তাহার পর মিলন। রাণী একখানি কৌচের উপর উপবেশন করিলেন, রাজা একখানি বেত্রাসন গ্রহণ করিলেন, স্বর্গভূষণ দাঁড়াইয়া।—তাঁহার সতৃষ্ণ নয়ন রাণীর মুখের দিকে ঘন ঘন বিঘূর্ণিত হইয়া কি যেন স্বর্গীয় সুধা পান করিতে লাগিল। তাদৃশ স্থলে আমরা কখনও প্রবেশ করি নাই, বুঝিতে পারিলাম না। শুনিয়াছি, অমরাবতীর দেবসভায়

অপ্সরা নাচে, কিন্নরী গায়, গন্ধর্ব্ব বাজায়, সে সকল শাস্ত্রের কথা। আমাদের এখানে দুর্ভাগ্যক্রমে কোন শাস্ত্র উপস্থিত নাই, তথাপি আমরা যেন দেখিতেছি, একটী বিদ্যাধরী আসিযাছে, কল্পিত দেবরাজ পুরন্দর এক দৃষ্টে সেই বিদ্যাধরীর দিকে সহস্র চক্ষে চাহিয়া রহিয়াছেন, চমৎকার রহস্য! সুরপুরে অর্জ্জুনকে দেখিয়া উর্ব্বশীর মন টলিয়াছিল, স্বর্গভূষণকে দেখিয়া তুচ্ছ মানবী নূতন রাণীর মন টলিবে, এ কি বড় আশ্চর্য্য কথা? উভয়েরই মন টলিল। রাজা বিরাটকেতু পক্ককেশ প্রাচীন, স্বর্গভূষণ নবীন, এমনি টলন টলিয়াই থাকে। স্বভাবের উপদেশই এই। সকলের পক্ষে নয়, সতী নারীর পক্ষে নয়, সতীতে আমরা কলঙ্ক দিব না, কিন্তু যাহারা কুলকলঙ্কিনী, তাহাদের পক্ষে অনিচ্ছাবশেও আমরা পক্ষপাতী।

স্বর্গভূষণ দাঁড়াইয়া ছিলেন, নেত্র তাঁহার নবীন রাণীর দিকে ছিল, কোথাকার কথা কোথায়? স্থির থাকিতে না পারিয়া রাজাকে সম্বোধন পূর্ব্বক তিনি কহিলেন, "রাজা! এ সকল ছবি তোমার ঘরে কত দিন আসিয়াছে? ছবিতে কাহাদের আকৃতি চিত্র করা?"

"জান না তুমি?" হাস্য করিয়া রাণী কহিলেন, "জান না তুমি? এই এসো, আমি বুঝাইয়া দিতেছি।"

রাণী আসন হইতে উঠিলেন।—"এই এসো।" এই কথা বলিয়া স্বর্গভূষণকে সঙ্গে করিয়া প্রথম ছবির কাছে গেলেন, সহাস্যবদনে কহিলেন, "এই দেখ অশোকবন, সীতাদেবী কাঁদিতেছেন, সরমাসুন্দরী সান্ত্বনা করিতে আসিয়াছেন, রামরাবণে যুদ্ধ হইবে, তাহারই এই সূত্রপাত; তাহারই এই অঙ্কুর। এখন বুঝিয়াছ?"

"বুঝিয়াছি।" হাস্য করিয়া স্বর্গভূষণ কহিলেন, "বুঝিয়াছি।—আবার চল!"

দ্বিতীয় ছবি।—নদীতে নৌকা,—সমুদ্রে না, নদীতে নৌকা। যমুনা নদী। রাণী কহিলেন, "রাধিকাসহচরী আহিরিণীদল পসরা মাথায় করিয়া মথুরায় যাইতেছে, যমুনা পার হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ কাণ্ডারী হইয়া পার করিতেছেন। এই নৌকার ভিতর দুই খণ্ড, দানখণ্ড, আর নৌকাখণ্ড। এখন বুঝিয়াছ?"।

"বুঝিয়াছি!—আবার চল!"—নির্নিমেষে নূতন রাণীর মুখপানে চাহিয়া প্রলোভন-পাগল ক্রূরবুদ্ধি স্বর্গভূষণ হাসিয়া কহিলেন, "আবার চল!"

তৃতীয় ছবি।—"বিজন বনে দময়ন্তীসতী ঘুমাইতেছেন, পার্শ্বে অর্দ্ধ উলঙ্গ কলিগ্রস্ত নলরাজা। গ্রহবশে মহা মহা ধর্ম্মশীল রাজাদের যে কি দশা হয়, তাহাই দেখাইবার জন্য বিধাতার এই খেলা।—বুঝিয়াছ?"

"বুঝিয়াছি,—আবার চল!"

চতুর্থ ছবি।—"এই দেখ মহাকালী। শিবের বুকে দাঁড়াইয়া খড়্গখর্পর-ধারিণী, মুক্তকেশী, চতুর্ভুজা; বাম পদ অগ্রে রাখিয়া নৃত্য করিতেছেন। জগৎকে দেখাইতেছেন, তিনি কালী, তিনি কাল।—বুঝিয়াছ?"

"বুঝিয়াছি,—পঞ্চম ছবি দেখাও!"

"বড় হাসি পায়, বৃন্দাবনের বনে নবনারী কুঞ্জর হইয়া কৃষ্ণকে পৃষ্ঠে করিয়া লইয়াছিল। নারীদের হস্তপদ হস্তীর হস্তপদ হইয়া জগৎচিন্তা-মণিকে বিমোহিত করিয়াছিল। চুল দেখিতেছ? ঐ চুল গোপিনীদের, হাতীর নয়। বুঝিয়াছ?"

"বুঝিয়াছি,—কিন্তু রাণি! তোমার চুলগুলি বেশ কালো! কালো রেশমের মত কালো!"

রাজা বিরাটকেতু হাস্য করিয়া কহিলেন, "স্বর্গভূষণ! তুমি আমার রাণীকে কি পরমসুন্দরী দেখিতেছ?"

"মাথা নাড়িয়া স্বর্গভূষণ উত্তর করিলেন, "হাঁ রাজা! তোমার অপ্সরা-সুন্দরী অপেক্ষাও এই নূতন রাণী পরমসুন্দরী।"

"চক্ষু দেখিয়াছ?"

"দেখিয়াছি, চক্ষের উপরে মধুলোভা মধুকর বসিয়া রহিয়াছে!"

রাণী হাস্য করিলেন।

রাজা কহিলেন, "সব ছবি ত দেখা হয় নাই, রাণী দেখাইয়া দিবেন, একবার আমি তোমার কাছে অপরাধী হইয়াছি, আর হইব না, আর সেই যে অপরাধ রাজকুমার, সে আমার নয়, আমার প্রাণাধারা প্রাণা-ধিকা, প্রাণকুমারী অপ্সরার! তুমি সব ছবি দেখ।"

রাণীও কহিলেন, "সব ছবি দেখ! এই দেখিতেছ, একটী লতাকুঞ্জ।

শকুন্তলা একাকিনী রহিয়াছেন, কেহ নিকটে নাই, স্বগত বাক্যে মনো-বেদনা ব্যক্ত করিতেছেন, রাজা দুষ্মন্ত গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া।—বড় লজ্জা করে!—তুমি কি জান রাজকুমার! এমন বিরহ কেমন বিরহ?"

"রাজাকে জিজ্ঞাসা কর। আমি এ প্রশ্নের উত্তর দিতে জানি না।"

"আরও ছবি দেখিবে?"

"কেন না?"

"তবে এসো।"

আর একখানি ছবির নিকটে লইয়া গিয়া নবীন রাণী দেখাইলেন, সাবিত্রীসত্যবান্। রাজপুত্র সত্যবান্ জীবনশূন্য হইয়া সাবিত্রীসতীর ক্রোড়ে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন, চন্দ্রসূর্য্যপ্রতিম ধর্ম্মরাজ অদূরে দাঁড়াইয়া সত্যবান্‌কে গ্রহণ করিবার ইচ্ছা করিতেছেন, কিন্তু সতী সাবিত্রীর অগ্নি,—সতীত্ব-অগ্নি, তাঁহাকে নিকটবর্ত্তী হইতে দিতেছে না। "সতীত্বের তেজ বড়! জগতে যদি ধর্ম্ম থাকে, তাহা ধার্ম্মিকের হৃদয়ে বাস করে; আর নারীজাতির,—সতী নারীর হৃদয়ক্ষেত্র উজ্জ্বল করে। সে ধর্ম্ম তুমি আমি দেখিতে পাই না। কেমন ছবি? বুঝিয়াছ?"

"না, ভাল বুঝিতে পারি নাই।"

কথা বলিয়াই দুষ্ট স্বর্গভূষণের হৃৎকম্প হইল। সে পাপিষ্ঠ জানিত, অপ্সরা-সুন্দরী ভূপেশচন্দ্রের প্রতি অনুরাগিণী। সংসারে সতী নারী কি প্রকারে সতীত্বধর্ম্ম রক্ষা করে, সতী স্ত্রীরাই তাহা জানিতে পারেন। সেই ধর্ম্মের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করা সকলের সাধ্য নহে। ছবি দেখিয়া দেখিয়া স্বর্গভূষণের প্রফুল্লবদন ক্রমে ক্রমে ম্লান হইয়া আসিতে লাগিল, কিন্তু রাজার দিকে মুখ ফিরাইয়া রাণী হাসিতে লাগিলেন।

"একটী কার্য্য আছে। সেই কার্য্যের ছল করিয়া রাজা বিরাটকেতু কক্ষ হইতে বহির্গত হইলেন। হাসিতে হাসিতে রাণী কহিলেন, "আরও ছবি দেখিবে?"

"হঁ্যা।"

"তবে এসো!"

দেয়ালে একখানি নূতন ছবি। ব্রজধামে রাধিকা রাজা হইয়াছেন,

কোটাল হইয়া শ্রীকৃষ্ণ প্রহরীর কার্য্য করিতেছেন। গোস্বামীরা ইহা যদি দেখিতেন, কাঁদিয়া ধূলায় গড়াগড়ি দিতেন, কিন্তু আমি তত ভক্তি রাখিতে পারি না, রাধারাণী গোয়ালাদের রাণী হইতে পারেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের উপরাণী হইতে পারেন না। সংস্কৃত পাঠক মহাশয়! আপনি আমার বাক্যে প্রতিধ্বনি করিবেন, কৃ—ষ—ণ,—কৃ অর্থে সৎ, ষ অর্থে চিৎ, ণ অর্থে আনন্দ, একত্র করিয়া দেখুন, কৃষ্ণ অর্থে সচ্চিদানন্দ। এ নামে গোপ অপবাদ হইতে পারে না। ভাগবতকে আমি বিশ্বাস করি, মহাভারতের কৃষ্ণকে আমি পূজা করি। বেদব্যাস কহিয়াছেন, মহাভারতে যাহা নাই, তাহা পৃথিবীতে নাই। এ কথা সত্য। মহাভারতে ভাগবতের কৃষ্ণলীলা কিছুমাত্র নাই। সত্য বটে, শিশুপাল একবার বলিয়াছিল, গোপসন্তান, তাহা নিন্দাবাক্য, আমাদের দেশের বৈষ্ণবেরা নন্দঘোষের নন্দন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের নামে যেরূপ ভক্তিভাবে নৃত্য করিয়া গড়াগড়ি দেন, অনন্তদেবকে ঘোষের সন্তান বলিয়া আমি সেরূপে অনাদর করিতে পারিব না। ছবিতে যাহা দেখা যায়, তাহা উত্তম, কিন্তু সে উত্তম,—সে উত্তম মূর্ত্তি আমাকে ভুলাইতে পারিবে না। আমি জানি, একটী বস্তু আছেন, সে বস্তু সাকার কি নিরাকার, কেহ তাহা আমাকে বুঝাইয়া দিতে পারে না। নবদ্বীপে চৈতন্যদেবের অবতার, কিন্তু সেই অবতার কাহার, রূপসনাতন তাহা জানিতেন না, চৈতন্যদেব নিজেও কখনও বলেন নাই, তিনি বিষ্ণুর অবতার। জগতে হরিভক্তি বিলাইবার জন্য তাঁহার আবির্ভাব হইয়াছিল। অদ্বৈত প্রভু কে, নিতাই প্রভু কে, বৈষ্ণবেরা হয় ত তাহা জানিতে পারেন, পুঁথিতে লেখা আছে, বলরাম আর মহাদেব। যদি তাহা সত্য হয়, তবে ত চৈতন্যপ্রভু হরি; হরি হইয়াও তিনি জগতে হরিনাম বিলাইয়াছিলেন।

ছবি দেখিয়াছ? এ ছবিতে একখানি দর্পণ আছে। সে দর্পণে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ছায়া পড়ে, কিন্তু সে ছায়াতে অনেক দেবদেবী ত আমরা দেখিতে পাই না; একটী দেখি, তিনি আমাদের জগৎব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তা হইতে পারেন, মহম্মদ হইতে পারেন, যিশুখ্রীষ্ট হইতে পারেন, চৈতন্যদেব হইতে পারেন, দুর্গাদেবীও হইতে পারেন, কিন্তু সবগুলি একত্র করিয়া আমি বলি, প্রকৃতিসতী। সেই সতী নানারূপে অবতীর্ণ হইয়া জীবের চক্ষে নানারূপে

প্রকাশ পান। দোষ হয় না, তথাপি আমি দেখি, সমস্ত রূপের সমষ্টি,—গণিতশাস্ত্র আমারে যেন বলিয়া দেয়, সমস্ত রূপের সমষ্টি।—সমষ্টিমধ্যে প্রথমে একটী অঙ্ক থাকে, তাহার মূল্য অনেক।

অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। রাণী কহিলেন, "ঐ ছবিখানি দ্রৌপদীর। কেশাকর্ষণ করিয়া দুঃশাসন যখন একবস্ত্রা পাঞ্চালীকে রাজসভায় আনয়ন করেন, সেই সময়ের এই ছবি। ছবি দেখিয়াছ?"

"দেখিয়াছি। আচ্ছা রাণি! রাজা এখানে নাই, তুমি যে আমার কাছে রহিয়াছ,—আচ্ছা রাণি! ও ছবিখানি কাহার?"

"জান না বুঝি? ও ছবি ভানুমতীর। ভানুমতীর স্বয়ম্বর। কত ভানুমতী একত্রিত হইয়াছে দেখিতেছ?"

"দেখিতেছি। কিন্তু ছবি দেখিয়া ঠিক করিতে পারিতেছি না।"

"কেন? ঐ যে ভ্রমরা উড়িতেছে, দেখিতেছ না?"

"ভ্রমরা ত কথা কহিতে জানে না।"

"কথায় তোমার আমার কি প্রয়োজন? ভ্রমরেরা দেখাইয়া দিতেছে, ঐ সত্য ভানুমতী।"

"তুমি অপ্সরাসুন্দরীর পাণি প্রার্থনা করিয়াছিলে?"

"না, রাণি! আমাকে ক্ষমা কর। রাজা অনুরোধ করিয়াছিলেন, সেই জন্য আমি অপ্সরাকে —"

"অপ্সরাকে কি?"

"অপ্সরাকে আমি বিবাহ করিব মনে করিয়াছিলাম। তাহার পর—"

"তাহার পর কি হইল?"

"পরমেশ্বর জানেন, রাজা জানেন, অপ্সরাসুন্দরী পলাইয়া গেল।"

কাঁচুলি কাঁপাইয়া রাজমহিষী কহিলেন, "আচ্ছা স্বর্গভূষণ! অপসরা যদি তোমারে বিবাহ না করে, তোমার সঙ্গে মিলন করিতে তাহার যদি মতি না হয়, তাহা হইলে আর কোন কামিনীকে তুমি ভালবাসিতে পারিবে কি না?"

"পারিতাম।" চুপি চুপি কাণে কাণে স্বর্গভূষণ কহিলেন, "তোমার

যদি বিবাহ না হইত, তাহা হইলে আমি আর একটী কামিনীকে ভালবাসিতে পারিতাম।"

"পারিতে তুমি স্বর্গভূষণ?" সমান মৃদুস্বরে নূতন রাণী কহিলেন, "পারিতে?"

"হ্যাঁ।"

"আচ্ছা, আমি যদি তোমাকে ভালবাসিতে পারি?"

শিহরিয়া উঠিয়া স্বর্গভূষণ কহিলেন, "আচ্ছা! কিন্তু তোমার যে বিবাহ হইয়াছে।"

"আমরা বাঙ্গলা দেশের মেয়ে নই, কথা আছে,—ইচ্ছা হইলে—"

"কি কথা তোমার আছে রাণি?"

"কথা আছে, তোমারে আমি ভালবাসিব, বলিয়াছি, তথাপি—

এই দেখ একটী কদমগাছ। কদম্বতলে কৃষ্ণ দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। রাধিকা আসিয়া চরণ সেবা করিতেছেন, কিন্তু কতক্ষণ? দুষ্টমতি কুটিলা আয়ান ঘোষকে ডাকিয়া দিল, কুঞ্জবনে কৃষ্ণ কালী হইলেন। রাধারাণী সেই পাদপদ্মে জবাপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতে লাগিলেন, বাতাস কহিয়া গেল, "সব ফক্কা!"

"তবে কি তুমি রাজাকে ভয় কর না?"

"যমকেও না। আমি যখন নিজমূর্ত্তি ধারণ করিয়া রাজা বিরাটকেতুর সম্মুখে দাঁড়াই, তখন আমার গা কাঁপে। সে মূর্ত্তি দেখিলে আমার মনে ঘৃণার উদয় হয়। তুমি রাজকুমার—"

"চুপ্ চুপ্! আর না, রাজা আসিতেছেন।"

রাজা প্রবেশ করিলেন। হাস্য করিয়া নবীন রাণীরে কহিলেন, "রাজকুমারের অভ্যর্থনার ত কিছু ত্রুটী হয় নাই?"

হাসিয়া স্বর্গভূষণের দিকে চাহিয়া নবীন রাণী কহিলেন, "ত্রুটী রাজা! তুমি ত্রুটীর কথা বলিতেছ? অতিথিসেবা আমি ভাল জানি। এই স্বর্গভূষণ তোমার জামাই হইতেন। তোমার জামাই আর আমার জামাই কি বিভিন্ন বস্তু রাজা?"

"আমি তাহা বলিতেছি না। তুমি পতিব্রতা সতীলক্ষ্মী! কিন্তু আমার

অপ্সরাকে তুমি ত দেখ নাই, সে অপ্সরা আমার কোথায় আছে, তুমি ত তাহা জান না।"

"পত্র লিখিয়াছি। অপ্সরা দেখা করিবে। যদি একদিনে না হয়,—এক সপ্তাহে না হয়,—এক মাসের মধ্যে দেখা করিবে।"

"রাণি! রাণি! রাণি! স্বর্গের বাক্য তোমার মুখে উচ্চারণ! আঃ! আঃ! আঃ! অপ্সরা! প্রাণের অপ্সরা! আমারে কি দেখা দিবে? এ জীবনে আর কি আমি তোমারে দেখিতে পাইব? স্বর্গভূষণ! দাঁড়াও! রাণি! তুমিও দাঁড়াও! সত্য করিয়া বল দেখি, আমার অপ্সরাসুন্দরী কি আবার ঘরে আসিবে?"

স্বর্গভূষণ উত্তর করিলেন, "রাণী যখন পত্র লিখিয়াছেন, তখন অবশ্যই অপ্সরা আসিবে, তুমি অত উতলা হও কেন রাজা? অপ্সরা যখন বাঁচিয়া আছে, তখন অবশ্যই দেখা হইবে।"

"আমি একখানি পত্র পাইয়াছিলাম, সে পত্র মা আমার যেন কাঁদিয়া কাঁদিয়া লিখিয়াছে, সকল অক্ষরগুলিই অশ্রুসিক্ত। রাণী সেই পত্রের উত্তর দিয়াছেন।"

স্বর্গভূষণ কহিলেন, "তুমি রাণি, মায়ামমতা বেশ জান।"

রাণী কহিলেন, "তুমি স্বর্গভূষণ, আমারে বারম্বার রাণী রাণী বলিতেছ কেন? তুমি যখন ছোট, তখন তোমার কাছে কত আব্দার করিয়াছি, সেই অশ্বত্থবৃক্ষতলে তোমারে হাসাইয়া হাসাইয়া কত খেলা খেলিয়াছি, আমার খেলা দেখিয়া তুমি কত হাসিতে, কতই আমারে ভালবাসিতে, আমি তোমারে কতই ভালবাসিতাম, অনেক দিনের কথা, সে সব কথা কি মনে হয়?"

রাজাকে সম্বোধন করিয়া স্বর্গভূষণ কহিলেন, "সত্য রাজা! ইনি এখন রাণী হইয়াছেন, নাম ধরিয়া ডাকিতে ভয় হয়, কিন্তু ছোটবেলা ইঁহার নাম ছিল জগৎকুমারী।"

"সেই, সেই, সেই কথা! তুমি স্বর্গভূষণ, সেই নামেই আমারে সম্বোধন কর। তোমার মুখে সেই নামটী শুনিতে সত্যই আমি বড় ভালবাসি।"

হাস্য করিয়া স্বর্গভূষণ কহিলেন, "আচ্ছা জগৎকুমারি! এখন অবধি সেই নামেই আমি তোমাকে ডাকিব!"

"তাহা হইলেই চরিতার্থ হইব।"

রাজা একটু হাস্য করিলেন।

আরও এক দণ্ড অতীত। তিন জনে অনেক কথোপকথন হইল, অবশেষে স্বর্গভূষণ কহিলেন, "আর বিলম্ব করিতে পারি না, অদ্য বিদায় হইলাম।" জগৎকুমারীর দিকে চাহিয়া পুনরায় কহিলেন, "জগৎকুমারি! পূর্ব্ব স্নেহ যেন স্মরণ থাকে, অদ্য বিদায় হইলাম।"

"সময় পাইলে এক একবার দর্শন দিও।"

অঙ্গীকার করিয়া রাজা রাণী উভয়কে অভিবাদনপূর্ব্বক স্বর্গভূষণ বিদায় গ্রহণ করিলেন।

নবচত্বারিংশ প্রবাহ।

এই বুঝি প্রণয়?

"রচি গাথা শিখাইব পল্লীবালদলে,
করতালি দিয়া তারা গাইবে নাচিয়া,
পরম অধর্ম্মাচারী রঘুকুলপতি।"

মাইকেল।

দুই সপ্তাহ অতীত হইয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যে এক দিন,—দিন বলা আমাদের অভ্যাস,—এক রজনীতে নূতন রাণী জগৎকুমারীর সহিত স্বর্গভূষণের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাহার পর অষ্টাহ কাল আর সাক্ষাৎ নাই। সূর্য্যদেব অস্তগত হইতেছেন, রক্তবর্ণ মেঘে বৃক্ষপত্রেরা যেন স্বর্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছে, জলে কমলিনী অপরাহ্ণ সমীরে অল্প অল্প দুলিতেছেন, কমলিনী যেন এখন বিরহিণী। ভ্রমর বা মৃদু মৃদু গুঞ্জন করিয়া মুখের কাছে আসিতেছে,

বাতাসে মস্তক সঞ্চালন করিয়া যেন, সূর্য্যপ্রণয়িনী নলিনী সতী তাহাদিগকে বিদায় করিয়া দিতেছেন, মৃদুবাতাসে সলিলে হিল্লোল হইতেছে। সেই হিল্লোলিত জলতলে হীরকপ্রভার ন্যায় অস্তগমনশীল প্রভাকরের খণ্ড খণ্ড ছায়া পড়িয়াছে। চমৎকার! চমৎকার! অট্টালিকার চূড়াগুলি লোহিতরাগে বিরঞ্জিত হইয়াছে, শোভা অতি মনোহারিণী। নবীন প্রভাত আর নবীন সন্ধ্যা জগতের সমস্ত ভাবুক মানবের চিত্তরঞ্জন করে। বায়ুদেবও সেই সেই সময়ে বিলক্ষণ সহায়তা করেন।

দেখিতে দেখিতে সূর্য্য অস্ত, দেখিতে দেখিতে কমলিনী মুদিত, দেখিতে দেখিতে সমস্ত ধরাধাম অন্ধকারে সমাবৃত, দেখিতে দেখিতে গগনক্ষেত্রে নক্ষত্রমালা সমুদিত, গৃহস্থের গৃহে গৃহে দীপমালা উজ্জ্বলিত।

স্বর্গভূষণ একাকী গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছেন, স্বর্গভূষণ তারকাবৃন্দ তাঁহাকে পথ প্রদর্শন করিতেছে। স্বর্গভূষণ যাইতেছেন কোথায়? জগৎকুমারীকে দর্শন করিতে।—সন্ধ্যার অন্ধকার তাঁহার গতিরোধ করিতে পারিতেছে না। তিনি মনের উৎসাহে, হৃদয়ের সাহসে, রাজা বিরাটকেতুর দ্বারদেশে উপস্থিত। দ্বার অনাবৃত ছিল, সঙ্কোচে সঙ্কোচে, সন্দেহে সন্দেহে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সোপানে পদক্ষেপ করিবার অগ্রেই দেখিলেন, গৃহের কিঙ্করী সারদা সম্মুখে। সে মতিয়া আর নাই, অপ্সরাসুন্দরী বিদায় হইবার পর মতিয়া যে কোথায় চলিয়া গিয়াছে, কোন সংবাদ নাই। এই সারদা নূতন, কিঞ্চিৎ সন্দিগ্ধভাবে স্বর্গভূষণ সারদাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজা কোথায়?"

"রাজা?—রাজার আর সে দিন নাই, তিনি আর সন্ধ্যাকালে গৃহে থাকেন না।"

স্বর্গভূষণ পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, "রাণী কোথায়?"

"রাণী অন্তঃপুরে।"

"তুমি আমাকে চিনিতে পার?"

"সারদার হাতে একটা বাতী ছিল, সেই বাতীর আলোতে প্রবেশকারীর মুখ দেখিয়া সারদা উত্তর করিল, "আপনি রাজকুমার! আপনাকে আমি চিনিতে পারি।"

"তবে আমার নাম করিয়া রাণীকে বল, সাক্ষাৎ করিবার অভিলাষ আছে।"

"আপনি উপরে আসুন, আমি সংবাদ দিতেছি।"

কুমার স্বর্গভূষণ সেই কিঙ্করীর সহিত দ্বিতলের উপবেশনগৃহে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে সেই স্থানে রাখিয়া সারদা সত্বরপদে অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিল।

একটু পরেই রাণী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। স্বর্গভূষণ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। রাণী কহিলেন, "বোসো রাজকুমার, বোসো। আমি ভাবিয়াছিলাম, তুমি এ দেশ পরিত্যাগ করিয়াছ।"

"ক্ষমা কর। জগৎকুমারি! আমাকে ক্ষমা কর।"

"রাজকুমার! কাহারে সম্বোধন করিতেছ? আমি আর এখন জগৎকুমারী নই, যখন কুমারী ছিলাম, তখন আমার ঐ নাম ছিল, কিন্তু এখন আমার বিবাহ হইয়াছে, এখন আমি রাজরাণী।"

"কিন্তু কেন? তুমিই ত সে দিন ঐ নামে ডাকিতে;—ঐ নামে সম্ভাষণ করিতে আমাকে অনুরোধ করিয়াছিলে।"

"করিয়াছিলাম সত্য, তখন জানা ছিল, শিশুকালের ভাব, সর্ব্বদা দেখা সাক্ষাৎ হইবে, তাহা যখন নয়, অষ্টাহ পরে যখন তুমি আসিলে, তখন আমি তোমারে অতিথির মত সমাদর করিব, তুমি আমারে আর ঘনিষ্ঠভাবে সম্বোধন করিও না।"

"ক্ষমা কর! রাণি! ক্ষমা কর! কোন বিশেষ কারণে, পিতার অনুরোধে এই অষ্টাহকাল আমাকে গৃহে আবদ্ধ থাকিতে হইয়াছিল। ইহা কি আমার পক্ষে যথেষ্ট ক্ষমাপ্রার্থনা বলিয়া তুমি স্বীকার করিবে না?"

"কারণ দেখাইয়া তুমি ক্ষমাপ্রার্থনা করিতেছ?" হাস্য করিয়া জগৎকুমারী কহিলেন, "পিতার অনুরোধে আবদ্ধ হইয়া ছিলে, সেই কারণ দেখাইয়া তুমি ক্ষমাপ্রার্থনা করিতেছ, ক্ষমা করিলাম, তুমি আমারে জগৎকুমারী বলিয়া ডাক। উপবেশন কর।"

"তুমিও উপবেশন কর। ভবিষ্যতে আমি আর তোমার নয়নপথ হইতে অধিকক্ষণ অন্তরে থাকিব না।"

হাস্য করিয়া রাণী জগৎকুমারী উপবেশন করিলেন। সেই আসনের নিকটে আর একখানি আসন সরাইয়া লইয়া স্বর্গভূষণ উপবিষ্ট হইলেন। দুটী চারিটী বাক্য বিনিময়ের পর স্বর্গভূষণ যেন কি পূর্ব্বকথা স্মরণ করিয়া রাণীকে কহিলেন, "জগৎকুমারি! তুমি আমাকে ক্ষমা করিয়াছ, তাহার প্রমাণ কি পাইলাম?"

"কি প্রমাণ চাও?"

"তোমার একখানি হস্ত প্রদান কর।"

সহাস্যবদনে জগৎকুমারী আপনার সুকোমল দক্ষিণহস্তখানি বিস্তার করিলেন, সস্নেহভাবে স্বর্গভূষণ সেই হস্তখানি আপন ওষ্ঠসমীপে লইয়া গিয়া প্রত্যেক অঙ্গুলীতে এক একটী চুম্বন করিলেন।

লজ্জা লুকাইবার নিমিত্ত পশ্চাদ্ভাগে মুখ ফিরাইয়া রাণী জগৎকুমারী মৃদু মৃদু হাস্য করিলেন, স্বর্গভূষণ সে হাস্য দেখিতে পাইলেন না। গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজা কি সত্য সত্য সন্ধ্যাকালে গৃহে থাকেন না?"

"তোমারে এ কথা কে বলিল?"

"তোমার পরিচারিকা।"

"না। তিনি গৃহে থাকেন না।"

"কোথায় থাকেন?"

"প্রায় এক ক্রোশ দূরে একটা জুয়াখেলার আখ্ড়া আছে, সেই থানেই লীলাখেলা হয়।"

"কত রাত্রে ফিরিয়া আসেন?"

"দুই প্রহরের এদিকে নয়। তাহাও যে রূপে আসেন, বলিতে আমার ঘৃণা হয়। ভয়ঙ্কর মত্ত অবস্থা।"

"তুমি কিছু বল না?"

"বলি না?—আমি তেমন মেয়ে নই, গালাগাল দিয়া ভূত ছাড়া করি। প্রহার করি না। স্বামী গুরু, প্রহার করিতে নাই। কেবল সেইটী বাকী রাখি, আর কিছুই বাকী রাখি না। রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত থাকিয়া এক দিন যদি তুমি দেখ, একদিন যদি শুন, তাহা হইলে জানিতে পারিবে, বুঝিতে পারিবে, এই জগৎকুমারীর কত তেজ।"

" তাই ত ! এই বৃদ্ধবয়সে রাজাকে এমন রোগে ধরিয়াছে ! তুমি এই নবযুবতী, তোমাকে একাকিনী ফেলিয়া তিনি বাহিরে আমোদ করিতে যান, তুমি ঘরে বসিয়া বসিয়া কেবল কাঁদ আর ভাব !"

"তাই বটে ! কাঁদি আর ভাবি !—যে দশা রাজার, তাহা মনে করিলে মুখ দেখিতে ইচ্ছা করে না।"

"সে কি জগৎকুমারি ! এই মাত্র তুমি বলিলে, স্বামী গুরু, গুরুকে কি ও কথা বলিতে আছে ?"

" বড় দুঃখে বলি। আগে যদি জানিতাম, শেষ দশায় তাঁহার এমন কুমতি ঘটিবে, তাহা হইলে বিবাহের অগ্রে বিবেচনা করিতাম।"

" কি বিবেচনা করিতে জগৎকুমারি ?"

" এই বিবেচনা করিতাম, বিবাহে বাধা দিতাম।"

" উঃ ! তোমার কি দুঃসাহস ! হিন্দুকুলকন্যা হইয়া স্বেচ্ছাচারিণী হইতে ?"

" স্বেচ্ছাচারিণী আমি নই। ইচ্ছা আমার দাসী, আমার হৃদয়ে জ্বলন্ত অহঙ্কার বিদ্যমান। সেই অহঙ্কারকে তোমরা হয় ত স্বাধীনতা বলিতে পার, কিন্তু আমার বিশ্বাস, সেই একমাত্র অহঙ্কারই নারীজাতির অলঙ্কার।"

"দেখিতেছি, তোমার ক্রোধরিপু প্রবল হইয়াছে, অহঙ্কার ইহার কাছে আধিপত্য করিতে পারে না। জগৎকুমারি ! আমি কিন্তু সর্ব্বদাই দেখি, সর্ব্বদাই মনে করি, ক্রোধের সময় সুন্দরী রমণীকে আরও পরমসুন্দরী দেখায়।"

"মনে কর ?—তবে তোমার খোষামোদ শুনিয়া আমি তোমার উপর রাগ করিব।" বক্রভাবে হাস্য করিয়া রাণী জগৎকুমারী কুটিল কটাক্ষে স্বর্গভূষণের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া এই ছোট ছোট কথাগুলি বলিলেন।

" ক্রোধ, অভিমান, অহঙ্কার, সত্যই এই তিনটী স্ত্রীজাতির অলঙ্কার। তুমি যদি আমার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ কর,—জগৎকুমারি ! পরমেশ্বরের নাম করিয়া বলিতেছি, আমি কৃতার্থ হইব। আমি অনেক কামিনীর ক্রোধ দেখিয়াছি, কিন্তু ক্রোধমুখী তুমি, তোমাকে যত সুন্দরী দেখি, এত সুন্দরী সংসারে আর কাহাকেও দেখি নাই।"

"সৈনিক পুরুষেরা নারীজাতির মর্য্যাদা আর তোষামোদ যেমন জানে, তেমন আর কেহই না। বিশেষতঃ এই স্বর্ণভূষণ।"

"তুমি রাণী আমাকে বিদ্রূপ করিতেছ। আমি মনের কথা কহিয়াছি, তুমি তাহার বিপরীত অর্থ ঘটাইয়া সত্যের আসনে পরিহাসকে বসাইতেছ।"

"বিদ্রূপ করা উচিত ছিল। কিন্তু তুমি আমার সকল কথার উপর নূতন নূতন কথা আনিয়া আমার মনের ভাব চাপা দিবার ইচ্ছা করিতেছ, সেই জন্যই—"

"কেন বল দেখি?"

"বলিব?—স্বর্ণভূষণ! তুমি রাজকুমার, অবিবাহিত, তুমি যে অনেক সুন্দরী কামিনীর ক্রোধ দেখিয়াছ, এটী কেমন কথা?"

"জগৎকুমারি! বিবাহ হইবার পূর্ব্বে কেহ যে সুন্দরী কামিনী দেখিতে পায় না, এটী বা তোমার কেমন কথা? তোমার যখন বিবাহ হয় নাই, তখন কি তুমি কোন সুন্দর পুরুষ দেখিতে পাইতে না?"

"ঠকিয়াছি! সত্যই তুমি আমারে হারাইয়াছ। এখন তুমি কি চাও?"

প্রশ্নের তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া, স্বর্ণভূষণ স্থিরনেত্রে জগৎকুমারীর চঞ্চলনেত্র নিরীক্ষণ করিলেন। জগৎকুমারী পুনরায় কহিলেন, "তুমি এখন কি চাও?"

দ্বিতীয় বারেও প্রশ্নের অর্থ হৃদয়ঙ্গম হইল না। অপ্রস্তুত হইয়াছেন, তাহাও জানাইলেন না। গোলে মালে উত্তর করিলেন, "চাই কেবল শুনিতে তোমার মধুমাখা কথা।"

"আমি ত সে কথা জিজ্ঞাসা করি নাই, কিছু আহার করিবে?"

"না, অনেক রাত্রে আহার করা আমার অভ্যাস, আমাদের এ নবীন প্রসঙ্গে বাধা দিয়া আহারের আয়োজনে তুমি ব্যস্ত হও, আমার বাসনা সেরূপ অনুরোধ করিতে নিষেধ করিতেছে। ভাবিতেছি কেবল সন্ধ্যার পর তুমি একাকিনী থাক, বি—র—হ—য—ন্ত্র—"

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, রাণী জগৎকুমারী অসম্ভব বিলাস ভালবাসেন। তিনি ক্ষত্রিয়কুলকন্যা, বিলাসের অনুরোধে তথাপি সুরাপান করেন। তাঁহার একটী বচন আছে: সুরার নাম সুরসুন্দরী। দেবতারা, দেবীরা,

"তাই ত! এই বৃদ্ধবয়সে রাজাকে এমন রোগে ধরিয়াছে! তুমি এই নবযুবতী, তোমাকে একাকিনী ফেলিয়া তিনি বাহিরে আমোদ করিতে যান, তুমি ঘরে বসিয়া বসিয়া কেবল কাঁদ আর ভাব!"

"তাই বটে! কাঁদি আর ভাবি!—যে দশা রাজার, তাহা মনে করিলে মুখ দেখিতে ইচ্ছা করে না।"

"সে কি জগৎকুমারি! এই মাত্র তুমি বলিলে, স্বামী গুরু, গুরুকে কি ও কথা বলিতে আছে?"

"বড় দুঃখে বলি। আগে যদি জানিতাম, শেষ দশায় তাঁহার এমন কুমতি ঘটিবে, তাহা হইলে বিবাহের অগ্রে বিবেচনা করিতাম।"

"কি বিবেচনা করিতে জগৎকুমারি?"

"এই বিবেচনা করিতাম, বিবাহে বাধা দিতাম।"

"উঃ! তোমার কি দুঃসাহস! হিন্দুকুলকন্যা হইয়া স্বেচ্ছাচারিণী হইতে?"

"স্বেচ্ছাচারিণী আমি নই। ইচ্ছা আমার দাসী, আমার হৃদয়ে জ্বলন্ত অহঙ্কার বিদ্যমান। সেই অহঙ্কারকে তোমরা হয় ত স্বাধীনতা বলিতে পার, কিন্তু আমার বিশ্বাস, সেই একমাত্র অহঙ্কারই নারীজাতির অলঙ্কার।"

"দেখিতেছি, তোমার ক্রোধরিপু প্রবল হইয়াছে, অহঙ্কার ইহার কাছে আধিপত্য করিতে পারে না। জগৎকুমারি! আমি কিন্তু সর্ব্বদাই দেখি, সর্ব্বদাই মনে করি, ক্রোধের সময় সুন্দরী রমণীকে আরও পরমসুন্দরী দেখায়।"

"মনে কর?—তবে তোমার খোষামোদ শুনিয়া আমি তোমার উপর রাগ করিব।" বক্রভাবে হাস্য করিয়া রাণী জগৎকুমারী কুটিল কটাক্ষে স্বর্গভূষণের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া এই ছোট ছোট কথাগুলি বলিলেন।

"ক্রোধ, অভিমান. অহঙ্কার, সত্যই এই তিনটী স্ত্রীজাতির অলঙ্কার। তুমি যদি আমার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ কর,—জগৎকুমারি! পরমেশ্বরের নাম করিয়া বলিতেছি, আমি কৃতার্থ হইব। আমি অনেক কামিনীর ক্রোধ দেখিয়াছি, কিন্তু ক্রোধমুখী তুমি, তোমাকে যত সুন্দরী দেখি, এত সুন্দরী সংসারে আর কাহাকেও দেখি নাই।"

"সৈনিক পুরুষেরা নারীজাতির মর্য্যাদা আর তোমাদের যেমন জানে, তেমন আর কেহই না। বিশেষতঃ এই স্বর্গভূষণ।"

" তুমি রাণী আমাকে বিদ্রূপ করিতেছ। আমি মনের কথা কহিয়াছি, তুমি তাহার বিপরীত অর্থ ঘটাইয়া সত্যের আসনে পরিহাসকে বসাইতেছ।"

"বিদ্রূপ করা উচিত ছিল! কিন্তু তুমি আমার সকল কথার উপর নূতন নূতন কথা আনিয়া আমার মনের ভাব চাপা দিবার ইচ্ছা করিতেছ, সেই জন্যই—"

" কেন বল দেখি?"

" বলিব?—স্বর্গভূষণ! তুমি রাজকুমার, অবিবাহিত, তুমি যে অনেক সুন্দরী কামিনীর ক্রোধ দেখিয়াছ, এটা কেমন কথা?"

"জগৎকুমারি! বিবাহ হইবার পূর্ব্বে কেহ যে সুন্দরী কামিনী দেখিতে পায় না, এটী বা তোমার কেমন কথা? তোমার যখন বিবাহ হয় নাই, তখন কি তুমি কোন সুন্দর পুরুষ দেখিতে পাইতে না?"

"ঠকিয়াছি। সত্যই তুমি আমাকে হারাইয়াছ। এখন তুমি কি চাও?"

প্রশ্নের তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া, স্বর্গভূষণ স্থিরনেত্রে জগৎকুমারীর চঞ্চলনেত্র নিরীক্ষণ করিলেন। জগৎকুমারী পুনর্ব্বার কহিলেন, " তুমি এখন কি চাও?"

দ্বিতীয় বারেও প্রশ্নের অর্থ হৃদয়ঙ্গম হইল না। অপ্রস্তুত হইয়াছেন, তাহাও জানাইলেন না। গোলে মালে উত্তর করিলেন, "চাই কেবল শুনিতে তোমার মধুমাখা কথা।"

" আমি ত সে কথা জিজ্ঞাসা করি নাই, কিছু আহার করিবে?"

" না, অনেক রাত্রে আহার করা আমার অভ্যাস, আমাদের এ নবীন প্রসঙ্গে বাধা দিয়া আহারের আয়োজনে তুমি ব্যস্ত হও, আমার বাসনা সেরূপ অনুরোধ করিতে নিষেধ করিতেছে। ভাবিতেছি কেবল সন্ধ্যার পর তুমি একাকিনী থাক, বি—র—হ—য—ন্ত্র—"

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, রাণী জগৎকুমারী অসম্ভব বিলাস ভালবাসেন। তিনি ক্ষত্রিয়কুলকন্যা, বিলাসের অনুরোধে তথাপি সুরাপান করেন। তাঁহার একটী বচন আছে; সুরার নাম সুরসুন্দরী। দেবতারা, দেবীরা,

দেবকন্যারা সুরাপান করিতেন, পৃথিবীর কুলাঙ্গনারা তবে তাহার আস্বাদনে বঞ্চিত থাকিবে কেন? সেই সদানন্দময়ী সুরা পৃথিবীর নারীজাতিকে সদানন্দ বিতরণ করিবে না কেন? যদি কোন শাস্ত্র থাকে, সে শাস্ত্র অগ্রাহ্য। এই ধর্ম্মবিশ্বাসে (!!!) রাণী জগৎকুমারী সুরাপান করিতেন। কথা কহিতে কহিতে সহাস্যমুখে চঞ্চলভাবে উত্থিত হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী পাত্রাধার হইতে দুটী সুরাপাত্র আনয়ন করিলেন। কুমার স্বর্গভূষণ চিররুগ্ন শরীরেও সেই পদার্থের,—সেই হলাহলের সেবনে বিলক্ষণ অনুরক্ত,—বিলক্ষণ অভ্যস্ত।

উভয়েই সুরাপানে প্রবৃত্ত। ওষ্ঠ-রসনার নিকট বিদায় লইয়া দুই তিন পাত্র কণ্ঠস্থ ও জঠরস্থ হইবার পর জগৎকুমারী গম্ভীরভাবে কহিলেন, "না স্বর্গভূষণ, আমি একাকিনী থাকি না; সন্ধ্যার পরে আমার মা আমারে দেখিতে আইসেন, ভগ্নীরা আইসে, মধ্যে মধ্যে পিতাও আইসেন, আরও অনেক বন্ধুবান্ধবের সহিত সাক্ষাৎ হয়। গীতবাদ্য আমি বড় ভালবাসি। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত তাহারা থাকেন।"

"রাজা কিছু বলেন না?"

"কতবার বলিব? রাজাকে আমি গ্রাহ্য করি না। তুমি স্বর্গভূষণ। আজ একটু রাত্রি পর্য্যন্ত থাক, যে দিন তুমি রাজার সঙ্গে আসিয়াছিলে, সে দিনও দেখিয়াছ, তোমাতে আমাতে নির্জ্জনে কত কথা হইতেছিল, গোপনে দরজার পার্শ্বে দাড়াইয়া রাজা তাহা শ্রবণ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমারে একটীও কথা বলিতে তাঁহার সাহস হয় নাই। কত তিরস্কার করি, প্রমত্তভাবেও বিরক্তি করিতে পারেন না। তুমি থাক, আজ দেখাইব, দুই প্রহরের পূর্ব্বে এক দিনও তিনি আসেন না, ভয় কি তোমার?"

রজনী একাদশ ঘটিকা। রাজপথে লোকজনের গতিবিধি প্রায়ই নাই, গৃহসমীপস্থ বৃক্ষশাখায় পাখীরা অন্ধকারে বসিয়া এক একবার পক্ষপুটের ঝট্‌পট্ শব্দ করিতেছে। যে সকল পাখীর মনে বড় আমোদ, তাহারা দূরে অদূরে বৃক্ষাগ্রে বসিয়া প্রকৃতির উপদেশে সুন্দর সুন্দর গীত গাইতেছে। স্বর্গভূষণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজা আসিবার আর কত বিলম্ব? এখানে আর

অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে না। তিনি আসিয়া যদি আমাকে এখানে দেখেন, তাহা হইলে আমরা উভয়েই বিপদে পড়িব, সাক্ষাৎসম্বন্ধে বিপদ যদি নাও ঘটে, নিশ্চয়ই অপ্রতিভ হইতে হইবে।"

দ্বারে আঘাত হইল। ঘন ঘন আঘাত। রাণী জগৎকুমারী কিছুমাত্র চঞ্চলা না হইয়া সমান শান্তভাবে কহিলেন, "রাজা আসিয়াছেন।"

চঞ্চল হইয়া স্বর্গভূষণ কহিলেন, "তবে যে তুমি বলিতেছিলে, রাত্রি দুই প্রহরের পূর্ব্বে আসিবেন না।"

"আসিয়াছেন, তাহাতে কি? তুমি ভয় পাইতেছ কেন?"

"ভয় না, তিনি আমাদের উভয়কে একসঙ্গে দেখিলে তোমার ভয়ে যদি কিছু নাও বলিতে পারেন, ঈর্ষাবশে আমার প্রতি আক্রোশ জন্মিবে। বিশেষতঃ রাত্রি অনেক হইয়াছে। এতরাত্রি পর্য্যন্ত—"

"রাত্রি হইয়াছে, তাহা ত হইয়াই থাকে, তাহার সঙ্গে তোমার আমার—"

"আমি তাহা বলিতেছি না, রাজা নিত্য নিত্য যে সময়ে আসেন, তাহার পূর্ব্বে যখন আসিয়াছেন, তখন আমার বোধ হয় প্রকৃতিস্থ।"

একটু হাসিয়া জগৎকুমারী কহিলেন, "যেমন প্রকৃতিস্থ, দ্বারের আঘাত শুনিয়াই আমি তাহা বুঝিতে পারিয়াছি। আমার কর্ণ ঐ শব্দগুলি বেশ বুঝিতে পারে। আমার কর্ণ তাহা বিলক্ষণ অভ্যাস করিয়াছে, দেখ না তামাসা!"

"তামাসা ত দেখিব, কিন্তু—"

"তোমার কিন্তুর অর্থ আমি বুঝিয়াছি। তুমি এক কর্ম্ম কর, ঐ গবাক্ষের গাত্রে যে যবনিকা আছে, তাহার পশ্চাতে খানিকক্ষণ তুমি গাঢাকা হইয়া থাক, রাজা এখানে অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিতে পারিবেন না। আমার শক্ত শক্ত ভর্ৎসনা শুনিবামাত্র এ গৃহ হইতে গৃহান্তরে প্রস্থান করিবেন। সেই অবকাশে সচ্ছন্দে আমি তোমাকে নিরাপদে গৃহে পাঠাইয়া দিতে পারিব।"

"আর ঐ দাসীটা যদি বলিয়া দেয়?"

"কাহার কথা বলিতেছ? সাবদা? সে কিছুই বলিবে না। যাহাকে

যে কথা বলিতে আমি শিখাইয়া দিই, সেই কথা ভিন্ন আর কাহাকেও সে কোন কথা বলে না।”

বাক্যব্যয়ে সময় যায়, কুমার স্বর্ণভূষণ ইহা মনে করিয়া শশব্যস্তে গবাক্ষ আচ্ছাদন পর্দ্দার অন্তরালে লুকাইলেন।

সারদার সহিত রাজা বিরাটকেতু গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বিষধরী ভুজঙ্গিনীর ন্যায় তীব্রবেগে দণ্ডায়মান হইয়া রাণী জগৎকুমারী রক্তবর্ণ চক্ষে ঘাড় বাঁকাইয়া সম্মুখে দাঁড়াইলেন। ক্রোধব্যঞ্জক, ঘৃণাব্যঞ্জকস্বরে কহিতে লাগিলেন, “রাজা! তুমি কি নিত্য নিত্যই এইরূপে আমারে জ্বালাতন করিবে? লজ্জা হয় না? বয়স কি হয় নাই? তোমার লজ্জা হয় না, কিন্তু আমার লজ্জা হয়।”

“রাণি! তুমি জান, আমি এই বাটীর প্রভু?”

“রাজা! তুমি জান, আমি এই বাটীর কর্ত্রী?”

“আমাকে শয়ন করিতে হইবে, তুমি শীঘ্র আমার সঙ্গে এসো।”

“আমি তোমার হুকুমের দাসী নই। জানি আমি, ঘরে আসিয়া তুমি আর দাঁড়াইতে পার না, আচ্ছা, সারদা আলো লইয়া যাইতেছে, তুমি গিয়া শয়ন কর।”

“আমি আজ্ঞা করিতেছি, তুমি চল।”

“তোমার আজ্ঞা করিবার অধিকার নাই। যদি তুমি কখনও এই সকল কুপ্রবৃত্তির সেবা করিতে নিরস্ত হও, তাহা হইলে আমি তোমার আজ্ঞার বশবর্ত্তিনী হইব। তাহা না হইলে তুমি আমাকে বশীভূত দেখিতে পাইবে না!”

যে স্বরে রাজা কথা কহিতেছিলেন, সে স্বর একটু নরম হইল। একটু মিষ্ট করিয়া কহিলেন, “মহিষি। রাত্রি অধিক হয়, আমার যদি আসিতে বিলম্ব হইয়া থাকে, সে দোষ আমার নহে। যাঁহাদের গৃহে যাইতে হয়, তাঁহারা অনুরোধ করিলে শীঘ্র উঠিতে পারা যায় না। ইহা কি তুমি জান না রাণি?”

“হ্যাঁ,—হ্যাঁ,—জানি,—জানি,—সমস্তই আমি জানি, উপরোধ অনুরোধ সমস্তই আমি জানি, তুমি উপরে যাও। একটু পরেই আমি যাইতেছি।”

"রাণি! আমাকে তুমি যেরূপ বিবেচনা করিতেছ, তাহা আমি না হইতেও পারি, কিন্তু তোমার এই উগ্রস্বভাব আমাকে ক্ষিপ্ত করিয়া দিতেছে।"

"আর তর্কবিতর্কের সময় নাই, তুমি উপরে যাও রাজা।"

পর্দ্দার আড়ালে দাঁড়াইয়া স্বর্গভূষণ কাঁপিতেছেন। ভাবিতেছেন, স্ত্রীলোকের বুদ্ধিতে এমন কর্ম্ম কেন করিলাম! রাজা যদি শীঘ্র এখান হইতে বিদায় না হন, লুকাইয়া রহিয়াছি, কোন প্রকারে যদি প্রকাশ পায়, তাহা হইলে মহা অনর্থ বাধিবে। আমি এখন করি কি? আসিয়াছিলাম, দেখা করিতে আসিয়াছি, সম্মুখে যাইয়া এ কথা যদি বলি, রাজা বিশ্বাস করিবেন না। চতুরা রাণী যে কথা বলিয়া আমাকে বুঝাইয়াছিল, তাহা বোধ করি সত্য নয়। বিষম সঙ্কটে পড়িলাম। নারীজাতির চতুরতার নিকটে মহামায়ার মহামায়াও স্থান পাইতে পারে না।

স্বর্গভূষণ এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, রাণী জগৎকুমারী ব্যগ্রস্বরে কহিলেন, "রাজা! তুমি কি মনে করিতেছ রাত্রি হয় নাই? তোমার জ্ঞান কোথায়? রাত্রি দুই প্রহর অতীত। উপরে যাও।"

"না,—আমি একাকী যাইব না। তুমি অগ্রে অগ্রে চল, আমি পশ্চাতে যাইতেছি।"

সারদার দিকে নেত্রসঙ্কেত করিয়া রাণী অগত্যা তাহাই অঙ্গীকার করিলেন।

রাজা আর রাণী উভয়ে একত্রে ত্রিতলের শয়নকক্ষে প্রবেশিলেন, স্বর্গভূষণ পর্দ্দার অন্তরাল হইতে বাহির হইলেন। সারদা একটী প্রজ্বলিত বাতী ধরিয়া সদর দরজা পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গেল। স্বর্গভূষণ তাহার হস্তে দশটী টাকা দিয়া বিশ্বস্তভাবে কহিলেন, "সারদা! রাত্রের কথা কেহ যেন জানিতে না পারে।"

সারদা উত্তর করিল, "রাজকুমার! আমারে সাবধান করিতে হয় না। আমি কেবল দেখি আর শুনি, কাহাকেও কোন কথা বলি না। বড় ঘরের বড় কথা, আমি ছোট ঘরের মেয়ে, আমার সে সকল কথায় প্রয়োজন কি?"

স্বর্গভূষণ বহির্গত হইলেন। সারলা ধীরে ধীরে দরজা বন্ধ করিয়া আপন কক্ষে প্রবেশ করিল। কেবল গৃহ জানিল, আকাশ জানিল, আকাশের নক্ষত্রেরা জানিল, বায়ুদেব জানিলেন, আর যাঁহার অনেক চক্ষু আছে, তিনি জানিলেন, কি হইল। আর কেহ জানিল না।

পথে যাইতে যাইতে স্বর্গভূষণ ভাবিতেছেন, উত্তম হইয়াছে। প্রতিশোধ লইবার ইহাই উচিতমত পন্থা। রাজা বিরাটকেতু বিশ্বাসঘাতক, মিত্রদ্রোহী, কৃতঘ্ন। ইহার সঙ্গে যদি আমি চাতুরীখেলা খেলি, তাহা হইলেই ঠিক হয়; তাহারই অঙ্কুর হইয়াছে। আমার হৃদয়ে প্রতিহিংসা আছে, আমি প্রতিফল দিতে জানি। রাজা বিরাটকেতু ধূর্ত।——অর্থ আকর্ষণের নিমিত্ত ধূর্ততা করিয়া অপ্সরাসুন্দরীর সহিত আমার বিবাহ দিতে চাহিয়াছিল। ইচ্ছাপূর্ব্বক বঞ্চনা করিয়াছে। আমি তাহার প্রতিশোধ লইব। সেই প্রতিশোধের শুভ অবসর এই। জগৎকুমারী আমারে অনেক কথা বলিয়াছে। জানিতেছি আমি, রাজা বিরাটকেতুর প্রতি জগৎকুমারীর সত্য অনুরাগ অতি অল্প। দুই তিন দিনের আলাপে,—ছিল ত শৈশবের আলাপ,—এখনকার দুই তিন দিনের আলাপে জগৎকুমারী অবশ্যই আমার বশীভূত হইবে। কোন প্রকার বশীকরণ আবশ্যক হইবে না। আজ আমি তাহার পরিচয় পাইয়াছি। হস্তচুম্বন স্থানান্তর করিয়া ওষ্ঠে ওষ্ঠ মিশাইবার আকিঞ্চন পাইয়াছিলাম, হাসিয়া হস্ত সঞ্চালনে জগৎকুমারী আমারে সরাইয়া দিয়াছে। এ কথা আমার এক সপ্তাহ মনে থাকিবে, বেশী নয়। এক সপ্তাহ পরে পুনরায় সাক্ষাৎ হইলে রাণী হয় ত আর ঐরূপ—

সম্মুখে কে আসিতেছে? কে ও? কে তুমি? কই,—আর ত দেখা গেল না! তবে এ কি স্বপ্ন? স্বপ্ন কিরূপে হইতে পারে? আমি ত জাগিয়া রহিয়াছি, দাঁড়াইয়া রহিয়াছি, পথে চলিয়া যাইতেছি, এখানে স্বপ্ন কিরূপে আসিবে? তবে ইহা কি সেক্সপিয়ারের হাম্লেট? তাহাই বা ভারতবর্ষে কিরূপে সম্ভবে?—ওঃ! রাজা বিরাটকেতু! তুমি বিশ্ববঞ্চক, প্রতারক! তোমার কন্যা অপ্সরাসুন্দরীকে আমাকে দান করিবে বলিয়াছিলে, প্রবঞ্চনা

করিয়াছ। এখন দেখিব,—দেখিব,—দেখিব! জগৎকুমারীকে তুমি কিরূপে বশীভূত রাখিতে পার!

নক্ষত্রেরা আরও উজ্জ্বল হইয়া নিশীথসময়ে আকাশের শোভা সম্পাদন করিতেছে। দ্বিপ্রহর রজনী অতীত হইয়াছে; শান্ত সুধানিধি রজনীকান্ত নক্ষত্রমালার সঙ্গে অল্পে অল্পে পশ্চিম দিকে ঢলিয়া পড়িতেছেন। জীব, জন্তু, পশু, পক্ষী, সকলেই নিস্তব্ধ। কুমার স্বর্গভূষণ গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার জনকজননী তাঁহার অপেক্ষায় তত রাত্রি পর্য্যন্ত বাহিরের গৃহে বসিয়া রহিয়াছিলেন। বিবাহের গল্প হইতেছিল। স্বর্গভূষণের একটী পিসীমা আছেন, তাঁহাব নাম আনন্দা। তিন জনেই এক গৃহে একত্র। স্বর্গভূষণ প্রবেশ করিবামাত্র রাণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্বর্গভূষণ! এত রাত্রি কি জন্য?"

"আমি মহারাজ অনন্ত সিংহের গৃহে—"

হাস্য করিয়া পিসীমা কহিলেন, "সে কি স্বর্গভূষণ? মহারাজ অনন্ত সিংহ আজ আমাদের গৃহে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন, এখনও অর্দ্ধদণ্ড হয় নাই, তিনি বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। তুমি এতক্ষণ তাঁহার বাটীতে ছিলে?"

পিসীমার এই প্রশ্নে স্বর্গভূষণ কহিলেন, "তবে আমি সেখানে যাই নাই। তুমি আমাকে অমন কথা জিজ্ঞাসা করিও না। এখন আর আমি শিশু নই। আমারে ধমক্ দিলে আমি আর শুনিব না।"

রাণী কহিলেন, "সত্যই ত আনন্দাদেবি! স্বর্গভূষণ এখন আর বালক নাই।"

"অগ্রে আমি ত কিছু জিজ্ঞাসা করি নাই, তুমিই ত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে।"

রাণী চলিয়া গেলেন, রাজা চলিয়া গেলেন, পিসীমা একাকিনী রহিলেন। স্বর্গভূষণ চলিয়া যাইতেছিলেন, বাধা দিয়া পিসীমা কহিলেন, "দাঁড়াও স্বর্গভূষণ, একটু দাঁড়াও, দুটী কথা আছে।"

"তুই বুড়ী সর্ব্বনাশি! তোর কথা শুনিয়া অনেক বার আমি—

"না,—না স্বর্গভূষণ! এবারে সে কথা না, আদরিণীর কথা।"

ছোট ছোট হাসি হাসিয়া পিসীমার কোলের কাছে আসিয়া স্বর্গভূষণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আদরিণীর কি কথা পিসীমা?"

"মনকে স্থির কর। হৃদয়ে ধৈর্য্যকে বাঁধিয়া রাখ, আদরিণী আর তোমাকে ভালবাসে না।"

"কেন পিসীমা? তোমরাই ত সম্বন্ধ করিয়াছিলে?"

"ছিলাম সত্য, কিন্তু তোমার প্রতি আর আদরিণীর সে প্রকার অনুরাগ নাই। দেখিতেছ না, তুমি যখন তোমার ঘরে থাক, আদরিণী তখন ম্লানমুখে পলাইয়া যায়।"

"ভাল করিয়া বুঝাইয়া দাও, তোমার কথা আমি ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছি না।"

"আমি ভাল করিয়া বুঝাইতে জানি না। তোমার জননীকে জিজ্ঞাসা কর। আমার অপেক্ষা তিনি ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতে পারিবেন।"

শিকারী ব্যাঘ্রের মত প্রজ্বলিত নয়নে পিসীমার মুখের দিকে চাহিয়া স্বর্গভূষণ ত্রস্তপদে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া গেলেন। উপরের সোপানে আরোহণ করিবার পূর্ব্বেই জননীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল।

হিতাহিত বিবেচনাপরিশূন্য হইয়া স্বর্গভূষণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা! আদরিণীর সঙ্গে আমার কি বিবাহ হইতে পারে না?"

"কেন পারে না বৎস! আদরিণীর জননী তোমারে আদরিণী সমর্পণ করিতে অন্তঃকরণের সহিত ইচ্ছা করেন।"

"না মা! আমি তাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি না। স্বয়ম্বরাপ্রথা উঠিয়া গেলেও ক্ষত্রিয়কুমারীরা ইচ্ছাবশে আজিও পতি নির্ব্বাচন করিতে পারে। আমাকে বিবাহ করিতে আদরিণীর কি ইচ্ছা আছে?"

"তুমি কি জানিতে পারিতেছ না? তাহার মাতা তাহারে তোমার কাছে রাখিয়া ছলনাক্রমে গৃহান্তরে গমন করেন।"

"তাহা ত জানি। কিন্তু আদরিণীর সঙ্গে আমার যে বিবাহ হইবে, তাহা আমি জানিতে পারিতেছি না। পিসীমা কহিলেন, ইন্দোরের কে এক রাজকুমার;—নাম কি মনে পড়িতেছে না,—হঁ্যা, হঁ্যা, রঘুপৎ, হরবিলাস রঘুপৎ———"

"মিথ্যা কথা। তোমার পিসীমা তোমাকে ভয় দেখাইয়াছেন। সে কথা তুমি মনে করিও না বাছা।"

"মনে করি কেন, জান মা! পিসীমা চির অবিবাহিতা কুমারী; তিনি আমাদের মনের ভাব না জানিতে পারেন, কিন্তু মা! আদরিণীর সঙ্গে—"

রাণীর ইচ্ছা ছিল না, অল্প বয়সে স্বর্গভূষণের বিবাহ দেন, স্বর্গভূষণের ইচ্ছা ছিল না, আর কোন কামিনীকে বিবাহ করেন, কিন্তু ঘটনা আসিয়া মধ্যবর্ত্তিনী হইল, বিবাহের জন্য মাতাপিতা উভয়েই প্রস্তুত।

কথায় কথায় নক্ষত্রেরা মলিন হইয়া গেল, কথায় কথায় উষা আসিয়া দেখাদিয়া চলিয়া গেল, আবার নূতন প্রভাত। সম্বন্ধ হইতেছে, জনকজননীর আনন্দ-আকিঞ্চন বৃদ্ধি হইতেছে, কিন্তু স্বর্গভূষণের মনের ভাব স্বতন্ত্র। এক সপ্তাহ অতীত। সপ্তাহ অতীত হইতে হইতে স্বর্গভূষণের মনের ভাব নূতন হইয়া দাঁড়াইল। কতক্ষণে দিন যাইবে, কতক্ষণে সন্ধ্যা আসিবে, কতক্ষণে পদ্মিনী ঘুমাইবে, কতক্ষণে কুমুদিনী জাগিবে, এই সকল চিন্তায় তিনি চঞ্চল হইতে লাগিলেন। কিন্তু দিনমণি! তুমি কি কাহারও হাত ধরা? সময়! তুমি কি কাহারও হাত ধরা? শশধর আকাশে যদি না থাকেন, আমি তাঁহাকে দেখিতে পাইব না। ঘোর মেঘে যদি গগন-ক্ষেত্রকে আচ্ছন্ন না করে, তাহা হইলে নক্ষত্রকে আমি দেখিতে পাইব। তবে কেন এত অন্ধকার? চন্দ্র কি আর দেখা দিবেন না? দিন যাইতেছে, তোমারও যাইতেছে, আমারও যাইতেছে। যাহারা সুখী, তাহাদেরও দিন যাইতেছে, যাহারা দুঃখী, তাহাদেরও দিন যাইতেছে। পৃথিবীর লোকের সুখদুঃখ বিবেচনা করিয়া দিবারাত্রির যাওয়া আসা বন্ধ থাকে না। সুখদুঃখ বিবেচনা করিয়া চন্দ্রসূর্য্যের গতিবিধি বন্ধ থাকে না। থাকেন যদি চন্দ্র আকাশে, থাকুন, থাকে যদি আকাশে অন্ধকার, থাকুক, উভয়কেই আমরা পূজা করি। রাত্রি এক প্রহর আসিবার পূর্ব্বে আমাদের স্বর্গভূষণ ভ্রমণ করিতে করিতে বিরাটকেতুর ভবনে প্রবেশ করিয়াছেন। রাজা বিরাটকেতু গৃহে নাই। স্বর্গভূষণ রাণীর সহিত দেখা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই বুঝি প্রণয়? তুমি আজ কেন এত বিষাদিনী জগৎকুমারী?"

"তুমি আসিয়াছ?"

"আসিতে বলিয়াছিলে, আসিয়াছি। কিন্তু বল দেখি, আজ তোমার এত বিষণ্ন বদন কেন?"

বালক-বালিকার মত অভিমানে মুখ ভারী করিয়া রাণী জগৎকুমারী কহিলেন, "ও কথা জিজ্ঞাসা করিতে তোমাকে কে শিখাইয়া দিল? মানস আমারে যাহা শিখাইয়া দিয়াছিল।—অহঙ্কার যাহা শিখাইয়া দিয়াছিল,—নারীজাতির অভিমান তাহা শিখাইয়া দিয়াছে। কিন্তু তুমি—"

"আমি কি অপরাধ করিয়াছি?"

"অপরাধ কর নাই। কিন্তু তোমার ঐ প্রশ্ন বড় শক্ত অপরাধ করিতেছে।"

"সে অপরাধের কি ক্ষমা নাই?"

"থাকিতে পারে, কিন্তু রাজকুমার স্বর্গভূষণ সে ক্ষমার অধিকারী হইতে পারে না।"

"তোমারে কি ভূতে পাইয়াছে? কি কথা বলিতেছ, বুঝিতে পারিতেছি না। যাহাতে আমি বুঝিতে পারি, সেইরূপ স্পষ্ট স্পষ্ট কথা বল।"

"তোমার পিসীমা।"

"আমার পিসীমা কি?"

"তোমার মা, তোমার পিতা, তোমার পিসীমা, আদরিণীর সঙ্গে তোমার বিবাহ দিতে চাহেন, হাত ধরাধরি করিয়া তুমি আদরিণীর সহিত বাগানে বেড়াইতে যাও, সে কথা কি তুমি মনে মনে জান না স্বর্গভূষণ?"

"লোকে আমাকে বাধ্য করে, কিন্তু তুমি রাণী,—তুমি জগৎকুমারী, তোমাকে আমি———"

"কি কথা বলিতেছ?"

"যে কথা সে দিন বলিতেছিলাম, তুমি আমার হাত ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলে, যাহা মুখে আসিল, তাহা বলিয়া লাঞ্ছনা করিলে, সেই জন্যই—"

"কেন দিয়াছিলাম জান? তোমার বুদ্ধি অত্যন্ত অস্থির। প্রণয় যে কি বস্তু, তোমার চঞ্চল বুদ্ধি তাহা জানে না। তুমি একবার অপ্সরাসুন্দরীকে ভালবাসিতে চাহিয়া———"

"তোমার পতির সেই বিশ্বাসঘাতকতা এখনও আমার মনে জাগিতেছে। তোমার অনুগ্রহে সেই বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ, প্রতিহিংসা——"

"তুমি একবার আদরিণীকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলে?"

"মিথ্যা কথা। মাতাপিতার অনুরোধ। হয় হোক্ অপ্সরাসুন্দরী, হয় হোক্ আদরিণী, কিন্তু জগৎকুমারি! তোমার অপেক্ষা প্রিয়তমা সংসারে আর আমার দ্বিতীয় নাই।"

"কি! কি স্বর্গভূষণ! তুমি আমারে প্রিয়তমা বলিয়া সম্বোধন কর? যখন আমি বাল্যকালে অশ্বথবৃক্ষতলে তোমারে স্বর্গভূষণ বলিয়া ভালবাসিতাম, এক সঙ্গে খেলা করিতাম, তখন সে এক দিন, আমার তখন সে এক দিন ছিল। এখন স্বর্গভূষণ! এখন আমি রাজমহিষী হইয়াছি। এখন তুমি আমারে অপমানের কথা কহিতে পার না। হস্ত চুম্বন আমি সহ্য করিয়াছি, কিন্তু তাহা যখন ওষ্ঠের নিকটে উঠিতে চায়, সমস্ত জগতের জন্যও আমি তাহা সহ্য করিতে পারিব না।"

"রাজা কখন আসিবেন?"

"তাহা ত তুমি জান, নারীজাতির অহঙ্কার ত তুমি জান।"

"তবে আমি বিদায় হই।"

হাস্য করিয়া রাণী কহিলেন, "বিলম্ব আছে। একটী কথা জিজ্ঞাসা করি। রাজকুমার!"

"এখনও তুমি আমাকে রাজকুমার বলিয়া ডাক?"

"তুমি আমারে রাণী বলিয়া ডাক?"

"জগৎকুমারি! ভুল হইয়াছে। তুমি জগৎকুমারী।"

"হাঁ! আমি জগৎকুমারী। কিন্তু বৃদ্ধ রাজা তোমারে এখানে দেখিলে ক্রোধ, ঈর্ষা, হিংসা প্রকাশ করিতে পারেন, তাহা কি তুমি বিশ্বাস কর?"

"সে বিশ্বাস অনেক দূরে। কিন্তু তুমি যখন আমার হস্ত ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছ, তখন আমার এত যে তেজ, এত যে গর্ব্ব, এত যে অভিমান, তাহা পশ্চাতে রাখিয়া আমার চক্ষে জল আসিতেছে।"

"তোমার চক্ষে জল আসিতেছে?—কেন বল দেখি স্বর্গভূষণ? রাজা আমারে এক প্রকার বন্দিনী করিয়া রাখিয়াছেন। বাহির হইতে পারি না। তিনি বৃদ্ধ, আমি যুবতী। আমার প্রতি তাঁহার সর্ব্বদাই সন্দেহ। তবে কি জান রাজপুত্র! অনুগ্রহ করিয়া যাঁহারা গৃহে আইসেন, তাঁহাদের কাছে আমি মনের কপাট খুলিয়া দিই।"

"যদি দাও,—লোকের কাছে যদি দিতে পার, তবে আমার কাছে খুলিয়া দিতে না পার কেন?"

"একটী কথা আছে।" সে দিনের কথা ভুলিয়া গিয়া ওষ্ঠে ওষ্ঠ স্পর্শ করিয়া রাজমহিষী কহিলেন, "একটী কথা আছে।"

"কি কথা? আমার কাছে প্রকাশ করিতে,—" শিহরিয়া উঠিয়া স্বর্গ-ভূষণ কহিলেন, "আমার কাছে সে কথা প্রকাশ করিতে তুমি কি রাণী লজ্জা বিবেচনা কর?"

বসনাঞ্চলে লজ্জাকে লুকাইয়া রাজরাণী কহিলেন, "স্বর্গভূষণ! তুমি বড় উত্তেজিত হইতেছ, একটু স্থির হও। তোমাকে আমার অনেক কথা বলিবার আছে। একটু স্থির হও, আমার সত্য নাম কি, তাহা তুমি এখনও জান না, কি নামে তোমাদের সঙ্গে আমার খেলা হইয়াছিল, তাহা হয় ত তোমার মনে নাই। অশ্বত্থবৃক্ষ ছলনা মাত্র। সেই তমাল-তলা। কত তমালপাতা খসিয়া পড়িত, কত তমালফুল ঝরিয়া পড়িত, তুমি, আমি, আর সেই আর এক জন সেই বৃক্ষতলে লুকাচুরী খেলিতাম। স্বর্গভূষণ! এখন কি তাহা তোমার মনে পড়ে? গাছটী এখনও বাঁচিয়া আছে। তুমি আমি বাঁচিয়া আছি, কিন্তু সেই——না, তাহাকে আমি ভালবাসিতাম না। স্বর্গভূষণ! তোমার সঙ্গে আমার যে কত কথা হইত, এখন মনে করিলে হাসি পায়। তখন আমি সর্ব্বদা কাপড় পরিতে শিখি নাই, প্রায়ই উলঙ্গ থাকিতাম। এখন তোমারে দেখিয়া এত লজ্জা হয় কেন?"

"জগৎকুমারি! তুমি অনেক কথা কহিতেছ, আমি সকল কথা বুঝিতে পারিতেছি না। তুমি এখন রাজরাণী হইয়াছ। সর্ব্বদা তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে এখন আমার ভয় হয়। তুমি——

তোমারে নিহারি আমি কাল ভুজঙ্গীরূপিণী।
মস্তকে দংশিতে পার হয়ে কাল স্বরূপিণী॥
তোমার বিষ অনলে আমার অন্তর জ্বলে,
তোমারে হৃদিকমলে, রাখি রে কাল সাপিনী॥

কত দুঃখ দিবি মোরে, সুধাই, সুধাই তোরে,
বিষানলে দগ্ধ কোরে, তুই কি হবি সুখিনী ?”

রাণী এ কথা শুনিলেন না। একটু হাসিয়া কহিলেন, “রাজকুমার!”

“আবার তুমি আমাকে রাজকুমার বল ?”

“না বলিয়া কি করি ? তোমার সঙ্গে আমার সে সম্পর্ক আর নাই।”

“কেন নাই রাজমহিষী ? রাত্রি কি অধিক হইয়াছে ?”

“আমি রাত্রের কথা কহিতেছি না।”

“তবে কাহার কথা কহিতেছ রাণী ?”

“তুমি বিবেচনা কর।”

রাণী কহিলেন, “তুমি হয় ত ভাবিতেছ আদরিণী।”

“আর লজ্জা দিও না। পদে পদে আমি তোমার কাছে অপরাধী হইতেছি। রাজা আসিবার বিলম্ব কত ?”

পূর্ব্ব রজনীতে যে প্রবন্ধে বাধা পড়িয়াছিল, মনে মনে সাহস ছিল, উৎসাহ ছিল, আশা-চপলার উপদেশ ছিল, চারি পাঁচবার বিনিময় হইয়া গেল। বাধা পড়িল না। সারদা প্রবেশ করিল না, রাজা প্রবেশ করিলেন না, তবে ত বড় সুখের সময়। এ সুখের সময় রাজকুমার স্বর্গভূষণের সঙ্গে রাজমহিষী জগৎকুমারীর অনেকগুলি মনের কথা হইল।

“রসনা ডাকে তোমারে, দেখিবারে নিরন্তর।
দেখিতে তোমারে সখা, সদা কাতর অন্তর॥
অপরাধ করিয়াছি, ক্ষমা কি হে দিতে নাই ?
জুড়ি হাত প্রাণনাথ! ক্ষমা আমি ভিক্ষা চাই॥”

“কি রাণী জগৎকুমারি! তুমি আমারে প্রাণনাথ বলিয়া সম্ভাষণ করিলে ? তুমি এখন রাজমহিষী হইয়াছ। অপরিচিতকে নূতন সম্ভাষণে সম্ভাষণ করিলে আমি পাপী হইব। জগৎকুমারি! বাল্যকালের খেলাধূলা আমাদের ফুরাইয়া গিয়াছে। আমি তোমারে সেই শৈশবের সখীভাবে আর

দর্শন করিতে ইচ্ছা করি না। সে দিনের সম্ভাষণে সম্ভাষিত হইতে আর আমার সাহস হয় না। রাণি! এখন তুমি রাণী হইয়াছ, রাণী থাক। পূর্ব্ব পরিচয় ভুলিয়া যাও। পূর্ব্বে আলাপ-পরিচয় ছিল, ভূত-সাগরে তাহা ডুবাইয়া দাও। অত ঘনিষ্ঠতার আর আমি আশা রাখি না। যত দিন বিবাহ হয় নাই, ততদিন তমালবৃক্ষতলে খেলা করিয়াছি। বিবাহের পর পতিব্রতা সতী ক্ষত্রিয়কুমারীর সহিত ক্ষত্রিয়কুমারের প্রেমভাবের কথা-বার্ত্তা হইতে পারে না।"

"পারে না স্বর্গভূষণ? সেই তমালবৃক্ষ আমাদের কোথায় গেল? তুমিই সেই তমালবৃক্ষ। আমি তাহার পাতা। বৃক্ষ না থাকিলে পাতা কোথায় থাকে রাজকুমার?"

"ছন্দ ছাড়িয়া দাও। মনে যদি কিছু কপটতা থাকে, ছাড়িয়া দাও, ভুলিয়া যাও। তমালবৃক্ষে লতা উঠিতে পারে। সে লতা আশ্রয় পাইবে কোথা? আমি তোমারে বিশ্বাস করিয়া বলিতেছি, রাজার ভয় করিও না। রাজা আমারে দমন করিতে পারিবেন না। বিবাহ হইয়াছে, সে বিবাহে আমি সুখী হই নাই। শৈশবাবধি তোমারে আমি ভালবাসি। জীবনে সে ভালবাসা ফুরাইয়া যাইবে না। অপরাধ যদি হইয়া থাকে, সে অপ-রাধ অমার্জ্জনীয় হইবে না। স্বর্গভূষণ! বৃদ্ধ রাজার রাণী হইয়া আমি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হইয়াছি। অপ্সরাসুন্দরী কোথায় চলিয়া গিয়াছে, সন্ধান নাই। তবে স্বর্গভূষণ! তোমাতে আমাতে ছাড়াছাড়ি হইবে কি জন্য?"

"রাত্রি অনেক হইয়াছে। রাজা এখনি আসিবেন, আমারে বিদায় দাও।" মনে মনে হাস্য করিয়া স্বর্গভূষণ কহিলেন, বিরাটকেতু! তুমি অন্তরে আছ, আসিয়া দেখ, মিত্রদ্রোহিতার প্রায়শ্চিত্ত কিরূপে হয়! আমার মনে মনে প্রতিহিংসাবহ্নি জ্বলিতেছে। অপ্সরাসুন্দরীকে আমাকে সম্প্রদান করিবে বলিয়া তুমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, বঞ্চনা করিয়াছ। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছ। এখন তোমার এই নূতন রাণী কি করে, আসিয়া দেখ!

বিশ্বাসের ফলাফল হাতে হাতে ফলে।
অবিশ্বাস মহাবহ্নি বনে জলে জ্বলে।

তুমি অবিশ্বাসী রাজা ! লহ প্রতিফল।
বিশ্বাস নাশিলে ভবে ফলে এই ফল ॥
আমি অবিশ্বাসী নই, অবিশ্বাসী নারী।
তাহার হৃদয়বেগ দমিবারে নারি ॥
তুমি রাজা ! আছে তব বড় অহঙ্কার !
এই বার দর্পচূর্ণ হইবে তোমার ॥
সংসারেতে বিরাজিত দর্পহারী হরি।
দিবেন দিবেন তব দর্পচূর্ণ করি ॥
আমি বুঝি——

আর কথা কহিবার অবসর হইল না। রাজা বিরাটকেতু টল্‌টলায়মান-ভাবে গৃহমধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। পূর্ব্বে সংবাদ ছিল না, আসি-য়াই সম্মুখে দেখিলেন, জগৎকুমারী আর স্বর্গভূষণ ! নিদারুণ ঈর্ষ্যানল তাঁহার অন্তঃকরণকে জ্বালাইয়া দিল। চৈতন্যের আধিপত্য অল্প। কিঙ্করীকে সম্বোধন করিয়া তিনি কহিলেন, "সারদা ! কারা এরা ?"

হাস্য গোপন করিয়া সারদা উত্তর করিল, "মহারাজের অনুমতি আছে, অতিথিসেবা। গৃহে অতিথি উপস্থিত।"

"অতিথি ?" জড়িত রসনায় রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "অতিথি ? অতিথির তুমি নাম জান ?"

অঞ্চলে বদন আবৃত করিয়া সারদা উত্তর করিল, "আমি দাসী। আমার অপেক্ষা মহারাজ ভাল জানেন, এই অতিথি মহারাজ স্বর্গভূষণ !"

"স্বর্গভূষণ ? বৎস স্বর্গভূষণ ? তুমি এতক্ষণ পর্য্যন্ত আমার অপেক্ষা করিতেছ ?"

"কি করি রাজা ! আপনি নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, আমি অতিথি, আপনি গৃহে উপস্থিত নাই, কিরূপে বিদায় হই ?"

"রাণী অভ্যর্থনা জানেন না ?"

"রাণী জানেন, কিন্তু মহারাজ উপস্থিত না থাকিলে——"

"ওঃ! ও কথা আমার মনেই ছিল না। স্বর্গভূষণ! তোমার গৃহ; যখন ইচ্ছা, তখনই আসিবে, তোমার আবার নিমন্ত্রণ কি বাপু?—রাণি!"

"মহারাজ!"

"স্বর্গভূষণের আদরের ত——"

"না মহারাজ! আমার যতদূর সাধ্য, আমি সমাদর করিয়াছি।"

"সারদা!"

"মহারাজ!"

"স্বর্গভূষণের আহারাদির আয়োজনের আর বিলম্ব কত?"

রাণীর দিকে চাহিয়া সারদা উত্তর করিল, "মহারাজের অতিথি, মহারাজ উপস্থিত না থাকিলে, কি কি প্রয়োজন, তাহা আমরা কিরূপে জানিব?"

"আচ্ছা! এক কাজ কর। এই পল্লীতে যদি কিছু না পাওয়া যায়, গৃহে যাহা যাহা প্রস্তুত হইতে পারে, হউক। সমস্ত কিঙ্করকে লইয়া তুমি,—না না, তুমি না, তুমি স্ত্রীলোক, সমস্ত কিঙ্করেরা আর ব্রাহ্মণেরা গাড়ী করিয়া সহরে গমন করুক।"

"যে আজ্ঞে মহারাজ!"

রাজা আর অধিকক্ষণ কথা কহিতে পারিলেন না, সে গৃহে দাঁড়াইতেও পারিলেন না; শয়নকক্ষে শয়ন করিতে গমন করিলেন।

রাণী হাস্য করিয়া কহিলেন, "দেখিলে স্বর্গভূষণ! আমার রাজার কত গুণ!—দেখিলে, আমার রাজার কেমন দশা? এই রকম রাজাকে দেখিয়া তুমি কি ভয় পাও?"

স্বর্গভূষণ কহিলেন, "এখন আমি তোমারে কি বলিয়া ডাকিব? রাণী, না জগৎকুমারী?" হাস্য করিয়া স্বর্গভূষণ আবার কহিলেন, "জগৎকুমারী নামটী খুব ভাল!"

"ছেলেবেলা যে নাম শুনা যায়, জীবনাবধি সে নামটী ভাল লাগে। কিন্তু স্বর্গভূষণ।"—আরও পাঁচ সাত বার * * * * * বিনিময় হইয়া গেল।

রাজা শয়ন করিয়াছেন। বিশ্বাসিনী কিঙ্করী সারদা আস্তে ব্যস্তে প্রবেশ করিয়া রাণীকে কহিল, "মহারাণি! নক্ষত্রেরা অনেক উঁচুতে উঠিয়াছে।"

"জানি তা। আরও উঁচুতে উঠিবে, আবও নীচুতে নামিবে, ধূমের আবরণে লুক্কায়িত হইবে, তাহাও জানি। উষা আসিবে, প্রভাত আসিবে, তাহাও জানি। কিন্তু সাবদা! তুমি এখন কি বলিতে আসিয়াছ?"

থতমত থাইয়া সারদা উত্তর করিল, "রাজা নিদ্রাগত।"

"নিত্য বজনীতেই ত আমি তাঁহাবে নিদ্রাগত দেখি। সে নিদ্রা ত এক দিনও আমাবে নূতন কথা বলিয়া দেয় না।"

"বাজা কথা কহিতেছেন।"

"হাসালি, হাসালি, হাসালি সাবদা! হাসালি আমাবে তুই।—নিদ্রা কালে আমাব রাজা কি কথা কহিতে পাবেন? স্বপ্ন আসিয়া খেলা করিতেছে। যখন ভাল নিদ্রা না হয়, তখন স্বপ্নদেবী বড়ই খেলা কবেন।"

কবি কিম্বা অকবি ইঁহাবা উভয়েই ব্যাকরণেব বড লাঞ্ছনা কবেন। উভয়েই স্বপ্নকে দেবী বলিয়া সম্বোধন কবেন। কিন্তু স্বপ্ন যে কেন দেবী হন, আমবা বুঝিতে পাবি না। তথাপি তাঁহাদেব উপদেশে আমবা দেবী বলিয়া ডাকি। এতদিন ডাকিযাছি, আজি কেন ছাডিব? কবি মাথায় থাকুন, ব্যাকরণ মাথাব থাকুক্ স্বপ্ন মাথায থাকুন, আজ তাঁহাবে আমবা দেবী বলিয়া ডাকিব।

বাত্রি আডাই প্রহর। বাজা বিবাটকেতু স্বপ্ন দেখিতেছেন। দেখিতেছেন, তাঁহার অপ্সবাসুন্দরী কাননে। বাবণেব অশোককাননে সীতাদেবী যেন শ্রীবামচন্দ্রেব নিমিত্ত বোদন কবিতেছেন, চক্ষে চক্ষে বাক্ষসীমায়া যেন তাঁহাবে কাঁদাইযা কাঁদাইযা বিহ্বল কবিতেছে। উভয়েই কাঁদিতেছেন। মায়াসীতা দেখিয়া বামচন্দ্র কাঁদিতেছেন, মায়ামৃগ দেখিয়া সীতাদেবী কাঁদিতেছেন। পাঠক মহাশয়! বামায়ণেব সব কথা স্মবণ করুন। আব এই ক্ষেত্রে যাহা যাহা ঘটিতেছে, তাহাও মনে বাখুন। অপ্সবাসুন্দরী ঘরে নাই, ভূপেশচন্দ্র দেশে নাই, বিরাটকেতু স্বপ্নাভিভূত। স্বর্গভূষণ প্রতিহিংসাবশবর্ত্তী হইয়া জগৎকুমাবীকে ভুলাইয়া বাখিযাছে। আদবিণীকে ভুলিয়া গিয়াছে। আদবিণীকে ভুলিতে হয না, আদবিণী তাহাকে গ্রাহ্যও কবে না। আমবা বাঙ্গালী, আমরা ইচ্ছামত পাত্রী পাত্র নির্ব্বাচন করিযা তনয় তনযাব পবিণযবিধান কবিযা থাকি,

কিন্তু এমন অনেক দেশ আছে, অনেক দেশ কেন,—এই ভারতভূমির মধ্যেও এমন অনেক স্থান আছে, যেখানে ক্ষত্রিয় রাজকন্যারা স্বয়ম্বরা হয়। লোকে হয় ত মনে করিতে পারে, আর্য্য রাজত্বের সঙ্গে স্বয়ম্বরা প্রথার অবসান হইয়াছে; কিন্তু সেটী ভুল। স্বয়ম্বরাপ্রথা আর্য্যবর্ষ হইতে উঠিয়া যায় নাই। আছে। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যাউক, আর নাই যাউক, কিন্তু আছে।

রাজা বিরাটকেতু ঘুমাইতেছেন। জগৎকুমারীর সহিত একত্র বসিয়া স্বর্গভূষণ প্রেমালাপ করিতেছেন। কি আশ্চর্য্য! বিবাহের পর স্বয়ম্বর? এটী বড় শক্ত প্রশ্ন! এ প্রশ্নের মীমাংসা করা ঘুমন্ত বিরাটকেতুর সাধ্য নয়। কেন জান? বিরাটকেতু পবিত্র প্রণয়ের নিমিত্ত বিবাহ করেন নাই। পবিত্র প্রণয় কাহাকে বলে, বিরাটকেতু তাহার কিছুই জানেন না।

তাই ত! রাত্রি আসিয়াছিল, রাত্রি কোথায় গেল? আবার এক নূতন উষা। উষা ত নূতন হয় না। যে উষা নিত্য আইসে, নিত্য যায়, তাহাকে নূতন বলিয়া পরিচয় দিব কিরূপে? কিন্তু নিশা যেন বলিয়া দিতেছে, আমি চলিলাম, নূতন উষা আসিতেছে, তোমরা মঙ্গলাচরণ কর। নিশার কথাই সত্য। উষার আগমনে মঙ্গলাচরণ করিতে হয়। তুমি আমি জানি, নিশাকালে পাখীরা ঘুমায়, কাণা হয়। উষাকালে নিদ্রাভঙ্গে তাহাদের চক্ষু নবীন দীপ্তি প্রাপ্ত হয়। তাহারা ডাকে। কি বলিয়া ডাকে? আমি যদি কবি হইতাম, তাহা হইলে বলিয়া দিতে পারিতাম, পাখীরা পাখীর ভাষায় জগদীশকে ডাকে।

প্রভাত হইল, বিহঙ্গকুল কলরব করিয়া দিগ্‌দিগন্তে গগনমার্গে উড়িয়া গেল। রাণী জগৎকুমারী আর স্বর্গভূষণ সমস্ত রজনী জাগরণ করিয়াছেন, প্রভাতে স্বর্গভূষণ বিদায় গ্রহণ করিলেন। বিদায়কালে রাণী কহিয়া দিলেন, আজ সন্ধ্যার পর যেন আবার সাক্ষাৎ হয়। হস্তধারণপূর্ব্বক অঙ্গীকার করিয়া স্বর্গভূষণ বিদায় হইলেন।

পঞ্চাশৎ প্রবাহ।

গতানুশোচনা।

"নয়নের কোলে কি ঘোর কালিমা,
ঘোর দুঃখচিহ্ন অচিন্তার সীমা,
ধরায় নিরখি আজি কি ভাবিছ ?
মনোমধ্যে আজি কি স্বপ্ন দেখিছ ?
বিম্বাধরে আজি নাহি সে রক্তিমা।
তব মনোভাব মুখচিহ্ন সীমা॥"

আশা।

স্বর্গভূষণ গৃহে উপস্থিত হইয়াছেন। বেলা তখন অনুমান চারিদণ্ড। সমস্ত রজনী অনুপস্থিত, তাঁহার পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাত্রে কোথায় ছিলে ?" পুত্র উত্তর করিলেন, "পথে রাজা বিরাটকেতুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তিনি নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, নৃত্যগীতপ্রমোদে তথায় অধিক রাত্রি হইয়া গেল, সুতরাং অগত্যা সেই স্থানেই থাকিতে হইয়াছিল।" রাজার মনে কোন সন্দেহ হইল না, স্বর্গভূষণ সম্মুখ হইতে সরিয়া যাইতেছেন, পশ্চাতে ডাকিয়া রাজা কহিলেন, "স্বর্গভূষণ! শোন! রাজা বিরাটকেতু লোক ভাল নয়, সে একবার কন্যাসম্প্রদানে বাগ্দান করিয়া প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছে। তাহার সহিত ঘনিষ্ঠতা রাখিতে আর আমার ইচ্ছা নাই।"

স্বর্গভূষণ মস্তক অবনত করিয়া পিতার কথাগুলি শুনিলেন, মনে কি ভাবের উদয় হইল, তিনিই জানেন। উত্তর না করিয়াই মৃদুপদে তথা হইতে চলিয়া গেলেন।

সমস্ত দিনের মধ্যে পিতার সহিত স্বর্গভূষণের আর সাক্ষাৎ হইল না।

জননীর সহিত দুই চারিটী কথা হইয়াছিল, কিন্তু যে লোক মিথ্যা বচনে পিতাকে ভুলাইতে পারে, সে যে স্নেহাধারা জননীকে ভুলাইতে পারে না, এ কথা যে মনে করে, সে মূর্খ।

দিন গেল, সন্ধ্যা আসিল। ক্রমশই স্বর্গভূষণের মন চঞ্চল হইতে লাগিল। সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পরেই তিনি মাতাপিতার অজ্ঞাতে বাটী হইতে বাহির হইলেন। চঞ্চলপদে রাজা বিরাটকেতুর ভবনে উপস্থিত। নিত্য যেরূপ হইয়া থাকে, সে দিনও তাহার অন্যথা হয় নাই। রাজা গৃহে ছিলেন না, রাণী যে গৃহে উপবেশন করেন, দস্তুরমত একাকিনী সেই গৃহে বিরাজ করিতেছিলেন, সে দিন তাঁহার অপূর্ব্ব বেশ, অপূর্ব্ব শোভা! সমস্ত অলঙ্কার পরিয়া চমৎকার কবরী সাজাইয়া কয়েকটী পুষ্পস্তবক হস্তে একখানি কৌচের উপর বসিয়া আছেন। স্বর্গভূষণ উপস্থিত হইলেন। রাণীর মুখখানি কিছু ভারি ভারি। তিনি জানিতেন, প্রভাতে নিমন্ত্রণ করা আছে, স্বর্গভূষণ অবশ্যই আসিবেন। মনে মনে তাহা নিশ্চয় করিয়াই ভারি হইয়া বসিয়া ছিলেন। স্বর্গভূষণ প্রবেশ করিলেন। রাণী তাঁহার দিকে একবার চাহিয়াও দেখিলেন না, বসিতেও বলিলেন না। স্বর্গভূষণের বিস্ময় জন্মিল, সবিস্ময়গম্ভীরভাবে দণ্ডায়মান হইয়াই তিনি বলিয়া উঠিলেন, "ইস্! আজ যে তোমার বড় চমৎকার সজ্জা! এই সজ্জার সঙ্গে সমস্ত গর্ব্ব মূর্ত্তিমান! জগৎকুমারি! আজ আর কি কাহারও নিমন্ত্রণ আছে? আর কেহ কি এখানে আসিবে?"

"কেহই না।" সেইরূপ গম্ভীরভাবে সগর্ব্বে রাণী কহিলেন, "কেহই না। আমি একাকিনী থাকিব, কাহাকেও প্রবেশ করিতে দিব না, দিতে ইচ্ছাও নাই।"

"আমাকেও না? সত্য জগৎকুমারি! আজ তোমাকে যথার্থই যেন স্বর্গের বিদ্যাধরীর মত সুন্দরী দেখাইতেছে। কি চমৎকার চুল! এমন চুল আমি কখনও দেখি নাই!" এই কথা বলিতে বলিতে স্বর্গভূষণ ত্রস্তপদে সমীপবর্ত্তী হইয়া রাণীর আসনে গিয়া বসিলেন। অঙ্গে অঙ্গ স্পর্শ হইল। রাণী একবার তাঁহার দিকে মুখ ফিরাইলেন। কিন্তু মুখ সেইরূপ গম্ভীর। তথাপি যেন উৎসাহ পাইয়া স্বর্গভূষণ সহাস্যবদনে সেই সুন্দরীর সুগন্ধযুক্ত অলকদাম হস্তদ্বারা স্পর্শ করিলেন।

যেন বিদ্যুৎবেগে সরিয়া গিয়া সর্ব্বশরীর সঞ্চালন করিয়া রাণী জগৎকুমারী কহিলেন, "স্বর্গভূষণ! কি করিতেছ? দূরে যাও! স্থির হইয়া বোসো! আজ তোমার আচরণ আমার ঘৃণা জন্মাইয়া দিতেছে। কিরূপে তুমি আমার কেশ স্পর্শ করিতে সাহস করিলে?" রাণী যখন এই কথাগুলি বলেন, তৎকালে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ দুলিতেছিল। বড় বাতাসে যেমন গাছের পাতা কাঁপে, তাঁহার কর্ণপার্শ্বের অলকমালা আর কর্ণভূষাগুলি সেইরূপ কাঁপিয়া উঠিল।

স্বর্গভূষণ এ ভাবের ভাব বুঝিতে পারিলেন না। কথার তাৎপর্য্যও তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইল না। পূর্ব্ব রজনীর বিশ্বাসে সাহস পাইয়া তিনি আবার কহিলেন, "এই সুন্দর বসনে তোমাকে আরও সুশ্রী দেখাইতেছে, তোমার গঠনও অতি সুঠাম! দেখি দেখি, অঙ্গুলীতে কেমন সুন্দর অঙ্গুরী সাজিয়াছে দেখি।" কথা সমাপ্ত করিবার পূর্ব্বেই স্বর্গভূষণ আবার নিকটে সরিয়া গিয়া জগৎকুমারীর কর ধারণ করিলেন। একবার আকর্ষণপূর্ব্বক জগৎকুমারী হাতখানি ছাড়াইয়া লইলেন, স্বর্গভূষণ পুনর্বার ধারণ করিলেন। কম্পিতস্বরে কহিলেন, "আহা! কি চমৎকার অঙ্গুলী! জগৎকুমারি! আমি তোমার অঙ্গুরীর প্রশংসা করিতেছি না, হস্তের প্রশংসা করিতেছি।" এইরূপ চাটুবাক্য বলিয়া সেই সুকোমল হস্তখানি ওষ্ঠসমীপে লইয়া প্রেমভাবে চুম্বন করিলেন। তাচ্ছিল্যভাবে হাত সরাইয়া লইয়া রাণী পূর্ব্ববৎ ঘৃণাব্যঞ্জকস্বরে কহিলেন, "আবার? আবার স্বর্গভূষণ? আবার তোমার এরূপ ব্যবহার? তোমার কি লজ্জা হইতেছে না? তুমি যে অঙ্গুরী দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছ, ইহাও আমার ভাগ্য।"

"সন্তুষ্ট?—সন্তুষ্ট জগৎকুমারি? আমি সর্ব্বদাই তোমার প্রতি সন্তুষ্ট।—সন্তুষ্ট না হইলে দেখিতে আসিব কেন? তোমার রূপ অতি চমৎকার! বর্ণ অতি চমৎকার! কেশ অতি চৎকার! বিশেষতঃ—"

"ছিঃ!—স্বর্গভূষণ! ছিঃ! বৃথা খোসামোদ করিতেছ।" অনাদরে এই কথা বলিয়া অভিমানিনী রাণী অন্য দিকে মুখ ফিরাইলেন।

স্বর্গভূষণ সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। সে দিকে দৃষ্টিপাতও করিলেন না। আপনার মনেই কহিতে লাগিলেন, "বিশেষতঃ আজ রাত্রে তোমার

এই চমৎকার রূপের যে চমৎকার শোভা হইয়াছে, আমার যদি দেবরাজের মত সহস্র চক্ষু হইত, আমি যদি নাগরাজের মত সহস্রবদন হইতাম, তাহা হইলে সাধ মিটাইয়া ঐ রূপসুধা পান করিয়া ঐ রূপরাশি দর্শন করিয়া, ঐ রূপগরিমা গান করিয়া জীবন সার্থক করিতাম।" কথা বলিতে বলিতে রাণীর মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া দুষ্টবুদ্ধি স্বর্গভূষণ তাঁহার ওষ্ঠে ওষ্ঠ সংলগ্ন করিলেন।

ঠিক্ সেই মুহূর্ত্তেই বাহির হইতে গৃহদ্বার উদ্ঘাটিত হইয়া গেল। খাদ্যসামগ্রীপূর্ণ একখানি স্বর্ণপাত্রহস্তে সারদা প্রবেশ করিল।

রাণী জগৎকুমারী যেন চপলা সঞ্চালনে আসন হইতে লাফাইয়া উঠিলেন। দূরে আর একখানি আসন ছিল, মৌনভাবে, নতশিরে সেই আসনে উপবেশন করিলেন। স্বর্গভূষণ যেখানে ছিলেন, সেইখানেই রহিলেন। তিনিও অবনত মস্তকে মস্তক কণ্ডূয়ন করিতে করিতে মিহিসুরে একটী অস্পষ্ট গীত ধরিলেন।

সারদা কোন দিকে চাহিল না, একটীও কথা কহিল না, সম্মুখবর্ত্তী একটী ত্রিপদীর উপরে পাত্রখানি রাখিয়াই দ্বার অবরুদ্ধ করিয়া চলিয়া গেল।

দারুণ লজ্জা পাইয়া বিরক্তভাবে রাণী কহিলেন, "বড় অন্যায়! বড় অন্যায়! আমি——"

বাধা দিয়া স্বর্গভূষণ কহিলেন, "তুমি কেন অমন করিতেছ জগৎকুমারী? সারদা কিছুই দেখে নাই, যদি কিছু দেখিয়া থাকে, সে তাহা প্রকাশ করিবে না, একটী বর্ণও না। যে রাত্রে আমি পর্দ্দার আড়ালে লুকাইয়া ছিলাম, সে রাত্রে বিদায় হইবার সময় তাহাকে আমি পুরস্কার দিয়া গিয়াছি।"

"তাহা হউক, আজিকার কার্য্য সে যদি না দেখিত, তাহা হইলে——"

"সে দেখে নাই।"

"দেখিয়াছে। তুমি গোপন করিলে আমি শুনিব কেন? তোমার লজ্জাভয় অপেক্ষা আমার লজ্জাভয় বেশী। পুনরায় যাহাতে ঐরূপ ঘৃণাকর কাণ্ড না ঘটে, আমি সে বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকিব।"

রাণীকে অন্যমনস্ক করিবার নিমিত্ত প্রসঙ্গ চাপা দিয়া কুমার স্বর্গভূষণ সহসা জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজা আজিও কি সেই জুয়ার আথ্‌ড়ায় ?"

"তাহাই সম্ভব। কিন্তু আর আমি ঐরূপ ইচ্ছা করি না। অনুরোধ করিব, আর যেন তিনি রাত্রিকালে আমাকে এরূপে একাকিনী ফেলিয়া কোথাও না যান। যাহাতে তিনি ঠাণ্ডা থাকেন, সৎপতি বলিয়া যাহাতে তাঁহারে আমি ভক্তি করিতে পারি, যাহাতে তিনি সর্ব্বদা গৃহে থাকেন, সে চেষ্টা করিবই করিব। ইহাই আমার ইচ্ছা। আমি জানি না, আরও কি আমার ইচ্ছা।"

"জগৎকুমারি। ওঃ! পাগলের মত তুমি কি কথা কহিতেছ? বিকার-গ্রস্ত রোগীর ন্যায় ও কি প্রলাপ বকিতেছ?"

"পাগল?—বিকারগ্রস্ত?"—সত্যই যেন উন্মাদিনীর ন্যায় রাণী জগৎ-কুমারী আসন হইতে উত্থিত হইয়া উচ্চকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, "হ্যাঁ সত্যই আমি পাগল! এই দেখ, যথার্থই আমি পাগলিনী। ওঃ! আমি কি নির্ব্বোধ! বিবেচনাশূন্য হইয়া আমি পাগলের মত কার্য্য করিতেছি! একজন দাসী আমার পাগলের কার্য্য দেখিয়া গেল! ওঃ! সারদা কি মনে করিতেছে? স্বর্গভূষণ! তুমি আমার একটী উপকার কর।"

"কি বল। তোমার উপকার করিতে সর্ব্বদাই আমি প্রস্তুত।"

"তুমি এখান হইতে বিদায় হও। স্বর্গভূষণ! আমি একাকিনী থাকিতে ভালবাসি, একাকিনী থাকিতে দাও। যদি কখনও আমাকে দেখিবার ইচ্ছা হয়, দিনের বেলা আসিও, যখন নিকটে লোকজন থাকিবে, সেই সময় আসিও। নির্জ্জনে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আর আমি ইচ্ছা করি না।" গর্ব্বপূর্ণ গম্ভীর বদনে এই কথাগুলি বলিয়া গর্ব্বিতা রাণী অনেক দূরে গিয়া দাঁড়াইলেন।

স্বর্গভূষণ কহিলেন, "বড় হাস্যকর কথা! অকস্মাৎ তোমার এরূপ চিত্তভ্রম উপস্থিত হইল কি জন্য?"

"চিত্তভ্রম নয়; আমার নিজের ব্যবহারের নিমিত্ত আমি অনুতাপ করিতেছি। দেখিতেছি, আমার দুষ্প্রবৃত্তি অনেক দূর গিয়াছে! অনেক দিন অবধি আমি যেন অন্ধ হইয়া বিপথে পরিভ্রমণ করিতেছি। দয়াময়

পরমেশ্বরকে নমস্কার। এক দিনের জন্যও আমি সতীত্বের অপমান করি নাই। আজ কি না আমার সেই সতীত্বের সুনাম দুর্নাম একজন কিঙ্করীর হস্তে। যাও! স্বর্গভূষণ। মিনতি করি, চলিয়া যাও, ধর্ম্মকে সাক্ষী রাখিয়া আমি একাকিনী থাকি।"

"সে কি জগৎকুমারি! একজন বৃদ্ধ অস্থিরচিত্ত লোকের নিমিত্ত তুমি সত্য সত্য কি——"

"যাও! বিদায় হও। এক মুহূর্ত্তও আর এখানে থাকিও না। বৃদ্ধ অস্থিরচিত্ত,—হ্যাঁ,—রাজা বিরাটকেতু বৃদ্ধ, অস্থিরচিত্ত, তথাপি তিনি আমার স্বামী। তিরস্কার করি, বিরক্ত হই, নিন্দা করি, যাহাই করি, তথাপি তিনি আমার স্বামী। আমি নির্ব্বোধের কাজ করিয়াছি। তুমি স্বর্গ ভূষণ! আর বিলম্ব করিও না। শীঘ্র বিদায় হও।" এই কথাগুলির সঙ্গে সঙ্গে রাণী যেন চমকিতভাবে কাঁপিয়া উঠিলেন।

পূর্ব্বভাবে মুখপানে চাহিয়া স্বর্গভূষণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "সত্য সত্য ওগুলি কি তোমার মনের কথা অথবা পরিহাস?"

"মনের কথা।—পরিহাস ভাবিয়া তুমি যে আমারে প্রশ্ন করিলে, তজ্জন্য তোমারে আমি ক্ষমা করিলাম। আমার যেরূপ ব্যবহার দেখিতেছ, তাহাতে তুমি আমার বাক্যকে রঙ্গভূমির অভিনয়ক্রীড়া মনে করিতে পার, কিন্তু এখন আমি সাবধান হইয়াছি। তুমি বিদায় হও স্বর্গভূষণ!"

"তবে এইরূপেই কি আমাদের ছাড়াছাড়ি হইবে?"—কিঞ্চিৎ ক্ষোভ, কিঞ্চিৎ ঘৃণা, কিঞ্চিৎ নৈরাশ্য একত্র করিয়া ভর্ৎসনাস্বরে স্বর্গভূষণ ঐ ক্ষুদ্র প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রশ্নের সঙ্গে একটী দীর্ঘনিশ্বাস বিনির্গত হইল।

"হ্যাঁ!—এইরূপেই আমাদের ছাড়াছাড়ি হইল। এইরূপে হওয়াই উচিত। আমারে দুষী করিও না, আমি কোন মন্দ অভিপ্রায়ে তোমারে বিদায় করিতেছি না। আদরিণীর সহিত তোমার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে। পূর্ব্ব রজনীতে আমি যে তোমারে কতকগুলি কথা বলিয়াছিলাম, তাহাতে তুমি কিছু মনে করিও না। কথার ছলে সে কেবল রহস্যমাত্র। তুমি আদরিণীকে বিবাহ করিয়া সুখী হও, এই আমার

অভিলাষ। যাও, আর বৃথা কাল হরণ করিও না, তোমার জনকজননী যাহাতে সুখী হন, সে চেষ্টা করিও। কেবল চেষ্টা নহে, প্রাণপণে যত্ন করিও। এখন বিদায় হও।"

দীর্ঘ দীর্ঘ দুটী নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গভূষণ কহিলেন, "বিদায় হইবার পূর্ব্বে আমার একটী মাত্র কথা।—স্নেহের নিদর্শনস্বরূপ আমি যৎকিঞ্চিৎ উপহারসামগ্রী প্রেরণ করিব, গ্রহণ করিবে কি?"

"আচ্ছা, আচ্ছা, তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহা করিও, এখন চলিয়া যাও।"

"আর একটী কথা,—বিদায়কালে তোমার ঐ ললিত করপদ্ম স্পর্শ করিতে আমি কি একবার অধিকারী হইব?"

"যাও, যাও। ও সকল রহস্যের আর সময় নাই। বিনয় করিয়া বলিতেছি স্বর্গভূষণ! আর আমাকে যন্ত্রণা দিও না; বিদায় হও।"

নৈরাশ্যকে হৃদয়ে আহ্বান করিয়া স্বর্গভূষণ বিদায় গ্রহণ করিলেন। বিদায়কালে আর একটী কথা কহিয়া গেলেন। "রাণি!—আর এখন আমি তোমাকে রাণী ভিন্ন আর কি কথায়, কি নামে ডাকিব? কি নামে সম্ভাষণ করিব?—রাণি। যদি কখনও আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা হয়, একখানি ক্ষুদ্র পত্রিকা প্রাপ্ত হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হইব।"

স্বর্গভূষণ বিদায় হইলেন। ক্রূর, চতুর লম্পটদিগের অন্তঃকরণ কখনই সুস্থির হইয়া থাকে না, দুরাচার লম্পটের মন কখনই সরল পথে চলে না। পাপীর হৃদয় পাপানলে দগ্ধ হয়ই হয়। পথে যাইতে যাইতে স্বর্গভূষণ ভাবিতেছেন, কি হইল! হৃদয়ে প্রতিহিংসা বলবতী। মনোরথ সুসিদ্ধ হইবার সুপন্থাও প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, কিন্তু কি হইল! সমস্তই বৃথা হইয়া গেল! সহসা জগৎকুমারীর যখন চিত্তভাবের এতদূর পরিবর্ত্তন, তখন আর সে প্রতিহিংসা সাধনের উপায় দেখিতেছি না। মনে যে আশার সঞ্চার হইয়াছিল, নিরাশা পবন সে আশা উড়াইয়া দিল। আমি ত আদর করিতে, করিতে, তোষামোদ করিতে কিছুমাত্র ত্রুটী করি নাই, তবে এমন টা কি জন্য? সুখের পথে কাঁটা পড়িল কি জন্য? না,—কাঁটা নোরথ বিফল হইবে কেন? আশা উড়িয়া যাইবে কেন?

সমস্তই ঠিক্ আছে। স্ত্রীজাতির মন প্রায় সর্ব্বদাই চঞ্চল। সে মনে ক্ষণে ক্ষণে নবীন নবীন ভাবের খেলা হয়, রাণী জগৎকুমারীর হৃদয় একটী ছোট নদী। হঠাৎ তাহাতে তরঙ্গ আসিয়াছে, সে তরঙ্গ স্থায়ী হইবে না, অবশ্যই আমি জয়ী হইতে পারিব, মনের সঙ্গে আশার যুদ্ধ হইতেছে, এ যুদ্ধে আশার জয় লাভ হইবে, আমি নিশ্চয়ই আশার সহায়ে রণজয়ী হইয়া বিরাটকেতুর বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ লইবই লইব। এই অন্ধকার পথে আশা আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছেন, চারি দিক যেন আলো করিয়া পথ দেখাইয়া দিতেছেন, আশা আমার কাণে কাণে কহিতেছেন, মনকে দৃঢ় কর, কৌশল অস্ত্র ধারণ কর, তোমার জয় লাভ হইবেই হইবে।

স্বর্গভূষণ জানিতেন না, আশা চপলা। আশাকে কেহই স্থির রাখিতে পারে না। আশা কখনও আকাশে উড়িয়া যায়, কখনও সাগরে ডুবিয়া থাকে, কখনও অন্তরীক্ষে বিচরণ করে, কখনও গৃহস্থের ঘরে ঘরে আসিয়া মানুষের কাণে কাণে কথা কয়। আশার একটা দীপ্তি আছে। সেই দীপ্তিতে অতি শোকসন্তপ্ত, অতি দীনাবস্থাপন্ন, অতি সঙ্কট বিপদাপন্ন লোকেরও বদন প্রফুল্ল দেখায়। সেই দীপ্তি কিন্তু ক্ষণপ্রভার দীপ্তির ন্যায় ক্ষণস্থায়িনী। সেই নিমিত্তই আমি বলি, আশা চপলা।

একপঞ্চাশৎ প্রবাহ।

ইনি পতিব্রতা !!!

"বসেহ ভর্ত্তৃসহিতা মমাগমনকাঙ্ক্ষিণী—
দ্রক্ষসে ভর্ত্তৃসহিতা মমাভ্যাগমনং পুনঃ॥"

রামায়ণম্

পূর্ব্ব প্রবাহের উপসংহারে আমরা পুনঃপুন বলিয়াছি, আশা এই চপলার খেলা যে, কোন্ সময়ে কোন্ প্রকার হয়,

পারেন না। স্বর্গভূষণ তিন দিন পূর্ব্বে এক প্রকার অপমানিত হইয়া নৈরাশ্যকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। চতুর্থ দিবস প্রাতঃকালে তিনি স্বয়ং এক জন বস্ত্রবিক্রেতা মহাজনের দোকানে গমন করিয়া এক জোড়া বহুমূল্য সাল, একখানি রক্তবর্ণ রেশমী শাড়ী, এক-জোড়া নীলবর্ণ রেশমী কাঁচুলী, একখানি লাল ফুলদার পীতবর্ণ ওড়না, আর একটী সবুজবর্ণ পেসোয়াজ নির্ব্বাচন করিলেন। মহাজনকে উপদেশ দিলেন, "এই বসনগুলি একটী সুবর্ণাঙ্গীণ সুন্দর সৌখীন বাক্সে বন্ধ করিয়া রাজা বিরাটকেতুর ভবনে পাঠাইয়া দিও। রাণীর নিমিত্ত এই উপঢৌকন। কোথা হইতে আসিয়াছে, রাণী যদি জিজ্ঞাসা করেন, যে লোক লইয়া যাইবে, তাহাকে বলিয়া দিও, সে যেন আমার নাম করে।"

মহাজন সেই উপদেশমত কার্য্য করিতে অঙ্গীকার করিলেন। রাজ-কুমার স্বর্গভূষণ সেই নির্ব্বাচিত বসনগুলির উচিত মূল্য প্রদান করিয়া একটী কাঁচুলির মধ্যে একখানি ক্ষুদ্র পত্রিকা রাখিয়া দিলেন। মহাজন তাহা দেখিলেন কি না, সে দিকে লক্ষ্য রাখিলেন না। অন্যমনস্কভাবে গুন্‌গুন্ স্বরে যেন কি গান গাইতে গাইতে বিপণী হইতে বহির্গত হই-লেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া মনে মনে কি যেন ভাবিয়া দ্রুতপদে আবার ফিরিলেন। আবার সেই বিপণীমধ্যে প্রবেশ করিয়া মহাজনকে কহিলেন, "একটী কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি। যাহার হস্তে বসনগুলি প্রেরণ করিবে, সে যেন অবশ্য স্ত্রীলোক হয়। রাজার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া রাজরাণীর হস্তে বাক্স সমর্পণ করা অবশ্যই স্ত্রীলোকের কার্য্য। স্ত্রীলোক ;—বুঝিতে পারিয়াছ ?"

"বুঝাইয়া না দিলে বুঝিতে পারিতাম না, কিন্তু এখন বুঝিয়াছি।"

স্বর্গভূষণ বিদায় হইলেন। কেন কে জানে, হাসিতে হাসিতে বিদায় হইলেন। পথেও সে হাসি আছে। হাসির অর্থ কি, তাহা স্বর্গভূষণ ভিন্ন অন্য লোকে জানে না। অন্য লোক হইতে আমি কিছু পৃথক। সে হাসির অর্থ আমি জানি। হাসি কথা কহিতে পারে, স্বর্গভূষণের হাসি কথা কহিতেছে। চুপিচুপি বলিতেছে, এই বার দেখি দেখি, চতুরা জগৎকুমারী এবার কি খেলা খেলে। গ্রহণ করে কি ফিরাইয়া দেয়।

দি গ্রহণ করে, তবে জানিব, সে রাত্রের ছলনা ক্ষণস্থায়িনী। পত্র লিখিয়াছি, যদি গ্রহণ করে, সে পত্র পাঠ করিবে, পাঠ করিলেই উত্তর দিতে হইবে, সেই উত্তরেই আমি নিশ্চয় জানিব, সত্য কি কপটতা। সরলতা কি ছলনা।

হাসি এই সকল কথা কহিতেছে। স্বর্ণভূষণ গৃহে উপস্থিত হইলেন। চিন্তায় চিন্তায় দিন গেল। সন্ধ্যা আসিল, সন্ধ্যাকালেও স্বর্ণভূষণ আশা করিতেছেন, পত্রের উত্তর আসিবে। কাননের পাখীরা প্রভাতে উড়িয়া যায়, সন্ধ্যাকালে আপন আপন নীড়ে ফিরিয়া আইসে। স্বর্ণভূষণ দেখিলেন, সব পাখী ফিরিয়া আসিল, একটী পাখী আসিল না। সে পাখী সেই বস্ত্রবাহিকা। সন্ধ্যার পর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিলেন, চিন্তাদেবী অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহাকে ধ্যাননিমগ্ন করিয়া রাখিলেন। আশাসতী আসিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার চক্ষের সমীপে হাসিয়া হাসিয়া ক্রীড়া করিয়া গেলেন, কিন্তু পত্রবাহিকাও আসিল না, পত্রও আসিল না। রাত্রি ক্রমশঃ অধিক হইল। আশার ছলনে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত তিনি জাগিলেন। বলিতে যদি কোন বাধা না থাকে, তাহা হইলে আমরা অনায়াসে বলিতে পারি, সমস্ত রাত্রি জাগিলেন। আশা তাঁহাকে জাগাইয়া রাখিলেন। মায়াবিনী আশা! তুমি সব পার! যাহা হইবার নয়, তাহাও হইবে বলিয়া আশ্বাস দিয়া এই মায়াধামে তুমি মানুষকে বাঁচাইয়া রাখ। স্বর্ণভূষণ জানেন না, কিন্তু তোমার কুহক আমি ভাল জানি। স্বর্ণভূষণ জানেন না, তুমি কিরূপে মায়াখেলা খেলিয়া মানুষকে নাচাইয়া নাচাইয়া বেড়াও; কিন্তু মায়াবিনি! কিন্তু কুহকিনি! আমি তোমাকে ভাল চিনি। চিনি বলিয়াই বারবার বলিতেছি, আশা চপলা।

স্বর্ণভূষণ সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিলেন কেন? অকৃত্রিম বিশুদ্ধ প্রণয়ের অনুরোধে?—পাঠক মহাশয়! ইহা কি কখনও সম্ভব হইতে পারে? দুরাত্মা লম্পটের হৃদয়ে কি অকৃত্রিম প্রণয় বাস করে? অকৃত্রিম প্রণয়ের অবস্থানযোগ্য একটী পবিত্র স্থান আছে। কলঙ্কিনী কুলটা কিম্বা দুরাচার লম্পট সে পবিত্র স্থান কখনই দেখিতে পায় না। তাহাদের হৃদয় নাই! যাঁহাদের হৃদয় আছে, তাঁহারাই পবিত্র প্রণয়কে স্থান দিতে পারেন।

লম্পট স্বর্গভূষণ সে হৃদয় কোথায় পাইবে? স্বর্গভূষণের জাগরণ কেবল দুরভিসন্ধি সাধনের নিমিত্ত। প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার বাসনায়। সে বাসনা দুর্ব্বাসনা। পত্র আসিবে, পত্রে হয় ত রাণী জগৎকুমারী তাঁহাকে পুনরায় সাক্ষাৎ করিতে লিখিবেন, জগৎকুমারীকে বশে আনিয়া রাজা বিরাটকেতুকে হয় ত তিনি কাঁদাইতে পারিবেন, সেই আশাই তাঁহাব আশা। প্রতিশোধ, প্রতিহিংসা, দুরন্ত ধূর্ত্ত লোকের হৃদয়কে, অধম পাপী লোকের হৃদয়কে প্রচণ্ড হুতাশনে অষ্টপ্রহর দগ্ধ করে। সেই হুতাশনে দগ্ধ হইয়াই পাপিষ্ঠ স্বর্গভূষণের সারা রাত্রি জাগরণ। আশা! তোমার বেশ মায়া! এই মায়া তুমি পাপসংসারে নিত্য নিত্য দেখাও, নিত্য নিত্য খেলাও, ইহাই আমার বাসনা, ইহাই আমার প্রার্থনা। মা! মায়াময়ী মোহিনি! অভিমান করিও না, নিত্য নিত্য আমি তোমার নাম ধরিয়া ডাকিব, আশা চপলা।

এক মাস অতীত। স্বর্গভূষণের সহিত এখন আর সাক্ষাৎ করিবার প্রয়োজন হইতেছে না। রাজা বিবাটকেতু কি করিতেছেন, রাণী জগৎকুমারী কি করিতেছেন, গোপনভাবে একবার,—পাঠক মহাশয়! আসুন, গোপনভাবে একবার দেখিয়া আসি।

বিরাটকেতু আর জগৎকুমারী একত্র।—কোন্ দিন, তাহা আমাদের স্মরণ হয় না। স্মরণ হয় রাত্রি চারি দণ্ড। উভয়ে একত্র। রাণী একটু গম্ভীর হইয়া রাজাকে কহিতেছেন, "রাজা! তুমি আমারে বিবাহ করিয়াছ কিসেব জন্য? কেবল কাঁদাইবার জন্য? সংসারে দুঃখিনী কাঙ্গালিনী করিবার জন্য? ইহা ত ভাল নয়; ইহা ত ধর্ম্ম নয়;—গৃহাশ্রমে থাকিতে হইলে দাম্পত্যসুখে সুখী হওয়া সংসারী লোকের,—না রাজা! আমি তোমারে বুঝাইয়া দিতে পারিতেছি না;—আমার চিত্ত যেন উন্মত্ত হইতেছে। চক্ষের জল আমি যেন রাখিতে পারিতেছি না। তুমি আমার হৃদয়ের গুরু। তোমার এই গৃহ কমলার গৃহ।—মন দিয়া আমার কথা শুনিয়া যাও,—এই গৃহে অহরহ যদি আমি চক্ষের জল ফেলি, সংসারের অকল্যাণ হইবে। তোমার পুত্র নাই, অপ্সরাসুন্দরী দেশত্যাগিনী, নিরুদ্দেশ; ইহা ত অকল্যাণের একশেষ, ইহার উপর আরও অকল্যাণ

যদি আমি ঘটাই, তাহা আমার পক্ষে অভিসম্পাত ;—জগৎপিতা পরমেশ্বরের অভিসম্পাত !"

"তুমি আমাকে কি করিতে বল রাণী ?"

"আমি বলি, যেমন তোমার পদ, যেমন তোমার সম্ভ্রম, যেমন তোমার মর্য্যাদা, তুমি সেই রকমেই থাক। দেখিতে শুনিতে ভাল হইবে, আমিও সুখী হইব। ঘরের বাহির হইও না। ঘরের লক্ষ্মী ঘরে থাক। 'কেন রাজা আমারে আর কাঁদাও ?"

"ঘরেই ত আমি থাকি।—তবে কি জান মহিষি! নিরন্তর একস্থানে অবস্থান করিলে মনের চাঞ্চল্য দূর হয় না; চিত্ত সুস্থির থাকে না; সেই নিমিত্ত——"

"তাই বুঝি এই ?"—ম্লানমুখে একটু ব্যঙ্গহাসি হাসিয়া রাণী কহিলেন, "তাই বুঝি এই ? তুমি একজন রাজা, দেশের মান্য গণ্য পূজ্য বস্তু;—নিত্য সন্ধ্যাকালে জুয়ার আড্ডায় রাজ্যের বদ্‌মাস্ লোকের সঙ্গে মিশিয়া মিশিয়া বসিয়া থাক, ইহা কি তোমার পদের তোমার সম্ভ্রমের, তোমার মর্য্যাদার উপযুক্ত কার্য্য ? মহারাজ! গুরুদেব! ভাবিয়া দেখ দেখি, সে কথা শুনিতে আমার কতদূর লজ্জা ! পতিনিন্দা করিতে নাই, পতিনিন্দা শুনিতে নাই, কিন্তু আমি এখন করি কি ? তুমি ত লজ্জাসম্ভ্রমে জলাঞ্জলি দিয়াছ, কিন্তু আমারে দেখিয়া লোকে হাসে, টিট্‌কারি দেয়, ছলে ছলে কত কথা বলে, আমি চক্ষের জল চক্ষে নিবারণ করি।"

দরদর ধারে রাণীর চক্ষে জলধারা পড়িল, বসনাঞ্চলে তিনি তাহা মার্জ্জন করিলেন। বক্ষঃস্থল কম্পিত করিয়া নিশ্বাস পড়িতেছিল, তিনি তাহা সম্বরণ করিলেন। সে অশ্রু সম্বরণ করা সহজ কথা নহে। মার্জ্জন করিলেন, পুনর্ব্বার সেই পদ্মনেত্র হইতে নূতন অশ্রুপ্রবাহ প্রবাহিত হইল। বদনমণ্ডল আরক্তবর্ণ ধারণ করিল।

রাজা বিরাটকেতুর হৃদয় রক্তমাংসে গঠিত কি না, ব্যবহার দর্শনে লোকে তাহা স্থির করিতে পারিতেন না। সকলে হয় ত মনে করিতেন, পাষাণের হৃদয়। আমি তাহা মনে করিতাম না। নদনদীর জনক পাষাণ কখনও নির্জ্জল হইতে পারে না। আমি ভাবিতাম, লৌহময় হৃদয়।

কিন্তু সেই রাত্রে সেই লৌহহৃদয়ে দয়ানদীর কিঞ্চিৎ স্রোত বহিল। কাতরভাবে তিনি কহিলেন, "রাণি! তুমি কেঁদো না। আমি আর কোথাও যাইব না। তুমি আমার অযত্নলব্ধ রত্ন। তুমি আমার গৃহের লক্ষ্মী; আমার জীবনের সর্ব্বস্ব। তোমারে অনুতাপিনী করিয়া ক্ষণেকের জন্যও আমি যে শান্তি পাইব, এমন আশা আমি করি না।"

"তুমি বুঝিয়াছ? আমি চরিতার্থ হইলাম। আমার আর কিছু অনুরোধ নাই, কেবল একটী মাত্র কথা। রাজা যেন নিজে রাজসম্ভ্রম রক্ষা করিতে পারেন।"—থামিয়া থামিয়া এই কটী কথা উচ্চারণ করিয়া রাণী জগৎকুমারী যুগল হস্তে যুগল নেত্রের জলধারা মোচন করিলেন। অনেকক্ষণ মুখপানে চাহিয়া রাজা বিরাটকেতু কহিলেন, "রাণি! আর আমাকে কাতর করিও না, আর আমাকে লজ্জা দিও না। আমার আপনার পাপ আমি আপনিই বুঝিতে পারিয়াছি। আমার দুষ্কর্ম্মের যে কি পরিণাম, তাহা আমি জানিতে পারিয়াছি। তোমার বাক্যে আমার চৈতন্য জন্মিয়াছে। আমাদের মহাদেবী মহাদেবের বুকে দাঁড়াইয়া নৃত্য করেন; উলঙ্গিনী মুক্তকেশী। রক্তমাখা কলেবর, দৈত্যমুণ্ড কণ্ঠমালা, দৈত্যশিব বাম করে, দৈত্যহস্ত কটিতটে। তুমি মহিষি! সেইরূপে আমার বক্ষে নৃত্য করিতে পার? বাম হস্তে খড়্গ ধরিয়া দৈত্যদল নিপাত করিতে পার? আমি তোমার পদানত হইয়া থাকিব। কেমন?—কেমন? সাহস হয়?"

"কেন সাহস হইবে না মহারাজ? স্ত্রীজাতিমাত্রেই শক্তিরূপিণী। তোমার যদি বৈরী থাকে;—

সহিবে না সহিবে না সহিবে না প্রাণে।
খণ্ড খণ্ড করিব হে ভীষণ কৃপাণে॥
রাজা তুমি, তব শত্রু করিলে শ্রবণ।
কাতরে কাতর হয়ে কেঁদে উঠে মন॥
ফেটে যায় হৃদি মম, বিপক্ষের নামে।
থাকিতে পারি না যেন গৃহশান্তি ধামে॥

দেখাইয়া দিতে পার শত্রু আছে কারা ?
মম খড়্গে পরিত্রাণ নাহি পাবে তারা ॥
নাচিতে বলিছ তুমি মহাকালীরূপে।
নাচিবারে পারি আমি ভাবি'বিশ্বরূপে ॥
কিন্তু দেব ! তুমি মম জীবনের স্বামী।
নাচিতে তোমার বুকে নাহি পারি আমি ॥
পারিতেন মহালক্ষ্মী দেবী ভগবতী।
শুইতেন পদতলে দেব পশুপতি ॥
সে সব দেবের খেলা, আমরা মানবী।
দেয়ালেতে দেখি স্বধু দেবদেবী ছবি ॥
রক্তবীজ বিনাশিনী চামুণ্ডা অভয়া।
দাঁড়ায়ে ছিলেন বুকে অভয় হৃদয়া ॥
তথাপি, তথাপি রাজা, লজ্জায় লজ্জায়।
জিব কেটে মহামায়া ছিলেন তথায় ॥
আমি কি তেমন পারি ? তবু আমি পারি।
পতি অনুরতা যত পতিব্রতা নারী ॥"

"তুমি পার ?"

"হ্যাঁ !"

"তুমি আমার বুকে দাঁড়াইতে পার ?"

"দাসী আমি, পতির অনুমতি পাইলে দাসী কি যে করিতে পারে না, তাহা আমি জানি না। যদি তুমি গৃহবাসী হও, যদি তুমি আমারে একাকিনী রাখিয়া দুষ্ট লোকের সঙ্গে মিলিত হইতে না যাও, তাহা হইলে আমি যে কি করিতে না পারি, তোমারে এখন তাহা বলিব না। আচ্ছা রাজা ! ভগবতী ত শিবের বুকে নৃত্য করেন, তুমি যেন সংসারে একটা নূতন সৃষ্টি

দেখাও না।"—উত্তেজিতভাব অন্তরে রাখিয়া রাণী জগৎকুমারী কিঞ্চিৎ শীতল হইয়া কহিলেন, "তুমি কেন আমার হৃদয়ে নিত্য নিত্য প্রসন্নবদনে মহাবীররূপে নৃত্য কর না?"

"তাহা আমি পারিব না। তুমি মহাদেবী, তোমাকে পূজা করিতে হয়, তুমি পূজা করিবার সামগ্রী, তোমার হৃদয়ে পদার্পণ করিয়া,—পাতকী আমি,—মহাপাতকী হইতে পারিব না।"

"এ কি কথা মহারাজ? চরণের দাসী আমি;—আমারে মহাদেবী বলিয়া কেন অপরাধিনী কর?"

"আমি অপরাধী হইয়াছি। কন্যার কাছেও অপরাধী হইয়াছিলাম, তোমার কাছেও অপরাধী হইলাম। আমার অপ্সরাসুন্দরী কোথায় গেল? পাপ,—পাপ,—মহাপাপ। উঃ। এ পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত আছে রাণী? ঐ—ঐ— ঐ। ঐ বুঝি সেই পাপ আসিতেছে। উঃ! কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র! রক্তমাখা মুখ! করাল লোল রসনা। চক্ষে যেন আগুন জ্বলিতেছে! উঃ! রাণি! রাণি! রাণি! পাপের কি মূর্ত্তি আছে? ওঃ! আমাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে! রাক্ষসী। পাপ কি স্ত্রীজাতি? না,—তা না। রাক্ষসী! অপ্সরা! অপ্সরা! অপ্সরা! কোথায় মা তুই! আয় একবার, দেখিয়া যা, তোর অভাগা পিতা রাক্ষসীর গ্রাসে গ্রাসিত হয়। দেখিয়া যা!—গৃহে আলো কেন? দ্বারে গবাক্ষে ছিদ্র কেন? চক্ষের নিকটে বিরাট মূর্ত্তি দাঁড়াইয়া কেন? অপ্সরা! তুমি মা উহাকে তাড়াইয়া দাও!"

কথার ভাবার্থ বুঝিতে না পারিয়া কাতরা, চঞ্চলা, রাণী জগৎকুমারী ব্যগ্রভাবে কহিলেন, "রাজা! কাহার সঙ্গে কথা কহিতেছ? তোমার অপ্সরা এখানে কোথায়? আমি রহিয়াছি। আমি জগৎকুমারী, দ্বার গবাক্ষ অবরুদ্ধ রহিয়াছে, এখানে কে আসিতে পারে? প্রাণেশ্বর! মহারাজ! আ ম—আমি—আমি—আমি রহিয়াছি।—তোমার ভয় কি?"

রাজা ঘুমাইয়া পড়িলেন। নিদ্রা কি মূর্চ্ছা, রাণী তখন তাহা অনুভব করিতে পারিলেন না। নিশ্বাস বহিতেছিল, সেই লক্ষণে অনুমান করিলেন, নিদ্রা।

দুই দণ্ড অতীত। রাজা জাগরিত হইলেন। চাহিয়া দেখিলেন, অদূরে

ম্লানবদনে রাণী বসিয়া রহিয়াছেন। বিভ্রান্তমানসে রাণীকে সম্বোধন করিয়া উদ্ভ্রান্তচিত্ত বিরাটকেতু কহিতে লাগিলেন, "মহিষি! আহা! কি চমৎকার স্বপ্নই দেখিতেছিলাম। চতুর্ভুজা দেবীমূর্ত্তি! রাঙ্গা বস্ত্র পরিধান, মুখে অট্ট অট্ট হাস্য, শিরোদেশে রত্নমুকুট, চমৎকার রূপ। সেই দেবীর উভয় পার্শ্বে আর দুটী দেবী।—একটী আমার সেই,—ঈর্ষা করিও না,—একটী আমার সেই স্বর্গীয়া রাণী, আর একটী আমার সেই প্রাণাধিকা অপ্সরাসুন্দরী। তিনটী মূর্ত্তিই নিশ্চলা তিনটীই নির্ব্বাক্। আমি কথা কহিব মনে করিতেছিলাম, এমন সময় নিদ্রাভঙ্গ হইল. নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গেই স্বপ্ন ভঙ্গ। আহা! কে আমাকে জাগাইল? সে রূপ আর দেখিব না! রাণি! তুমি কি আমাকে জাগাইয়াছ?"

"না মহারাজ! আমি যেখানকার, সেইখানেই বসিয়া আছি। তুমি ক্লান্ত হইয়াছিলে, বিশ্রাম করিতেছ, বিরামদায়িনী নিদ্রা তোমারে শান্ত রাখিয়াছেন, আমি একটীও কথা কহি নাই, একটুও শব্দ করি নাই।"

"তবে আমার সুখস্বপ্ন ভঙ্গ হইবার কারণ?—স্বপ্ন আমাকে ছলনা করিয়া কোথায় পলাইয়া গেল? আর কি আসিবে না? আর কি দেখা দিবে না?"

"মহারাজ! স্বপ্নে কত কি দেখা যায়, তাহা কি সকল সময় মনে থাকে? স্বপ্ন কেবল মায়া মাত্র। মায়ার ছায়া মাত্র, স্বপ্ন ভঙ্গে আক্ষেপ করিবার কোন কারণ নাই।"

রাজা উত্তর করিলেন না। নিশাকর্ত্তব্য ভোজনাদি সমাপন করিয়া রাজা বিরাটকেতু শয়ন করিলেন। পুনরায় নিদ্রা আসিল, সে নিদ্রায় স্বপ্ন আসিল কি না, আমরা তাহা জানিলাম না। রাণীও শয়ন করিলেন। নিশা-সতী ক্ষণকাল পরে উষাসতীকে সংসাররঙ্গভূমে আসন প্রদান করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

প্রভাত আসিল। সপ্ত প্রভাত, সপ্ত রজনী, পর্য্যায়ক্রমে আগমন করিল, আর বিদায় হইল। এই সপ্তাহকাল রাজা বিরাটকেতু গৃহ হইতে বাহির হইলেন না। রাণী জগৎকুমারী একপ্রকার প্রবোধ প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু সে প্রবোধ সপ্তাহের পর আবার দূরে পলায়ন করিল। অষ্টম প্রদোষের

আগমনে রাজা পুনর্ব্বার পূর্ব্ব প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে প্রাসাদ হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইলেন। তদবধি নিত্য নিত্য পূর্ব্ব অভ্যাসমত বিচ্ছিন্নভাব। রাণী আবার ক্ষুণ্ণ হইলেন।

স্বর্গভূষণ কি করিতেছেন? একমাস অতীত হইয়া গিয়াছে, তিনি আর জগৎকুমারীর কোন সংবাদ প্রাপ্ত হন নাই। হতাশ হইয়াছেন, দুষ্প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার আর আশা নাই।

রাণী জগৎকুমারী কি করিতেছেন? একাকিনী গৃহে বসিয়া তিনি ভাবিতেছেন, কি করিলাম। কি করিতে কি হইল! রাজাকে বশীভূত করিতে পারিলাম না। ভাবিতেছেন, আর মধ্যে মধ্যে এক একটী মর্ম্মভেদী নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন। নারীজাতির চিত্ত নিতান্তই অস্থির। তিনি স্বর্গভূষণের প্রেরিত উপহারসামগ্রী ফিরাইয়া দিতে পারেন নাই। দুটী কারণ আছে। প্রথম কারণ, মনে মনে স্বর্গভূষণের প্রতি তাঁহার অনুরাগ জন্মিয়াছিল, দ্বিতীয় কারণ, বিলাসদ্রব্য তিনি বড় ভালবাসিতেন। এই দুই কারণেই সেই মূল্যবান্ উপঢৌকন তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। স্বর্গভূষণের প্রতি অনুরাগের পরিচয় পাঠক মহাশয়ের অবিদিত না থাকিতে পারে, রাণী তাঁহার কাছে হৃদয়ের দ্বার মুক্ত করিয়া সংসারের সকল কথাই কহিয়াছিলেন। অধিক কথা কি, পতির প্রতিও তাঁহার ঘৃণা জন্মিয়াছিল। সেই ঘৃণাবৃত্তিকে আরও প্রবলা করিবার নিমিত্ত স্বর্গভূষণ বৃদ্ধ রাজার অনেক অকারণ নিন্দা করিয়া রাণীকে উত্তেজিতা করিয়াছিলেন। সেই সকল কথা রাণীর মনে পড়িল। এই একমাসকাল একখানি পত্র লিখিবার নিমিত্ত তাঁহার অঙ্গুলী কম্পিত হইতেছিল। যতবার লেখনী ধারণ করিয়াছেন, কি এক সন্দেহ, কি এক শঙ্কা, তাঁহার মনে উদয় হইয়াছে, ততবারই তিনি কম্পান্বিত কলেবরে মসীমুখী লেখনীকে দূরে নিক্ষেপ করিয়াছেন। এক দিন তাঁহার মনে পড়িল, অতি অল্পদিনমধ্যে স্বর্গভূষণের বিদায়কালের অবসান হইবে, অতি অল্পদিন পরেই তিনি কর্ম্মস্থলে গমন করিবেন। পরিণয়সম্বন্ধানুরোধে তাঁহার জননী কহিয়াছিলেন, পুনরায় দীর্ঘকালের ছুটী লইও, কিম্বা, আমার ইচ্ছা,—কর্ম্ম পরিত্যাগ করিও। তাহাতে স্বর্গভূষণ উত্তর দিয়াছিলেন, লাল পোষাক

আমি বড় ভালবাসি, কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারিব না। সে কথা রাণী জগৎকুমারীর মনে হইল। তিনি জানিলেন, স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া অল্প দিন মধ্যেই স্বর্ণভূষণ লাহোর যাত্রা করিবেন। আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিলেন না, মনকে দৃঢ় করিয়া পত্র লিখিতে আরম্ভ করিলেন। পত্রে লিখিলেন কি ;———

"প্রিয় স্বর্ণভূষণ।

তোমার প্রেরিত উপহার বস্ত্রগুলি মহামূল্য জ্ঞানে আমি গ্রহণ করিয়াছি। তোমারে দর্শন করিবার নিমিত্ত আমার হৃদয় অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছে, নয়ন কাতর হইয়াছে। যদি দেখা দিবার কোন বিশেষ বাধা না থাকে, তাহা হইলে এই পত্র পাইবামাত্র সময় নিরূপণ করিয়া পত্রবাহিকার দ্বারা সমাচার প্রেরণ করিও। রাজকুমার! আমি তোমার জন্য পাগলিনী। সে রাত্রে আমি তোমারে যেরূপ উগ্রভাবে বিদায় করিয়াছি, অবস্থা স্মরণ করিয়া সে কথা মনে রাখিও না। তোমার দর্শনাকাঙ্ক্ষিণী———

শ্রীমতী জগৎকুমারী।"

পত্রখানি দুইবার পাঠ করিলেন, মোড়ক করিলেন, নামের মোহর তাহার উপর অঙ্কিত করিলেন, সারদাকে ডাকিলেন, সারদা আসিল, পত্রখানি তাহার হাতে দিলেন; কহিলেন, "সারদা! স্বর্ণভূষণের বাড়ীতে যাও। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, উত্তর দিও, রাজবাড়ীর কোন পরিচারিকার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি। রাজকুমার যখন একাকী থাকিবেন, সেই সময় তাঁহার হস্তে এই পত্র দিও। কাহারও সাক্ষাতে অথবা কাহারও হস্তে দিও না।"

সারদা চলিয়া গেল। রাণী অস্থির হইলেন। যতক্ষণ বিলম্ব হওয়া সম্ভব, ততক্ষণ পরে সারদা ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, রাত্রি এক প্রহরের সময় রাজপুত্র আসিবেন। রাণী যখন এই সংবাদ পাইলেন, তখন বেলা অনুমান তৃতীয় প্রহর। সেই সময় অবধি তিনি সংখ্যা গণনা করিতে লাগিলেন, মুহূর্ত্ত গণনা করিতে লাগিলেন, দণ্ড গণনা করিতে লাগিলেন। আশা তরঙ্গিত হৃদয়মধ্যে আশা-চপলা খেলা করিতে লাগিল।

সন্ধ্যা হইল। রাজা [illegible]স্থানে নিত্য নিত্য ক্রীড়া করিতে যান, সন্ধ্যা

বিদায় হইবার পরেই তিনি সেই প্রমোদস্থানে শুভযাত্রা করিলেন। রাণী ক্রমশই চঞ্চলা। আকাশপানে চাহিয়া রাত্রিকে কহিলেন, "নিশাদেবি! আজ মা তুমি এত মৃদু মৃদু চলিতেছ কেন? এই অভাগিনীকে যন্ত্রণা দিবার নিমিত্তই বুঝি? চিন্তানলে এই অবলার হৃদয়কে দগ্ধ করিবার নিমিত্তই বুঝি? যাও মা! একটু শীঘ্র যাও! শীঘ্র শীঘ্র এক প্রহরকে আসিতে বল।"

দিবারঙ্গী কি মানুষের কথা শুনে? মন্থরগতিতে রজনীদেবী চলিতে লাগিলেন। রাণী জগৎকুমারী একটী ক্ষুদ্র গৃহে প্রবেশ করিলেন। বক্ষে হস্তার্পণ করিয়া দর্পণে মুখ দেখিলেন। সুন্দর সুচিক্কণ কেশগুচ্ছ স্তরে স্তরে বিন্যস্ত করিয়া পৃষ্ঠদেশে একটী সুদীর্ঘ ভুজগাকার বেণী বিলম্বিত করিলেন। কুমার স্বর্গভূষণ যে পেসোয়াজ, যে কাঁচুলি, যে ওড়না উপহার দিয়াছিলেন, সেইগুলি পরিধান করিলেন। সর্ব্ব শরীর সুন্দর সাজে সাজিল। কিন্তু সে রাত্রে অধিক অলঙ্কার পরিধান করিলেন না। যুগল হস্তে দুইগাছি মণিময় কঙ্কন, কণ্ঠদেশে তিন নর মতির হার, আর দুই কর্ণে দুটী মণিময় নীলমণি দুল। কেবল এই পর্য্যন্ত। আর না।—এইরূপে সুসজ্জিত হইয়া বিলাসিনী রাণী জগৎকুমারী মখমল-মণ্ডিত একখানি পর্য্যঙ্কের উপর দর্পণহস্তে উপবেশন করিলেন। দর্পণে রূপের ছায়া দেখিতেছেন। কখনও হাসিতেছেন, কখনও মুখ ফুলাইতেছেন, কখনও বুক ফুলাইতেছেন, কখনও অল্প অল্প দন্তবিকাশ করিতেছেন। দন্তপংক্তির মধ্য হইতে রসনাকে এক একবার অল্প অল্প বাহির করিতেছেন, কখনও কখনও মস্তক সঞ্চালন করিয়া কুঞ্চিত কেশগুলি দুলাইতেছেন, নির্জ্জীব দর্পণ সজীব রাণীর রূপের সঙ্গে সমান খেলা খেলিতেছে।

রাত্রি এক প্রহর। স্বর্গভূষণ দর্শন দিলেন। জগৎকুমারীর সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল। দর্পণখানি শয্যার উপর রাখিয়া পর্য্যঙ্ক হইতে তিনি নীচে নামিলেন। ছোট ছোট অনেকগুলি আসন ছিল, একখানিতে স্বয়ং উপবেশন করিয়া আর একখানির দিকে অঙ্গুলী সঙ্কেতে স্বর্গভূষণকে উপবেশন করিতে কহিলেন।

স্বর্গভূষণ উপবেশন করিলেন। দৃষ্টি কেবল জগৎকুমারীর দিকে। রাণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্বর্গভূষণ! ভাল আছ?"

"ছিলাম না, এখন ভাল হইলাম।" হাস্য গোপন করিয়া স্বর্গভূষণ কহিলেন, "যতক্ষণ লোকে ভাল থাকে, ততক্ষণই সুখ। এখন ভাল হইলাম।"

হাস্য করিয়া রাণী কহিলেন, "স্বর্গভূষণ। এ প্রকার বাক্যের কৌশল তুমি কত দিন শিখিয়াছ?"

"আজ শিখিয়াছি। বহু দিন শিখি নাই, তোমার পত্র পাইয়া আজ শিখিয়াছি। তোমার প্রেমপূর্ণ পত্র আজ আমাকে বিপুল আনন্দ বিতরণ করিয়াছে।"

"সত্য? আমার সেই ক্ষুদ্র পত্রিকা তোমারে বিপুল আনন্দ বিতরণ করিতে সমর্থ হইয়াছে?"

"সমর্থ না হইলে আমি আসিব কেন? জগৎকুমারি। এক মাস দেখি নাই, এক মাসের পর আজ দেখিতেছি, যাহা ছিলে, তদপেক্ষা আরও সুন্দরী হইয়াছ।"

"তুমি দেখিতেছ?"

"না দেখিলে বলিতেছি কিরূপে? দেখ জগৎকুমারি। তোমার মত সুন্দরী এক বৃদ্ধ রাজার গৃহে বন্দিনী হইয়া থাকে, ইহা দেখিতে শুনিতে আমার বড় কষ্ট বোধ হয়। তোমার নিজের একটী মনোহর নিকুঞ্জপ্রাসাদ থাকে, তাহাই আমার বাসনা।"

"তবে কি তুমি আমারে সেইরূপে সুখী করিতে পার?"

"যদি তুমি সম্মত হও, তাহা হইলে আমি তোমাকে এমন নির্জ্জন প্রদেশে, এমন আনন্দপূর্ণ প্রাসাদে লইয়া যাইতে পারি, এমন ভক্তিভাবে পূজা করিতে পারি, যে স্থানে, যে পূজায় তুমি সংসারের সকল যন্ত্রণা ভুলিয়া যাইতে পার।"

"পার তুমি স্বর্গভূষণ? আমার জন্য লোকলজ্জা, লোকাপবাদভয়, তুমি পরিত্যাগ করিতে পার?"

আসন হইতে উঠিয়া রাণীর আসনের নিকটবর্ত্তী হইয়া, প্রেমামোদী স্বর্গভূষণ প্রণয়পূর্ণস্বরে কহিলেন, "হস্ত প্রদান কর। দেখ, আমি পারি কি না।"

অনুরাগপূর্ণ নয়নে রাজপুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া, রাণী একখানি

হস্ত বাড়াইয়া দিলেন ; সপ্রেমে সেই হস্ত চুম্বন করিয়া, দুরন্ত লম্পট, কৌতুকচ্ছলে হস্তস্থিত ওষ্ঠকে রাণীর ওষ্ঠের নিকটে লইয়া যাইতেছিলেন, পশ্চাতে মুখ ফিরাইয়া রাণী তাঁহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিলেন। একটু উগ্রস্বরে কহিলেন, "দেখ স্বর্গভূষণ ! তোমার যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই করিতে তুমি প্রবৃত্ত হও, এটী তোমার দুঃস্বভাব। এক পক্ষে অমার্জ্জনীয় অপরাধ।"

ক্রোধমিশ্রিত আক্ষেপে স্বর্গভূষণ কহিলেন "তবে আহ্বান করিয়াছিলে কেন ? এই রূপে অপমান করিবার নিমিত্ত আমাকে পত্র লেখা কেবল তোমার চাতুরীর পরিচয় মাত্র। লোকে ইহা শুনিলে কি বলিবে ? সত্য আমি পাগল নই, কিন্তু তুমি,—তুমি জগৎকুমারী, তুমি আমাকে পাগল বানাইয়া দিতেছ।"

"কি করিব স্বর্গভূষণ ! আমি বিবাহিতা নারী, আমি একজনের বিবাহিতা পত্নী, কিরূপে আমি সে বিশ্বাস নষ্ট করিতে পারি ? তোমারে আমি ভালবাসি যথার্থ, কিন্তু সে ভালবাসা কেবল মুখে মুখে ভিন্ন অন্য প্রকারে প্রদর্শন করিতে পারি, এমন সাধ্য আমার নাই, সেরূপ আশা করাও তোমার পক্ষে অসম্ভব। তবে হ্যাঁ,—তবে যদি আমি অবিবাহিতা থাকিতাম, তাহা হইলে,—আর সেই সময় যদি তুমি আমার সঙ্গে এইরূপে সাক্ষাৎ করিতে, তাহা হইলে, সত্য বলিতেছি, তোমারে ভিন্ন আর কাহারে আমি বরণ করিতাম না।"

কথার ভাবে সাহস প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গভূষণ উভয় হস্তে জগৎকুমারীর কণ্ঠ বেষ্টনপূর্ব্বক ওষ্ঠে ওষ্ঠ মিশাইয়া দিলেন।

তৎক্ষণাৎ গৃহদ্বার অনাবৃত, সারদা প্রবেশ করিল। রাণী জগৎকুমারী সাক্ষাৎ বিষধরীর মত গর্জ্জন করিয়া লম্পটের হাত ছাড়াইয়া দশ হস্ত দূরে দণ্ডায়মান হইলেন। সারদা অতি মুগ্ধস্বভাবা। মাথা নীচু করিয়া প্রবেশ করিয়াছিল, মাথা নীচু করিয়াই রাণীকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, "রাত্রে কিরূপ ভোজনের আয়োজন করিতে হইবে, তাহাই জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি।"

রাণী উত্তর দিলেন না। স্বর্গভূষণ অগ্রসর হইয়া সারদার হস্তে বিংশতি

মুদ্রা প্রদানপূর্ব্বক স্তোকবাক্যে কহিলেন, "দেখ সারদা! মহারাজ অত্যন্ত সন্দিগ্ধচিত্ত, তিনি যাহাতে এ সকল কথার কিছু জানিতে না পারেন,——"

স্বর্ণভূষণ এইরূপে কিঙ্করীকে উৎকোচ প্রদান করিয়া সাবধান করিতেছেন, রাণী সেই সময়ে সৌদামিনীসম চঞ্চলবেগে সে গৃহ হইতে বাহির হইয়া তীরগতিতে ত্রিতল কক্ষে প্রস্থান করিলেন। সারদাও সঙ্গে সঙ্গে গেল। হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া স্বর্ণভূষণ কত কি চিন্তা করিতে লাগিলেন; বাহির হইলেন না। একটী আধারের উপর সুরাপাত্র প্রস্তুত ছিল, ইচ্ছামত পান করিলেন। ভাবিলেন, রাণীর অভিমান হইয়াছে, লজ্জা হইয়াছে, সেই অভিমানকে আর লজ্জাকে বাতাসের কাছে পাঠাইয়া একটু পরেই আবার ফিরিয়া আসিবেন। এই আশার আশ্বাসে একখানি আসনে উপবিষ্ট হইয়া রাণীর প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, পুনর্ব্বার সুরাপাত্রের আদর করিলেন। তৃতীয় বার সেই পাত্রের সম্ভ্রম রক্ষা করিলেন, চতুর্থ বার মর্য্যাদা রক্ষা করিলেন, অবশেষে পঞ্চম পাত্রও সমাপ্ত হইল। মনে মনে আশা, জগৎকুমারী ফিরিয়া আসিবেন। সেই সময় ত্রিতল গৃহের দরজায় ঝঞ্চন্ ঝঞ্চন্ শব্দ হইল, আশা বাড়িয়া উঠিল। স্বর্ণভূষণ ভাবিলেন, রাণী নামিয়া আসিতেছেন, কিন্তু আশা-চপলা রাণীর পরিবর্ত্তে সারদাকে আনিয়া উপস্থিত করিল। ব্যস্তভাবে স্বর্ণভূষণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি সারদা! রাণী কি আসিতেছেন?"

"না রাজকুমার! তাঁহার বড় অসুখ, তিনি শয়ন করিলেন।"

"তবে তুমি কি সংবাদ আনিয়াছ?"

"সংবাদ বড় ভাল নয়। এই দণ্ডেই তোমারে এখান হইতে বিদায় করিয়া দিতে বলিলেন। তুমি আর থাকিও না; চলিয়া যাও! বোধ করি, কোন বিপদ আছে।"

"ও হরি! এই খানেই কি তবে সমস্তই শেষ হইয়া গেল! সারদা! তুমি আর একবার যাও! জিজ্ঞাসা করিয়া আইস, আবার আর কোন দিন দেখাসাক্ষাৎ হইতে পারে কি না?"

সারদা উত্তর করিল, "তাহা আমি পারিব না। দরজা বন্ধ হইয়াছে। আমার সেখানে যাইতে নিষেধ।"

উন্মত্তের ন্যায় বকিতে বকিতে বিত্রস্তপদে স্বর্গভূষণ গৃহ হইতে বাহির হইলেন। যতক্ষণ গৃহমধ্যে ছিলেন, ততক্ষণ যেন জ্ঞান ছিল না, পথে আসিয়া জ্ঞান হইল। আপনাআপনি কহিলেন, উঃ! এখন বুঝিলাম, এই জন্যই পত্র লিখিয়াছিল, এইরূপে আমাকে দণ্ড দিয়া দগ্ধ করিবার জন্যই তাহার এই ছলনা। আচ্ছা! আমিও এ বাজীর বাজী জানি। আচ্ছা! আমিও দেখিব, আমার অপমান করিয়া জগৎকুমারী কিরূপে নির্ব্বিঘ্নে রাজসংসারে বাস করিতে পারে!—না, সে কথা নয়, জগৎকুমারী আমাকে ভালবাসে। লক্ষণে আমি তাহা বেশ বুঝিয়াছি, আবার হয় ত পত্র লিখিবে, কিন্তু আমি যদি আর সেখানে যাই, তাহা হইলে আমার তুল্য গর্দ্দভ পৃথিবীতে আর কেহ খুঁজিয়া পাইবে না। আমি কখনই যাইব না। তাহা হইলেই তাহার উচিতমত দণ্ড হইবে। তবে যদি যাইতে হয়, তবে তাহার সাক্ষাতে যাহা বলিয়াছি, তাহাই করিব। বিরাটকেতুর গৃহে আর তাহাকে বাস করিতে দিব না। এই আমার প্রতিজ্ঞা, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।

নাটকের নটের ন্যায় এই প্রকার স্বগত বাক্য উচ্চারণ করিতে করিতে অধিক রাত্রে স্বর্গভূষণ আপনার পিতৃনিকেতনে উপস্থিত হইলেন। মনে মনে তাঁহার নিরন্তর চিন্তা, কি উপায়ে অভীষ্টসিদ্ধ হয়। দুষ্টলোকের দুষ্ট কল্পনা কত দূরে দূরে উড়িয়া বেড়ায়, কেহই প্রায় তাহা দেখিতে পায় না। গগনের বাতাসবিহারী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পক্ষীকুল যত উচ্চে উঠিয়া মেঘের কোলে লুকাইয়া যায়, কবিকল্পনা যত উচ্চে উঠিয়া অনন্ত বিশ্বসংসার নিরীক্ষণ করে, পাপবুদ্ধি দুষ্টলোকের কুৎসিত কল্পনা তদপেক্ষাও উচ্চ উচ্চ স্থানে নিঃশব্দে বিচরণ করে। কখনও জলে ডুবিয়া যায়, কখনও বাতাসে উড়িয়া যায়, কখনও আগুনে ভস্ম হয়। স্বর্গভূষণের কল্পনাও তদ্রূপ। পাপ কল্পনা সুসিদ্ধও হইল। পক্ষান্ত হইতে না হইতেই সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইয়া গেল, রাজা বিরাটকেতুর পত্নী শ্রীমতী রাণী জগৎকুমারী গৃহত্যাগিনী হইয়া রাজকুমার স্বর্গভূষণের সহিত পলায়ন করিয়াছেন! সকলের মুখেই ঐ কথা!—ইনিই পতিব্রতা!!!

দ্বিপঞ্চাশৎ প্রবাহ।

বিপক্ষ-দলন-কল্প।

"গম্যতামর্থ লাভায় ক্ষেমায় বিজয়ায় চ।
শত্রুপক্ষ বিনাশায় পুনরাগমনায় চ॥"

পঞ্চতন্ত্র।

ভুপেশচন্দ্র কোথায় গিয়াছেন, অপ্সরাসুন্দরী কোথায় গিয়াছেন, অনেক দিন সমাচার নাই। পাঠক মহাশয় হয় ত মনে করিতেছেন, শীঘ্র আর আমরা তাঁহাদিগকে অভিনয়ক্ষেত্রে আনয়ন করিব না। কিন্তু পাঠক মহাশয়! আপনি যতদূর উদ্বিগ্ন, আমরা আরও তাহা অপেক্ষা সমধিক উৎকণ্ঠিত। কলিযুগে সংসারে সাধুলোক যাঁহারা, তাঁহারা প্রায়ই সুখী হইতে পারেন না। এক দিনের জন্যও, এক দণ্ডের জন্যও, তাঁহারা চিন্তাশূন্য থাকেন না। চিন্তা দুই প্রকার আছে, স্বীকার করি; কিন্তু শুভ অশুভ দুই প্রকার চিন্তা ছাড়া সাধুর হৃদয়ে আর একপ্রকার চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহা সচরাচর সকলে অনুভব করিতে পারেন না। নিরীহ, নিষ্কলঙ্ক, নির্ব্বিরোধী যে সাধুপুরুষ, তিনি যেন সংসারে রাহুচক্রে ঘেরা। তিনি ভাবেন, দুষ্ট লোকেরা হয় ত বিনা কারণে তাঁহাকে কুচক্রে ফেলিয়া অকারণে যন্ত্রণা দিবে। সক্রেটীস্ এই ফাঁদে পড়িয়াছিলেন, প্রভু যিশুখ্রীষ্ট এই ফাঁদে পড়িয়াছিলেন; আমাদের ভূপেশচন্দ্রও সেই ফাঁদে পড়িয়াছেন। তিনি একাকী রহিয়াছেন, কিম্বা সতী-সুন্দরী অপ্সরাসুন্দরী নিকটে রহিয়াছেন, এত দিন তাহা প্রকাশ পায় নাই। বহু দিনের পর আজ এক অদ্ভুত দৃশ্য আমাদের সম্মুখে। অপ্সরাসুন্দরী একটী গৃহে শয্যার উপর অজ্ঞান হইয়া শুইয়া আছেন। একজন দাসী বাতাস করিতেছে, কিন্তু কোথায়, কোন্ স্থানে, পাঠক মহাশয় তাহা জানিতে পারিবেন না। বিপদ যাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে ফেরে, তাঁহারা যে

কখন কোথায় থাকেন, সকলে তাহা জানিতে পারে না। অপ্সরাসুন্দরী অজ্ঞান হইয়া রহিয়াছেন, গৃহের এক ধারে একটী বাতী জ্বলিতেছে, শব্দ মাত্র নাই। আমরা বলিতে ভুলিয়াছি, অপ্সরা শয্যায় শয়ন করেন নাই, শয্যাতলের গালিচার উপর অচেতন। দাসীর নাম বিরাজী।—বিরাজী যদিও বহুদিনের দাসী নয়, তথাপি তাহার মায়ামমতা বহুদিনের প্রতিপালিতা পরিচারিকা অপেক্ষা কিছু বেশী বেশী। কাঁদো কাঁদো মুখে বিরাজী বাতাস করিতেছে, ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া গৃহের চতুর্দ্দিকে চাহিতেছে; কেহ আসিয়া সাহায্য করুক, এই যেন তাহার ইচ্ছা; কিন্তু নিকটে কেহই নাই; গৃহে কেহই আসিতেছে না। ভয়ের উপর আরও ভয় আসিয়া বিরাজীকে বিহ্বল করিয়া দিতেছে। বাতীব আলো ক্রমে ক্রমে কমিয়া আসিতেছে। নির্ব্বাণ হয় হয়, ঠিক তেম্নি সময়ে একজন অস্ত্রধারী পুরুষ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। কে তিনি, এই দুঃসময়ে কেহ যদি এমন প্রশ্ন করেন, আর কেহ উত্তর করিবে না, আমরা উত্তর করিব, বীরবর রাজকুমার ভূপেশচন্দ্র।

গৃহে প্রবেশ করিয়াই সেই স্তিমিত দীপালোকে গৃহভূমি দর্শন করিয়া সবিস্ময়ে সকাতরে শীঘ্র শীঘ্র বাক্যে ভূপেশচন্দ্র আকুলকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "এ কি! আমার প্রাণপ্রতিমা হৃদয়লক্ষ্মী অপ্সরাসুন্দরী ধূলায় গড়াগড়ি কেন? অকস্মাৎ কোন্ ব্যাধি ইঁহারে আক্রমণ করিয়া ইঁহার চৈতন্য হরণ করিয়াছে? আমি আর স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারিতেছি না। বল্, বল, বিরাজি! শীঘ্র বল্, কি ঘটিয়াছে, কি হইয়াছে; শীঘ্র বল্। আমার রাজলক্ষ্মী এ অবস্থায় কেন ভূতলে গড়াগড়ি?"

বীজনীহস্তে স্নেহময়ী বিরাজী সেই ভূশায়িনী রাজলক্ষ্মীর নিকটেই বসিয়া ছিল, প্রভুকে প্রবেশ করিতে দেখিবামাত্র সেইরূপ সকাতরভাবে বীজনহস্তে এক পার্শে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ভূপেশচন্দ্রের বাক্যে কি উত্তর করিবে, ছল ছল চক্ষে অবনত মস্তকে তাহাই যেন চিন্তা করিতেছে। কথা কহিতেছে না।

ভূপেশচন্দ্র পুনঃপুন জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "বিরাজি! মৌন হইয়া রহিলি কেন? আমার স্বর্ণলতা ধূলায় গড়াগড়ি যাইতেছে, ইহা আর আমি দেখিতে পারি না। তুই—"

উত্তর দিবার আকাঙ্ক্ষায় বিশ্বাসিনী কিঙ্করী ধীর মৃদুপদে নিকটবর্ত্তিনী হইতেছিল, বিলম্ব সহ্য করিতে না পারিয়া ভূপেশচন্দ্র কাতরভাবে বিচঞ্চল পদবিক্ষেপে অপ্সরাসুন্দরীর গাত্রপার্শ্ববর্ত্তী হইয়া যেন সরোদনকণ্ঠে অস্ফুট স্বরে বারম্বার ডাকিতে লাগিলেন," অপ্সরা! অপ্সরা! প্রাণাধিকে! জীবনসুন্দরি! তোমার এ দশা কে করিল? আমার এমন সর্ব্বনাশ কে করিল? স্বর্ণপ্রতিমা ধূলার উপর! আর ত সহ্য হয় না! অপ্সরা! বল, কে তোমার অপমান করিয়াছে? কে তোমারে কটু বাক্য বলিয়াছে? কিসের নিমিত্ত এই অভিমান? গৌরবিণি! তুমি কি আমার উপর অভিমান করিয়া মৌনব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক ধূলাশয্যা আশ্রয় করিয়াছ? কথা কও, একবার চক্ষু উন্মীলন কর, আমি ত কোন অপরাধ করি নাই। মনোময়ি! জগৎসুন্দরি! আমারই জন্য তুমি পিতৃত্যাগিনী। রণে, বনে, অনলে, সাগরে, গিরিকন্দরে, আমি তোমারে রক্ষা করিব, এই ত আমার প্রতিজ্ঞা। তাহা কি তুমি জান না? জানিয়া শুনিয়া কেন নিরুত্তর হইয়া রহিয়াছ? চিত্তাবেগ আর আমি দমন করিতে পারিতেছি না। জীবিতেশ্বরি—বিবাহের অগ্রে আমি তোমারে জীবিতেশ্বরী বলিয়া সম্বোধন করিলাম,—চাহিয়া দেখ, আমার হস্তে আজ বিপক্ষবিনাশন ভীষণ অস্ত্র ঝক্ ঝক্ করিতেছে। যে কোন ব্যক্তি, কোন পাপাত্মা তোমার এই দুরবস্থার হেতু, একটী বার মাত্র তোমার মুখে তাহার নাম শুনিলেই আমি তাহার পাপমুণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়া শত হস্ত দূরে নিক্ষেপ করিব। এক জানু ভূমে পাতিয়া, এক জানু উত্থিত রাখিয়া সদর্পে সক্রোধে মহাবীর ভূপেশচন্দ্র কটিকোষ হইতে কালসর্পাকার ভীম অসি নিষ্কোষিত করিলেন।

ঠিক সেই অবসরে সভয়কম্পিত কলেবরে ভয়চকিতা কুরঙ্গিণীর ন্যায় কিঙ্করী বিরাজী সমীপবর্ত্তিনী হইয়া কম্পিতকণ্ঠে কহিল, "না রাজকুমার! ব্যক্তি নয়, পাপাত্মা না, কেহই না, একখানা পত্র।"—পত্রাধারের দিকে অঙ্গুলী সঙ্কেত করিয়া স্ত্রীজাতিসুলভ গ্রীবা ভঙ্গী করিয়া বিরাজী কহিল, "ঐখানে এক পত্র আছে, সেই পত্র পাঠ করিতে করিতেই ইহাঁর এই দশা। আমি ত রাজপুত্র লেখাপড়া জানি না, পত্রে কি লেখা আছে, তাহা ত আমি বলিতে পারি না, কিন্তু ঐ পত্রই কালসর্প।"

"বাতী উজ্জ্বল করিয়া দাও।" তাড়িতবেগে গাত্রোত্থান করিয়া ভূপেশচন্দ্র কহিলেন, "বাতী উজ্জ্বল করিয়া দাও।"

কিঙ্করী কম্পিতহস্তে বর্ত্তিকা উজ্জ্বল করিয়া দিয়া প্রভুর আজ্ঞা প্রতিপালন করিল। ভূপেশচন্দ্র পত্রাধারের নিকটে গিয়া আশুবিমুক্ত একখানি পত্রিকা গ্রহণ করিলেন। শিরোনামে লেখা ছিল, "রাজকুমারী অপ্সরাসুন্দরী।"

"ওঃ! আমি উপস্থিত থাকিতে অপ্সরাসুন্দরীর নামে পত্র? এ পত্র কাহার লেখা? ক্রোধে শিরোনাম ছিন্ন করিয়া ক্রোধপূর্ণ নয়নে পত্রখানি পাঠ করিলেন। পত্রের নির্ঘণ্ট এইরূপ ;--

"কুমারী অপ্সরাসুন্দরী!"

আমি তোমার পিতার পরমবন্ধু, ভূপেশচন্দ্রের জাতশত্রু। আমি যখন যখন যে যে স্থানে যে সকল কার্য্য করি, ভূপেশচন্দ্র জানে। তোমাকে পিঞ্জরে রাখিয়া দিনকতক ভূপেশচন্দ্র কোথায় গিয়াছিল, তাহা তুমি জান না। জুয়াচুরী অভিযোগে আমাকে ধরাইয়া দিয়া দশ বৎসরের জন্য আমাকে কারাগারে পাঠাইয়াছিল। কারাগার কি আমাকে আটক রাখিতে পারে? এক মাসের মধ্যেই আমি পলায়ন করিয়াছি। ভূপেশচন্দ্র, সেই পাপিষ্ঠ নরাধম, দুইবার কারাযন্ত্রণা ভোগ করিয়াছে, শত শত বেত্রাঘাত সহ্য করিয়াছে, আর কিছু জান? হাকিমেরা তাহাকে দাগী করিয়া ছাড়িয়াছেন। তাহার বাম বাহুর নিম্নভাগে দগ্ধলৌহমুদ্রিত "পলাতক বদ্মাস্।" তুমি তাহা জান না। সর্ব্বদা পোষাকে ঢাকা থাকে, দেখিতেও পাও না। পাপিষ্ঠ ভূপেশচন্দ্রের জীবন লইয়া যদি আমার জীবন যায়, তাহাতেও আমি ভয় করিব না। প্রাণে তাহাকে মারিবই মারিব। পরীক্ষা করিয়া দেখো, আমি যাহা বলিলাম, "পলাতক" দাগ তাহার বামবাহুতলে উজ্জ্বল হইয়া আছে কি না? শীঘ্রই দেখা হইবে।

আমি
ভূপেশচন্দ্রের
চিরজাত শত্রু
বিতাসু।"

পত্র পাঠ করিয়া ভূপেশচন্দ্র আত্মবিস্মৃত হইলেন। শিকারভ্রষ্ট করাল ব্যাঘ্র যেমন গর্জ্জন করে, সেইরূপ ভীষণ গর্জ্জন করিতে করিতে রাজকুমার ভূপেশচন্দ্র সেই ঘৃণিত পত্রখানা খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। অণু-পরমাণুমাত্র অবশিষ্ট রাখিয়া সদর্পে পদতলে পদাঘাতে বিদলন করিলেন। নেত্রদ্বয় হইতে যেন সতেজ বহ্নি ছুটিয়া ছুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। প্রসন্ন মুখমণ্ডল ঘোর রক্তবর্ণ। বিশ্বয়বিমোহিনী বিরাজী বিস্ময়বিকশিত নয়নে নিঃশব্দে সেই রোষারুণ মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

এত কাণ্ড হইতেছে, অপ্সরা তাহার কিছুই জানিতেছিলেন না। ভূপেশ-চন্দ্রের পদাঘাতশব্দে তাঁহার একটু একটু জ্ঞান হইল। ধীরে ধীরে চাহিয়া দেখিলেন, গৃহমধ্যে ভূপেশচন্দ্র। মূর্চ্ছা তখনও বিদায় হয় নাই, কিন্তু সাহস এক আশ্চর্য্য অস্ত্র। সেই সাহসাস্ত্র প্রদর্শন করিয়া অপ্সরাসুন্দরী মূর্চ্ছাকে তাড়াইয়া দিলেন। নিদ্রাভঙ্গ হইবার পর মানুষ যেমন নেত্রবিকাশ করিয়া উঠিয়া বসে, নেত্র একটু ঘোর ঘোর থাকে, কেশকলাপ যেমন রুক্ষ রুক্ষ দেখায়, সেইরূপ ভঙ্গীতে অপ্সরাসুন্দরী উঠিয়া বসিলেন। যেমন বসিলেন, তেমনি উঠিলেন। উঠিয়াই কম্পিতচরণে ভূপেশের পার্শ্ববর্ত্তিনী হইয়া বীরা-ঙ্গনাগর্ব্বে কহিতে লাগিলেন, "ভূপেশ! তুমি অকস্মাৎ এখানে কিরূপে আসিয়া উপস্থিত হইলে? পতঙ্গ নিধন করিতে কি তোমার মত বীরপুরুষের সাহায্য প্রয়োজন? তুমি কি সেই ঘৃণিত কুকুরের,—সেই নারকী দস্যুর কাল পত্র পাঠ করিয়াছ? আমি তাহা ইচ্ছা করি নাই। তুমি আসিবার পূর্ব্বেই জ্বলন্ত অনলে আমি সেই পত্র দগ্ধ করিতে পারিতাম, কিন্তু জানি না, কি ছলনায়, কি অপরাধে মায়াবিনী মূর্চ্ছা সহসা আমারে আক্রমণ করিয়া-ছিল। ভূপেশ! ভূপেশ! প্রাণসর্ব্বস্ব! আমারে ধর, আমি আবার যেন পড়িয়া যাইতেছি।"

ভূপেশচন্দ্র অপ্সরাসুন্দরীর হস্ত ধারণ করিলেন। নির্নিমেষ নয়নে ভূপেশচন্দ্রের নির্নিমেষ নয়ন নিরীক্ষণ করিয়া বিজয়া-বৈকালে ভগবতী-প্রতিমা যেমন হেলিয়া হেলিয়া জলে পড়িয়া যান, সেইরূপে অপ্সরাসুন্দরী পড়িয়া যাইতেছিলেন, অনুচিত কার্য্য জানিয়াও ধর্ম্মশীল ভূপেশচন্দ্র নিষ্কপট

বিশুদ্ধ ধর্ম্মভাবে অপ্সরাকে কোলে করিয়া বসিলেন। মধুরস্বরে কহিলেন, "অপ্সরা! ভয় পাইতেছ কেন? তোমার হৃদয় নিষ্কলঙ্ক সুপবিত্র। আমার হৃদয় হিমাচলের ন্যায় অটল। আমি শত্রুকে ক্ষমা করিতে জানি, কিন্তু স্বর্গসুন্দরি! এখন আমি দাগী বদ্‌মাস, তোমার ঐ পবিত্র প্রণয়ের প্রতিদান করিতে পারিলাম না। পবিত্র কুমারী তুমি, সাধ্বীসতীলক্ষ্মী, নির্ম্মলা পদ্মিনী তুমি, এখন কি আর আমি তোমার ঐ পবিত্র প্রণয়ের অধিকারী হইতে পারি?"

"কেন ভূপেশ! কেন আর জ্বলন্ত অনলে আহুতি দাও? কালভুজঙ্গ আমারে দংশন করিতেছিল, তুমি আসিয়া সেই কালসর্পকে বিনাশ করিয়াছ। শান্তিসলিলে,—অমৃতসলিলে আমার অভিষেক করিয়াছ। আর কেন তবে এখন—"

"কালসর্প বিনাশ করিয়াছি কই সতী? তুমি থাক। বিরাজি! আমার অপ্সরার যেন কোন অমঙ্গল না হয়, যেখানে সন্ধান পাইব, সেইখানে প্রবেশ করিয়াই আমি সেই কালসর্পকে বিনাশ করিব।"

তরবারি অর্দ্ধনিষ্কোষিত হইয়া ছিল, পূর্ণ নিষ্কোষ। অপ্সরাকে মৃদুসুস্থির ভাবে শয্যায় শয়ন করাইয়া অসি বিকম্পিত করিয়া ভূপেশচন্দ্র কহিলেন, "অপ্সরা!" এখন আমি বিদায় হইলাম, রজনী প্রভাতে সেই পাপিষ্ঠকে যদি আমি নিপাত না করি, তাহা হইলে নাম রাখিব না। সেই দুরাত্মা যদি জলধির অতল সলিলেও প্রবেশ করে, আমার প্রতিহিংসা বাড়বাগ্নিরাশিসম তেজে সেই স্থানে প্রবেশ করিয়া তাহাকে ধরিবে। সে দুরাত্মা যদি জনশূন্য নিবিড় কাননে লুকায়, আমার প্রতিহিংসা দাবাগ্নিরূপে প্রজ্জ্বলিত হইয়া সেখানেও তাহাকে আক্রমণ করিবে। রজনীর ঘোর অন্ধকার কদাচ তাহাকে লুকাইয়া রাখিতে পারিবে না। তুমি শান্ত হও, কোন ভয় নাই, কোন চিন্তা নাই। বিরাজি! আমার অপ্সরাকে তুমি রাত্রির মত রক্ষা কর।" ভীমস্বরে,—সান্ত্বনাস্বরে এই কথা বলিয়া উলঙ্গ অসিহস্তে ভূপেশচন্দ্র গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। অপ্সরাসুন্দরী কি বলিবেন বলিবেন মনে করিতেছিলেন, বলিবার সময় পাইলেন না।

সৈনিক শিবিরে প্রবেশ করিয়া ভূপেশচন্দ্র প্রত্যেক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা

করিতে লাগিলেন, "তোমরা কি কেহ দেখিয়াছ, বিতাস্থ নামে পরিচিত সেই দুরাচার নররাক্ষস এখানে কি আসিয়াছে?" সকলেই একে একে উত্তর করিল, "আমরা তাহাকে চিনি না। আজ রবিবার, তুমি কি আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়া সুরাপান করিবে?"

ভূপেশচন্দ্র কথা কহিলেন না।

একজন বলিল, "সুরাপান করিলে মনের ভ্রান্তি জন্মে। সকল কথাই যেন ভুলিয়া যাইতে হয়। আমরা দরিদ্র যোদ্ধা। প্রাণ পোষণের অনুরোধে প্রাণ দিতে আসিয়াছি, পরমেশ্বর জানেন, আমরা যখন পান করি, তখন কোন কথাই মনে থাকে না।"

ভূপেশচন্দ্র কহিলেন, "পান করিলে হৃদয় উত্তপ্ত হয়। জীবনের মায়া তখন কিছু কমিয়া আইসে। সৈনিক পুরুষের অবস্থা সেই প্রকারেই পরিণত হওয়া আমি ভাল মনে করি।"

"তুমি গাধা, তোমার যদি এমন বুদ্ধি না হইবে, তবে দুই তিনবার কারাগারে তাদৃশ অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিবে কি জন্য?"

"তোমাদের সঙ্গে বৃথা তর্কবিতর্ক করিতে আমার অভিলাষ হয় না। আমি যুদ্ধে প্রাণ দিতে পারি, কিন্তু এমন একটা রিপুর সহিত যুদ্ধ হইতেছে যে, সে রিপুর যুদ্ধে প্রাণ দিতে না পারিয়া তাহার প্রাণ সংহার করিতে আমার সংকল্প হয়। আমি মানুষ, তথাপি আমার যেন মানুষের রক্ত পানের পিপাসা হইতেছে। তোমরা কি কেহ বিতাস্থকে চেনো না?"

একজন কহিল, "চিনিবে না কেন? সকলেই চেনে। কিন্তু সে লোক গুরুতর অপরাধ করিয়া কয়েদ হইয়াছিল, কারাগার হইতে পলায়ন করিয়াছে। তাহার নাম করিয়া এখানে যদি আমরা কথা কই, আমরাই বিপদে পড়িব। সেই জন্যই সকলে বলিতেছে, চিনি না। আমিও বলিতেছি, চিনি না।"—এই কথাগুলি অতি মৃদুস্বরে উচ্চারিত হইল।

ভূপেশচন্দ্র কহিলেন, "সে এখন কোথায় আছে, বলিতে পার?" সকলে সকলের মুখপানে চাহিল। তাহাদের মধ্যে একজন ধীরে ধীরে আসন হইতে উত্থিত হইয়া ভূপেশকে কহিল, "আমার সঙ্গে এসো।"

ভূপেশচন্দ্র গাত্রোত্থান করিলেন। সেই লোকের সঙ্গে একটু অন্তরে

সরিয়া গেলেন। অন্য লোকেরা দৃষ্টির বহির্ভূত হইল; তথাপি চতুর্দ্দিকে চাহিয়া বিশেষরূপে সতর্ক হইয়া সেই লোক চুপি চুপি বলিল, "তোমার টাকা আছে ?"

"এ কথায় এ কথা কেন ?"

"এই কথার ঠিক উত্তর পাইলে আমি সন্ধান বলিয়া দিতে পারি।"

ক্রোধের সহিত উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়া উত্তেজিতস্বরে ভূপেশচন্দ্র কহিলেন, "তুমি কিছু চাও ?"

"নিতান্ত প্রয়োজন।"

"আচ্ছা। প্রয়োজন পূর্ণ হইবে, বল দেখি, সে লোকটা কোথায় ?"

"আগে দাও।"

"তুমি ত আমাকে জান। যাহা অঙ্গীকার করি, তাহা লঙ্ঘন হয় না।"

"জানি বটে, কিন্তু এমন সঙ্কট সময়ে তুমি থাক কি সেই থাকে, তাহাতেই মূলে সন্দেহ। সে যাহা করিয়াছে, তাহা জানি। তোমার বীরবেশ। তুমি তাহাকে যে জন্য অন্বেষণ করিতেছ, তাহাও বুঝিতেছি। চক্ষে চক্ষে সাক্ষাৎ হইলে পরিণাম কি হইবে, তাহা জানিতে পারিতেছি না। সেই জন্যই—সেই জন্যই—তা—তা—"

হাস্য করিয়া ভূপেশচন্দ্র কহিলেন, "তুমি বুঝি তাহাই মনে করিতেছ ? সেই ধূর্ত্ত শৃগাল আমাকে মারিয়া ফেলিবে, তাহাই বুঝি তুমি ভাবিতেছ ? আচ্ছা! অগ্রে উৎকোচ লইতে ইচ্ছা কর, গ্রহণ করিতে পার। কত তোমার আকাঙ্ক্ষা ?"

"সহস্র মুদ্রা।"

"মুদ্রা লইয়া কথা হইতেছে না। সে দুরাত্মা কোথায় আছে, সন্ধান বলিয়া দাও, একবার আমি সেই পাপমূর্ত্তি নয়নে নিরীক্ষণ করি, তাহার পর যাহা করিতে হয়, আমি বিবেচনা করিয়া তাহার মীমাংসা করিব।"

"তোমার কথায় আমার বিশ্বাস হয় না। যাহা অঙ্গীকার করিতেছ, অগ্রে তাহা অর্পণ কর।"

"এত অবিশ্বাস যাহার মনে, সে ব্যক্তি যে সত্য কথা বলে, সত্য প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে জানে, তাহা আমার মনে লয় না। আচ্ছা। পুরস্কার

গ্রহণ কর, দেখাইয়া দাও। দেখাইয়া দিতে সাহস না কর, সন্ধান বলিয়া দাও।” অৰ্দ্ধ নিষ্কোষিত অসির মূলদেশে হস্তার্পণ করিয়া চপল, চঞ্চল, বিদ্যুতস্বরে ভূপেশচন্দ্র কহিলেন, “সন্ধান বলিয়া দাও। আমার এই তীক্ষ্ণ অসি কোন বিশ্বাসঘাতককে ক্ষমা কবিবে না।”

গোপনে গোপনে পুরস্কার প্রদত্ত হইল। যে লোক পুরস্কারের লোভী, সে একটু সঙ্কুচিত হইয়া চুপি চুপি কহিল, “সর্ব্বানন্দ মহলানবিস, জহরাতের দোকান, সেই দোকানে—”

আর একজন লোক প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়া থতমত খাইয়া গুপ্তসন্ধানবক্তা অৰ্দ্ধসমাপ্ত কথায় নীরব হইয়া, যেন কিছুই জানে না, সেই ভাবের ভাণ করিয়া মৌন অবলম্বন করিল।

নূতন প্রবেশকারী হাস্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “তোমরা ভাই এখানে দুজনে নির্জ্জনে কেন?”

“অনেক দিনের পর দেখা হইয়াছে, মনের কথা কহিবার জন্য।”

“তোমাদের মনের কথা শুনিবার নিমিত্ত মনে মনে আমার বড় অভিলাষ। আমি কি তাহা শুনিতে পাই না?”

“এখন সরিয়া যাও, সময় আসিবে, শুনিতে পাইবে।”

লোকটা অস্ফুটগৰ্জ্জনে কি কথা বলিতে বলিতে একটু অন্তর হইয়া গেল, ভূপেশচন্দ্র দূরদৃষ্টিতে তাহার প্রস্থান দর্শন করিয়া সঙ্গী লোককে কহিলেন, “নির্জ্জন। এখন আর ভয় নাই, বাধা নাই, অন্য লোকের শুনিবার সম্ভাবনা নাই, বল দেখি, সেই পাপাশয় নরকুলকলঙ্ক বিতাস্থ এখন কোথায়?”

“কারাগার হইতে পলায়ন করিয়াছে। ফকির সাজিয়া এক বনের ধারে পীরের মস্‌জিদে লুকাইয়া আছে, চিনিতে পারা যায় না। অতিথিসেবা করে, পশুকুলকে পানীয় জল দেয়, ভিখারী নিকটে গেলে আদর করিয়া ভিক্ষা দেয়, পরম ধাৰ্ম্মিক! দীর্ঘ দীর্ঘ দাড়ী হইয়াছে। যেন নূতন জগতের নূতন লোক। আমি তাহাকে অনেক দিন দেখিয়াছি, কিন্তু এখন দেখিলে শীঘ্র চিনিতে পারি না।”

“স্থানটী আমাকে নিশ্চয় করিয়া বলিয়া দাও।”

"এক নদীতীরে নিবিড় জঙ্গল, সারি সারি অনেক বৃক্ষ, বৃক্ষের কাছে কাছে অনেক লতা। মাঝখানে একটী ঘর, সেই ঘরে সেই লোক থাকে! সন্ন্যাসী বলিয়া বনচারী লোকে তাহাকে সমাদর করে। ভিক্ষা দেয়, পূজা করে।"

"নদীতীরের সে স্থান আমি চিনিতে পারিব না। তুমি যদি লইয়া যাও, দেখাইয়া দাও,—তাহা—"

"আমি তাহা পারিব না। আমাকে দেখিলেই চিনিতে পারিবে।

"যাহাতে চিনিতে না পারে, আমি যদি তাহার কোন উপায় করিতে পারি?"

"উপায় করিতে পার? তোমার জন্য, আমার জন্য, যদি কোন বিশেষ উপায় করিতে পার, তাহা হইলে এখনি—"

"সে লোকের যখন উপায় হইয়াছে, তখন আমাদের কি কোন উপায় হইতে পারে না? আমরাও ছদ্মবেশ ধারণ করিব।"

পরামর্শ স্থির হইল। এক বহুরূপীর আবাসে গিয়া ভূপেশচন্দ্র ঋষিবেশ ধারণ করিলেন। আর তাঁহার সেই সঙ্গী লোকও যোগীবেশ ধারণ করিল। কাহার সাধ্য সে বেশকে ছদ্মবেশ বলিয়া চিনিয়া লইতে পারে?

যে পথে যাইতে হয়, সে পথে নিবিড় বন।—বনে বনে অনেক দূর যাইয়া উভয়ে দেখিলেন, আকাশে চন্দ্রোদয় হইয়াছে। কাননের বৃক্ষপত্র ভেদ করিয়া ভগবান চন্দ্রদেব বনস্থলে শীতল কর বর্ষণ করিতেছেন। বনে আলো আছে, লোক নাই; কিঞ্চিৎ দূরে যেন মানুষের মৃদু কণ্ঠের অস্পষ্ট গোঁগোঁশব্দ শ্রুতিগোচর হইল। ভূপেশচন্দ্র,—ছদ্মবেশী ভূপেশচন্দ্র সেই ছদ্মবেশী বার্ত্তাবহের সঙ্গে শঙ্কিত মনে সেই দিকে অগ্রসর হইলেন। দেখিলেন, একটা লোক পদতল হইতে গলদেশ পর্য্যন্ত স্তবকে স্তবকে ভুজঙ্গবেষ্টিত হইয়া, অন্তিম নিশ্বাসে অর্দ্ধোক্তিতে অস্পষ্ট বাক্যে কাতরতা প্রকাশ করিতেছে। সাপটা তাহার মস্তকের কাছে ফণা তুলিয়া দংশন করিবার উপক্রম করিতেছে, পদতল হইতে জড়াইয়া জড়াইয়া সর্ব্বশরীর পেষণ করিতেছে। কিন্তু আশ্চর্য্য! দংশন করিতেছে না। লোক ছদ্মবেশী। যদিও চন্দ্রের আলো সেই বনস্থলীমধ্যে পূর্ণদীপ্তি বিকাশ করিতে পারিতেছিল না, লোকটা কে, যদিও ঠিক দেখা যাইতেছিল না, কিন্তু ভূপেশচন্দ্র

দেখিলেন, চন্দ্র তাঁহাকে দূরে দেখাইয়া দিলেন, একটা মানুষ, একটা সর্প। মানুষের প্রতি আমাদের এই আখ্যায়িকার প্রধান নায়ক ভূপেশচন্দ্রের বড় দয়া। যে কেন হউক না, মিত্র হউক, শত্রু হউক, যে কেন হউক না, যথাশক্তি তাহাকে রক্ষা করা তাঁহার পার্থিব জীবনের চিরসংকল্প। ক্ষত্রিয়-কুমার,—ক্ষত্রিয়কুমার কখনও অস্ত্রশূন্য থাকেন না। বিশেষতঃ সেই রাত্রে।—বিবেচনাপরিশূন্য হইয়া এক আঘাতে তিনি সেই কালসর্পের,—বৈরিদেহবেষ্টিত কালসর্পের ফণা কাটিয়া দিলেন। কি হইতেছিল, তাহা তিনি জানিতেছিলেন না। লোকটা ধুম করিয়া ভূমে পড়িল। সর্ব্বশরীর সর্পবিষে জর্জ্জরিত। নিকটে গিয়া ভূপেশচন্দ্র কহিলেন, "তুমি বুঝি সন্ন্যাসী? বিতাসু! কতদিন তুমি সন্ন্যাসী হইয়াছ? আমাকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত তোমার সংকল্প। কিন্তু কেন জান? অনেক সময়ে অনেক প্রকারে আমি তোমার উপকার করিয়াছি, জীবন ধারণের যথা-সম্বল পর্য্যন্ত—যথাসর্ব্বস্ব পর্য্যন্ত তোমাকে আমি সমর্পণ করিয়াছি। কিন্তু বিতাসু! ওঃ! তোমার বিশ্বাসঘাতকতা তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া যায় না। সাপের বিষ কি তোমাকে বেশী যন্ত্রণা দিতেছে? বিতাসু! বিশ্বাসঘাতকতা এক বিষ। সে বিষের নিকটে সাপের বিষ বড় হইতে পারে না। সাপের দংশন হইতে আমি তোমাকে নিস্তার করিয়াছি। তুমি হয় ত মনে করিতেছ, বৈরনির্য্যাতনের অভিলাষে এই রাত্রিকালে আমি এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। অবশ্য, পাপের প্রতিফল আছে। সে প্রতিফল আমারই হস্তে থাকিতে পারে, কিন্তু এমন অবস্থায় পরমশত্রুর প্রতিও দয়া হয়।" এই কথা বলিয়া স্বহস্তে তাহার শরীরের সর্পবন্ধন মোচন করিয়া দিলেন। নাগপাশমুক্ত হইয়া কূটবুদ্ধি বিতাসু ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিল। তখন তাহার জ্ঞান যায় নাই। ধীরে ধীরে কহিল, "তুমি কে? আমার পাপের প্রতিফল তোমার হস্তে, এ কথা কেন বলিতেছ? আমার পাপ তোমার কি অপকার করিয়াছে?"

ঈষৎ হাস্য করিয়া ভূপেশচন্দ্র কহিলেন, "বিতাসু! তুমি আমাকে চিনিতে পারিতেছ না? যাহাকে তুমি প্রথমে একবার বন্ধুভাবে গ্রহণ করিয়া যাহার হৃদয়ের বন্ধুত্ব আকর্ষণ করিয়াছিলে, সেই আমি। কৌশলজাল

বিস্তার করিয়া যাহাকে তুমি দুরাশয় নিরেশ্বরের হস্তে অর্পণ করিয়াছিলে, সেই আমি। বার বার প্রতারণা করিয়া তুমি যাহার বহুশ্রমার্জ্জিত অর্থ অপহরণ করিয়াছ, সেই আমি। দুইবার যাহাকে তুমি বিশ্বাসের বিনিময়ে বিপক্ষের হস্তে ধরাইয়া দিয়াছ, সেই আমি।—আমি ভূপেশচন্দ্র।"

মিট্ মিট্ করিয়া ভূপেশের মুখের দিকে চাহিয়া বিষজর্জ্জরিত বিতাস্ক একটু যেন কাঁপিয়া উঠিল। কৃত্রিম কাতরবচনে কহিল, "ভূপেশচন্দ্র! তুমি আসিয়াছ?—আমি অপরাধ করিয়াছি; তুমি তাহা বিস্মৃত হইয়া এই আসন্নমৃত্যু হইতে আমাকে রক্ষা করিতে আসিয়াছ; তুমি সাধুপুরুষ, আমি তোমাকে নমস্কার করি। আমি ব্রহ্মচারী হইয়াছি; সংসারের সমুদয় বন্ধন আমি খুলিয়া ফেলিয়াছি; আমার মনে এখন আর বিন্দুমাত্র কপটতা নাই; পাপকর্ম্মে এখন আর আমার মন নাই। পরাৎপর পরমেশ্বরে মন সমর্পণ করিয়াছি; পরমে—"

"থাক্ থাক্, আর না।—তোর কলুষিত রসনা সেই পবিত্র নাম উচ্চারণ করিবার অধিকারী নয়। তুই আমার বিস্তর অপকার করিয়াছিস্, যদি কিছু কারণ থাকিত, তাহা হইলে আমি কোন কথা বলিতাম না, কিন্তু অকারণে পদে পদে তুই আমাকে মহা মহা বিপদের মুখে নিক্ষেপ করিয়াছিলি। অনন্ত জীবন থাকিলেও আমার হস্তে তোর নিস্তার থাকিত না, কিন্তু এখন তুই বিপদাপন্ন। সাধ্যমত চেষ্টা করিয়া দেখিব, যদি আর কিছু দিন তোর পাপ-নিশ্বাসকে তোর পাপ নাসিকায় রাখিয়া, আর কিছুদিন পৃথিবীর বায়ুকে কলুষিত করাইতে পারি।" ব্যস্তভাবে ঘন ঘন এই কটী কথা বলিয়া ভূপেশচন্দ্র সেই ধরাশায়ী পাপীকে ধরাধরি করিয়া ধরাতল হইতে তুলিয়া বসাইলেন। তাঁহার সঙ্গে যে লোক ছিল, তাহার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই কপট মায়াবী এখন যে গৃহে বাস করে, তুমি কি সেই ঠিকানা জান?"

সঙ্গীলোক উত্তর করিল, "জানি।"

ভূপেশচন্দ্র কহিলেন, "তবে আর বিলম্ব নয়, ধর, চল, ইহাকে সেই স্থানে লইয়া যাই।"

উভয়ে বিতাস্কের উচ্চ হস্ত ধারণ করিয়া তাহার আবাসকুটীরে লইয়া

গেলেন। নিভৃত স্থান, নিকটে লোকালয় নাই। "আসিতেছি, তুমি কিয়ৎক্ষণ ইহার নিকট থাক।" সঙ্গীকে এইরূপ উপদেশ দিয়া ভূপেশচন্দ্র একাকী সেই বনভূমে বহির্গত হইলেন। লোকালয়ে প্রবেশ করিয়া এক জন বিষ-চিকিৎসককে সন্ধান করিয়া, তাহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া সেই রাত্রে সেই কুটীরমধ্যে পুনরায় প্রবেশ করিলেন। যথাসাধ্য যত্ন করিয়া চিকিৎসক সেই রাত্রের সম্ভবমত কয়েক প্রকার চিকিৎসা করিলেন। সমস্ত রজনী চিকিৎসা হইল। সঙ্গীসহ ভূপেশচন্দ্র সমস্ত রজনী সেই স্থানে রহিলেন। প্রভাতে চিকিৎসকের অনুরোধে অবধারিত হইল, বনস্থল হইতে রোগীকে লোকালয়ে লইয়া যাওয়া কর্ত্তব্য। যখনকার সেই কথা, তখন বিতাসু একপ্রকার সংজ্ঞাশূন্য। ভূপেশচন্দ্রের আদেশে তাঁহার সেই সঙ্গীলোক পল্লীমধ্যে প্রবেশ করিয়া একখানি শিবিকা আনয়ন করিল। সেইরূপ অবস্থায় বিতাসুকে পল্লীমধ্যে আনয়ন করা হইল। চিকিৎসককে সম্বোধন করিয়া ভূপেশচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "অবস্থা কিরূপ বিবেচনা করেন?"

"এখনও আশা আছে। লোকালয়ে প্রয়োজনমত ঔষধ প্রাপ্ত হওয়া যাইবে, চেষ্টার ত্রুটী হইবে না, তবে পরমেশ্বরের হাত।"

ভূপেশচন্দ্র কহিলেন, "সমস্ত খরচপত্র আমি দিব, আপনি একজন পরি-চারক নিযুক্ত করিবেন, যদি ইহার জীবন রক্ষা হয়, আপনি উপযুক্ত পুরস্কার প্রাপ্ত হইবেন। আমি মধ্যে মধ্যে আসিয়া দেখিয়া যাইব।"

এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া সঙ্গীসহ ভূপেশচন্দ্র তথা হইতে তখন প্রস্থান করিলেন। পথে যাইতে যাইতে সহচরকে কহিলেন, "বিতাসু বাঁচিবে না। গরলে উহার সর্ব্বশরীর পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। সাধারণ লোকেও বলে, পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে। শাস্ত্রকারেরাও বলেন, পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে। আধুনিক ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা কাহন কাহন কড়ি উৎ-সর্গ করিবার ব্যবস্থা দেন, কিন্তু আশা-চপলা সেরূপ ব্যবস্থা দিতে পারেন না। কার্য্যের দ্বারাই প্রতিফল হইয়া থাকে। দুরন্ত বিতাসু। আমি উহাকে নিধন করিবার বাসনায় বহির্গত হইয়াছিলাম, একপ্রকার হইল ভাল, ষাঁড়ের শত্রু বাঘে মারিয়াছে!"

ত্রিপঞ্চাশৎ প্রবাহ।

স্বর্গভূষণ!—রঘুনন্দন।

"To become the laughing stock of his brother officers * * * and that was to escape from home; his heart was still full of bitterness towards all mankind."

Reynolds.

এক মাস অতীত। স্বর্গভূষণের বিদায়কাল অবসান হইয়াছে। তিনি পুনরায় কর্ম্মস্থলে উপস্থিত হইয়াছেন। কর্ম্মস্থল তথন পঞ্জাবে। কার্য্যে পুনঃপ্রবৃত্ত হইয়াছেন সত্য, কিন্তু মন সর্ব্বদাই অপ্রসন্ন;—সর্ব্বদাই চিন্তা-নিমগ্ন।—মানবজাতির উপরে তাঁহার একপ্রকার বিকৃত ভাব জন্মিতেছে। রাজকুমারী আদরিণীর সহিত তাঁহার পরিণয়সম্বন্ধ হইতেছিল। প্রতিবেশী-মণ্ডলী তাহা শ্রবণ করিয়াছিলেন। শেষে রাজকন্যা আদরিণী ইচ্ছা করিয়া ইচ্ছাবশে ঘৃণা করিয়া, তাঁহাকে অগ্রাহ্য করিয়াছেন। ইহাও সকলে শুনিয়াছেন। স্বর্গভূষণ চিরদিন মর্য্যাদাগর্ব্বে ঘোর অভিমানী। তিনি আপনার মান আপনার মুখেই বাড়াইতেন, লোকের মুখেও নিরন্তর চাটুবাদ শ্রবণ করিতে ভালবাসিতেন। এতাদৃশ অভিমানী অহঙ্কৃত লোকের পক্ষে ইহা কি সামান্য অপমান? একজন অবলা তাহাকে ঘৃণা করিয়া অগ্রাহ্য করিল। দিবা-রাত্রি তিনি কেবল তাহাই ভাবেন,—কেবল তাহাই নহে, আরও আছে।—অপরের বিবাহিতা পত্নীকে প্রলোভনে ভুলাইয়া গৃহের বাহির করা অপরাধে বিচারালয়ে তাঁহার নামে অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে। সেনাদলের সকলে এই দুটী কথা যখন জানিতে পারিবে, তখন উপহাসের তুফানে তিনি ভাসিয়া যাইবেন, সর্ব্বদা এই ভয় করেন। মনে যদি এই ভয় আছে, তবে পুনর্ব্বার সেনাদলে প্রবেশ করিলেন কি জন্য?—জন্য আছে।—দুই দিকেই দায়। বাটীতে পরিবারেরা সর্ব্বক্ষণ দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকেন। সুন্দরী

আদরিণীর সহিত বিবাহ হইল না, এই কারণে তাঁহার মাতাপিতা অনু-তাপী। তাঁহার পিসীমা অবসর পাইলেই মাথা নাড়িয়া বিদ্রূপবাক্য উচ্চারণ করেন, বিরাটকেতুর রাণীর নাম উল্লেখ করিয়া রঙ্গপ্রিয় প্রতি-বেশীরা তাঁহার মুখের আছে হাত নাড়িয়া হাসিয়া যায়। এই সকল কারণে তিনি বিদেশে আসিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবেন মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না।

মন্দকথা অতি দ্রুত চলে। এক এক সময় তাহার গতি আর আকাশের বিদ্যুতের গতি সমান হয়। স্বর্গভূষণ জানিতে পারিলেন, আদরিণীর সম্বন্ধের কথা আর রাণী জগৎকুমারীর পলায়নের কথা ইতিমধ্যে পঞ্জাবে প্রচার হইয়া গিয়াছে। কেবল প্রচার মাত্রই না, সচরাচর যেমন হইয়া থাকে, লোকের মুখে মুখে সেই দুটী বৃত্তান্ত সেইরূপ অনেক প্রকার অলঙ্কার পরিধান করিয়াছে। গল্পে যেমন শাখাপল্লব থাকে, জনরবেও তদ্রূপ অনেক শাখাপল্লব জন্মে, এত শাখাপল্লব হয় যে, সত্যটুকু একপ্রকার ঢাকা পড়িয়া যায়, সেইরূপ অলঙ্কৃত রহস্যগল্পে স্বর্গভূষণ দিন দিন অত্যন্ত লজ্জিত হইতে লাগিলেন। সমপদস্থ,—অসমপদস্থ, সকলে অথবা অনেকে একত্র হইলেই ঐ দুই প্রসঙ্গ লইয়া স্বর্গভূষণের সহিত পরিহাস আরম্ভ করেন। বলা বাহুল্য, স্বর্গভূষণের প্রকৃতি যেরূপ কদর্য্য, মনে মনে তাঁহার এক প্রকার ভয়ঙ্কর গর্ব্ব, তাহাতে ভাল লোকেরা কেহই তাঁহাকে ভাল-বাসেন না। যে সকল লোক তোষামোদ ভাল জানে, স্বর্গভূষণের নিকট তাহারা বিলক্ষণ সমাদর পায়। স্বর্গভূষণের টাকায় ভোজ্যপানীয় প্রাপ্ত হয়,—স্বর্গভূষণের অশ্বে আরোহণ করিতে পায়,—আবশ্যকে অনাবশ্যকে প্রচুরাধিক প্রচুর অর্থ ঋণ প্রাপ্ত হয়, সে সকল লোক পরিহাসের সময় মুখ বাঁকাইয়া চুপ করিয়া থাকে।

ক্রমাগত দুই মাস ঐরূপ পরিহাসের তরঙ্গ চলিল। এক দিন সন্ধ্যার পর স্বর্গভূষণ অত্যন্ত অপমানিত হইয়াছেন, ক্রোধে তাঁহার পাণ্ডুগণ্ড রক্তবর্ণ হইয়াছে। কাহাকেও কিছু না বলিয়া একগাছি বেত্রহস্তে তিনি গৃহ হইতে বিনির্গত হইলেন। দ্রুতপদে একেবারে রাস্তায়।—মনে মনে প্রতিজ্ঞা হইল, সেনাদলের পরিহাসকারীদের মধ্যে প্রথমে যাহাকে সম্মুখে

দেখিতে পাইবেন, তাহাকেই বেত্রাঘাত করিবেন। সৌভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্যক্রমে প্রথম শিকার লিঙ্গেশ্বর।—সে ব্যক্তি উচ্চমাত্রায় মদ্যপান করিয়া রাজপথে হেলিতে ভুলিতে মন্থরগতিতে আগমন করিতেছে। একবার এ ধার, একবার ও ধার! মাঝে মাঝে হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইতেছে, হঠাৎ যেন চট্‌কা ভাঙ্গিয়া খাড়া হইয়া দাঁড়াইতেছে, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গীম ঠাম। স্থূল কথায় সে ব্যক্তি তখন নয়নের প্রতিকূলে,—অবয়বের প্রতিকূলে ঘোরতর যুদ্ধ করিতেছে। তাহার নয়নে তখন যেন সমস্ত পৃথিবী ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। যে দিক দিয়া চলিতেছে, সে দিকের অর্দ্ধেক পৃথিবী যেন রসাতলে প্রবেশ করিতেছে। মাথার উপর ভোঁ ভোঁ করিয়া যেন গগনমণ্ডল ঘুরিতেছে। অকস্মাৎ এক ভাঙ্গা গলার মিহিসুর তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল। সম্মুখে চাহিয়া দেখিল, স্বর্গভূষণ।—ভয় হইল। একজন উচ্চ পদস্থ সৈনিকের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ঐরূপে ভূত-ভঙ্গী দেখাইতেছে, অকস্মাৎ চৈতন্য হইল। অধিক ভয়ে আর অধিক শোকে মাতালের নেশা ছুটিয়া যায়। ভঙ্গী ছাড়িয়া লিঙ্গেশ্বর স্থির হইয়া দাঁড়াইল। স্বর্গভূষণ অদূরে। কপালে দুই হাত তুলিয়া লিঙ্গেশ্বর তাঁহাকে নমস্কার করিল। কিন্তু অধিকক্ষণ তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিতে সাহস হইল না। ভয়ে চট্‌কা ভাঙ্গিয়াছিল, মনেই কেবল অল্প চৈতন্য, কিন্তু চরণ সে ভয় মানিবে কেন? চরণ স্থির রাখিতে পারিতেছিল না। কম্পিত পদে পাশ কাটাইয়া অন্য দিকে চলিয়া যাইতে লাগিল।

পাঠক মহাশয় অবগত আছেন, স্বর্গভূষণের মিহিসুর।—মিহিসুর যত উঁচু করিয়া তুলিতে পারা যায়, ততদূর উচ্চস্বরে স্বর্গভূষণ ডাকিলেন, "লিঙ্গেশ্বর! দাঁড়াও! কথা শুনিয়া যাও! শৃগাল!"

লিঙ্গেশ্বর ত কাঁপিতেইছিল, আবার কাঁপিল। ধীরে ধীরে কম্পিত চরণে স্বর্গভূষণের সমীপবর্ত্তী হইয়া পুনরায় যুগল হস্তে এক সুদীর্ঘ নমস্কার করিল। তখন যেন তাহার কিছুমাত্র নেশা নাই, সেইরূপ ভাণ করিয়া সেই ধূর্ত্ত কত যেন শান্তভাব দেখাইতে লাগিল।

রুক্ষস্বরে স্বর্গভূষণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "লিঙ্গেশ্বর! তুমি মদ খাইতেছিলে? মাতাল হইয়াছ?"

থতমত খাইয়া লিঙ্গেশ্বর উত্তর করিল, "রাজকুমার! আমি—আমি না,—আমি"—চারি পাঁচবার এইরূপ আমি আমি করিয়া অবশেষে কহিল, "সত্য কথায় মার নাই, আমি নিবেদন করিতেছি, দোষী। তুমি আমাদের দলের সাধুলোকের আদর্শ। তোমাকে——"

"আচ্ছা, আচ্ছা! আমার ভ্রম হইয়াছিল। তুমি যাও!"

স্বর্গভূষণ অত্যন্ত তোষামোদপ্রিয়। এক ধূর্ত্ত মাতাল তাঁহাকে সাধু-লোকের আদর্শ বলিয়া সচ্ছন্দে নিষ্কৃতি লাভ করিল। পূর্ব্ব রজনীতে ঐ লিঙ্গেশ্বর তাঁহার প্রতি পরিহাসে হাস্য করিয়া আনন্দে মস্তক সঞ্চালন করিয়াছিল। অভিমানগর্ব্বিত তোষামোদপ্রিয় কাশরোগগ্রস্ত রুগ্ন সৈনিক এক কপটতামিশ্রিত "আদর্শ" বাক্যে সমস্তই ভুলিয়া গেলেন। লিঙ্গেশ্বরকে বিদায় দিয়া হস্তস্থিত বেত্রকেও সঙ্কুচিত করিয়া, প্রহারের প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হইয়া নিজেও শিবিরাভিমুখে চলিলেন। যাইতে যাইতে একটু উচ্চকণ্ঠে আপনাআপনি কহিলেন, লিঙ্গেশ্বর বেস্ লোক! আমি বিবেচনা করি, আমিও বেস্ লোক!

লিঙ্গেশ্বর চাতুরী কৌশলে আসন্ন বিপদ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া গুন্‌গুন্ গুঞ্জনে গান করিতে করিতে গৃহে যাইতেছে। মানুষ যখন কথা কয়, তাহার মন তখন বিশ্রাম করে না। মুখে যে কথা বলে, মনেও সেই কথা ভাবে, তাহাও না। লিঙ্গেশ্বর মুখে গান করিতেছে, তাহার মন গান গাইতেছে না। সে তখন ভাবিতেছে, উঃ! স্বর্গভূষণকে কেমন ফাঁকি দিয়ে এলেম! স্বর্গভূষণ আমার উচ্চ পদস্থ, তাহার উপর প্রতিশোধ লওয়া হইবে না। এই দণ্ডে এই পথে যদি আমি কোন নিম্ন পদস্থ সেনাকে দেখিতে পাই, তাহা হইলে তাহারই উপর এই অপমানের শোধ তুলিব। ভাবিতেছে আর চলিতেছে। ঠিক্ সেই সময় সেই স্থানে ভূপেশ-চন্দ্র। নিত্য নিত্য নিয়মানুসারে যে সময়ে ভূপেশচন্দ্র সৈনিক শিবিরে প্রবেশ করেন, সে রাত্রে তাহার এক দণ্ড অগ্রে আসিয়াছিলেন। লিঙ্গেশ্বর তৎকালে শিবিরের সোপানের উপর উঠিতেছিল। ভূপেশচন্দ্রও শিবিরে প্রবেশ করিয়া সোপানে পদার্পণ করিয়াছেন, এমন সময় ঊর্দ্ধ সোপানে টিপ্ করিয়া একটা শব্দ হইল। যেন একটা মানুষ পড়িয়া গেল। ভূপেশচন্দ্র

শীঘ্রপদে ব্যস্তভাবে তাড়াতাড়ি উপরে উঠিয়া দেখিলেন, লিঙ্গেশ্বর।—সিঁড়ির উপর লিঙ্গেশ্বর গড়াগড়ি। সিঁড়িতে আলো জ্বলিতেছিল, মাতালটা তথাপি চৌচাপটে পড়িয়া গিয়াছে। ভূপেশচন্দ্র তাহাকে ধরিয়া তুলিলেন; কিন্তু লোকটা দাঁড়াইতে পারিল না। দেয়াল ঘেঁসা করিয়া ভূপেশচন্দ্র তাহাকে সোজা করিয়া রাখিলেন,—ধরিয়া রহিলেন।—লিঙ্গেশ্বর দেয়াল ঠেস্ দিয়াও কম্পিত হইতে লাগিল। ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস। এ অবস্থাতেও মনে তাহার বিষানল। যাহাকে সে ব্যক্তি মর্ম্মে মর্ম্মে ঘৃণা করে, সেই ঘৃণা-পাত্র পরমশত্রু তাহার সেই অবস্থা দর্শন করিল! সেই ঘৃণাপাত্র পরমশত্রু আসিয়া বিপদসময়ে তাহার সাহায্য করিল! ইহা কি সামান্য অপমান!—সামান্য যন্ত্রণা! তদবস্থায় দাঁড়াইয়া ক্রূরবুদ্ধি লিঙ্গেশ্বর মনে মনে কি চিন্তা করিয়া,—কি একটা পাকাপাকি বুদ্ধি আঁটিয়া সদম্ভ জড়িতস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "ভূপেশচন্দ্র! তুমি মদ্যপান করিতেছিলে?"

ক্রোধে, অতি সংক্ষেপে নায়ক উত্তর করিলেন, "কি প্রলাপ!"

"মিথ্যা কথা বলিও না। দেখিতেছি, তুমি দাঁড়াইতে পারিতেছ না,—দেখিতেছি, তুমি মাতাল,—তোমার মুখ রক্তবর্ণ,—তোমার চক্ষু যেন জ্বলিতেছে,—আমার নাসিকায়, তোমার ওষ্ঠে বিলক্ষণ সরাপের গন্ধ বাহির হইতেছে।"

মনের বেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া, তাচ্ছিল্যভাবে ভূপেশচন্দ্র কহিলেন, "তাহার আর সন্দেহ কি?"

"কি বলিস্ তুই?"—ক্রোধান্ধ হইয়া লিঙ্গেশ্বর কহিল, "কি বলিস্ তুই? দোষ করিয়া অস্বীকার! বিলক্ষণ মাতাল! সিঁড়ির উপর পড়িয়া গিয়াছিস্। সটান পড়িয়াছিস্;—আমি দেখিয়াছি, লোকে দেখিয়াছে, দেয়ালেরা দেখিয়াছে, আনোয়ারের কুকুরেরা সাক্ষী আছে, তথাপি অস্বীকার?"

"লিঙ্গেশ্বর!"—আরক্ত নয়নে স্থিরপ্রতিজ্ঞ ভূপেশচন্দ্র কহিলেন, "লিঙ্গেশ্বর! সাবধান হও! ফের যদি তুমি আর একটী কথা উচ্চারণ কর, তাহা হইলে এই মুহূর্ত্তেই আমি শিবিরের সমস্ত লোক একত্র করিব। সর্ব্বাঙ্গে ধূলামাখা, বস্ত্রে ধূলামাখা, এই চিহ্ন দর্শন করিয়া সকলে চিনিবেন, মাতাল কে? তুমি না আমি?"

এই কয়েকটী শেষ বাক্য উচ্চারণ করিয়াই সিদ্ধেশ্বরকে ছাড়িয়া দিয়া ভূপেশচন্দ্র আপনার নির্দ্দিষ্ট মহলে প্রবেশ করিলেন।

স্বর্গভূষণ শিবিরাভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন, কিন্তু তৎকালে শিবিরে প্রবেশ করেন নাই। মনে কি এক দুষ্টভাবের আবির্ভাব হইয়াছিল, রাজপথেই বিচরণ করিতেছিলেন। রাজপথে যে সকল স্ত্রীলোক গতিবিধি করিতেছিল, তাহাদের প্রতি ঘন ঘন কটাক্ষপাত করিতেছিলেন। পথপার্শ্বে যে সকল বিপণীতে স্ত্রীলোকেরা প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে আসিয়াছে, নারীলোভী স্বর্গভূষণ এক একবার ছলক্রমে সেই সকল দোকানের সম্মুখে পরিক্রমণ করিতেছিলেন।

যে রাত্রের কথা, সেই রাত্রে কোন বিশেষ প্রয়োজনে শ্রীমতী অপ্সরাসুন্দরী ভূপেশচন্দ্রের সহিত শিবিরের ফটক পর্য্যন্ত আইসেন। ভূপেশচন্দ্র প্রবেশ করিবার পর তিনি রাস্তার এক ধারে একটী প্রাচীন বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া ছিলেন। সঙ্গে একজন অনুচরী ছিল, কয়েকখানি বস্ত্র ক্রয় করিবার জন্য তাহাকে এক দোকানে প্রেরণ করিয়াছেন। তাহারই প্রত্যাগমন-প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া।—ঘটনাক্রমে স্বর্গভূষণের দুষ্টদৃষ্টি সেই দিকে নিপতিত হইল, তিনি যেন চমকিয়া উঠিলেন। জ্যোৎস্না রাত্রি ছিল, অপ্সরাসুন্দরীর বদনও সম্পূর্ণরূপে আবৃত ছিল না। স্বর্গভূষণ নিঃশব্দে নিকটবর্ত্তী হইয়া চন্দ্রালোকে সেই চন্দ্রবদন নিরীক্ষণ করিলেন। নিরীক্ষণ করিয়াই চিনিলেন, অপ্সরাসুন্দরী।—চমকিতভাবে কয়েকপদ পশ্চাতে সরিয়া আসিয়া অন্তরালে দাঁড়াইলেন। সেখান হইতেও সেই চন্দ্রমুখখানি সুস্পষ্ট দেখা যাইতে লাগিল। স্বর্গভূষণ স্ত্রীজাতির সতীত্বের পরমশত্রু। অপ্সরাকে দেখিয়া তাঁহার কলুষিত অন্তরে এক কলুষিত চিন্তা জাগিল। তাঁহার যে প্রকার কলঙ্কিত স্বভাব, তাহারই অনুরূপ চিন্তা। তিনি মনে মনে তর্ক করিতেছেন, ভূপেশচন্দ্রের যে দশা হইয়াছে, তাহাতে অবশ্যই তাহার প্রতি অপ্সরাসুন্দরীর মন চটিয়া থাকিবে। এই সময় চেষ্টা করিলেই আমি জয়ী হইতে পারিব। হৃদয়ে যেন আগুন জ্বলিয়া উঠিল। অধৈর্য্যভাবে ব্যস্তপদে নিকটবর্ত্তী হইয়া প্রকৃতিসিদ্ধ ক্ষীণস্বরে তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "অপ্সরা! আহা! বহুদিন পরে তোমাকে দেখিলাম!"

অপ্সরাসুন্দরীর চক্ষু অন্য দিকে ছিল না। তাঁহার সেই মাধুরীমাখা নীল নলিন নয়নযুগল ধীর প্রশান্তভাবে ধরণী অবলোকন করিতেছিল। সম্বোধন শ্রবণে সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, স্বর্গভূষণ। শিহরিয়া উঠিলেন। বক্ষঃস্থল কাঁপিল, চমকিতভাবে পাঁচ সাত হস্ত পশ্চাতে সরিয়া গেলেন। তাহাতেও দুষ্টের দুরভিসন্ধি হইতে পরিত্রাণ পাইলেন না। তিনি পশ্চাতে সরিলেন, স্বর্গভূষণ সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হইলেন। কহিলেন, "অপ্সরা! তুমি আমাকে চিনিতে পার?"

লজ্জায় কুণ্ঠিত হইয়া অপ্সরা উত্তর করিলেন, "স্বর্গভূষণ! সরিয়া দাঁড়াও! পথ ছাড়িয়া দাও! আমি চলিয়া যাই। মিনতি করি, আমার পথরোধ করিও না।"

"সে কি অপ্সরা? এ তোমার কি প্রকার কথা? তুমি কি আমার স্নেহ-বাক্য ভালবাস না?"

অপ্সরাসুন্দরী অন্য দিক দিয়া চলিয়া যাইবার চেষ্টা করিলেন, রাজপথে তখন অনেক লোক, স্বর্গভূষণ সে চেষ্টায় বাধা দিতে সাহস করিলেন না। একটু সরিয়া দাঁড়াইলেন, অপ্সরা চলিলেন। স্বর্গভূষণ তথাপি সঙ্গ ছাড়িয়া দিলেন না। পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। কোন্ বাটীতে তিনি থাকেন, জানিয়া আসিবেন, এই সঙ্কল্প। তিনি যে পশ্চাতে পশ্চাতে আসিতেছেন, অপ্সরা তাহা জানিতে পারিলেন, কিন্তু ফিরিয়া চাহিতে সাহস করিলেন না। কারণ, স্বর্গভূষণের প্রকৃতি তিনি ভাল জানিতেন। ফিরিয়া চাহিলে প্রশ্রয় দেওয়া হইবে, এই আশঙ্কায় কোন দিকে না চাহিয়া আপনার মনেই চলিতে লাগিলেন। মুখের বর্ণ রূপান্তর প্রাপ্ত হইল। বেগে সর্ব্বাঙ্গে উষ্ণ শোণিত প্রবাহিত হইতে লাগিল। পূর্ব্বে,—অনেক দিন পূর্ব্বে এই স্বর্গভূষণের হস্তে তিনি যেরূপ অপমানিত ও উৎপীড়িত হইয়াছিলেন, নূতন হইয়া তাহা মনে পড়িল। সে সকল কথা যেন তিনি ভুলিয়াছিলেন; স্বর্গভূষণও যেন বহুদিন অপ্সরাকে ভুলিয়া ছিলেন, আবার নূতন হইল।

অপ্সরাসুন্দরী একমনে চলিয়া যাইতেছেন বটে, কিন্তু তাঁহার নয়নে বদনে লজ্জার সহিত রোষচিহ্ন বিলক্ষণ লক্ষিত হইতেছে। তিনি ভাবিতেছেন,

কত কি বিপদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা গেল, কত কত মহা বিপদের সঙ্গে যুদ্ধ করা গেল, আমি ত রণজয়ী, আমার ভাগ্যে না জানি আরও কি নূতন বিপদ আছে। আবার কি নূতন বিপদ উপস্থিত হয়!

ভাবনার বিরাম নাই, গতিরও বিরাম নাই।—তখনও স্বর্গভূষণ পশ্চাতে। অপ্সরার গতি আরও দ্রুত হইল। তিনি একটী বক্রপথে প্রবেশ করিলেন। দুরাশাচালিত অনুগামী দুষ্ট সৈনিক যাহাতে তাঁহার আবাসস্থানের ঠিকানা জানিতে না পারেন, সেই অভিপ্রায়েই বক্রপথে প্রবেশ। পথ অপ্রশস্ত, অন্ধকার, লোকজনের গতিবিধি অল্প, সেখানেও পশ্চাতে মানুষের পদশব্দ শুনিতে লাগিলেন। নিশ্চয় বুঝিলেন, সে পদশব্দ দুষ্ট স্বর্গভূষণের। তথাপি মুখ ফিরাইলেন না। সে পথ ছাড়িয়া আরও অন্ধকার, আরও নির্জ্জন। অপর এক নূতন পথ ধরিলেন। সেখানেও পশ্চাতে পশ্চাতে পদশব্দ। অতি দ্রুত গতিতে অনেক দূর অগ্রসর হইয়া স্থির কর্ণে শুনিয়া বুঝিলেন, কর্ণ তখন আর কোন শব্দ শুনিতেছে না। অত্যন্ত শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, একটু থামিলেন। প্রায় নিশ্বাস রোধ।

আঃ! নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। ঐ দুরন্ত বৃষভ এতদূর পর্য্যন্ত আমার সঙ্গ লইয়াছিল। পথপ্রান্তে ক্ষণকাল নিশ্বাসপ্রশ্বাসের স্বাধীন গতি প্রদান করিয়া দুষ্টপ্রপীড়িতা, ভয়চকিতা কুলবালা অন্ধকারে, (জ্যোৎস্না-যামিনীতে সেই সঙ্কীর্ণ বিজন পথ ঘোর অন্ধকার,—সেই অন্ধকারে), পূর্ব্বাপেক্ষা মৃদুগতিতে গমন করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতেই পুনরায় পশ্চাদ্ভাগে পদশব্দ,—ঘন ঘন বিদ্রুত পদশব্দ।

অপ্সরাসুন্দরী আর মৌন থাকিতে পারিলেন না। অন্ধকারে পশ্চাদ্দিকে মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন, একজন লোক। অনুমানে বুঝিলেন, সেই লোক। স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। অনুমান যথার্থ। যথার্থই স্বর্গভূষণ। অপ্সরাকে দাঁড়াইতে দেখিয়া সাহসের স্বরে স্বর্গভূষণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "অপ্সরা! কেন বল দেখি তুমি ঐরূপে আমাকে অপমান করিতেছ? বহু দিনের পর দেখিয়াছি, একটী কথা শুনিয়া যাও,—একটী কথা বলিয়া যাও।"

"স্বর্গভূষণ! কেন বল দেখি, বারম্বার এরূপে আমাকে জ্বালাতন করিতেছ? আমি অসহায়িনী রমণী এখন। প্রকাশ্য রাজপথে নিশাকালে

একাকিনী। এ অবস্থায় আমাকে পীড়ন করিয়া তোমার কি পৌরুষ, কি বীরত্ব বৃদ্ধি হইবে?"

"কেবল একটী মাত্র কথা।—দোহাই ধর্ম্মের, সত্য বলিতেছি অপ্সরা! আমার কেবল একটী মাত্র কথা!"

পাছে ভূপেশচন্দ্রের কোন বিপদ ঘটে, এই লোক তাঁহার উচ্চ পদস্থ, পাছে কোন বিপদ ঘটায়, সেই শঙ্কায় মনের ক্রোধ মনে গোপন করিয়া সুশীলা অপ্‌সরাসুন্দরী বিনম্রস্বরে বিনয় করিয়া কহিলেন, "রাজপুত্র! আমারে আর লজ্জা দিও না। শিবিরে গমন কর। আমি অনাথা, আমারে গৃহে যাইতে দাও।"

হাস্য করিয়া স্বর্গভূষণ কহিলেন, "তুমি অনাথা হইবে কেন সুরসুন্দরি! আমি মহাবীরপুরুষ। সামরিক অস্ত্রশস্ত্রে সুরক্ষিত। আমি নিকটে থাকিতে তুমি অনাথা বলিয়া বিলাপ করিও না।"

"স্বর্গভূষণ! তুমি অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করিলে! তুমি মহাবীর, তাহা আমি জানি। কিন্তু তোমার মত মহাবীরেরা এই অবলার চরণের ভার সহ্য করিতে পারে না।"—অপ্‌সরাসুন্দরী এতক্ষণ ক্রোধবেগ সম্বরণ করিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু আর সম্বরণ করিতে পারিলেন না। মহা উত্তেজিতা হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "স্বর্গভূষণ! আবার যদি তুমি আমার সম্মুখে ঐরূপ অপমানের কথা বল, তাহা হইলে ভাল হইবে না। এখনই আমি সাহায্য আহ্বান করিব,—রক্ষা প্রার্থনা করিব।"

"কোথায়? কাহার নিকটে? অন্ধকার বিজন নিস্তব্ধ পল্লী, প্রতিবাসী নাই, বৃথা চীৎকার করিবে।"

"তোমার তাহাতে কি? অন্ধকার হউক,—বিজন হউক,—নিস্তব্ধ হউক, তোমার তাহাতে কি? অপ্‌সরাসুন্দরীর করুণস্বর দয়াময়ের কর্ণে অবশ্যই প্রবেশ করিবে।"

স্বর্গভূষণ একটু ভয় পাইলেন। মনে করিলেন, যদিও নিকটে কেহ না থাকে, এই অহঙ্কৃতা রমণী চীৎকার করিয়া ডাকিলে পন্থাবাহী পান্থ-লোকেরাও এখানে আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে। ভাল কথা নয়। আরও মনে করিলেন, আমি যে ভাবিতেছিলাম, পলাতক ভূপেশচন্দ্রের

প্রতি,—দণ্ডপ্রাপ্ত আসামী অপরাধীর প্রতি ইহার অনুরাগ কমিয়া গিয়াছে, তাহা আমার সম্পূর্ণ ভ্রম। এ রাত্রে ইহাকে আর কোন কথা বলা হইবে না। কালসর্পিণীকে ঘাঁটাইলে আমার মস্তকে না হউক, এই সাপিনী আমার সম্ভ্রমের মস্তকে দংশন করিবে। মনে মনে এইরূপ আলোচনা করিয়া স্বর্গভূষণ চুপি চুপি কহিলেন, "অপ্সরা! বহু দিনের পর আজ তুমি আমাকে যেরূপে নৈরাশ করিলে, তাহার প্রতিফল আছে। এমন একটী প্রতিফল, যাহা দর্শন করিলে তোমাকে পলকে পলকে কাঁপিয়া কাঁপিয়া কাঁদিতে হইবে।"

"আচ্ছা! তাহাই ভাল, তুমি তাহাই করিও। এখন বিদায় হও!"

ত্রস্তস্বরে এই তিনটী কথা বলিয়া তেজস্বিনী অপ্সরাসুন্দরী আপনার পথে গমন করিতে লাগিলেন।—ক্রোধে, নিরাশ্বাসে জ্বলিতে জ্বলিতে দুরাচার স্বর্গভূষণ বিপরীত পথে ফিরিয়া গেলেন।

রাত্রি এক প্রহর। শুক্লপক্ষ রজনীতে অকাশে নক্ষত্র কিছু অল্প দেখা যায়। পাপী স্বর্গভূষণ সেই শুক্লপক্ষ রজনীতে নক্ষত্র অল্প দেখিতেছেন। তথাপি তিনি যে পথে যাইতেছেন, সে পথ অন্ধকার। সুধাকর চন্দ্রদেব সে পথে প্রবেশ করিতেছেন না। কেন না, ইচ্ছা করিয়া না,—কি ঘৃণা করিয়া না, কিম্বা বাধা পাইয়া না,—তাহা চন্দ্র জানেন। পথ অন্ধকার। দুই ধারে নিবিড় জঙ্গল। স্বর্গভূষণ ভাবিতে ভাবিতে যাইতেছেন, কি হইল! একটা সামান্য স্ত্রীলোককে বশ করিতে পারিলাম না! আচ্ছা! সময় আছে। আমি দেখিব। দুরাত্মা ভূপেশচন্দ্রকে নিপাত করিয়া অপ্সরাকে আমি একদিন আপন বশে আনিব। আকাশপাতাল সাক্ষী, আমার এই তলোয়ার সাক্ষী, এই আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা রহিল।

নৈরাশ্যে আপনাআপনি কথা কহিতে কহিতে সেই জঙ্গলাকীর্ণ পথে স্বর্গভূষণ প্রায় দুই তিন শত পদ অতিক্রম করিয়াছেন, সহসা বনভূমি ভেদ করিয়া এক মূর্ত্তি তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। সেখানে চাঁদের আলো নিতান্ত অপ্রদীপ্ত ছিল না। স্বর্গভূষণ দেখিলেন, বিকট মূর্ত্তি! মাথায় একটা প্রকাণ্ড পাগ্‌ড়ী, কৃষ্ণবর্ণ মুখ। স্বর্গভূষণের নিজের গর্ব্ব আছে, তিনি একজন মহাবীর। সেই বিকট মূর্ত্তি দর্শন করিয়া মহাবীরের হৃদয়

মহা ঝড়ে বিকম্পিত তরুর মত ঘন ঘন বিকম্পিত হইতে লাগিল। তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন, বন্য ডাকাত তাঁহাকে খুন করিবার জন্য বন হইতে বাহির হইয়াছে। স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। মুখে কথা সরে না। চাহিয়া দেখিতেছেন, বিরাট বিকটমূর্ত্তি। একবার, ভাবিয়াছিলেন, চোর, আবার ভাবিতেছেন, রাক্ষস। এই রাক্ষস হয় ত তাঁহাকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে।

বীরপুরুষ কাঁপিতেছেন। কাঁপিতে থাকুন। সেই বিকট মূর্ত্তি মৌনভঙ্গ করিয়া প্রথমে কথা কহিল, "আমি সব শুনিয়াছি। আশা হইয়াছে, আমি তোমার উপকারে আসিতে পারিব। গোপনে লুকাইয়া থাকিয়া আমি সব শুনিয়াছি।"

ভয়ের সঙ্গে বিস্ময় আসিল, বিস্ময়ের সঙ্গে একটু সন্দেহ আসিল। বনবাসী নূতন লোক উপকার করিবে, ইহা শুনিয়া আরও বিস্ময়।—ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?"

"পরিচয় এখানে হইবে না। আমাকে দেখিয়া তুমি ভয় পাইতেছ? আমি ভয় দেখাইতে আসি নাই। আমাকে বিশ্বাস কর। আমি তোমার কার্য্য উদ্ধার করিয়া দিব। আমি সব শুনিয়াছি।"

"কি শুনিয়াছ? আমি কে, তাহা কি তুমি জান?"

"তুমি স্বর্গভূষণ।"

বিস্ময়াপন্ন হইয়া স্বর্গভূষণ কহিলেন, "তুমি আমার নাম জান?"

"না জানিলে কিরূপে বলিলাম?"

"আচ্ছা! বল দেখি, আমাদের কি কথা শুনিয়াছ? বল দেখি, তুমি আমার কি উপকার করিতে পার?"

"তুমি অপ্সরাসুন্দরীকে চাও, আমি মিলাইয়া দিতে পারি। সকল ফন্দী আমার হাতে আছে। তুমি যে হও, তুমি স্বর্গভূষণ! তুমি চাও অপ্সরাসুন্দরী, আমি চাই অর্থসুন্দরী। যদি রাজী হইতে পার, যে প্রকারে পারি, মিলাইয়া দিব।"

সেই লোক যতক্ষণ কথা কহিতেছিল, চন্দ্রের আলোতে স্বর্গভূষণ ততক্ষণ নির্নিমেষ নয়নে তাহার ভীষণ বিকটবদন নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। এত ভয় তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছিল যে, তিনি নিকটে দাঁড়াইয়া

থাকিতে পারিতেছিলেন না। অনেক দূরে। ভয়ের সময়, শোকের সময়, দারুণ ক্রোধের সময়, জলন্ত ঈর্ষানলে জ্বলিবার সময় মানুষের জ্ঞান থাকে না। স্বর্ণভূষণ সেইরূপ জ্ঞানশূন্য হইয়া অনেক দূরে দাঁড়াইলেন।

তীব্র হাস্য করিয়া সেই লোক কহিল, "তুমি ভয় পাইতেছ? ধিক্! ধিক্ স্বর্ণভূষণ! ধিক্ তোমাকে! তুমি মহাবীর, তোমার সঙ্গে তলোয়ার, তুমি আমাকে দেখিয়া ভয় পাও? আমি তোমার উপকার করিব, যদি বিশ্বাস না কর, তলোয়ারের খাপ খুলিয়া রাখ, যেই মাত্র আমার পক্ষে কোন বিশ্বাসঘাতকতার অঙ্কুর দেখিবে, তৎক্ষণাৎ আমার মাথা কাটিয়া ফেলিও।"

স্বর্ণভূষণের একটু ভরসা হইল। ভয়কে আর সন্দেহকে একটু অন্তরে রাখিয়া গম্ভীরভাবে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি তোমার সত্য পরিচয় দিতে পার?"

"তুমি আমার বাসায় যাইতে পার? সে বাসাকে যদি বাসা বলিতে পারা যায়, তাহা হইলে আমি তোমাকে সেইখানে লইয়া যাইতে চাই। পথে সকল কথা হইতে পারে না।"

স্বর্ণভূষণ মহা সন্দেহদোলায় দোদুল্যমান। কি বলিবেন, কি করিবেন, মনকে জিজ্ঞাসা করিয়াও উত্তর পাইলেন না। হৃদয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াও প্রকৃত উত্তর পাইলেন না।

মূর্ত্তি কহিল, "ভাবিতেছ কি? আমাকে তুমি অবিশ্বাস কর? বাসায় চল, সকল কথার মীমাংসা হইবে, মনের আশা পূর্ণ হইবে, অপ্সরাসুন্দরী তোমার হইবে।"

তখনও স্বর্ণভূষণের সন্দেহ ঘুচিল না। তিনি মনে করিলেন, হয় ত সেখানে কি ফাঁদ পাতা আছে, ফাঁদে ফেলিয়া আমাকে নষ্ট করিয়া দিবে। কিম্বা প্রাণেই মারিবে। কি সাহসে যাই।

"আবার কি ভাবিতেছ? তুমি মহাবীর! তোমার সঙ্গে তলোয়ার! তোমারে কি এত ভয় শোভা পায়? যদি এতই ভয়, তবে আর এক কর্ম্ম কর।—নির্জ্জন আবশ্যক; তোমার যদি কোন নির্জ্জন গৃহ জানা থাকে, সেই খানেই আমাকে লইয়া চল।"

স্বর্গভূষণ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। কহিলেন, "তবে চল! পথ দেখাও, তোমার বাসাতেই আমি যাইব।"

বিকট মূর্ত্তি উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়া হাস্য করিতে করিতে কহিল, "দূর না, এক, দুই, তিন,—অত কথা আমি জানি না, পঁচিশ হাত।"

"আচ্ছা, তাই চল।"

উভয়ে বনমধ্যে এক কুটীরসমীপে উপস্থিত হইলেন। লতাবৃক্ষ ঘেরা, অন্ধকার, মধ্যে একখানি জীর্ণ কুটীর। সেই কুটীরদ্বারে দাঁড়াইয়া স্বর্গভূষণ মনে মনে কহিলেন, কোথায় আসিলাম? এখানে কি মনুষ্য বাস করে? যাহারা মানুষের গলা কাটে, তাহারাই এরূপ স্থলে লুকাইয়া থাকে। এ প্রকার স্থানে ভূতপ্রেত বাস করে। নিশ্চয়ই প্রাণ গেল! প্রায়শ্চিত্ত এই খানেই হইল!

বনবাসী আপনার ছিন্ন গাত্রবস্ত্র হইতে একটা মরিচা ধরা চাবী বাহির করিল। গৃহের চাবী খুলিল। অন্ধকার। মেঘাবৃত অমা-রজনী অপেক্ষাও অন্ধকার। এত অন্ধকার যে যাহার সঙ্গে আসিয়াছেন, স্বর্গভূষণ তাহাকেও দেখিতে পাইতেছেন না। লোক কহিল, "তুমি একটু দাঁড়াও, আলো আনি।"

স্বর্গভূষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন, লোকটা আলো আনিতে গেল। আলো আর আসে না। অন্ধকারে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া স্বর্গভূষণ ভাবিতেছেন, কাণ্ডখানা কি? বনে বুঝি বনদস্যু বাস করে? তাহাদিগকে বুঝি খবর দিতে গেল! একদল দস্যু বুঝি প্রবেশ করিয়া আমাকে কাটিয়া ফেলিবে! কেন এমন কুমতি হইল? কেন এই রাক্ষসের সঙ্গে আসিলাম? পলায়ন করিই বা কিরূপে? বলে, সব শুনিয়াছে। বলে, আমার উপকার করিবে। বলে, আমাদের জানে। বলে, অপ্সরাসুন্দরীকে আমার করিয়া দিবে। এ কি আশ্চর্য্য ভোজমায়া। প্রাণ গেল! অপ্সরা! তুমি কি শাপ দিয়াছ? সেই শাপে আমার কি এই দুর্দ্দশা? ডাকাতের অন্ধকূপে প্রাণ যায়! নীচে হয় ত গর্ত্ত আছে, যেখানে আমি দাঁড়াইয়া আছি, সেখানে হয় ত তক্তা ঢাকা। ডাকাত আসিয়া তক্তা সরাইয়া লইবে, আমি সেই অন্ধকার গহ্বরে পড়িয়া মরিব! আমাকে মারিবার জন্য ইহারা এমন ফাঁদ

পাতিয়া রাখিয়াছে কেন? আমি ইহাদের কি করিয়াছি!—এখানে অনেক লোক আছে, দল বাঁধিয়া আছে, বুঝিতে পারিতেছি। কিন্তু আমার সঙ্গে কি শত্রুতা? আমাকে মারিয়া ফেলিয়া ইহাদের কি লাভ হইবে? ভাল কাজ করি নাই। অচেনা লোককে বিশ্বাস করিয়া ভাল কাজ করি নাই।

দূরে একটু একটু আলো দেখা গেল। আবার নির্ব্বাণ হইয়া গেল। আর সাড়াশব্দ নাই। অনেক ক্ষণ পরে সেই লোক প্রবেশ করিয়া ক্রোধ, ঘৃণা, তাচ্ছিল্যমিশ্রিতস্বরে কহিল, "জ্বলে না! এত চেষ্টা করিলাম, কিছুতেই জ্বলে না!—আচ্ছা, আমার চক্‌মকি আছে।—অন্ধকারে সেই লোকটা চক্‌মকি ঠুকিতে বসিল। আগুন উঠিল। দীপ জ্বলিল। একটা কালো বোতলের মাথার উপর একটা বাতী। আধপোড়া, গায়ে গায়ে মোম্ গলা, একটা বাতী।—বাতীটা জ্বলিতেছে।—যখন জ্বলিয়াছে, তখন সেই মূর্ত্তির মুখ সেই বাতীর দিকে; পৃষ্ঠ আমাদের স্বর্গভূষণের দিকে। স্বর্গভূষণ ঘর দেখিতেছেন। মাকড়সার জালে আচ্ছন্ন। নূতন অভিধান প্রস্তুত করিতে পার? সেই জালের অর্থ চাঁদোয়া। দেয়ালে দেয়ালে বড় বড় আরসুল্লা, সেই অভিধানে দেখ, অর্থ পাইবে, আয়না আর ছবি। গৃহতলে দেখ, গালিচা পাতা। আমার অভিধান কি বলে? গালিচা অর্থে ধূলা আর আবর্জ্জনা। গবাক্ষ দেখিতেছ? কি চমৎকার! আবরণ নাই, ছিন্ন বস্ত্র ঢাকা। এ দিকে দেখিতেছ? নবীন নবীন দরজা, কিন্তু কবাট নাই। ছিন্ন ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড সেই সকল কবাটের প্রতিনিধি!

লোকটা ফিরিয়া দাঁড়াইল। হাস্য করিয়া কহিল, "স্বর্গভূষণ! আমাকে চিনিতে পার?"

"হরে কৃষ্ণ হরি! তোমাকে আমি চিনিতে পারিব? হরে কৃষ্ণ হরি! তোমাকে আমি জন্মেও কখনও দেখি নাই।"

"দেখ নাই, আজ দেখ।"

উষ্ণ হইয়া রাজপুত্র কহিলেন, "নূতন দর্শন এই, নূতন পরিচয়। যদি তোদের মনে, কিম্বা তোর মনে কোন পাপ থাকে, আমি তাহা পুড়াইব।"

"তুমি কি তাহা পার রাজা? তুমি রাজা আছ, রাজা থাক, আমি গ্রাহ্য করি না! আমাকে যদি অবিশ্বাস না কর, তাহা হইলে, অপ্সরাসুন্দরীকে তোমার হস্তে অবশ্যই আমি সমর্পণ করিব।"

ঘরে আলো জ্বলিতেছে। ঘর চমৎকার! পাঠক মহাশয় কিছু অগ্রে এ ঘরের কিছু কিছু পরিচয় পাইয়াছেন। সেগুলি ঘরের সাজ। ঘর নিজে কিরূপ? ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ। ইষ্টকগুলি যেন দশমুণ্ড,—সহস্রমুণ্ড রাক্ষসের মত দন্তবিকাশ করিয়া হাসিতেছে। কৃত্তিবাস পণ্ডিতকে মনে পড়িল। রাবণের হাসি দেখিয়া সেই কবি কহিয়াছেন,—

"দশপাটি দন্ত মেলি দশানন হাসে।
কেতকী কুসুম যেন ফোটে ভাদ্র মাসে॥"

এই ঘরের ইট্‌গুলি প্রায় সেইরূপ। ঠাঁই ঠাঁই ফাটা। রাক্ষস যেন হাঁ করিয়া রহিয়াছে। ছাদের উপর বড় বড় গাছ বসিয়া আছে। গাছেরা অঙ্গদের লাঙ্গূলের মত বড় বড় শিকড় নামাইয়া ঘরের ভিতর দেয়ালের গায়ে যেন বড় বড় সাপ ঝুলাইয়াছে। সম্মুখে সেই বিকট মূর্ত্তি। গৃহমধ্যে বসিবার স্থান নাই। উভয়ে দাঁড়াইয়া।—বাতীর আলোতে স্বর্গভূষণ সেই বিকট মূর্ত্তি দর্শন করিতেছেন। ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি,—ভয়ঙ্কর প্রকাণ্ড,—দীর্ঘাকার।—এত দীর্ঘ যে, মাপিলে চারি হাতে কুলায় না। মুখে কাটা কাটা অনেক দাগ, যেন সেলাই করা। একটা চক্ষু নাই; সেই চক্ষের তারা গোলাকার সীসার বর্ণ। জলচর মৎস্যকে বহুদিন জল ছাড়া করিয়া রাখিলে তাহার চক্ষের তারকাপুতুলি যেরূপ সীসকবর্ণ হয়, ঠিক্ সেইরূপ বর্ণ। নাকের অর্দ্ধেকটা কে যেন খাইয়া ফেলিয়াছে। ভ্রূ নাই;—যেন আগুনে দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। লোকটা তখন সেই প্রকাণ্ড মস্তকের পাগ্‌ড়ী খুলিয়া ফেলিয়াছিল। মাথায় একগাছিও চুল নাই। ঠাঁই ঠাঁই পোঁড়া পোড়া কালো দাগ: টাক নয়, টাকে সে প্রকার কাল্‌সিটা দাগ পড়ে না। কেহ যেন আগুন দিয়া পুড়াইয়া দিয়াছে বোধ হয়। যথার্থই ভীষণ মূর্ত্তি!

স্বর্গভূষণ সেই মূর্ত্তি দেখিলেন। ভয় আবার নূতন হইয়া তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল। তরবারির মূলদেশে হস্তার্পণ করিয়া এমনি ভাবে

দাঁড়াইলেন, প্রয়োজন মাত্রেই যেন নিষ্কোষিত করিয়া আত্মরক্ষা করিতে পারিবেন। মনে মনে ভাবিলেন, নিশ্চয়ই ডাকাত। অগ্রে বিবেচনা না করিয়া ইহার সঙ্গে আসিয়া অত্যন্ত নির্ব্বোধের কাজ করিয়াছি। ডাকাতের হাতেই প্রাণ গেল!

ঘন ঘন গাত্রকম্প। রসনা বাক্যশূন্য। দৃষ্টি সচঞ্চল। স্বর্ণভূষণের সেই ভাব দেখিয়া হাস্য করিয়া সেই লোক কহিল,—লোক কি রাক্ষস,—কিম্বা কোন সৃষ্টিছাড়া পদার্থ, তাহা আমরা বলিতে পারি না, কিন্তু যখন মানুষের আকার, তখন লোক বলিয়াই পরিচয় দিতে হয়।—হাস্য করিয়া সেই লোক কহিল, "আবার কি আমাকে দেখিয়া তোমার ভয় হইতেছে? এখনও কি তুমি আমাকে সন্দেহ কর? অগ্রেই ত বলিয়াছি,—পুনরায় বলিতেছি, তলোয়ারের খাপ খুলিয়া রাখ, অবিশ্বাসের একটু হেতু দেখিলেই কাটিয়া ফেলিও। তুমি মহাবীর; তাহাতে অস্ত্রধারী। আমি সামান্য লোক, দরিদ্র, দুর্ব্বল, তাহাতে নিরস্ত্র। আমাকে দেখিয়া তোমার ভয় হয়, বড় আশ্চর্য্য কথা!"

বিমনস্কভাবে স্বর্ণভূষণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিন্তু তুমি কে? আমাকে তুমি কিরূপে চিনিলে? অপ্সরাসুন্দরীকে তুমি কিরূপে চিনিলে? কিরূপেই বা তুমি আমার উপকার করিতে পার?"

"এক এক করিয়া জিজ্ঞাসা কর,—ঝড়ের মত অত কথার জবাব আমি একেবারে দিতে পারি না। প্রথম কথা, আমি কে? আচ্ছা! আমার নামে তোমার প্রয়োজন কি? আচ্ছা, মনে কর, আমার নাম রঘুনন্দন। কেমন, এ নাম কি বড় সুন্দর নাম নয়? এ নামে পৃথিবীতে অনেক লোক, অনেক পরিবার আছে। এখন মনে কর, আমার নামের সঙ্গে তোমার পরিচয় হইল। ইহার পর দ্বিতীয় কথা।—দ্বিতীয় কেন, দ্বিতীয় তৃতীয় এক সঙ্গে। তোমারে আমি কিরূপে চিনিলাম, অপ্সরাসুন্দরীকে কিরূপে চিনিলাম। আচ্ছা, মনে কর, আমি একজন ভ্রমণকারী, আমি একজন অনুসন্ধানকারী, সংসারের সর্ব্বতত্ত্ব আমি অন্বেষণ করি। এক মাস হইল, পঞ্জাবে আসিয়াছি। এ ঘর কাহার, তাহা জানি না। খালি পড়িয়া ছিল, চাবী দেওয়া ছিল, কিন্তু চাবী কেহ লইয়া যায় নাই;

কুলুপেই সংলগ্ন ছিল। সন্ধ্যাকালে আমি আসি। অনাহার। চাবী খুলিয়া এই ঘরে আমি প্রবেশ করি। ঘরের শ্রী এখনও যেমন দেখিতেছ, তখনও এইরূপ। গৃহে জিনিসপত্র কিছুই ছিল না; এখনও নাই। বসিবার আসন ছিল না; এখনও নাই। শয়ন করিবার শয্যা ছিল না, এখনও নাই। আমি উপবাসী দরিদ্র ভিখারী। ধুলার উপরে শয়ন করিলাম। উপবাসে সকলের নিদ্রা হয় না, আমার কিন্তু নিদ্রা হইয়াছিল। নাক ডাকিয়াছিল!"

মুখে বস্ত্র দিয়া রাজকুমার স্বর্গভূষণ হাস্য করিলেন। যাহার নাক নাই, তাহার আবার নাক ডাকে!!! মুখ ফুটিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, বলিয়া যাও, শুনিতেছি।—তাহার পর?"

"তাহার পর,—মনে কর, রাত্রি প্রভাত হইল। আমি নগরে ভিক্ষায় বাহির হইলাম। কাহারও বাটীতে প্রবেশ করিলাম না। পথে যে সকল রাজা, আমীর, আর বড় লোক দেখিতে পাইলাম, উদরে হস্ত দিয়া ভিক্ষা চাহিলাম। আমাকে দেখিয়া তাঁহারা সকলেই পথের অন্য ধার দিয়া চলিয়া গেলেন। আমার দিকে চাহিয়াও দেখিলেন না। শেষে,—কি করি, পেটের জ্বালা বড় জ্বালা, অনেক দূর চলিয়া গেলেম। চন্দ্রভাগা নদীর পারে জন কতক লোক কর্ম্ম করিতেছিল, তাহাদের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেম। পেটে হাত দিয়া দুর্দ্দশা জানালেম। বড় লোক অপেক্ষা তাহারা ভাল। আমাকে দেখিয়া তাহাদের দয়া হইল। আপনাআপনি চাঁদা তুলিয়া তাহারা আমাকে সাত আনা পয়সা ভিক্ষা দিল। সেই সকল দাতাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া আমি এই গৃহে ফিরে এলেম। সেই দিন অবধি—"

আর অধিকক্ষণ ধৈর্য্য রাখিতে না পারিয়া বিরক্তভাবে স্বর্গভূষণ কহিলেন, "যাহা জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহার উত্তর কর। বাজে কথার আড়ম্বরে কালহরণ করিতে আমি ভালবাসি না। তোমার নিদ্রা, তোমার নাক ডাকা, তোমার ভিক্ষা, তোমার গৃহ, এ সকলে আমার কি প্রয়োজন? কাজের কথার উত্তর কর।"

"তাহাই ত বলিতেছি,—কাজের কথাই ত বলিতেছি। তাহার পর সেই দিন হইতে কেমন এক প্রকার ঘৃণা জন্মিল, সেই দিন অবধি দিনের

বেলা আর আমি ঘরের বাহির হই না। সন্ধ্যার পর পৃথিবী অন্ধকার হইলে নগরে যাই, সামান্য সামান্য লোকের কাছে যৎসমান্য ভিক্ষা পাই, বড় লোকের ত্রিসীমায় যাই না। গৃহস্থেরা দয়া করিয়া যাহা ভিক্ষা দেন, তাহাতে যাহা যাহা কিনিয়া আনিতে হয়, সংগ্রহ করিয়া আনি, এই পর্য্যন্ত। অভ্যাসমত আজ সন্ধ্যার পর বাহির হইয়াছিলাম। তোমরা উভয়ে যখন কথা কও, তখন আমি বনের ধারে দাঁড়াইয়া।"

"তাহাতে কি হইল? অন্ধকার বিজন পথে বনের ধারে দাঁড়াইয়া আমাকে তুমি কিরূপে চিনিলে? অপ্সরাসুন্দরীকেই বা—"

"শোন না বলি,—তাহাই ত বলিতেছি। তোমরা উভয়ে যখন কথা কও, তখন দুজনের মুখেই দুজনের নাম শুনিয়াছি। তোমার মনের যাহা অভিপ্রায়, আর তাহার মনের যেরূপ সঙ্কল্প, কথার ভঙ্গীতে তাহাও আমি বুঝিয়াছি।"

বিস্ময়ান্বিত হইয়া স্বর্ণভূষণ কহিলেন, "বুদ্ধিমান লোক বটে! আমার বোধ হইতেছে, তোমার দ্বারা কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারিবে। কিন্তু বল দেখি, কি উপায়ে—"

"তুমি বড় বাধা দিতেছ। ঐ শেষ কথাটীই বাকী আছে। কি উপায়ে আমি তোমার উপকার করিতে পারিব, সেই কথাটী তুমি শুনিতে চাও? সে অতি তুচ্ছ কথা। সে ভার আমার উপর। তুচ্ছ কথা!"

"সেইটীই প্রধান কথা।—তাহা যদি তুমি তুচ্ছ ভাবিয়া গোপন করিয়া রাখ, তবে আমি তোমাকে প্রতারক মনে করিব।"

"অর্থ আমার নিতান্ত প্রয়োজন। অর্থের উপরেই আমার পৃথিবীর সমস্ত স্বার্থ নির্ভর করে। শুদ্ধ সেই কারণেই এত কষ্ট সহ্য করিয়া তোমাকে আমি এখানে আনিয়াছি। আমি—"

"তাহা বুঝিয়াছি। কার্য্য সিদ্ধ হইলে প্রচুর পুরস্কার পাইবে। কিন্তু সেই উপকারের প্রকারটী কিরূপ, অগ্রে সেইটী আমি শুনিয়া রাখিতে চাই।"

অর্দ্ধদগ্ধ প্রকাণ্ড মস্তক সঞ্চালন করিয়া, নাকী সুরে হুঁ হুঁ করিয়া গান করিতে করিতে প্রকাণ্ড রঘুনন্দন ভঙ্গীক্রমে কহিতে আরম্ভ করিল,

পাঠক মহাশয় স্মরণ রাখিবেন, এই লোক এতক্ষন যত কথা কহিল, সমস্তই নাকী সুরে,—যাহার অর্দ্ধেক নাক নাই, স্বাভাবিকস্বরে কথা কহা তাহার পক্ষে কিরূপে সম্ভবে? সেইরূপ নাকী সুরে সেই লোক কহিতে লাগিল, "উপাঁয়?—বঁড় চঁমৎকার। তুঁমি এঁকখাঁনা পত্র পাঁইবে, সেঁই পঁত্রে লেঁখা থাঁকিবে, অঁমুক বাঁড়ীতে অঁপ্সরাসুঁন্দরী আঁছে। এঁখন বুঁঝিলে তঁ?"

"হাঁ! এ কৌশল অতি চমৎকার বটে! বিশ্বাস হইতেছে, তুমি পারিবে। আচ্ছা! কিছু অগ্রিম চাও?"

সেইরূপে মস্তক সঞ্চালন করিয়া রঘুনন্দন হুঁ হুঁ করিয়া কহিল, "অঁগ্রিম, অঁগ্রিম?—হাঁ হাঁ,—যাহাঁর বাঁড়ী," সেঁই লোঁক কিছুঁ ভাঁড়া না পাঁইলে—"

পাঁচটী স্বর্ণমুদ্রা বাহির করিয়া স্বর্গভূষণ কহিলেন, "এই লও! তাহাকে দিতে হয় দিও, নিজে রাখিতে ইচ্ছা হয়, রাখিও, কার্য্য শেষ হইলে উপযুক্ত পুরস্কার।"

রঘুনন্দন হস্ত বিস্তার করিল। হস্ত যেন ঠাঁই ঠাঁই সেলাই করা; কালসিটে পড়া। সেই হস্তে স্বর্গভূষণ পঞ্চ মুদ্রা অর্পণ করিলেন। কিন্তু সেই লোকের হস্ত, মুখ, মস্তক, ঐ প্রকার বিকৃত কেন, স্বর্গভূষণ তাহার কারণ বুঝিতে পারিলেন না। তাহার মুখপানে আবার অনেকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া গম্ভীরভাবে যেন কি চিন্তা করিতে লাগিলেন।

মুখের ভাব দেখিয়া রঘুনন্দন তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিল। শীঘ্র শীঘ্র জিজ্ঞাসা করিল, "আমার আকৃতি দেঁখিয়া তুঁমি বুঁঝি সন্দেহ কঁরিতেছ?—পুঁড়িয়া গিঁয়াছে।"

"পুড়িয়া গিয়াছে? কিরূপে পুড়িয়া গেল? কেহ কি পুড়াইয়া দিয়াছে?"

"না!—পুঁড়াইয়া দিঁবে কেঁ? কাঁহার এঁত বঁড় সাধ্য! আপনিই পুঁড়াইয়া দিঁয়াছি। আপনি আমি।"

হাস্য করিয়া মুখ বাঁকাইয়া ভঙ্গীক্রমে সর্ব্বশরীর সঞ্চালন করিয়া দুষ্টবুদ্ধি-সঞ্চালিত স্বর্গভূষণ কহিলেন, "সে কিরূপ?"

"কিঁরূপ?—তাঁও বুঁঝি জাঁন না? এঁকটা ঘঁরে আগুন জ্বঁলিয়াছিল, নিঁবাইতে গিঁয়াছিলাম।"

"তবে তুমি পরোপকারী লোক! পরের ঘরের আগুন নিবাইতে গিয়া আপনার অঙ্গ পুড়াইয়া ফেলিয়াছ!"

"তা না ত কি? এই আমার অভ্যাস; পরের উপকার করাই আমার অভ্যাস। তা যদি না হবে, তবে কি আমি সাধ করিয়া তোমার উপকার করিতে আপন ইচ্ছায় অতদূর যাই? সাধ করিয়া কি সেই অন্ধকার পথে তোমাদের গোপনীয় কথা শুনি? সাধ করিয়া নয়।"

"বাধিত হইলাম। তোমার তুল্য পরোপকারী বন্ধুর সহিত ভাগ্যক্রমে আজ আমার সাক্ষাৎ হইয়াছে। কথা স্মরণ রাখিও। আজ আমি বিদায় হইলাম।"

এই কথা বলিয়া কুমার স্বর্গভূষণ গৃহের দ্বার পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন। সেই স্থানে দাঁড়াইয়া ঘরের দিকে মুখ ফিরাইয়া সহাস্যবদনে কহিলেন, "রঘুনন্দন! আমি মনে করিয়াছিলাম, তুমি বুদ্ধিমান লোক, এখন দেখিতেছি, তুমি বোকা! ভারী বোকা!"

"কেন বল দেখি?"—তাড়াতাড়ি নিকটে গিয়া রঘুনন্দন কহিল, "কেন বল দেখি আমি বোকা? এতক্ষণ বুদ্ধিমান ছিলাম, এখন হঠাৎ বোকা হইলাম কিসে?"

"কিসে?"—হাস্য করিয়া স্বর্গভূষণ কহিলেন, "কিসে? মনে কর দেখি, তুমি বলিয়াছ, আমার কাছে একখানি পত্র যাইবে, তুমি ত আমার ঠিকানা জান না, কোথায় পত্র পাঠাইবে?"

"ওঃ! ভুল হইয়াছে! অমন ভুল সকলেরি হইয়া থাকে, তুচ্ছ ভুল!" মাথা নাড়িয়া রঘুনন্দন কহিল, "তুচ্ছ ভুল।"

"তুচ্ছ ভুলই বটে!"—এইরূপ ব্যঙ্গোক্তি করিয়া আশ্বাসে আশ্বাসে ঠিকানা বলিয়া দিয়া স্বর্গভূষণ বিদায় হইলেন। তথা হইতে বাহির হইয়া তিনি নিশ্বাস ফেলিয়া বাচিলেন। রজনীদেবী কৌমুদীমাখা। ধরণীদেবী কৌমুদীময়ী। মৃদু মৃদু বাতাস বহিতেছে, পবনদেব সুধাংশুদেবের সেই সুশীতল কর প্রকৃতিগাত্রে যেন ছড়াইয়া ছড়াইয়া দিতেছেন। সেই বাতাসে স্বর্গভূষণের শরীর জুড়াইল। প্রফুল্ল মনে তিনি শিবিরে প্রবেশ করিলেন।

চতুঃপঞ্চাশৎ প্রবাহ।

ভয়াবহ নূতন ফাঁদ!!!

ধূর্ত্তের চাতুরী বড় ধূর্ত্ততা সংসারে।
সাদা কালো, কালো সাদা করিবারে পারে ॥
কিন্তু সেই বিশ্বময় অনন্ত ঈশ্বর।
পাপপুণ্য সমস্তই তাঁহার গোচর ॥
অনাথের নাথ তিনি করুণানিধান।
তাঁর কাছে পাতকীর নাহি পরিত্রাণ ॥

ভারতবন্ধু।

ভূপেশচন্দ্রকে মধ্যে মধ্যে এক এক রজনীতে শিবিরে প্রহরিতা করিতে হইত। সেই সকল রজনী অপ্সরাসুন্দরী একাকিনী আবাসগৃহে অতি কষ্টে অতিবাহন করিতেন। যে রাত্রে রঘুনন্দনের সঙ্গে স্বর্ণভূষণের বিজন মন্ত্রণা, সেই রাত্রে ভূপেশচন্দ্র শিবিরেই ছিলেন। তদবধি অপ্সরার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই। পথে একাকিনী পাইয়া স্বর্ণভূষণ সেই রাত্রে অপ্সরাসুন্দরীর অনুসরণক্রমে ধাবিত হইয়া যেরূপ অপমান করিয়াছিলেন, ভূপেশচন্দ্র সুতরাং তাহা জানিতে পারেন নাই। পর দিন সন্ধ্যার সময় ভূপেশচন্দ্র নির্দ্দিষ্ট গৃহে, নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসিয়া আছেন, আর পাঁচসাত জন সৈনিক পুরুষ তাহার চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টিত হইয়া নানা প্রকার খোস্‌গল্প করিতেছে, কিন্তু তিনি কথা কহিতেছেন না। একজন কহিল, "এখানে বড় অবিচার।" দ্বিতীয় ব্যক্তি কহিল, "এ অবিচারের শেষ হইবে না। তৃতীয় ব্যক্তি বলিয়া উঠিল, "ভগবান যদি দিন দেন, আমরা ইহার শোধ লইব।" আর এক জন চুপি চুপি বলিল, "এই ভূপেশচন্দ্রকে আমরা বড় ভালবাসি। ইনি যেমন সাহসী, যেমন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, যেমন

ধার্ম্মিক, ইহাঁর প্রকৃতিও তেমনি শান্ত। মার্কিণ দেশে যেমন সকলের স্বাধীনতা আছে, এখানে যদি আমরা তেমনি স্বাধীনতা পাই, ভগবান যদি দিন দেন, আমরা সেনাপতি বাছিয়া লইব। এই ভূপেশচন্দ্রকেই আমরা সেনাপতি করিব।" এক জন বৃদ্ধ কহিল, "ও সকল কথা কথাই নয়, আমি স্থির করিয়া রাখিয়াছি, যে সকল লোক এখানে এখন উচ্চ পদস্থ, তাহারা বিদায় না হইলে আমরা সুখী হইতে পারিব না। কিছুতেই শান্তি পাইব না। আমরা—"

কথা সমাপ্ত হইবার অগ্রেই লিঙ্গেশ্বরের সহিত স্বর্গভূষণ সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। সুরাপানে গণ্ডস্থল লোহিতবর্ণ, নেত্রপুট অল্প অল্প নিমীলিত। প্রবেশ করিয়াই স্বর্গভূষণ স্বভাবসিদ্ধ ক্ষীণ কর্কশস্বরে কহিতে লাগিলেন, "তোমরা কি এখানে তামাসা করিতেছ? এই রকমেই কি তোমরা কর্ত্তব্য পালন কর? আচ্ছা! আমি দেখিব।"—ভূপেশচন্দ্রের দিকে নয়নভঙ্গী করিয়া সেইরূপ বিকৃতস্বরে কহিলেন, "তুমি না পাহারায় আছ? এই বুঝি সেই কার্য্য? এই বুঝি তোমাদের আমোদের স্থান? দাঁড়া! উঠিয়া দাঁড়া। কুকুর! মনে একটু ভয় রাখ না? আমাদেরই নিন্দা! আমাদেরই অপবাদ! আমাদেরই নামে দোষ! আমরা অবিচার করি? তুই———তোর নাম কি?"——যেন কিছুই জানেন না কস্মিনকালেও যেন পরিচয় নাই, এই রূপ ভাণ করিয়া ঘৃণাব্যঞ্জকস্বরে বারম্বার কহিলেন, "এমন অবাধ্য প্রহরী আমি চাই না। উপযুক্ত শাস্তি!—কি বল লিঙ্গেশ্বর?"

লিঙ্গেশ্বর কহিল, "ভারী দুষ্ট, ভারী বদমাস, বরাবর অবাধ্য, পলাতক আসামী!"

"অঁ্যা? পলাতক? শাস্তি পায় নাই? ইহার নাম কি?"

"ভূপেশ সিংহ।"

"ওঃ! ওঃ!" বিকৃত নয়নভঙ্গীতে ভূপেশের দিকে চাহিয়া স্বর্গভূষণ কহিলেন, "ইহারই নাম ভূপেশ সিংহ? এই লোকই পলাতক? শাস্তি পায় নাই? লিঙ্গেশ্বর! তুমি বল কি?"

যেন নাচিয়া উঠিয়া লিঙ্গেশ্বর কহিল, "শাস্তি? শাস্তি? বিলক্ষণ শাস্তি পাইয়াছে। দুইবার জেল খাটিয়াছে, দুইবার বেত খাইয়াছে।

তথাপি এমনি বদ্‌মাস, কিছুতেই দুরস্ত হয় না।" মুখ বাঁকাইয়া লিঙ্গেশ্বর কহিল, "ইহাকে সায়েস্তা করিবার কোন উপায় নাই বোধ হয়। দুই বার দুই বার!"

"অঁ্যা? বল কি লিঙ্গেশ্বর! দুই বার?"

"হাঁ হজুর! দুই বার। কেবল তাও না, তা ছাড়া দাগ পাইয়াছে। দাগী বদ্‌মাস্।"

"বটে! তবে ইহার অপরাধ ক্ষমার যোগ্য নয়। আবার অবাধ্য হইল। কেবল তোমার কাছেও নয়, আমার কাছেও।—দাঁড়াইতে বলিলাম, দাঁড়াইল না, গ্রাহ্যই করিল না।"

ভূপেশচন্দ্র এতক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া ছিলেন, প্রথমাবধি এপর্য্যন্ত একটীও কথা কহেন নাই। দুর্বিনীত লোকের কটুবাক্যে ক্রোধে সর্ব্ব-শরীর জ্বলিতেছিল, নয়নকোণ হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিনির্গত হইতেছিল, অতিকষ্টে অতি সাবধানে সে ভাব গোপন করিয়া ধীরস্বরে কহিলেন,—আসন হইতে উঠিলেন না, যেমন বসিয়া ছিলেন, সেইরূপ প্রশান্তভাবে বসিয়া বসিয়া উত্তর করিলেন, "আমি কোন অপরাধ করি নাই, কাহারও গ্লানি করি নাই, অবাধ্যতাও শিক্ষা করি নাই। শাস্ত্র—"

"অপরাধ?—গ্লানি?—অবাধ্যতা?—শাস্ত্র?—এত শুদ্ধ কথা এখানে? ভিখারীর আবার অভিধানে অধিকার কি?"

ভূপেশচন্দ্র অস্থির হইলেন। অপেক্ষাকৃত সতেজস্বরে কহিলেন, "কি? আমি ভিখারী?"

"আবার উত্তর? আবার অবাধ্য? আচ্ছা! থাক্ তুই। আমি তোরে বন্দী করিলাম! লিঙ্গেশ্বর! শীঘ্র ইহাকে বন্দী করিবার হুকুম দাও!"

এইরূপ হুকুম দিয়া মহাবীর স্বর্গভূষণ ঠিক যেন এক মহাযুদ্ধে জয়লাভ করিলেন, এইরূপ ভাবে বিকট চক্ষে ভূপেশের দিকে চাহিতে চাহিতে বিকট মুখে হাস্য করিয়া লিঙ্গেশ্বরের সহিত সেই গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া গেলেন।

ভূপেশচন্দ্র বন্দী। কারাগৃহে বন্দী নহেন, শিবিরের মধ্যে সেই গৃহেই নজরবন্দী। সৌভাগ্যক্রমে সেনাদলে তাঁহার বন্ধু অনেক ছিল। তাঁহার শান্ত প্রকৃতি আর সদ্ভাব কতকগুলি ভাললোকের মিত্রতা তাঁহার

হৃদয়কে অলঙ্কৃত করিয়া দিয়াছিল। বিনাদোষে বন্দী হইয়াও তিনি অধিক কাতর হইলেন না। কেবল কাতর হইলেন অপ্‌সরার জন্য। অপ্‌সরা তাঁহার নয়নের দীপ্তি, মানসের ছবি, হৃদয়ের শান্তি। অপ্‌সরাকে দেখিতে পাইবেন না, কেবল সেই চিন্তাই তখন বলবতী হইল। বসিয়া বসিয়া অনেকক্ষণ ভাবিলেন। ভাবনার সঙ্গে বেষ্টিত বন্ধুবান্ধবের সম্মতি লইয়া একখানি পত্র লিখিলেন।

পাঠক মহাশয় স্মরণ করিতে পারিবেন, ভূপেশচন্দ্রের একজন অকপট বন্ধুসৈনিকের বনিতা শতদ্রুতীরে বাস করেন। তিনি মধ্যে মধ্যে অপ্‌সরাকে সান্ত্বনা করিতে যান। সেই বন্ধুসৈনিক তৎকালে সেই গৃহে উপস্থিত ছিলেন। পত্র লেখা সমাপ্ত হইলে, ভূপেচন্দ্র সেই বন্ধুকে কহিলেন, ' মিত্রবর! অনেক সময়ে তুমি আমার অনেক উপকার করিয়াছ, তোমার সতীসাধ্বী দয়াবতী সহধর্ম্মিণী আমার অপ্‌সরাসুন্দরীর অনেক উপকার করিয়াছেন। কিন্তু এইবার আর একটী।—এইপত্রখানি সেই দয়াময়ীর হাতে দিয়া অপ্‌সরাকে অর্পণ করিতে বলিও।"

বন্ধু উত্তর করিলেন, "অনুরোধ বাহুল্য। তোমার উপকারে,—যদি যৎকিঞ্চিৎ উপকার করিতেও পারি, তোমার উপকারে আমার বড় আনন্দ হয়। আজ আমি শীঘ্রই এখান হইতে গৃহে যাইব। অল্পক্ষণের মধ্যেই আমার পত্নীর হস্তে স্নেহময়ী অপ্‌সরাসুন্দরী তোমার পত্র প্রাপ্ত হইবেন।"

ভূপেশচন্দ্রের বদনে অতিসুন্দর সন্তোষচিহ্ন দেখা দিল। বন্ধুকে নমস্কার করিয়া তিনি সেই পত্রখানি আপনার মনে একবার পাঠ করিলেন।

পত্রে লেখা হইলঃ—

"প্রিয়তমে!"

আমাদের বড়ই দুর্ভাগ্য! গ্রহদেবতারা আমাদের প্রতি নিতান্তই অপ্রসন্ন। পদে পদেই আমি বিপদে পড়িতেছি। দুষ্ট স্বর্গভূষণ পুনরায় আমারে বন্দী করিয়াছে। অকারণে বিনাদোষে আবার আমি বন্দী। এক রাত্রের জন্য নয়, কত দিন যে আমি তোমারে দেখিতে পাইব না, ঈশ্বর জানেন! পাপিষ্ঠ স্বর্গভূষণ আমাকে ভিকারী বলিয়াছে! ইহার

প্রতিশোধ যদি কিছু থাকে, ভগবান তাহা প্রেরণ করিবেন। প্রাণাধিকে! লিখিবার ইচ্ছা ছিল না, তোমার স্নেহকাতর কোমল অন্তঃকরণকে ব্যথা দিবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু বড় অধৈর্য্য হইয়াছি। চিত্তবেগ দমন করিতে পারিতেছি না। এই ঘৃণিত নরকুক্কুর স্বর্গভূষণ বড় ভয়ানক লোক। সে তোমার বিমাতাকে লোভ দেখাইয়া গৃহ হইতে বাহির করিয়াছে। রাজা বিরাটকেতু তাহার নামে নালিস করিয়াছেন, সাক্ষাৎ হইলে সমস্ত কথা প্রকাশ করিব। তুমি সাবধানে থাকিও। আমি এই বিপদ হইতে ঈশ্বর-কৃপায় শীঘ্রই মুক্ত হইতে পারিব। শীঘ্রই পুনরায় সাক্ষাৎ হইতে পারিবে। আজ এই পর্য্যন্ত।

তোমার

ভূপেশচন্দ্র।"

বন্ধুসৈনিক বিধিমত সান্ত্বনা করিয়া পত্রখানি গ্রহণপূর্ব্বক বিদায় হইলেন। ভূপেশচন্দ্র চিন্তা-নিমগ্ন। কি যে তখন তাঁহার হৃদয়ের চিন্তা, তাহা তিনি ভিন্ন, অপ্সরা ভিন্ন পৃথিবীতে আর কেহই জানে না। তবে কোথায় কে জানেন? যিনি সর্ব্বান্তর্যামী জগদীশ, তিনি।

চিন্তায় চিন্তায় একদণ্ড অতীত। চিন্তায় চিন্তায় অন্য লোকের সহিত কথা হইতেছে। কথা কি?—শুদ্ধ হাঁ আর না। এই ছোট ছোট কথা ছাড়া কাহারও সহিত ভূপেশচন্দ্র মন খুলিয়া বেশী কথায় আলাপ করিতে পারিতেছেন না। যে হৃদয়ে অকপট প্রণয় থাকে, সে হৃদয় সে অবস্থায় তাহা কখনও পারেও না।

এক অভাবনীয় ঘটনা। একটী অপরিচিত অষ্টম বর্ষীয় বালক সহসা সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। হস্তে একখানি ক্ষুদ্র পত্রিকা। ব্যগ্রহস্তে ভূপেশচন্দ্র সেই পত্রিকাখানি গ্রহণ করিয়া উন্মোচনপূর্ব্বক পাঠ করিলেন। কাহার প্রেরিত পত্র? সে পত্রে কি লেখা? পাঠক মহাশয়কে সে নির্ঘণ্ট অপরিজ্ঞাত রাখা গ্রন্থকারের অকর্ত্তব্য। পত্রে লেখা আছে:—

"জীবন!

তোমার পত্র পাইলাম। এই অভাগিনীর ভাগ্যদোষেই,—এই অভাগিনীর অদৃষ্টফলেই তোমার এত বিপদ। প্রাণাধিক। তুমি কুশলে থাক,

দিবারাত্রি ইহাই আমার কামনা। কিন্তু কেমন দৈব বিড়ম্বনা, মায়াবেলীর কেমন ছলনা, শান্তিদেবী আমাদিগকে শান্তিময় শ্রীচরণে স্থান দান করিতেছেন না। প্রাণসর্ব্বস্ব! সংসারসর্ব্বস্ব! দুরাত্রি তোমারে আমি দেখি নাই। গৃহ অন্ধকার হইয়া রহিয়াছে। যেদিকে চাহিয়া দেখি, সেই দিকেই ঘোর অন্ধকার। মনোময়! যে ধূর্ত্ত শৃগাল তোমারে অকারণে যন্ত্রণা দিতিছে, পরমেশ্বর তাহাকে নবকে বাখিবেন। দেব! বিপদে অবসন্ন হইও না। বিপদেব এক বন্ধু আছেন। তাঁহার নাম অনাথের নাথ। দীন জনের পরমবন্ধু। তিনি রক্ষা কবিবেন। আশা পরিত্যাগ করিও না। শুভদিন আসিতেছে, শুভদিন আসিবে, সে দিনে আমরা যে কত সুখে সুখী হইয়া সেই অনন্ত মঙ্গলময়কে মানসমন্দিবে পূজা করিতে পারিব, তাহা মনে করিলেও,—কল্পনা কবিলেও শরীর রোমাঞ্চিত হয়। "তুমি জান, আমি জানি, আশা চপলা। কিন্তু সে চপলাকে তুমি যেন পরিত্যাগ করিও না।

"প্রাণাধিক! তোমার পত্রের একটী কথা আমার প্রাণে বড় ব্যথা দিল। ধূর্ত্ত শৃগাল স্বর্গভূষণ আমার নূতন মাতাকে বিপথে লইয়া গিয়াছে। আহা! হা আমার অভাগা পিতা! এই বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার কি দশা হইবে? জীবনেশ্বর! কি যেন আমি ভুলিয়া যাইতেছি। কত দিন তোমারে দেখিতে পাইব না,—সে কি কথা? হৃদয়দর্পণে মুহুর্মুহু আমি তোমারে দেখি। তুমি কি মনে কর, অন্তরে থাকিলে অন্তবে আমি তোমারে দেখিতে পাই না? হৃদয়েশ! আর লিখিতে পাবিলাম না। চক্ষের জলে কাগজখানি ভিজিয়া গেল। রাত্রের মত এই পর্য্যন্ত।

চরণের চিরদাসী

অপ্সরা।"

পত্র পাঠ করিয়া ভুপেশচন্দ্র দুই হস্তে দুই চক্ষু আবরণ করিলেন। মৃদু কণ্ঠে কহিলেন, "বালক! তুমি যাও, যদি দেখা হয়, আমার আশীর্ব্বাদ দিয়া বলিও, রজনী প্রভাতে নূতন কথা।"

বালক চলিয়া গেল। আরও অর্দ্ধদণ্ড।—আরও অর্দ্ধদণ্ড ধ্যানচিন্তার অবসর। আশ্চর্য্য দেখ! সেই বালক আবার সম্মুখে। হস্তে আর একখানি পত্র।

মৌনভাবে চিন্তা করিতেছিলেন, পত্রহস্তে বালককে শীঘ্র প্রত্যাগত দর্শন করিয়া ভূপেশচন্দ্রের মুখে নূতন কথা ফুটিল। "তুমি কি এত শীঘ্র গিয়াছিলে? এত শীঘ্র ফিরিয়া আসিলে?"

বালক কথা কহিল না। পত্রখানি হাতে দিল। বিত্রস্ত হস্তে আবরণ মোচন করিয়া ভূপেশচন্দ্র পাঠ করিলেন। সর্ব্বনাশ! পত্র বলিতেছে,—

"ভূপেশচন্দ্র। তোমার নাম ভূপেশচন্দ্র, তাহা আমি শুনিয়াছি। অপ্সরাসুন্দরী বিপদে। মহাকুচক্র! ভয়ানক ষড়্‌যন্ত্র! সতীত্ব সঙ্কটাপন্ন। ঘরে যাইও না. অপ্‌সরা ঘরে নাই। ঘরে অপ্‌সরাকে দেখিতে পাইবে না। বাড়ীতে যাহারা থাকে. তাহারাও বলিতে পারিবে না, অপ্‌সরা কোথায় গিয়াছে। যদি পার, শীঘ্র বাহিরে আইস। শিবিরের পঁচিশ ত্রিশ হস্ত দক্ষিণে আমি দাঁড়াইয়া আছি, সাক্ষাৎ কর। সমস্তই ঠিক হইবে।

একজন বন্ধু।"

হাতের লেখা চিনিতে পারিলেন না, অথচ ধৈর্য্যসূত্রে মনকেও বাঁধিতে পারিলেন না। সামরিক পোষাকেই উন্মত্তের ন্যায় ভূপেশচন্দ্র গৃহ হইতে বাহির হইলেন। যে সকল সৈনিক পুরুষ নিকটে ছিল, তাহারা ব্যস্ত হইয়া কহিল, "কর কি ভূপেশচন্দ্র? কর কি? অকস্মাৎ তুমি কি পাগল হইলে?" সেই পূর্ব্বপরিচিত বৃদ্ধ সৈনিক কহিল, "তুমি বন্দী, সে কথা মনে পড়ে কি? বিবেচনা করিয়া কাজ কর।"

ভূপেশচন্দ্র কাহারও কথায় উত্তর দিলেন না।

"তীর তারা উল্কাপাত শীঘ্রগামী যারা।"—

তাহারাও তাঁহার বেগের নিকট পরাজয় মানিল। ফটক পার হইয়া ভূপেশচন্দ্র একেবারেই রাস্তায়। উত্তর দক্ষিণ জ্ঞান ছিল না, তথাপি যেন কোন স্বর্গীয় উপদেশে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর। একজন মানুষ পাইচারি করিতেছিল। দেখিয়া মনে করিলেন, এই সেই।—ঘন ঘন হাঁফাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি আমাকে পত্র লিখিয়াছ? আমার নাম ভূপেশচন্দ্র।"

ছায়ার আবরণে মুখ লুকাইয়া সেই লোক কহিল, "শীঘ্র এসো! শীঘ্র

এসো! আমার সঙ্গে এসো!" কথা বলিয়াই দ্রুতপদবিক্ষেপে সেই লোক দক্ষিণ দিকে যেন ছুটিয়া চলিল। ভূপেশচন্দ্রও যেন মরিয়া হইয়া সঙ্গে সঙ্গে ছুটিলেন। বহিজ্ঞান পরিশূন্য। পথপ্রদর্শকের চেহারা দেখিতে পাইলেন না, দেখিবার অবসর থাকিলেও দেখিতে পাইতেন না। সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত, নাসিকা পর্য্যন্ত বস্ত্রে ঢাকা। খানিক দূর যাইয়া লোকটী একটা গৃহের ছায়ার দিকে মুখ ফিরাইয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল। যেন কতই সাবধান। যাঁহাকে সঙ্গে করিয়া আনিতেছে, তিনি যেন তাহার মুখ দেখিতে না পান, এইরূপ সাবধান। অদৃশ্য থাকাই যেন আকিঞ্চন।

ভূপেশচন্দ্র নিকটবর্ত্তী।

লোকটী কহিল, "দেখ ভূপেশচন্দ্র! আর অধিক দূর নাই। নিকটেই সেই বাড়ী। তুমি গিয়া,—আমি দেখাইয়া দিব,—তুমি গিয়া জোরে জোরে সদর দরজায় ধাক্কা দিও। অবশ্য কেহ না কেহ দ্বার খুলিয়া দিবে, তুমি তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিও না। জিজ্ঞাসা করিলে সত্য উত্তর পাইবে না। যদি পথরোধ করে, ধাক্কা মারিয়া ফেলিয়া সরাসর তুমি উপরে উঠিয়া যাইও। একটা ঘরের সম্মুখে সামাদানে একটা বাতী। সেই ঘরে অপ্সরা আছে। দরজা যদি বন্ধ থাকে, লাথী মারিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিও। গৃহে প্রবেশ করিয়াই দেখিতে পাইবে, যাহা—যাহা—যাহা।"

এইরূপ পরামর্শ দিয়াই পূর্ব্ববৎ মুখ লুকাইয়া সেই লোক তীরবেগে পশ্চিমদিকের পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। সমান বেগে সঙ্গে সঙ্গে ভূপেশ-চন্দ্র। বামদিকে একখানা বাড়ী। সেই বাড়ীর নিকটে গিয়া সেই লোক কহিল, "এই বাড়ী। যাহা বলিলাম, তাহাই করিও, আর আমি দাঁড়াইতে পারিব না।"

"একটু দাঁড়াও, আর একটী কথা জিজ্ঞাসা।"

"আমি ত আর কোন জিজ্ঞাসার উত্তর জানি না। যে দুটী ছোট কথা জানিতাম, বলিয়াছি। আপনার কার্য্য আপনি কর। সময় যায়, বিলম্ব করিও না।" অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া চুপি চুপি কর্ণে কর্ণে এই কয়েকটী শব্দ বর্ষণ করিয়া লোকটী ছুটিয়া পলাইল। ভূপেশচন্দ্র তাহাকে ভাল করিয়া দেখিবার অবসরও পাইলেন না।

অবসরের আর অবসর কোথায়? জগৎ যেন শূন্যময়। সমস্ত জীবের রক্ত যেন এক শরীরে আবির্ভূত। নয়নে যেন ব্রহ্মাণ্ডের খেলা। হৃদয়ে আশা, নিরাশা, সাহস, উৎসাহ, ঘৃণা, ক্রোধ, অনুতাপ, এই সমস্তের সমষ্টি। ব্রহ্মাণ্ড যেন ঘুরিতেছে। আর কেন বিলম্ব? পুনঃ পুন সজোরে দ্বারে আঘাত।

একজন স্ত্রীলোক আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। জোর জোর আঘাত শুনিয়া ভাবিয়াছিল, চেনা লোক। শেষে দেখিল অচেনা।

ভূপেশচন্দ্র তাহাকে এক পার্শ্বে রাখিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিতে যাইতেছিলেন, দ্বারমুক্তকারিণী তাঁহার গাত্রবসন ধারণ করিয়া চোর চোর বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। চীৎকারকারিণী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক। গোল মুখ, এলো চুল, বদন রক্তবর্ণ। "তুই মাগি বুঝি মুখে আলতা মেখেছিস্?" ব্যঙ্গচ্ছলে এই কথা বলিয়া সজোরে ধাক্কা মারিয়া তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া ভূপেশচন্দ্র গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বুড়ীটা অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া রহিল। সেই সময় আর এক জোড়া যুবতী অন্য গৃহ হইতে বাহির হইয়া চীৎকার আরম্ভ করিতেছিল, ভূপেশচন্দ্র তখন দ্বিতলের অর্দ্ধেক সিঁড়ি অতিক্রম করিয়াছেন। কে কোথায় তখন, কে দেখে? ভূপেশচন্দ্র বারাণ্ডায়। সঙ্কেতস্থলে বাতী। লক্ষ্য স্থল লক্ষ্য করিয়া ভূপেশচন্দ্র দ্বারসমীপে উপস্থিত। বাহির হইতে দ্বার অবরুদ্ধ। সজোর পদাঘাতে দ্বার ভগ্ন করিয়া ধর্ম্মবল-সহায় বীরবর ভূপেশচন্দ্র সেই নরকনিবাসে প্রবেশ করিলেন।

"হায়! হায়! কি হইল! কি হইল! কি করিতেছিলাম! কি হইল! ভগবান রক্ষা করিলেন। মানুষকে খুন করিতে হইল না, আমার ভূপেশচন্দ্র উপস্থিত। অস্ফুটকণ্ঠে এই কথা বলিতে বলিতে আমাদের আদরিণী তেজস্বিনী বীরাঙ্গনা নায়িকা অপ্সরাসুন্দরী আমাদের মহাসমাদরপাত্র মহাসাহসী মহাবীর ভূপেশচন্দ্রের চরণতলে আসিয়া শয়ন করিলেন। ঠিক যেন অচেতন। কটাক্ষভঙ্গীতে ভূপেশচন্দ্র দেখিলেন, দূরের এক আসনে দুরাত্মা স্বর্গভূষণ। ব্যস্ত হইয়া অপ্সরাকে একটু সরাইয়া রাখিয়া প্রজ্জ্বলিত ক্রোধহুতাশনে প্রজ্জ্বলিত হইতে হইতে স্বর্গভূষণের সম্মুখে সদর্পে দণ্ডায়মান হইলেন।—একটু দূরে,—একটু তফাতে।—সে পাপকলঙ্কিত গাত্র যত শীঘ্র না স্পর্শ করিতে হয়, তাহাই তাঁহার মনে মনে।"

স্বর্গভূষণ যেন নাচিতে নাচিতে অসিকোষ হইতে অসি নিষ্কোষিত করিয়া ভূপেশের সম্মুখে নাচাইতে লাগিলেন। ক্ষীণস্বরে গর্জ্জন করিয়া,—ক্ষীণস্বরে যদি গর্জ্জন সম্ভবে,—সেইরূপ গর্জ্জন করিয়া স্বর্গভূষণ কহিলেন, "যেখানে আছিস্, সেই খানেই থাক্। আর একটু আগুয়ান হইলেই খুন করিব। কাটিয়া ফেলিব!"

ভীষণ ব্যাঘ্রের মত লম্ফ প্রদান করিয়া ভূপেশচন্দ্র স্বর্গভূষণের হস্তের তরবারি কাড়িয়া লইলেন। পঞ্চমবর্ষীয় শিশুর হস্ত হইতে বীরপুরুষেরা যেরূপে খেলিবার লাটিম কাড়িয়া লন,—যদি সম্ভব হয়, বিড়ালের মুখ হইতে সিংহ যেরূপে বন্য শিকার কাড়িয়া লয়, ভূপেশচন্দ্র সেইরূপে অতি সহজে অবলীলাক্রমে সেই তরবারি কাড়িয়া লইলেন। কিন্তু কেন? কাটিবার জন্য?—না। নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে সেই শত্রুহস্তের তরবারি চারিখণ্ড করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন।

যে লোক প্রহার করিতে আসিতেছিল, ভূপেশচন্দ্র তাহাকে প্রতি-প্রহার করিলেন না কেন? মূর্খ পাঠক হয় ত এ কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন; কিন্তু যাঁহারা এই পবিত্র আর্য্যবর্ষের মহিমা জানেন, যাঁহারা ক্ষত্রিয় কুলমর্য্যাদার গৌরব জানেন, তাঁহারা বলিবেন, বিনাযুদ্ধে ক্ষত্রিয় বীরপুরুষেরা কোন স্থানে রক্তপাত করেন না। বিনাযুদ্ধে ভূপেশচন্দ্র রক্ত-পাত করিলেন না। তরবারি ভাঙ্গিয়া স্বর্গভূষণের ললাটে এক বজ্রমুষ্টি প্রহার করিলেন। মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া মহাবীর (!!!) স্বর্গভূষণ ভূমিতলে পড়িয়া গেলেন! মরিলেন কি বাঁচিয়া রহিলেন, ভূপেশচন্দ্র সে দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন না। উন্মত্তভাবে অপ্সরাসুন্দরীর হস্তধারণপূর্ব্বক তাড়িত গতিতে উপর হইতে নামিয়া আসিলেন। বহির্দ্বারের নিকটে দেখিলেন, সেই দুটী স্ত্রীলোক রক্তবদনা মূর্চ্ছিতা বৃদ্ধাকে ধরাধরি করিয়া ঘরে আনিতেছে। মরা কি বাঁচা, ভ্রূক্ষেপ করিলেন না, চাহিয়া দেখিলেন মাত্র। নেত্রনিমেষে বহির্গত। এই কথাগুলি বলিতে যতক্ষণ গেল, কার্য্য সমাধা হইতে তাহার শতপঞ্চমাংশ সময়ও লাগিল না।

স্বর্গভূষণ অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া রহিলেন। মরিলেন, কি বাঁচিলেন, জানিবার আবশ্যক হইল না। ভূপেশচন্দ্রেরও না, অপ্সরাসুন্দরীরও না।

উভয়ে আশ্রমে উপস্থিত। পূর্ব্বে একটী কথা বলিতে ভুল হইয়াছিল। দুশ্চারিণী বুড়ীর সঙ্গে অপ্সরা যখন গৃহ হইতে বাহির হইয়া যান, তখন দ্বাররুদ্ধ করিবার অবসর হয় নাই। অপ্সরা বলিতে পারেন, অবসর হয় নাই; কিন্তু আমরা বলি, অবসর পান নাই। গৃহস্বামিনীকে বলিয়াছিলেন, যতক্ষণ ফিরিয়া না আসি, ততক্ষণ তুমি গৃহ রক্ষা করিও। অনুরোধবাক্য প্রতিপালিত হইয়াছিল।

ভূপেশচন্দ্রের সহিত অপ্সরাসুন্দরী গৃহে প্রবেশ করিলেন। গৃহস্বামিনী তাঁহাদিগের সেইরূপ অবস্থা দর্শন করিয়া ভয়ে, বিস্ময়ে, সন্দেহে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। ভাব দেখিয়া ভূপেশচন্দ্র কহিলেন, "তুমি মা এখন ঘরে যাও। আমরা আসিয়াছি, তোমাকে আর এখানে থাকিয়া কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে না।"

গৃহস্বামিনী সত্য ঘটনা বুঝিতে না পারিয়া সংশয়সাগরে ভাসিতে ভাসিতে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। অপ্সরাসুন্দরী এতক্ষণের পর চক্ষের জল ফেলিলেন। যাঁহাদের হৃদয়ে ধর্ম্মবন্ধন দৃঢ়, বিপদকালে তাঁহারা চক্ষের জল ফেলেন না। চক্ষের ভিতর সাগর আসিলেও বাহিরে একবিন্দু অশ্রুপাত হয় না। এটী বড় চমৎকার রহস্য। এ রহস্য দেবতারাও অতি অল্প বুঝিতে পারেন। তারা সতী, অহল্যা সতী, এ রহস্য অতি অল্পই বুঝিয়াছিলেন; সাবিত্রীসতী, সীতাসতী, দময়ন্তীসতী, বেহুলাসতী, ইহা অধিক বুঝিয়াছিলেন। অপ্সরাসতীও অধিক বুঝিয়াছেন। বিপদে চক্ষে জল ছিল না, এখন নিরাপদে চক্ষে জল।

ভূপেশচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "সতি!—আমার জীবনপ্রতিমা অপ্সরা-সতি! বল দেখি, এ সকল কি? আমি ত অন্ধকারে রহিয়াছি। কিছুই ত জানিতে পারিতেছি না। এত অল্প ক্ষণের মধ্যে এ সকল কি কাণ্ড হইয়া গেল?"

"একটু স্থির হও। জীবিতেশ্বর! একটু স্থির হও। আমারে নিশ্বাস ফেলিতে দাও বাঁচিয়া রহিয়াছি, আমার জ্ঞান আছে, চৈতন্য আছে,—, তথাপি এখনও যেন আমি অজ্ঞান, অচৈতন্য। তোমারে দেখিতে পাই-য়াছি, সেই জন্য কথা ফুটিতেছে। তোমারে দেখিতে পাইয়াছি, সেই জন্য

আমার চক্ষু ফুটিতেছে। কিন্তু প্রাণাধিক! মনে কর, কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইতেছিল!"

অপ্সরাসুন্দরী কাঁদিলেন। ভূপেশচন্দ্র কাঁদিলেন। একটু শান্ত হইয়া আমাদের ভূপেশচন্দ্র একহস্তে অপ্সরার চক্ষের জল মুছাইয়া, অন্য হস্তে আপনার চক্ষের জল মুছিলেন। উভয়ের চক্ষুই রক্তবর্ণ;—উভয়ের নাসিকাতেই ঘন ঘন নিশ্বাস।

প্রকৃতি সতি! তুমি কি মা এত চক্ষের জল দেখিতে ভালবাস? শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ের এতদূর নির্ব্বেদ তুমি কি ভালবাস? পরিতপ্ত নাসিকায় দীর্ঘ দীর্ঘ নিশ্বাস শুনিতে তুমি কি মা এতই ভালবাস? মা! তবে আমরা শান্তি কোথায় পাইব? শান্তি তোমার মেয়ে। শান্তিকে দেখিতে পাইলে অশান্তি-নিকেতনে আমরা জুড়াইয়া থাকি। কিন্তু মা! শান্তি আজ আমাদের কোথায় গেল? তুমি দেবী স্বর্গে রহিয়াছ; কিন্তু মা ত! তুমি প্রকৃতি, সমভাবে ত্রিভুবনে তুমি বিরাজ কর। তুমি স্বর্গে গিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবে কিরূপে? তুমি আমাদের কোলে কর, সেই জন্য শান্তি আমাদিগকে কোলে করেন। হয় তুমি থাক, না হয় শান্তিকে রাখিয়া যাও। উভয়ে স্বর্গে গেলে আমরা বাঁচিব না। "অপ্সরা!"—আকাশপানে মুখ করিয়া ভূপেশ-চন্দ্র কহিলেন, "অপ্সরা! তুমি কি আমার শান্তি? তুমি কি আমার অমরাবতীর দেবী?—বল দেখি দেবি এ বাক্যের এত স্পষ্ট কি?"

আবার ঘন ঘন নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া অপ্সরাসুন্দরী কহিলেন, "জীবন! কিছু কি তুমি জান না? মনে আছে, তোমার সঙ্গে আমি শিবিরের ফটক পর্য্যন্ত গিয়াছিলাম?"

"আছে।"

"আছে তোমার মনে প্রাণেশ্বর! উঃ! কি মহা সঙ্কট! একটা রাক্ষস! কে যেন একটা রাক্ষস! বলিতে এখনও গা কাঁপে। বৃক্ষতলে লুকাইয়া আমি দাঁড়াইয়া ছিলাম, রাক্ষস আসিয়া দেখা করিল। সঙ্গে সঙ্গে আসিল। অনেক দূর আসিল। পন্থা পরিত্যাগ করিয়া আমি নূতন নূতন বক্র পন্থা ধরিলাম। তথাপি সঙ্গ ছাড়িল না। কে জান সে? পাপাশয় স্বর্গভূষণ। গালাগালি দিয়া দূর করিলাম। কত যে কথা বলিয়াছিল, তোমাকে

তাহা বলিব না। রাত্রি আমার সখী হইয়া নিরাপদে রক্ষা করিয়াছে। দিন আমার সখা হইয়া নিরাপদে রক্ষা করিয়াছে, কিন্তু ভূপেশ! নূতন রজনীতেই এই অনর্থ। সন্ধ্যার পর তোমার পত্র পাইলাম। উত্তর লিখিয়া পাঠাইলাম। তাহার একটু পরেই এক বুড়ী আসিল। তোমার চিন্তায় তাহার চেহারা আমি ভাল করিয়া দেখিলাম না। সে চেহারা আমার চক্ষে নূতন। কেন যে দরজা খুলিয়া দিয়াছিলাম, জানি না। যেন রক্ত-মাখা মুখ। সে আমারে কহিল, 'তুমি কি রাজা বিরাটকেতুর কন্যা? তোমার নাম কি অপ্সরাসুন্দরী?'—আমি কাঁদিলাম। মনে করিলাম, বুড়ী বুঝি প্রয়াগধাম হইতে আসিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, পিতা কেমন আছেন? বুড়ী কহিল, 'তাহার বড় শক্ত পীড়া। বোধ হয় বাঁচিবেন না।' আমার চক্ষের জল আরো প্রবলবেগে প্রবাহিত হইল। বুড়ী কহিল, 'মৃত্যুকালে তিনি তোমাকে একবার দেখিতে চাহেন।' আমি যেন আপনাকে আপনি ভুলিয়া গিয়া কাতরভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি কোথায়?—ছলনাকারিণী মায়াবিনী উত্তর করিল, 'তিনি এইখানে। এই সহরে। সঙ্কটাপন্ন পীড়ায় শয্যাগত। তুমি কোথায় থাক, কোথায় আছ, সন্ধান জানেন না। আমার বাড়ীতে বাসা লইয়াছেন। আমি যত্ন রাখিয়াছি, অনেক অনুসন্ধান করিয়া তোমার ঠিকানা জানিতে পারিয়াছি; তোমাকে লইতে আসিয়াছি; যদি পিতাকে দেখিবার বাসনা থাকে, আমার সঙ্গে এসো।' আমি পাগলিনী, জানই তা, আমি তাহার সঙ্গে গিয়াছিলাম। পিতার সঙ্কটাপন্ন পীড়া শুনিলে কোন্ নির্দয়া তনয়া বিভ্রান্ত না হয়? ভূপেশচন্দ্র! বুঝিতেই পারিতেছ, তখন আমার বিবেচনা করিবার সময়ও ছিল না, শক্তিও ছিল না। পিতাকে দেখিতে যাইতেছি, তাঁহার আসন্নকাল, বক্ষঃস্থল কাঁপিতেছিল;—একে তোমার চিন্তায় হৃদয় অত্যন্ত ভারি, তাহার উপর সেই নিদারুণ সংবাদ। একান্ত অস্থির চিত্তে সেই বুড়ীর সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। যে বাড়ীতে তুমি আমারে দেখিলে, সেই বাড়ীতে বুড়ী আমারে লইয়া গেল। সেই ঘরে আমারে একাকিনী রাখিয়া বুড়ী বাহির হইল। বলিয়া গেল, "আসিতেছি।" কেবল আসিতেছি ভিন্ন আর কোন কথা কহিল না। আমি বসিয়া রহিলাম। গৃহ হইতে

বাহির হইয়াই সেই ডাকিনী বাহির দিক হইতে ঝন্‌ঝন্‌ শব্দে দরজা বন্ধ করিয়া দিল। শব্দে বুঝিলাম, চাবী বন্ধ করিল। বিদ্যুৎগতিতে আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম। পদতল হইতে মস্তকের কেশ পর্য্যন্ত কাঁপিতে লাগিল। দারুণ সন্দেহ আসিয়া আমার হৃদয় অধিকার করিল। বিশ্বাসঘাতিনী কি যে কুচক্রজালে আমাকে বন্দী করিয়াছে, তাহা তখন ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু নিশ্চয় বুঝিলাম, কুচক্র। ভয়, সংশয়, ঘৃণা, এই তিন একত্র হইয়া তৎকালে আমার চঞ্চল চিত্তকে আরও চঞ্চল করিয়া তুলিল। আমি যেন উন্মাদিনী হইলাম। চীৎকার করিয়া ডাকিলাম। কেহ উত্তর দিল না;—কেহই আসিল না। ক্রমশই আমার ভয় বৃদ্ধি হইতে লাগিল। কম্পিত হৃদয়ে, অস্থিরপদে গৃহের ইতস্তত যেন ক্ষিপ্তের ন্যায় পরিক্রমণ করিতে লাগিলাম। ঘরে আলো ছিল। দেখিলাম, পূর্ব্ব-ধারে একখানি খাট, সেই খাটে মশারি ফেলা। মনে করিলাম, পিতা হয় ত সেই খাটে নিদ্রা যাইতেছেন। শয্যার নিকটে গিয়া মশারির আবরণ উত্তোলন করিয়া দেখি শূন্য শয্যা। আরও সন্দেহ বৃদ্ধি হইল। সন্দেহের সঙ্গে ভয়। আবার চীৎকার করিয়া ডাকিলাম। কাহারও সাড়াশব্দ পাইলাম না। একটু পরে সিঁড়িতে মানুষের পদধ্বনি, দ্রুত দ্রুত পদধ্বনি। মনে একটু আশ্বাস জন্মিল। ভাবিলাম, এই বার আসিতেছে, এই বার দরজা খুলিয়া দিবে, পিতা যে ঘরে আছেন, সেই ঘরে লইয়া যাইবে। তবে কুচক্র নয়; বিশ্বাসঘাতকতা নয়; আমার ভুল হইতেছিল। বয়স হইয়াছে, বৃদ্ধ হইয়াছে, আমি কোন অপরাধ করি নাই, কেন সে বুড়ী আমার সঙ্গে ছলনা করিবে? ঐ আসিতেছে।

ভাবিতেছি, এমন সময় অতি সাবধানে দ্বার মুক্ত হইল। সাক্ষাৎ নরকের পিশাচ সদৃশ, কালকূট হলাহলবর্ষী ভয়ানক কালসর্প সদৃশ এক মূর্ত্তি সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। ভয়ে ভয়ে চাহিয়া দেখিলাম, পাপিষ্ঠ স্বর্গ-ভূষণ আমার সম্মুখে উপস্থিত! তাহাকে দেখিয়া ক্ষণকালের জন্য ভয়ে আমার হৃৎকম্প হইল। কিন্তু ভূপেশচন্দ্র! না বলিলেও তুমি বুঝিতে পারিবে, সে আশঙ্কা ক্ষণস্থায়িনী। ভয় অপেক্ষা তখন আমার হৃদয়ে ক্রোধের বেগ অধিক; ঘৃণামিশ্রিত ক্রোধ।—জান তুমি, গৃহ হইতে বাহির

ছুঁইবার সময় কদাচ আমি নিরস্ত্র থাকি না। ছলনাকারী দুষ্ট লোকের দুষ্কার্য্যের পুরস্কার কিরূপে দিতে হয়, আমার তীক্ষ্ণধার ছুরিকা তাহা ভালরূপেই অভ্যাস করিয়াছে। শঙ্কার ভাগ লঘু হইয়া ক্রোধের ভাগ গুরু হইল। ক্রোধের সঙ্গে অসম সাহস।

স্বর্গভূষণ কপট মায়া দেখাইয়া মিষ্ট মিষ্ট প্রলোভনবাক্যে আমারে ভুলাইবার চেষ্টা পাইতে লাগিল। যখন দেখিল, আমার ক্রোধানলে সমস্ত চেষ্টা ভস্ম হইয়া গেল, তখন অন্য অস্ত্র সন্ধান করিয়া উগ্র বাক্যে ভয় দেখাইতে আরম্ভ করিল। সে সময় সে ক্ষেত্রে যাহা করা উচিত, আমি অগত্যা তাহাই অবলম্বন করিতে বাধ্য হইলাম। বক্ষবস্ত্রের মধ্য হইতে যম দূতী ছুরিকাখানি বাহির করিলাম। এই স্থানে বলা আবশ্যক, সেই ঘৃণিত পাপিষ্ঠ লম্পট প্রবেশ করিবা মাত্র বাহির দিক হইতে পুনরায় প্রবেশদ্বারে চাবী পড়িয়াছিল। উপযুক্ত অবসরেই তুমি দ্বার ভগ্ন করিয়া স্বর্গীয় দেবভাবে আমারে দর্শন দিলে। সাহসে সম্মুখে চাহিয়া দেখি, তুমি!”

একটীও কথা না কহিয়া, কিছুমাত্র বাধা না দিয়া কুমার ভূপেশচন্দ্র স্থির মনে, স্থির কর্ণে সেই ভয়ঙ্কর কাহিনী শ্রবণ করিলেন। শেষ পর্য্যন্ত শুনিয়া এক সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, “উঃ! এতদূর ষড়যন্ত্র! এতদূর পাকচক্র! উঃ! পাপাত্মাদের এতদূর দুঃসাহস! কতদিনে সময় আসিবে, কতদিনে এই সকল পাপীলোকের পাপের যথোচিত প্রায়শ্চিত্ত হইবে! অনন্তদেব! বজ্রনিনাদে তাহা আমার কর্ণে শুনাইয়া দাও! অপ্সরাসুন্দরি! স্বর্গীয় সতীলক্ষ্মি! মানসপদ্মে তোমারে যে আমি পূজা করি, তাহা সার্থক। সেই বিপদক্ষেত্রে তুমি যথার্থ বীরাঙ্গনার কার্য্য দেখাইয়াছ। আমি উপস্থিত হইতে না পারিলেও দৈবশক্তিবলে পবিত্র শরীরে তুমি জয়লাভ করিতে পারিতে সন্দেহ নাই। আঃ! সেই অজ্ঞাত বন্ধু,—কে সেই অজ্ঞাত বন্ধু? তিনি আমার যতদূর উপকার করিয়াছেন, জীবনকালের মধ্যে আমি তাহা ভুলিব না। আকৃতিটী ভাল করিয়া দেখা হয় নাই, মুখ দেখিতে পাই নাই। তাদৃশ উতলা সময়ে নাম জিজ্ঞাসা করিবারও অবসর হয় নাই। আর কি সেই উপকারী বন্ধুকে আমি দেখিতে পাইব? অপরিচিত, অদৃষ্টপূর্ব্ব, অজ্ঞাতকুলশীল, অজ্ঞাতনামধাম, তাদৃশ বন্ধুর

পুনর্দ্দর্শন নিতান্তই অসম্ভব বোধ হইতেছে। একবার দর্শন করিয়া হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আমার একান্ত অভিলাষ। কিন্তু তাহা যে কিরূপে ঘটিবে, তাহারও ত আমি কোন সম্ভাবনাই দেখিতেছি না। তবে যদি তিনি স্বয়ং সদয় হইয়া আর একবার দর্শন দেন, তাহা হইলেই মনোরথ পূর্ণ হয়। দেখা যাউক, ভবিষ্যতের মনে কি আছে। উঃ। দুষ্টলোকের ষড়যন্ত্র কি ভয়ঙ্কর! কত প্রকার কূটবুদ্ধি খাটাইয়া তাহারা যে, নিরীহ লোকের সর্ব্বনাশের পন্থা আবিষ্কার করে, তাহা কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। ওঃ! অপ্সরা! তুমি থাক। আর আমি বিলম্ব করিব না। রাত্রি অধিক হইতেছে, আমি যাই।"

"কোথায় ?"——বিস্ময়াকুল লোচনে ভূপেশচন্দ্রের বদন নিরীক্ষণ করিয়া বিস্মিতভাবে অপ্সরাসুন্দরী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় ?"

"শিবিরে।"

"শিবিরে ?"—আরও বিস্ময়াম্বিতা হইয়া অপ্সরাসুন্দরী কহিলেন "শিবিরে ?—তুমি বল কি ? এত সাহস তোমার ? পত্রে দেখিয়াছি, সেই শৃগালের ছলনে তুমি বন্দী। অথচ রাত্রিকালে শিবির হইতে বাহির হইয়াছিলে; ইহা তাহারা জানিতে পারিয়াছে। বিশেষতঃ সেই ধূর্ত্ত শৃগাল———"

"শৃগাল ? আর শৃগালের ভয় নাই। শৃগাল কি আর বাঁচিয়া আছে ? তাহাকে যে ঘুসী দিয়াছি, সে এতক্ষণ যমরাজ্যের অনেক নিকটে গিয়াছে।"

"না ভূপেশ! সে মরে নাই। এক ঘুসীতে কি মানুষ মরে ? অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া আছে। জ্ঞান হইলে সে তোমার উপর আরো অধিকতর আক্রোশ প্রকাশ করিবে।"

"আর পারিবে না। যদি বাঁচিয়া থাকে, তথাচ আর পারিবে না। এবারে আমি ফরিয়াদী, সে আসামী। আমি তাহার নামে নালিস করিব। কুচক্র ফাঁদ পাতিয়া সেই দুষ্ট আজ রাত্রে যেরূপ দৌরাত্ম্য করিয়াছে, তাহার প্রতিফল দিব, উচিতমত শিক্ষা দিব, তবে ক্ষান্ত হইব। কোন চিন্তা নাই। তুমি শান্ত হইয়া ঘরে থাক;—নিশ্চিন্ত হইয়া থাক। এবারে তাহার আর পরিত্রাণ থাকিবে না। আমি যাই।"

"আমার বড় ভাল বোধ হইতেছে না। যাহারা অতদুর কুচক্র স্বজন করিতে পারে, তাহারা যে, তোমার আমার পক্ষে সুবিচার করিবে, এই অবলার মন তাহা বিশ্বাস কবিতে চায় না। অবশ্য, আমার অপেক্ষা তুমি অধিক বুঝিতে পার, তোমার কি বিবেচনা হয় ?"

"আমার বিবেচনা হয, যাঁহারা বিচারপতি নামধারণ করেন, তাঁহারা ততদূর পক্ষপাতী হইতে পারেন না।"

"আচ্ছা! পবমেশ্বর তোমাকে বক্ষা করুন। পরমেশ্বর তোমার মঙ্গল করুন! আমি স্ত্রীজাতি, আর বেশী কথা কি বলিব।"

অপ্সরাসুন্দরীব করস্পর্শ কবিয়া,—পরমেশ্বরেব নাম স্মরণ করিয়া ভূপেশ-চন্দ্র গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। অপ্সরাসুন্দরী একাকিনী গৃহে রহিলেন; চিন্তাকুল অন্তরে ধীরে ধীরে গৃহেব দ্বার অবরুদ্ধ কবিয়া ঘোর বিপদে বিপত্তারিণীকে স্মরণ করিলেন।

ভূপেশচন্দ্র শিবিরে। তথায় প্রবেশ করিয়া সরাসর সেনাপতির গৃহ-দ্বারে উপস্থিত। দ্বারে একজন চাপ্‌রাসী ছিল, তাহাকে কহিলেন, "হুজুরকে সংবাদ দাও, আমি সাক্ষাৎ কবিতে আসিয়াছি।" চাপ্‌রাসী গেল, একটু পরেই ফিরিয়া আসিল। ভূপেশচন্দ্র তাহার সঙ্কেত বুঝিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। যখন তিনি গৃহে প্রবেশ করেন, সেই সময় শুনিলেন, ভিতর দিকের আর এক ঘরের একটা দরজা সশব্দে অবরুদ্ধ হইল। কে একজন যেন সেনাপতির কাছে বসিয়া ছিল, তাড়াতাড়ি শশব্যস্তে অন্য গৃহে প্রবেশ করিল। আমাদের শুদ্ধচিত্ত নায়ক কোন প্রকার সন্দেহ করিলেন না। সসম্ভ্রমে সম্মুখে গিয়া সেনাপতিকে দস্তুরমত সেলাম করিলেন। সেনাপতি তখন দুটী তিনটী রজতপাত্র সম্মুখে রাখিয়া সেই সকল পাত্রের গর্ভস্থ রক্তবর্ণ তরল পদার্থের মর্য্যাদা রক্ষা করিতেছিলেন। একখানি আসনে উপবেশন করিয়া যেন কতই অযত্নে দক্ষিণ চরণের উপর বাম চরণ অর্পণ করিয়া অন্যমনস্কভাবে চুরুট নামক পদার্থের পুঞ্জীকৃত ধূমরাশি উদ্গীরণ করিতেছিলেন। অর্দ্ধ নিমীলিত নয়নে ভূপেশচন্দ্রের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি চাও ?"

"বিচার প্রার্থনা। আপনি বিচারের মালিক, আপনার কাছে আমি

সুবিচারের আশা করি। ভরসা রাখি, বঞ্চিত করিবেন না। যদি নৈরাশ করেন, তাহা হইলে কাজে কাজেই আমাকে অন্য কোন উচ্চ পদের শরণ লইতে হইবে।"

"দেখ ভূপেশ! তুমি আমার সম্মুখে ওপ্রকার গর্ব্বিতভাবে কথা কহিও না। আমি তোমাকে এখন ক্ষমা করিতেছি, কিন্তু বারান্তরে যদি এরূপ অবাধ্যতা দেখি, তাহা হইলে তোমার পক্ষে ভাল হইবে না।"

সেনাপতির শাসনাবাক্যে কিছুমাত্র শঙ্কিত না হইয়া, কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া ভূপেশচন্দ্র কহিলেন, "গর্ব্বিতভাব আমার কিছুই নাই। বিচার প্রার্থনা করিতে আসিয়াছি, বিচার চাই।"

"আরজ কর।"—গম্ভীরবদনে আর এক রাশি ধূম উড়াইয়া দিয়া তাচ্ছিল্যভাবে সেনাপতি কহিলেন, "আরজ কর।"

ভূপেশচন্দ্র কহিলেন, "এই সেনাদলের তৃতীয় সৈনিক স্বর্ণভূষণ বাও আজ রাত্রে আমার পত্নীকে ছলে কৌশলে এক গণিকার গৃহে লইয়া গিয়া অপমান করিবার উপক্রম করিয়াছিলেন। এক বৃদ্ধা বেশ্যাকে মধ্যবর্ত্তিনী করিয়া সেই অবলা কুলবালাকে পিতার পীড়ার মিথ্যা সংবাদ দিয়া গৃহের বাহির করেন। আমি একখানি পত্র পাই, কাহার লেখা, জানি না, কে লিখিয়াছেন, জানি না, কিন্তু সেই পত্রেই আমি ঐ ভয়ানক ষড়্যন্ত্রের বিষয় জানিতে পারি। সে পত্র আমার কাছে আছে। দর্শন করিতে ইচ্ছা করেন, দর্শন করুন।"—মহা উত্তেজিতভাবে উত্তেজিতকণ্ঠে এই কয়েকটী বাক্য উচ্চারণ করিয়া ভূপেশচন্দ্র সেই পত্রখানি সেনাপতির হস্তে প্রদান করিলেন।

পাঠক মহাশয় হয় ত এখনও কিছু অন্ধকারে রহিয়াছেন। সেই সেনাপতি কে? স্মরণ করুন, ভূপেশচন্দ্র যখন পলায়ন করা অপরাধে প্রথম বার বন্দী হন, সেই সময়ে যাঁহার নিকট বিচার হইয়াছিল, এই সেনাপতি সেই সেনাপতি। নাম আনোয়ার বখত।

আনোয়ার বখত কহিলেন, "তোমার আরজের মর্ম্ম আমি ভালরূপে বুঝিলাম না। অবাধ্যতা অপরাধে স্বর্ণভূষণের আদেশে তুমি বন্দী হইয়াছিলে, কত দিনের জন্য বন্দী, আদেশে তাহার কোন নির্দ্দেশ ছিল না।

তথাপি তুমি আজ রাত্রে সকলের অজ্ঞাতে বিনা অনুমতিতে বাহির হইয়াছিলে।"

"হাঁ! সেই কথাই ত কথা।"—ভূপেশচন্দ্র আর ততদূর বিনম্র থাকিতে পারিলেন না। দুর্জ্জয় ক্রোধ আসিয়া তাঁহাকে যেন মাতাইয়া তুলিল। গভীর গর্জ্জনে তিনি কহিলেন, "সেই কথাই ত কথা। শিবির হইতে আমি বাহির হইয়াছিলাম। যে ঘৃণিত নরকে আমার পরমপবিত্র সহধর্ম্মিণী কুচক্রীর কুচক্রে বিনিক্ষিপ্ত, সেই খানেই ত আমি গিয়াছিলাম, তুমি শুনিতেছ কি? তবে আমি বলিতেছি কি? সেই খানেই ত গিয়াছিলাম। না যাইলে জানিলাম কিরূপে? দেখিলাম কিরূপে? সতী সাধ্বীকে উদ্ধার করিলাম কিরূপে? পত্র দেখাইলাম কি জন্য?"

"বস্! বস্! আর আমি শুনিতে চাই না। অপরাধী বন্দী স্বইচ্ছায় বাহিরে যায়, এ অপরাধ অমার্জ্জনীয়। আমি তোমাকে উচিত শাস্তি প্রদান করিব।"

"এই ত বিচার বটে! আনোয়ার বখত। তুমি আমাকে যতই কেন ভয় দেখাও না, আমি সত্য কথা ভুলিব না. মিথ্যা কথা বলিব না। বাহির হইয়াছিলাম, সেখানে গিয়াছিলাম, দ্বার ভাঙ্গিয়াছিলাম, এত সত্য আমার মনে আছে। সেই নরকনিবাসে অপসরাসুন্দরীকে দেখিয়াছি। পাপাত্মা স্বর্গভূষণকে দেখিয়াছি। ঈশ্বর! ঈশ্বর! ঈশ্বর! দয়া কর! একটীও মিথ্যা কথা আমার রসনা যেন উচ্চারণ না করে। তলোয়ার তুলিয়া স্বর্গভূষণ আমাকে কাটিতে আসিয়াছিল, আমি তাহার সেই তলোয়ার কাড়িয়া লইয়া খণ্ডে খণ্ডে চূর্ণ করিয়াছি। তাহার কপালে ঘুসী মারিয়াছি। সে দুরাত্মা এখনও সেখানে অচেতন হইয়া পড়িয়া আছে। আছে কি মরিয়াছে, বিচারে জবাবদিহি করিতে আসিবে কি না, বলিতে পারি না। আমি—"

"ভূপেশ! আপনার অবস্থা বুঝিয়া কথা কও। আমরা তোমাকে জানি; অপরাধী তুমি। তোমাকে আমি গুরুদণ্ড প্রদান করিব।"

ক্রোধের উপর প্রভুত্ব রাখিতে না পারিয়া অস্থিরভাবে ভূপেশচন্দ্র কহিলেন, "দণ্ডে আমার ভয় কি? শত শত বেত্রাঘাত কর, ক্ষতস্থান শুষ্ক হইলে, পুনরায় বন্ধন করিয়া পুনরায় প্রহার কর, তাহার পর, তাহার পর,—

তাহার পর,—যতবার পার, গাত্রচর্ম্ম বিচ্ছিন্ন করিয়া দাও, সমস্তই সহ্য করিব। অকাতরে,—অকাতরে অম্লানমুখে সমস্তই সহ্য করিব। কিন্তু আমার ধর্ম্মশীলা সুশীলা বনিতার বিন্দুমাত্র অপমান আমি সহ্য করিব না। তাহার প্রতিশোধ আমি লইবই লইব। অসহ্য যন্ত্রণা! আর যন্ত্রণা সহ্য হয় না! কালভুজঙ্গ আমাকে কেন দংশন করিল না? আনোয়ার বখ্‌ত! তুমি আমাকে বন্দী বলিতেছ, দশ সহস্র গ্রেপ্তারি পরোয়ানা যদি আমার মাথার উপর থাকে, তথাপি ধর্ম্মশীলা পত্নীর সতীত্বনাশের ষড়্‌যন্ত্র আমি দেখিতে পারিব না। কিছুতেই ভয় পাইব না।"

মহাক্রোধে নেত্র ঘূর্ণিত করিয়া সেনাপতি কহিলেন, "ভূপেশ! তুমি কাহার কাছে শুদ্ধ কথা কহিতেছ? তুমি চাকর,—চাকরের আবার অত-দূর অহঙ্কারের কথা কেন?—তুমি জানিতেছ না, স্বর্ণভূষণ এই শিবিরের মধ্যেই আছেন। একটু পূর্ব্বেই আমি তাঁহাকে দেখিয়াছি।"

"তবে কি বিচার হইবে না?—এখানে যদি বিচার না থাকে, স্বর্গের বিচারের আমি আশ্রয় লইব। পৃথিবীতে যদি বিচার না থাকে, যেখানে বিচার আছে, সেই খানেই আমি দণ্ডায়মান হইব। তুমি সেনাপতি আনোয়ার বখ্‌ত,—ভয় দেখাইয়া তুমি আমাকে ভুলাইতে পারিবে না। তুমি হয় ত মনে করিতেছ, আমি তোমাদের ক্রীতদাস; কিন্তু তাহা নই! আমি আনোয়ার!—নিশ্চয় জানিও, তাহা আমি নই।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া ভূপেশচন্দ্র পুনর্ব্বার সক্রোধে কহিলেন, "তাহা আমি নই। আমার শরীরে ক্ষত্রিয় রক্ত বহিতেছে।—যে কোন দুরাত্মা আমার বনিতার অপমান করিবার উপক্রম করিবে,—প্রতিজ্ঞা,—প্রতিজ্ঞা,—দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, তাহার রক্তমাংস আমি শৃগালকুক্কুরকে ভক্ষণ করিতে দিব!"

রোষানলে প্রজ্জ্বলিত হইয়া ভূপেশচন্দ্র যেন তখন আত্মহারা হইয়া-ছিলেন। দৃঢ়মুষ্টি বন্ধন করিয়া ভূতলে পদাঘাত করিতে করিতে ক্ষত্রিয় রাজকুমারের উপযুক্ত দর্পে বজ্রস্বরে কহিলেন, "আনোয়ার! প্রতারণা ছাড়, পক্ষপাত ছাড়! আমি কাহাকেও ভয় করি না। হাঁ, সত্য!—আনোয়ার বখ্‌ত! সত্য,—তুমি পঞ্জাবী সেনাদলের সেনাপতি;—সত্য,—কিন্তু জান, আমি যদি ——"

"ভূপেশ! তুমি অত্যন্ত উত্তেজিত হইতেছ। একটু স্থির হও। ভবিষ্যতে আমি তোমার ভাল করিব। ভবিষ্যতে তোমার উপর আর কোন উপদ্রব হইবে না। ভবিষ্যতে--"

"ভবিষ্যৎ?—ভবিষ্যৎ আমার পদতলে। এখন বর্ত্তমানে যাহা হয়, তাহা দেখ। তুমি বিচারপতি। তোমার হস্তে আমি যে বিচার পাইলাম,—" কথা কহিতে কহিতে ভূপেশচন্দ্রের এমনি ইচ্ছা হইল যে, তিনি যেন শার্দ্দূল-বিক্রমে লাফাইয়া পড়িয়া নখাঘাতে যবন সেনাপতির মাথাটা ছিঁড়িয়া ফেলেন। অতি সাবধানে ধৈর্য্যকে হৃদয়ে আহ্বান করিয়া কিঞ্চিৎ পরিমাণে ক্রোধের শান্তি করিলেন।

সেনাপতি কহিলেন, "ভূপেশ! তোমাকে আমি বড় ভালবাসি। কথাটা চাপা দিয়া যাও। কেন বলিতেছি শুনিবে? স্বর্ণভূষণ আমাকে বলিয়াছেন, তোমার স্ত্রী ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য সেই গণিকার গৃহে আসিয়াছিল।"

ভূপেশচন্দ্র ভুজঙ্গগর্জ্জনে বলিয়া উঠিলেন, "এতদূর স্পর্দ্ধা তোমার? অপ্সরাসুন্দরীর নামে কলঙ্ক? কুকুর! এতদূর সাহস ধর তুমি? বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীকে আমি অপ্সরাসুন্দরীর দক্ষিণে রাখিতে পারি। সেই নামে কলঙ্ক? তোমাদের জাতিতে হয় ত সতীত্ব নাই। সতীত্বধর্ম্মের যে কি মহিমা, কি গৌরব, কি মর্য্যাদা, তাহা তুমি হয় ত জান না।"

আনোয়ার বখ্‌তের চুরুটের আগুন নিবিয়া গিয়াছে। তিনি যেন কতই অন্যমনস্ক; ঠিক সেই ভাবের ভাব দেখাইয়া, সেই ভাবের ভাণ করিয়া নিকটের একখানি কাগজ গুটাইয়া গুটাইয়া সরু করিলেন। দিব্য একটী সলিতা কি পলিতা প্রস্তুত হইল।—মোম বাতির শিখাগ্রে সেই পলিতাটী তিনি ধরিলেন, ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল; সেনাপতির চুরুট সেই আগুনে প্রধূমিত। সে দিকে ভূপেশচন্দ্রের লক্ষ্য ছিল না। অত্যন্ত কাতরভাবে তিনি কহিলেন, "সেনাপতি! এ রাজ্যে কি বিচার বিক্রয় হয়?"

সেনাপতি হাসিয়া উত্তর করিলেন, "তুমি ভূপেশচন্দ্র পাগল! আমি কি পক্ষপাত করিতেছি?—শুনিয়াছি, তোমার স্ত্রী স্বেচ্ছাবশে স্বর্ণভূষণের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য সেই বৃদ্ধা গণিকার গৃহে স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছিল।

স্বর্গভূষণ এই কথা বলেন। আর সেই গণিকা,—সে এখন বৃদ্ধ হইয়াছে, ধর্ম্মপথে মতি দিয়াছে, সেই গণিকাও ঐ কথা বলে। আসামীর জবাব ও সাক্ষীর জোবানবন্দীতে ঠিক্ ঠিক্ মিল আছে। এখন আমি কি করিব? তুমিই বা আমাকে কি করিতে বল?"

"মিথ্যা কথা! মিথ্যা কথা! দুই জনেই মিথ্যা কথা বলিতেছে। আমার সহধর্ম্মিণী সাবিত্রীর মত,—স্বর্গসতীর মত নিষ্কলঙ্ক সুপবিত্র। তাহার পক্ষে এ প্রকার দুর্নাম, এ প্রকার কলঙ্ক একেবারেই অসম্ভব। তুমি যদি বিশ্বাস কর, বিচারাসনের মর্য্যাদা থাকিবে না। আমি যদি বিশ্বাস করি, আমার আত্মা পৃথিবীতে থাকিবে না। আমি সেই স্বর্গসুন্দরীকে অপবিত্র অবিশ্বাসিনী বলিয়া কখনই সন্দেহ করিতে পারিব না।"

"ভূপেশচন্দ্র! রফা কর। আমি তোমাকে অনুরোধ করিতেছি, রফা কর! যাহা হইবার, হইয়াছে, ভুলিয়া যাও। কথা চাড়িয়া দাও। নিন্দার কথা, কলঙ্কের কথা, সে কথা লইয়া অধিক আন্দোলন করিলে আরো অধিক নিন্দা হইবে। রফা কর।"

"রফা?—কিসের রফা সেনাপতি? সতীর সতীত্বে মিথ্যা কলঙ্কের রফা?—হৃদয় যে দগ্ধ হইয়া যায়! তুমি যদি,—আনোয়ার বখ্‌ত! আজিও তুমি বিবাহ কর নাই,—তুমি যদি বিবাহ করিতে, তাহা হইলে জানিতে পারিতে, পতিব্রতা সতী স্ত্রীর নির্ম্মল হৃদয়ে কলঙ্কদাগ কত বড় যন্ত্রণা।"

রক্তবর্ণ চক্ষু ঘূরাইয়া আনোয়ার বখ্‌ত কহিলেন, "ভূপেশ! আর কেন কথায় কথায় কথা বাড়াও, ক্ষান্ত হও। আমি অনুরোধ করিতেছি, সে কথা ভুলিয়া যাও। যদি কিছু সত্য কলঙ্কের আভাস পাইয়া থাকে, আড়ম্বরে লোক জানাজানি হইলে সে কলঙ্ক আরো বাড়িবে, কমিবে না! ক্ষান্ত হও। কথা শোন।—চাপিয়া যাও।—ঢাকা দিয়ে ফেল।"

"তাহা আমি পারিব না। অন্তঃকরণ জ্বলিতেছে। তোমার কাছে যদি বিচার না থাকে, পত্রখানি ফিরাইয়া দাও। যে অজ্ঞাত বন্ধু সেই পত্র লিখিয়াছেন, আমি তাঁহার সন্ধান করিব, তিনি সাক্ষী হইবেন, সুবিচারের পথ সেই সূত্রেই পরিষ্কার হইবে। পত্রখানি আমাকে ফিরাইয়া দাও।"

"অবশ্য! অবশ্য! ভূপেশচন্দ্র! প্রিয়তম! পত্র তোমাকে ফিরাইয়া দেওয়া অবশ্যই আমার উচিত। অবশ্যই ফিরাইয়া দিব।"

"আর আড়ম্বর আমি শুনিব না। পত্রখানি আমাকে ফিরাইয়া দাও, চলিয়া যাই।"

"একটু স্থির হও না, শোন না আমার কথা।—রফা কর। পত্র ত দিবই, কিন্তু কথাটা চাপা দিয়া ফেলাই ভাল।—পত্র ত দিবই, কিন্তু—"

"দাও।—আর আমি কিন্তু কিন্তু শুনিতে পারিব না। শীঘ্র দাও।"

"দিবই ত;—কিন্তু আর একটী কথা শোনো।—চাপা দিয়া ফেল।"

"দাও বলিতেছি।—আনোয়ার! বৃথা কথা বাড়াইয়া কি লাভ?—দাও;—আমার পত্র আমাকে ফিরাইয়া দাও।"

"দিব বটে!—"হাস্য করিয়া আনোয়ার বণত কহিলেন, "দিব বটে, কিন্তু বাপু!—কিন্তু বাপু! সে পত্র কোথায়? অন্যমনস্ক হইয়া আমি সে পত্র পুড়াইয়া দিয়াছি! চুরুট ধরাইয়াছি।—তখন যে পলিতাটী প্রস্তুত করিয়াছিলাম, সেই পলিতাই তোমার সেই পত্র।"

সজোরে ভূপেশচন্দ্র একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। কহিলেন, "তবে আমার সমস্ত আশা ভরসা তোমার চুরুটে ভস্ম হইয়া গেল!—বিচারের আশা ফুরাইয়া গেল। অপ্সরাসুন্দরীর সতীত্বের একটী সামান্য নিদর্শনও তোমার হস্তে বিলুপ্ত হইয়া গেল! হা জগদীশ! ধন্য এই বিচারক! ধন্য ইহাদের বিচার!—ধন্য ইহাদের মায়া!!!"

আর কোন কথা না শুনিয়া, আর কোন কথা না বলিয়া মৃদু মৃদু গতিতে ধৈর্য্যশীল ভূপেশচন্দ্র সেই অধর্ম্মগৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। আমাদের দেশে এক পূর্ণিমার সন্ধ্যার সময় জনকতক লোক ধর্ম্মঠাকুরের নাটমন্দিরে বৎসর বৎসর সুর করিয়া বলে,—

"ধর্ম্মের ঘরখানি আগুনের কণা।
অধর্ম্মের ঘরখানি চিকুর ঝন্‌ঝনা॥"

এখানে কোন্‌টী আগুনের কণা, কোন্‌টী চিকুর ঝনঝনা, পাঠক-মহাশয়ের প্রতি তাহা বুঝিয়া লইবার ভার।

ভূপেশচন্দ্র কক্ষ হইতে বহির্গত হইলেন। দ্বারে চাপ্‌রাসী ছিল, চুপি চুপি

তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি আসিবার পূর্ব্বে সেনাপতির কাছে কোন লোক ছিল কি?"

চাপরাসী উত্তর করিল, "ছিলেন রাজকুমার স্বর্গভূষণ রাও।"

ভূপেশচন্দ্র আর কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না। চিন্তাকুল চিত্তে আপনার আবাসকক্ষে যাইয়া শয়ন করিলেন।

প্রবাহ সমাপ্ত করিবার অগ্রে আমাদের দুই একটী আনুষঙ্গিক কথা প্রকাশ করিবার আবশ্যক হইতেছে। ভূপেশচন্দ্রের অগ্রে স্বর্গভূষণ আসিয়া আনোয়ার বখ্‌তের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। ইহাতেই বুঝা হইল, তাঁহার মূর্চ্ছা অভিনয়শূন্য ছিল না। তিনি শিবিরে ফিরিয়া আসিয়া যখন সেনাপতিকে কতকগুলি অলঙ্কৃত কথা বলিয়াছিলেন। প্রায় সমস্তই মিথ্যা; একটি মাত্র সত্য। কিন্তু অর্থমহিমা দেখুন, সেই মহিমার নিকটে সত্যের আদর অতি অল্প। সেনাপতি আনোয়ার বখ্‌ত পৌতাতী জুয়ারী। তিন রাত্রি পূর্ব্বে জুয়াখেলায় তিনি সর্ব্বস্ব হারিয়াছেন। মনে করিয়াছেন, সেনাপতির পদ বিক্রয় করিয়া খোলসা হইবেন। স্বর্গভূষণ আসিয়া আশ্বাস দিলেন। বিংশতি সহস্র মুদ্রা। উপস্থিত বিপদ হইতে রক্ষা করিলে স্বর্গভূষণ তাঁহাকে বিংশতি সহস্র মুদ্রা প্রদান করিবেন। দান নহে, ঋণ।

ভূপেশচন্দ্র বাহির হইয়া যাইবার পর হাস্য করিতে করিতে স্বর্গভূষণ সেনাপতির গৃহে পুনঃপ্রবেশ করিলেন। হাস্য করিতে করিতে কহিলেন, "আজ তুমি পদের উপযুক্ত খেলা করিয়াছ। আমি পরমসন্তুষ্ট হইয়াছি। সেনাপতি হওয়া যে সে লোকের কর্ম্ম নয়। চতুর, বুদ্ধিমান, ধার্ম্মিক, ধড়ীবাজ!"

"আচ্ছা! তাহা যেন হইল, আমার প্রতিজ্ঞা আমি পূর্ণ করিলাম, তোমার প্রতিজ্ঞা তুমি পালন কর।"

"এই লও দশ সহস্রের হুণ্ডী। বাকী দশ সহস্র আমি অল্প দিনের মধ্যে আনাইয়া দিব।"

"সেনাপতির আনন্দের সীমা রহিল না। কোলাকুলি করিয়া স্বর্গভূষণকে তিনি কহিলেন, "তোমার তুল্য পরমবন্ধু জগৎসংসারে আমার আর দ্বিতীয় নাই।"

সে কথায় কর্ণ না দিয়া স্বর্গভূষণ কহিলেন, "যেরূপ নৈপুণ্যকৌশলে পত্রখানা তুমি দগ্ধ করিয়াছ, তেমন আর কেহই পারে না, কেহই পারিত না।—তাহাতে আমার সমস্ত বিপদ কাটিয়া গিয়াছে। আমার কাছেও একখানা পত্র আছে, দেখ দেখি,-এই পত্রের লেখা আর সেই পত্রের লেখা ঠিক এক প্রকার কি না?"

পত্রখানা হাতে করিয়া একবার কটাক্ষ দিয়া সেনাপতি কহিলেন, "ঠিক্! ঠিক্! ঠিক্।"

"তবে কিনারা হইবে। লোক বিশ্বাসঘাতক। সন্ধান করিয়া এই বিশ্বাসঘাতকতার সমুচিত প্রতিফল প্রদান করিব। ঐ বুঝি আবার কে আসিতেছে! চল আমরা দীপ নির্ব্বাণ করিয়া প্রস্থান করি।"

"প্রস্থান করিবার বিলম্ব আছে। ভূপেশচন্দ্রকে ত আমি এক প্রকার নৈরাশ করিয়া বিদায় দিয়াছি। সে আর ঐ বিষয় লইয়া কোন অভিযোগ করিতে আসিবে না! কিন্তু বল দেখি তুমি, সত্য ঘটনা কি?"

উপর্য্যুপরি দুটী তিনটী রজতপাত্রের মহিমা রক্ষা করিয়া হাস্য করিতে করিতে স্বর্গভূষণ কহিলেন, "সত্য ঘটনা তোমার অজ্ঞাত নাই। অতি চমৎকার কৌশলে বিরাটকেতুর কন্যাকে আমি গণিকাগৃহে আনয়ন করিয়াছিলাম। যে লোক আমার সহায় হইয়াছিল, গত রজনীতে তাহাকে পাঁচটী স্বর্ণমুদ্রা দান করি, আর এই রাত্রে সেই মধ্যবর্ত্তিনী গণিকাকে দুইশত রজত মুদ্রা প্রদান করিয়াছি। নিশ্চয় জানি, আমার সেই উত্তরসাধক তাহার অর্দ্ধাংশের অংশী হইবে। এক রাত্রের কৌশল বিফল হইয়া গিয়াছে, হইয়াই থাকে। আমি হতাশ্বাস হই নাই। তাহার বিশ্বাস নষ্ট করিতে নাই। প্রত্যুৎপন্নমতিপ্রভাবে ভূপেশচন্দ্রকে তুমি যে কথা বলিয়াছ, সেই কথাই ঠিক্। শপথ করিয়া আমি বলিব, বিরাটকেতুর কন্যা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিল। সেই বৃদ্ধা গণিকাও কহিবে, ঐ কথা। অর্থবলই মহাবল। মিথ্যাকে আমি জাজ্জ্বল্যমান সত্য করিয়া জগৎকে ভুলাইতে পারি।"

"তোমার জয় হইবে। কিন্তু স্বর্গভূষণ! বাকী দশ সহস্র আমি কবে পাইব? তুমি যেন মনে করিও না, আমি দান গ্রহণ করিতেছি। ধৎ চাও?

এখনি লিখিয়া দিতেছি। সেই দশ সহস্র কতদিনে পাইব? কত দিন পরে তাহা তুমি আমাকে প্রদান করিতে পারিবে?”

“পঞ্জাব হইতে প্রয়াগে সংবাদ যাইতে, প্রত্যুত্তর আসিতে যতদিন বিলম্ব সম্ভব, কেবল ততদিন অপেক্ষা। তুমি আমাকে খৎ লিখিয়া দিতে চাও? তোমাকে আমার অবিশ্বাস? তুমি আমার অকপট প্রিয়বন্ধু! কত বিংশতি সহস্র আমি বাতাসে উড়াইয়া দিয়াছি!”

“সাধু, সাধু! তোমার উদার স্বভাবের নিকটে আমি চিরকৃতজ্ঞ,—চির ঋণী রহিলাম।”

স্বর্গভূষণ হাস্য করিলেন। চুপি চুপি উভয়ে আরও কয়েকটী গোপনীয় কথা হইল, অনন্তর তাঁহারা রাত্রের মত বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক স্ব স্ব বিরাম-ক্ষেত্রে বিশ্রাম করিতে গেলেন।

পঞ্চপঞ্চাশৎ প্রবাহ।

কপটতা।—প্রতারণা।

——মানসের কত যে যাতনা,
সে যাতনা সকলে কি বুঝিবারে পারে?
প্রতারণা প্রবঞ্চনা বিশ্ব অলঙ্কার,—
সেই অলঙ্কার সাজে সাজেন পৃথিবী।
দেখিতে দুদিন ভাল, ভূতে বর্ত্তমানে।
বিষময় প্রতিফল আছে ভবিষ্যতে।

বঙ্গরত্ন।

অনিদ্রায় ভূপেশচন্দ্র নিশা যাপন করিলেন। সহস্র সহস্র যন্ত্রণা, সহস্র সহস্র চিন্তা সমস্ত রজনী তাঁহাকে পুড়াইল। সে সকল কথা আমরা এখানে

আনয়ন করিবে না। এইমাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, সুবিচারের আশা তিনি পরিত্যাগ করিলেন। এই পরিত্যাগ যে আরও কতদূর যন্ত্রণাপ্রদ, তাহা কেবল তিনিই জানিলেন আর তাঁহার তুল্য হতভাগ্য সংসারে যদি আর কেহ থাকেন, তিনিই জানিবেন। মিথ্যা ছলনায় স্বর্গভূষণ তাঁহাকে বন্দী করিয়াছিলেন, সে ছলনা দূর হইয়া গেল। ভূপেশচন্দ্র মুক্ত হইলেন। উপযুক্ত অবসরে অপ্সরাসুন্দরীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সেনাপতির সহিত সাক্ষাৎ অবধি শেষ পর্য্যন্ত বৃত্তান্ত তাঁহার নিকট প্রকাশ করিলেন। আনোয়ার বথ্ত একটী মর্ম্মভেদী কথা বলিয়াছিলেন, সে কথাটী অগত্যা চাপিয়া রাখিতে হইল। আমরাও সে ক্ষেত্রে চাপিয়া রাখিয়াছিলাম। কিন্তু এখন পাঠক মহাশয়কে তাহার কিছু আভাস দেওয়া উচিত। যবন সেনাপতি ইঙ্গিতক্রমে কহিয়াছিলেন, অনেকে আপনাদের স্ত্রীগণকে সতী দেখে, কিন্তু তাহারা যে, মনে মনে তাহা নহে, ইহা কেহ বিবেচনা করে না। এই কথাটী ভূপেশচন্দ্র চাপিয়া রাখিলেন। অপ্সরাসুন্দরী অনেকগুলি কথা কহিলেন, সে সকল কথার সহিত পাঠক মহাশয়ের অধিক সম্বন্ধ নাই। কেবল একটী শেষের কথা, "ধৈর্য্য!—ধৈর্য্য!—ধৈর্য্য!"

কত দিন, কত সপ্তাহ অতীত হইয়া গেল। স্বর্গভূষণের সহিত ভূপেশচন্দ্রের সাক্ষাৎ হইল না। নূতন কোন উপদ্রবও ঘটিল না। ভূপেশচন্দ্র সর্ব্বদাই বিমর্ষভাবে মনে মনে আক্ষেপ করেন, যে সকল দুরাত্মা তাঁহাকে অতদূর মর্ম্মপীড়া প্রদান করিল, তাহাদিগকে প্রতিফল দিতে পারিলেন না। সময় যাইতেছে, জলের স্রোতের ন্যায় সময়ের স্রোত ছুটিয়া চলিয়া যাইতেছে। ভূপেশচন্দ্র কোথায় কখন থাকেন, কোথায় কখন কি করেন, অপ্সরাসুন্দরী তাহা জানিতে পারেন না।

আরও অনেক দিন অতীত হইল। অপ্সরার সহিত ভূপেশচন্দ্রের প্রায়ই সাক্ষাৎ নাই। চিন্তা তাঁহারে এতদূর উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছে যে, এক দণ্ড তিনি স্থির হইয়া থাকিতে পারেন না। অকস্মাৎ এক দিন চিত্তবেগে অধীর হইয়া অপ্সরার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। দর্শন মাত্রেই অপ্সরাসুন্দরী নেত্রনীরে অভিষিক্ত হইলেন। হস্তদ্বারা ভূপেশচন্দ্র তাঁহার গণ্ডস্থল স্পর্শ করিয়া অশ্রুধারা মুছাইয়া দিলেন। কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায়

সপ্রণয় সস্নেহভাবে নহে; অন্য ভাবে। উভয়েই নিস্তব্ধ। অপ্সরাসুন্দরীর চন্দ্রমুখ সন্ধ্যাকমলের ন্যায় পরিম্লান। ঘন ঘন নিশ্বাস,—ঘন ঘন কম্প। ভাব দর্শন করিয়া ভূপেশচন্দ্র কিছু কাতর হইয়া সহাস্যবদনে কহিলেন, "প্রিয়তমে! আর কি তুমি আমাকে দেখিয়া হাসিবে না? কত দিন,—উঃ! কত দিন তোমার ঐ শশিমুখে আমি হাসি দেখি নাই। প্রিয়তমে! সেনাদল এখান হইতে চলিল। তিন দিন মাত্র বিলম্ব।"

একটু হাস্য করিয়া অপ্সরাসুন্দরী কহিলেন, "তবে ত ভালই হইল। আমারে অদর্শনযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না।"

"তাহারা এখানে থাকিলে কি তোমাকে অদর্শনযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়?"

"হয় না ত কি হয়? মনে করিয়া দেখ দেখি জীবন। কত দিন দাসীকে তুমি দেখা দাও নাই!"

"আর লজ্জা দিও না। হৃদয়বন্ধু! জান না তুমি, কি বিপাকে পড়িয়া আমি তোমার চক্ষের অন্তরে ছিলাম। লজ্জা দিও না। তুমি আমার চক্ষের দীপ্তি, বক্ষের ধন, কণ্ঠের হার। চক্ষে তোমাকে না দেখিয়া আমি কি সুখে থাকি মনে কর?"

"না, তাহা আমি মনে করি না।" এই কথা বলিতে বলিতে আবার অশ্রুপ্রবাহে অভিমানিনীর কপোলদেশ অভিষিক্ত হইয়া নয়নযুগলকে যেন অন্ধপ্রায় করিল। নিকটে সরিয়া গিয়া ভূপেশের যুগল হস্ত ধারণপূর্ব্বক সকরুণস্বরে কহিলেন, "সেনাদল স্থানান্তরে চলিল, তোমারে ত যাইতে হইবে না?"

"হইবে। আজিও সময় পূর্ণ হয় নাই। আমাকে তাহারা রাখিয়া যাইবে কেন? প্রতিজ্ঞাবন্ধনে আমি বদ্ধ আছি। পলায়ন করিতে আমি পারিব না, মিথ্যা কথা বলিতে পারিব না, লুকাইয়া থাকিতে পারিব না। আমি——"

"শুনিয়াছি,—বুঝিতে পারিয়াছি, আর শুনিতে হইবে না। তুমি যাইবে।" নয়ন মার্জ্জন করিয়া অপ্সরাসুন্দরী অর্দ্ধস্ফুটস্বরে কহিলেন, "তুমি যাইবে, কিন্তু হৃদয়বন্ধু! অন্ধকার জীবনের একমাত্র প্রদীপ! এই

অভাগিনী—" অশ্রুবর্ষণ করিয়া অপ্সরাসুন্দরী পুনর্ব্বার কহিলেন, "তুমি যাইবে!—যাও!—কিন্তু এই অভাগিনীকে কোথায় রাখিয়া যাইবে?"

"আমাদের সেনাদল প্রয়াগে যাইতেছে। তুমিও যাইবে।"—সাশ্রু-নয়নে হস্ত বিস্তার করিয়া প্রাণপ্রতিমার নয়নজল মার্জ্জন করিয়া দিতে দিতে আমাদের প্রণয়বিমুগ্ধ নায়ক বিমুক্তকণ্ঠে কহিলেন, "তুমিও যাইবে। তুমি তোমার স্বদেশে যাইবে।—মধুমতি! রোদন সম্বরণ কর! তোমার নয়নজল আর আমি দেখিতে পারি না। মনে মনে আমাকে বরণ করিয়া এক দিনের জন্যও তুমি সুখী হইতে পারিলে না। আমি হতভাগ্য,—ভাগ্যদোষে এক দিনের জন্যও আমি তোমাকে সুখী করিতে পারিলাম না। আরও যে ভগবানের মনে কি আছে, আমার এই ক্ষুদ্র হৃদয় তাহাও ধারণা করিতে পারিতেছে না।"

কষ্টে অশ্রুবেগ সম্বরণ করিয়া দুঃখিনী নায়িকা কহিলেন, "কেন জীবন-বল্লভ! আমাদের দুঃখ কিসের? চক্ষের কাছে তোমাকে দেখিতে পাই-লেই এই অভাগিনী অপ্সরাসুন্দরী অমরাবতীর সুখ অনুভব করে।"

নেত্র আচ্ছাদন করিয়া ভূপেশচন্দ্র কহিলেন, "ভূপেশচন্দ্রও।"

একজন লোক আসিয়া প্রবেশ করিল। উভয়ের চক্ষেই সেই লোক অপরিচিত। অপ্সরাসুন্দরী ভূপেশচন্দ্রের হস্ত ধারণ করিয়া অতি নিকটেই বসিয়াছিলেন, সেই লোককে দেখিয়া সলজ্জভাবে তিনি একটু সরিয়া গেলেন, কিন্তু গৃহ পরিত্যাগ করিলেন না। লোককে সম্বোধন করিয়া ভূপেশচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি চাও? কোথা হইতে আসিতেছ? আমার নিকট তোমার কি প্রয়োজন?"

যেন কতই কাতর, এইভাবে চক্ষে জল আনিয়া,—জোর করিয়া জল আনিতেছে, স্পষ্টই বুঝা গেল—যেন কতই কাতর, এই ভাবে সেই লোক উত্তর করিল, "আমি অনেক দূর হইতে আসিতেছি।"

"দূরাদূরের কথা আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি না, তোমার এখানে কি প্রয়োজন?"

লোকটা কৃত্রিম বিনীতভাব জানাইয়া সাধ্যমত নম্রস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনিই কি রাজকুমার ভূপেশচন্দ্র? আপনিই কি রাজা বিরাটকেতুর

কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন? ঐ দেবকন্যারূপিণী আমার জননীপ্রতিমা লক্ষ্মীদেবীই কি রাজা বিরাটকেতুর স্নেহময়ী কুমারী অপ্সরাসুন্দরী?"

"অগ্রে তোমার পরিচয় দাও। তাহার পর উত্তর প্রাপ্ত হইবে। কিছু দিন পূর্ব্বে এক ভয়ঙ্কর প্রতারণাচক্রে মহা অনর্থ সংঘটিত হইয়াছিল। সেই জন্য ——"

"আপনি বুঝি সেই মায়াবিনীর কথা বলিতেছেন? সে কথা আমরাও শুনিয়াছি। রাজাও শুনিয়াছেন। দুরন্ত লোকের পরামর্শে সেই মাগী—"

"থাক্ থাক্। সে কথা আর শুনিতে চাহি না। তুমি তোমার আপনার কথা বল।—কি অভিপ্রায়ে তুমি এখানে আসিয়াছ?"

"ঈশ্বরের শপথ, আমি কোন মন্দ অভিপ্রায়ে আসি নাই। রাজা বিরাটকেতু যথার্থই এই সহরে আসিয়াছেন। সঙ্কটাপন্ন পীড়া। সেই প্রতারণাকারিণী কোন সূত্রে সেই কথা জানিয়া দুষ্ট লোকের মন্ত্রণায় ছলনাক্রমে দেবীকে তাহার নিজের বাড়ীতে লইয়া গিয়াছিল। রাজা অন্য বাড়ীতে আছেন। আমি তাঁহার আজ্ঞাবহ কিঙ্কর।"

"কিঙ্কর তুমি? সত্যই আমার পিতা এখানে? সত্যই তাঁহার সঙ্কটাপন্ন পীড়া?"—চঞ্চলকণ্ঠে এই কথা বলিতে বলিতে চঞ্চলপদে অপ্সরাসুন্দরী পুনর্ব্বার নিকটবর্ত্তিনী হইলেন। তাঁহার স্নেহকাতর অন্তঃকরণে অকপট কাতরতা সমুদিত হইল। পুনঃপুন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "কিঙ্কর তুমি? কোথায় আমার পিতা? কোন্ বাড়ীতে তিনি রহিয়াছেন? তিনি কেমন আছেন? আমারে কি ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন?—আমারে কি দেখিতে চাহিতেছেন?"

"দেবি! ব্যাধিশয্যায় শয়ন করিয়া কোন্ স্নেহময় পিতা তাঁহার একমাত্র স্নেহময়ী তনয়াকে দেখিতে ইচ্ছা না করেন? কিন্তু আজ আমি সে অভিপ্রায়ে আসি নাই। তাঁহার খরচপত্র সমস্ত নিঃশেষিত হইয়াছে, বিদেশে অসময়ে অর্থের অকুলান।"

ঘটনাচক্র যেরূপ, তাহাতে ভূপেশচন্দ্রের অসন্দিগ্ধ অন্তঃকরণ এখন কিছু সন্দেহপ্রবণ হইয়াছে। লোকটাকে দেখিয়া তাঁহার সন্দেহ জন্মিয়াছিল। শেষের কথা শুনিয়া সে সন্দেহ অনেক পরিমাণে দূর হইল। বিশ্বস্তভাবে

জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজা, কি তবে আমার কাছে এখন কিছু অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করেন ?"

"সাহায্য প্রার্থনা নয়, আপাততঃ উপকার। রাজ্যে সংবাদ গিয়াছে, তথা হইতে লোক আসিলেই আপনার অর্থ আপনি পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন।"

কিয়ৎক্ষণ মনে মনে কি আলোচনা করিয়া সদয়হৃদয় ভূপেশচন্দ্র অপ্সরাসুন্দরীকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "রাজকুমারি! আমাদের ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের পরিমাণ কত ?"

অপ্সরাসুন্দরী শশব্যস্তে একটী বাক্স আনয়ন করিলেন। কম্পিতহস্তে আবরণ মোচন করিলেন। কোমল হস্ত কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি জানিতেন, নদীতে যেমন ভাঁটা পড়ে, তাঁহাদের সম্পদ-নদীতেও তখন তেমনি ভাঁটা। ভূপেশচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "কত ?"

অনেকক্ষণের পর অপ্সরা উত্তর করিলেন, "একটী স্বর্ণমুদ্রা। আর গৃহস্বামিনীর নিকট পাঁচটী মোহর আমানত। আর, নিত্য খরচের জন্য যাহা বাহিরে থাকে, তাহা একত্র করিয়া দেখিলে সমস্তশুদ্ধ আর একটী স্বর্ণমুদ্রা মিলিতে পারে।"

"সাত মোহর মাত্র ?—আর না ?—কেন ? সে দিন যখন আমি যাই, তখন তোমার হস্তে এক শত স্বর্ণমুদ্রা ছিল।"

"ছিল যথার্থ; তাহা আমার মনে আছে।" কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণস্বরে এই কথা বলিয়া অপ্সরাসুন্দরী ঈষৎ হাস্য করিলেন। হাস্য করিয়া কহিলেন, "মনে কর দেখি রাজকুমার! কতদিন তুমি আশ্রমে অনুপস্থিত! ইহার মধ্যে আমি এক কপর্দ্দকও ঋণ করি নাই। পূর্ব্বেও যে ঋণ ছিল, সমস্ত শোধ দিয়াছি। যাহাদের যাহা প্রাপ্য, সমস্তই প্রদান করিয়াছি। তা ছাড়া, নিত্য নিয়মিত ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়াছি। তবে বল দেখি, আর কত সঞ্চিত থাকিতে পারে ?"

হাস্য করিয়া ভূপেশচন্দ্র কহিলেন, "এ অবস্থায় এত ব্যয় করা আমাদের কি উচিত ? তুমি যেন জলের মত ব্যয় করিয়া ফেলিয়াছ। উত্তর করিতেছ না কেন ?"

অপ্সরা উত্তর করিলেন, "নষ্ট করি নাই, অপব্যয় করি নাই, জলে

ফেলিয়া দিই নাই, যাহা ব্যয় করিয়াছি, সমস্তই লিখিয়া রাখিয়াছি।” এই উত্তরের সঙ্গে সুশীলা অপ্সরাসুন্দরীর চক্ষে অনর্গল জলধারা।

“আমি তোমার বাক্যে অপ্রত্যয় করিতেছি না। মন পরীক্ষা করিবার জন্যও ও কথা উত্থাপন করি নাই। এই শোন। শুনিবে এসো।”

এই পর্য্যন্ত বলিয়া ভূপেশচন্দ্র গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সমীপবর্ত্তী সেই লোককে কহিলেন, “তুমি খানিকক্ষণ এই খানে থাক। আমি শীঘ্রই আসিতেছি।”

যে ঘরে ভূপেশচন্দ্র বসিয়াছিলেন, সেই ঘরের উত্তর দিকে আর একটী ক্ষুদ্র ঘর। অপ্সরার দিকে চাহিয়া ভূপেশচন্দ্র সেই ক্ষুদ্র গৃহে প্রবেশ করিলেন। ইঙ্গিত বুঝিয়া আমাদের সুন্দরীও সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। উভয়ে একত্র হইলে ভূপেশচন্দ্র একটু হাসি হাসিয়া প্রেমাকুলস্বরে বলিলেন, “সত্য! রাজকুমারি! মন বুঝিবার জন্য অভিমান?—কথায় কথায়—অপ্সরা! প্রাণাধিকে! তোমার কি অভিমান হইয়াছে?”

নেত্রমার্জ্জন করিয়া সজলনয়নে স্বামীর মুখপানে চাহিয়া অপ্সরাসুন্দরী কহিলেন, “কৈ না।”

“এখন না, কিন্তু তখন?—যখন আমি শত সহস্রের কথা কহিলাম, জলের মত ব্যয় করিয়াছি বলিলাম, তখন দেখিয়াছি, তোমার ঐ পদ্মচক্ষে অনেক জল পড়িয়াছিল।”

পুনরায় অশ্রুমার্জ্জন করিয়া অপ্সরাসুন্দরী কহিলেন, “কখন?—কৈ না ত।”

“অভিমানিনি! তোমার চক্ষে যে জল পড়ে, সে জলে আমার বক্ষঃস্থল যেন গলিয়া যায়। শান্ত হও। অভিমান ত্যাগ কর। আমার কথার মানে শুন।”

কথা না বলিয়া অভিমানিনী নায়িকা ঈষৎ বক্র দৃষ্টিপাতে ভূপেশচন্দ্রের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। রসনার পরিবর্ত্তে সেই নয়ন যেন জিজ্ঞাসা করিল, “মানে কি?”

ভূপেশচন্দ্র যেন সেই প্রশ্ন শুনিতে পাইলেন। উত্তর দিলেন, “সত্য! রাজকুমারি! রাজা বিরাটচন্দ্র ধার্ম্মিক। বিদেশে তাঁর অর্থের অকুলান।

লোক পাঠাইয়াছেন। আমি যদি এখন অল্প সঞ্চয় আছে বলিয়া অভাব জানাই, সন্দেহ না করিলেও তিনি ক্ষুণ্ণ হইতে পারেন। সেটী আমি ভালবাসি না। কাহারো মনে কোন প্রকার কষ্ট প্রদান করিতে আমার বড় কষ্ট হয়। মানে বুঝিলে?"

চন্দ্রমুখখানি নত করিয়া অপ্সরাসুন্দরী মৃদু মৃদু হাস্য করিলেন।

হাস্য করিয়া ভূপেশচন্দ্র কহিলেন, "ঐ হাসিই আমি বড় ভালবাসি। তোমার অভিমান যে দূরে গিয়াছে, তুমি যে এখন আর অভিমানিনী নও, ইহাতেই আমি পরমানন্দ লাভ করিলাম। হৃদয়েশ্বরি! এখন চল, লোকটী ওখানে অপেক্ষা করিতেছে, বিদায় করিতে হইবে।"

"একটু বিলম্ব কর।"—কৌতূহলাক্রান্তা হইয়া অপ্সরাসুন্দরী কহিলেন, "একটু বিলম্ব কর। তোমাকে আমি দুটী কথা জিজ্ঞাসা করিব।"

"কি জিজ্ঞাসা হৃদয়েশ্বরি?"

"এই জিজ্ঞাসা, ঐ লোকটাকে কি তুমি সত্যবাদী, অকপট বলিয়া জানিতে পারিতেছ? প্রাঞ্জলাশুদ্ধ বলিয়া কি বিশ্বাস করিতেছ? ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখিলে ভয় পায়, ইহা তুমি জান ত? আমি সেই ঘরপোড়া গরু। সেই মায়াবিনী যে রাত্রে আমাকে ভুলাইয়া লইতে আসিয়াছিল, সে রাত্রে সেই বুড়ীও ঐরূপ কাতরভাব জানাইয়া ঐরূপ বাগ্‌জাল বিস্তার করিয়া আমাকে বিমোহিত করিয়াছিল। আমার সন্দেহ হইতেছে, এ লোকটা ত সেরূপ ছলনাকারী হইবে না?"

"না প্রিয়তমে! এমন হইবে না। ছলনা করিয়া ইহার কি ফল? আমার ত সন্দেহ হয় না। যে লোক ছলনা করে, তাহার মুখ দেখিলে চিনিতে পারা যায়। মুখে সরল কথা কহিলেও তাহার চক্ষু যেন ছলের কথা কয়। এ লোকের চেহারাতে সেরূপ ছলনার চেহারা দেখা যাইতেছে না। মুখেও না, চক্ষেও না। তুমি চল।"

সন্দেহ ঘুচিল না, তথাপি মুগ্ধস্বভাবা অপ্সরাসুন্দরী ভূপেশচন্দ্রের শেষ বাক্যে প্রতিধ্বনি করিয়া ধীর মৃদুস্বরে কহিলেন, "তবে চল।"

উভয়ে পূর্ব্ব গৃহে উপস্থিত। লোকটা বসিয়া ছিল, তাহাদিগকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল। ভূপেশচন্দ্র কহিলেন, "বোসো।"—লোক

বসিল। অপ্সরার মুখের দিকে চাহিয়া ভূপেশচন্দ্র কহিলেন, "এ লোকটা অনেক ক্ষণ আসিয়াছে। তুমি একবার গৃহস্বামিনীর কাছে যাও।"

আভাস বুঝিতে পারিয়া অপ্সরাসুন্দরী কহিলেন, "পিতা পীড়িত, আমারে কি দেখিতে যাইতে হইবে না?"

ভূপেশচন্দ্র উত্তর করিবার অগ্রে সেই লোক উত্তর করিল, "না মা! আজ না। রাজা অনুমতি করিলে কল্য আমি শিবিকা আনিয়া আপনাকে লইয়া যাইব।"

অপ্সরাসুন্দরী গৃহস্বামিনীর গৃহে গমন করিলেন। এই অবসরে সেই লোকের সহিত রাজা বিরাটকেতুর সম্বন্ধে, তাঁহার ব্যাধির সম্বন্ধে, তাঁহার বাসস্থানসম্বন্ধে, তাঁহার চিকিৎসাসম্বন্ধে রাজকুমার ভূপেশচন্দ্রের অনেক কথা হইল। লোকটা এমনি সুচতুর, এমনি ধড়ীবাজ, এমনি চৌকোস, যে, কোন কথার উত্তরে একবারও থতমত খাইল না। তোতা পাখীর মত সব কথা যেন অভ্যাস করিয়া আসিয়াছিল। আদালতের শিক্ষিত সাক্ষীর মত সব কথা যেন কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিয়াছিল। কিছুতেই ঠকিল না। ভূপেশচন্দ্র কিছুতেই ধরিতে পারিলেন না,—"ছলনা।"

মনে ত সন্দেহ ছিলই না, এখন আবার সেই লোকের উত্তরপ্রত্যুত্তর শ্রবণে হৃদয়ে দৃঢ় বিশ্বাস বদ্ধমূল।

আমানতি পঞ্চ স্বর্ণমুদ্রা হস্তে অপ্সরাসুন্দরী সেই গৃহমধ্যে পুনঃপ্রবেশ করিলেন। যে কথোপকথন হইতেছিল, তাহা বন্ধ হইয়া গেল। আমানতি পাঁচ, বাস্নমধ্যস্থ এক, আর নিত্যখরচের এক, এই সাতটী মোহর প্রদান করিয়া ভূপেশচন্দ্র সেই লোককে কহিলেন, "বড় ক্ষুণ্ণ হইলাম। রাজা পীড়িত, এ সময়ে উচিতমত সাহায্য করিতে না পারিয়া বড়ই লজ্জা পাইতে হইল। যাহা কিছু সম্বল ছিল, সমস্তই অর্পণ করিলাম। রাজাকে আমাদের প্রণাম জানাইয়া কহিও, সপ্তাহের মধ্যে আমরা উভয়েই তাঁহার চরণ দর্শন করিয়া যথাশক্তি সেই শ্রীচরণে সমর্পণ করিব।"

অপ্সরাসুন্দরীও প্রত্যেক বর্ণে বর্ণে ঐ কয়েকটী বাক্যের প্রতিধ্বনি করিয়া সেই লোককে বিদায় করিলেন।—সুচতুর ধূর্ত্ত জুয়াচোর মাটীর দিকে মুখ করিয়া হাসিতে হাসিতে উভয়কে অভিবাদনপূর্ব্বক গৃহ হইতে

বাহির হইয়া গেল।—নিস্তব্ধ হইয়াই অভিবাদন করিল, নিস্তব্ধ হইয়াই বাহির হইয়া গেল;—যাইবার সময়, একটীও কথা কহিল না।

প্রবঞ্চক বিদায় হইবার পর অপ্সরাসুন্দরী মনে মনে কি যেন স্মরণ করিয়া ভূপেশচন্দ্রকে কহিলেন, "ভূপেশ! আবার সন্দেহ আমাকে যন্ত্রণা দিতেছে। মানুষেব মুখের কি ঐ রকম রং হয়? মানুষের চুল কি ঐ রকমে বিন্যস্ত থাকিতে পারে?—এতক্ষণের পর আমার মনে হইতেছে, পরচুলো, মুখে রং মাখা।"

হাস্য করিয়া ভূপেশচন্দ্র কহিলেন, "বুদ্ধিমতী হইলেও স্ত্রীজাতির এক ধর্ম্মই স্বতন্ত্র। বিশ্বাস হয় হয় হয় না, সন্দেহ যায় যায় যায় না। রাজকুমারি! ইহাও কি কখনও সম্ভব হইতে পারে? একজন লোক একজন রাজার সঙ্কট পীড়ার সংবাদ লইয়া আসিয়াছিল; সে যে রং মাখিয়া সং সাজিয়া আসিবে, এ কথা কি বিশ্বাসযোগ্য? মিথ্যা সংশয় তুমি মন হইতে দূর করিয়া দাও।"

"তুমি যাহাই বল, আমি যেন কেমন কেমন বুঝিতেছি।—থাকিয়া থাকিয়া আমার মন যেন ডাকিয়া ডাকিয়া বলিয়া দিতেছে, কপটতা, প্রবঞ্চনা, প্রতারণা, ছলনা।"

কেবল হাস্য মাত্র উত্তর দিয়া অবিশ্বাস-বাতাসে ভূপেশচন্দ্র সেই অত কথা উড়াইয়া দিলেন।

ফলাফল যাহাই হউক, স্থূল কথা, এই সুনির্ম্মল সাধুদম্পতীর নিত্য জীবনোপায় যাহা কিছু সঞ্চিত ছিল, একজন মহাপ্রবঞ্চক মহাছলনাজাল বিস্তার করিয়া তাহা হরণ করিয়া লইয়া গেল। রজনীপ্রভাতে কিরূপে যে তাঁহারা ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ করিবেন, তাহারও উপায় মাত্র রহিল না!

আশুপ্রত্যয়ী ধার্ম্মিক লোকের প্রায় এমনি দশাই ঘটিয়া থাকে। প্রায়ই তাঁহাদেব মনে সন্দেহ আইসে না। দুষ্ট লোকে দুষ্ট লোককে ঠকাইতে পারে না, সাধুলোককেই বঞ্চনা করে। যে লোক আসিয়াছিল, সে একজন প্রধান প্রবঞ্চক। ভূপেশচন্দ্র তাহারই প্রবঞ্চনায় ভুলিলেন।

ষট্‌পঞ্চাশৎ প্রবাহ।

চিনিতে পার ?

চিনিতে কি পার মোরে জগতমোহিনী ?
কোথা কি দেখেছ মোরে বিশ্ববিনোদিনী ?
আমি যেন তোমা ধনে চেন চেন করি।
মনে হয় তুমি মম হৃদয় ঈশ্বরী॥

আর্য্যরত্ন।

বর্ষা কাল।—ঝুপ্ ঝুপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। একটু একটু বেলা আছে, পশ্চিম গগন একটু একটু রক্তবর্ণ দেখাইতেছে, কিন্তু যিনি দিনকর, তাহাকে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। ইরাবতীনদীতীরে একটী ভগ্ন দেবালয়। সেই দেবালয়ে একটী অর্দ্ধভগ্ন শিবলিঙ্গ। বারিপূর্ণ ঘট খণ্ডে খণ্ডে ভগ্ন হইয়া গড়াগড়ি যাইতেছে। শুষ্ক পুষ্প, শুষ্ক বিল্বদল, দুর্গন্ধ বিস্তার করিয়া দুর্গন্ধলোভী কীটপতঙ্গকুলকে যেন আহ্বান করিতেছে। ভন্ ভন শব্দে মাছী উড়িতেছে, ভোঁ ভোঁ শব্দে মশা উড়িতেছে, তাহাদের পরমানন্দ। অনেক দূর পর্য্যন্ত জনমানবের সঞ্চার নাই। বৃষ্টি-ধারাবর্ষী মেঘাচ্ছন্ন আকাশ কখন যে সূর্য্যদেবকে লুকাইয়াছে, মানুষের চক্ষু তাহার কিছুই জানিতে পারে নাই। ধরাতল ঘোর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। সন্ধ্যাকাল; কিন্তু ঠিক যেন অমাবস্যা রজনীর ভয়ঙ্কর দ্বিপ্রহর! জোনাকি-পোকাদের রাজত্ব। এক একটা প্রাচীন নিবিড় পল্লবাবৃত বৃক্ষকে তাহারা যেন মণিদীপ্তিতে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। জোনাকির আলো ভিন্ন সে প্রদোষে, সে নদীতীরে, সে দেবালয়ে আর কি কোন আলো ছিল না?—ছিল, সে আলো ক্ষণপ্রভা। বর্ষাকালের মেঘ বসন্তগ্রীষ্মের মেঘের মত চপলাসতীকে তত অধিক আদর করে না। মাঝে মাঝে এক একবার চপলার খেলা হয়। যাহারা খেলা ভাল বাসে, একটু অবকাশ পাইলেই

তাহারা খেলা করে। বর্ষাকাশে যখন সাদা মেঘ থাকে, তখন চপলা ঘেঁসিতে পারেন না। যখন একটু ঘোর কৃষ্ণবর্ণ দেখেন, সেই সময়েই লুকাচুরি খেলার মত হাসিয়া হাসিয়া ক্রীড়া করিয়া যান। বর্ষারজনীতে পথবিহারী, প্রান্তরবিহারী, জীবের পক্ষে,—জীবের নয়নে কেবল সেই মাত্র আলো। জোনাকির আলো আর চপলার আলো। জোনাকির আলোতে কেবল জোনাকি দেখা যায়, কিন্তু বিদ্যুতের আলোতে ক্ষণেকের জন্য অন্য অন্য অনেক পদার্থ নয়নদর্পণে আইসে। প্রকৃতিসতী সেই নিমিত্তই মেঘের সময় চপলার সঙ্গে খেলা করিতে ভাল বাসেন।

ভগ্ন মন্দিরে দুটী পথিক। বোধ হয় নিরাশ্রয়। একটী পুরুষ, একটী স্ত্রী। বৃষ্টির জলে তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গ ভিজিয়া গিয়াছে; পৌষ মাসের শীতে মানুষ যেমন কাঁপে, বর্ষাকালের সন্ধ্যাকালে তাঁহারা যেন সেইরূপে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছেন। একবার চঞ্চল বিদ্যুৎ নল্‌পাইয়া গেল। দুই জনের চক্ষের চায়া দুই জনের চক্ষে পড়িল। দুই জনেই চমকিত। আবার, আবার, আবার;—তিন বার সৌদামিনী খেলা করিল। তিন বার তাঁহারা দুই জনে ক্ষণপ্রভাপ্রসাদে ক্ষণে ক্ষণে দুই জনকে দেখিলেন। আর ত আলো নাই। চপলার আলো ভিন্ন অন্য আলোতে ত ভাল করিয়া দেখিবার উপায়ও নাই;—তবে এখন হয় কি?

পাঠক মহাশয় হয় ত আমাদের উপর বিরক্ত হইতেছেন। শিবমন্দিরে দুটী নরনারী আছেন, তাঁহাদের পরস্পর চেনাশুনা নাই, এ কথা বড় আশ্চর্য্য! কিন্তু বিরক্ত হইলে আমরা কি করিব? দুই জনে এক সময়ে এক সঙ্গে প্রবেশ করেন নাই, সন্ধ্যার পূর্ব্বে এক জন একাকী, সন্ধ্যার পরে একজন একাকিনী। যেখানে এমন সংঘটন, সেখানে আমরা কি করিব?

আবার একবার চপলা চমকিয়া গেল। মন্দিরে যে পুরুষমূর্ত্তি, তাঁহার শরীরেও যেন চপলা চমকিয়া গেল। সকৌতূহলে, সবিস্ময়ে পার্শ্ববর্ত্তিনী রমণীকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাকে কি তুমি চিনিতে পার মোহিনী?"

"কে গা তুমি? শীতে আমি কাঁপিয়া মরিতেছি, বৃষ্টির জলে ভিজিয়া গিয়াছি, এ সময় তামাসা করিতেছ, কে গা তুমি? আমি রমণী। বিপদে

পড়িয়া শিবালয়ে আশ্রয় লইয়াছি, আমার সঙ্গে রহস্য করিতেছ, কে গা তুমি ?"

"আমিও বিপদে পড়িয়া শিবালয়ে আশ্রয় লইয়াছি।"

"তবে চুপ করিয়া থাক। বৃষ্টি ধরুক, চলিয়া যাইও। আমি কাঙ্গালিনী, এই খানেই পড়িয়া থাকিব।"

"আমিও থাকিব। এ রাজ্যে আমার আশ্রয়স্থান নাই। নূতন আসিয়াছি। তুমিও যেখানে থাকিবে, আমিও সেই খানে থাকিব।"

"সে কি গো ? কি কথা কও তুমি ? আমি কাঙ্গালিনী, ভিখারিণী, স্ত্রীলোক, তুমি পুরুষমানুষ, তুমি কেন সমস্ত রাত্রি এই মন্দিরে পড়িয়া থাকিবে ?"

"না থাকিলে কোথায় যাইব ? বিদেশী পথিক আমি। এই দুর্যোগ রজনীতে কে আমারে আশ্রয় দিবে ?''

হাসিতে হাসিতে আর একবার চপলা চলিয়া গেল। সেই বারে উভয়ের চারি চক্ষু একত্র। ক্ষণকালের জন্য উভয়েই নিস্তব্ধ।

বৃষ্টির বেগ একটু থামিয়াছে। কথা কহিলে স্বর বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু ইঁহারা আর কথা কহিতেছেন না। এক দণ্ড গেল, কেহই কথা কহিলেন না। বৃষ্টির বেগ আরও কমিতেছে। যেটী নারী, সেটী তখন ভয়ে, কম্পে, লজ্জায়, জড়ীভূতা হইয়া উৎকণ্ঠিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "তুমি যাও না, বৃষ্টি ত ধরিয়াছে। তুমি পুরুষমানুষ, তোমার ভয় কি ? আমি অসহায়িনী অবলা, আমি এই মন্দিরেই পড়িয়া থাকিব। তুমি যাও না !''

আশ্চর্য্য ! এই শেষের কথাগুলি শ্রবণ করিয়া পুরুষ পথিক যেন শিক্ষিত ভল্লুকের মত নৃত্য করিতে করিতে চীৎকারস্বরে কহিয়া উঠিলেন, ''কি শুনিলাম ! কাহার কথা শুনিলাম ! তুমি কোথায় ছিলে ? এত দিন পরে কোথা হইতে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলে ? আমারে কি তুমি চিনিতে পার মোহিনী ?''

''তাই ত ! তুমি এত দিন কোথায় ছিলে ? কোথা হইতে এখানে আসিয়াছ ? তোমার সঙ্গে আবার যে আমার সাক্ষাৎ হইবে, ইহা ত মনে ছিল না। এত ক্ষণের পর আমি ঐ স্বরে বুঝিতে পারিতেছি, তুমিই সেই।

কেন তুমি আর আমারে এমন করিয়া পোড়াও? মেঘ মানিব না, বৃষ্টি মানিব না, অন্ধকার মানিব না, বড় ঝড়ে গাছ পড়ে, গাছের আশ্রিতা লতা যেমন করিয়া বিদলিত হয়, তেমনি করিয়া বিদলিত হইব না। বনে দাবানল জ্বলিলে হরিণী যেমন ছুটিয়া যায়, সাপিনী যেমন সাঁ সাঁ করিয়া পলায়ন করে, আমি তাই,—আমি তেমনি করিয়া ছুটিয়া যাইব; তেমনি সাঁ সাঁ করিয়া পলায়ন করিব; কোন বাধা মানিব না; তোমার মুখ আর আমি দেখিব না।"

উচ্চৈঃস্বরে এই সকল কথা বলিতে বলিতে সিক্তকেশা, সিক্তগাত্রা, সিক্তবসনা অনাথা কামিনী সেই ঘোর অন্ধকারে মন্দির হইতে বহির্গতা হইয়া দক্ষিণ দিকে ছুটিলেন।

"দাঁড়াও! দাঁড়াও! কোথায় যাও! কোথায় যাও! একটী কথা শুনিয়া যাও।"—উচ্চকণ্ঠে এইরূপ চীৎকার করিতে করিতে পুরুষ পথিক অলক্ষিত পথে সেই ভীমাঙ্গনার সঙ্গে সঙ্গে ছুটিলেন। কিছুই দেখিতে পাইলেন না। হতাশ! হতাশ! হতাশ!

পরিচয় হইল না। শেষ কথার পর আর একটীও কথা হইল না। অন্ধকার পথে অন্ধকার রাত্রে উভয়েই অদৃশ্য।

আমরা একটু পরিচয় দিয়া রাখি। যে কামিনী অগ্রে অগ্রে ছুটিয়া গেলেন, পাঠক মহাশয়! সেই কামিনী আপনাদের বহুদিনের পরিচিতা বিলাসকুমারী মিহিরমোহিনী। আর যে বীরপুরুষ উন্মত্তের ন্যায় সঙ্গে সঙ্গে ছুটিলেন, তিনি সেই অস্থিরচিত্ত রাজকুমার শশিকুমার। অনেক বার অনেক রূপে অনেক স্থানে ইহাদের সহিত আপনার সাক্ষাৎ হইয়াছে; অনেক প্রকারে পরিচয় হইয়াছে, কিন্তু এই ভগ্ন দেবালয়ে বর্ষাতাড়িতা মিহিরমোহিনী যেন শশিকুমারকে চিনিয়াও চিনিলেন না। প্রথমে অন্ধকারে মন্দিরমধ্যে ভয় হইয়াছিল, যে ভাবে কথা কহিয়া আলাপ করিয়াছিলেন, তাহাতে কস্মিন্ কালেও যে জানাশুনা ছিল, কেহই এমন অনুভব করিতে পারেন নাই; শেষেও সেইরূপ উদাসীন ভাব।

—

সপ্তপঞ্চাশৎ প্রবাহ।

কত দিনের পর কোথায় ?

* * * * * *

"পূজয়ামাস তং দেবং পাদ্যার্ঘ্যাসনবন্দনৈঃ ॥"

রামায়ণম্।

দুই মাস অতীত। ইতিমধ্যে ভূপেশচন্দ্রের সহিত অপ্সরাসুন্দরীর দুই তিনবার মাত্র সাক্ষাৎ হইয়াছে। সেনাদল যে দিবস পঞ্জাব হইতে যাত্রা করিবে, কথা ছিল, সে দিন পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। উপদেশ দিয়াছেন, অগ্রে তুমি প্রয়াগে যাত্রা কর, শীঘ্রই সেই স্থানে আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। সেনাদল প্রয়াগেই যাইতেছে। যে দিনের উপদেশ, সে দিনের পর উভয়ে আর সাক্ষাৎ হয় নাই। যথাসম্ভব সম্বল সংগ্রহ করিয়া অপ্সরা-সুন্দরী একমাত্র কিঙ্করী সমভিব্যাহারে প্রয়াগধামে যাত্রা করিলেন। পঞ্জাব হইতে এলাহাবাদ যাইতে সম্ভবতঃ যত সময় আবশ্যক, তদপেক্ষা অধিক সময় পর্য্যটন করিয়া অপ্সরাসুন্দরী প্রয়াগধামে উপস্থিত হইলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার মানসে দুটী প্রবল চিন্তা।—যাই কোথায়? যদি পিতার আবাসে যাই, তিনি স্থান দিবেন কি না, নিশ্চয় নাই। এইটী প্রথম চিন্তা। দ্বিতীয় চিন্তা, ভূপেশচন্দ্রের সেনাদল এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে কি না? সেই এক মহাচিন্তা। এখন উপায় কি? কিঙ্করীর সহিত পরামর্শ করিয়া নগরের এক নিভৃত প্রান্তে একখানি ক্ষুদ্র গৃহে বাসা লইলেন। প্রায় সপ্তাহকাল সেই আবাসে বাস করিয়া বিষাদিত মানসাকাশে শত শত কল্পনা আনয়ন করিতে লাগিলেন। অন্ধকার আর জ্যোৎস্না, জলধর আর চন্দ্রমা, ইহাদের পরস্পর যেমন বিপরীত সম্পর্ক, মনের সহিত কল্পনার সেরূপ বিপরীত সম্পর্ক নহে। মনে নানা প্রকার

কল্পনা করিতে লাগিলেন। কল্পনা যেন একটী বৃক্ষ। তাহার শাখা-পল্লব অনেক। কি ভাবিতে কি ভাবিতেছেন, স্থিরতা নাই। একবার ভাবিতেছেন, ভূপেশচন্দ্র হয় ত মিথ্যা কথা বলিয়াছেন, তাঁহাদের সেনাদল হয় ত এখানে আসিবে না। আবার ভাবিতেছেন, সে কি? তিনি ত মিথ্যা কথা জানেন না। আমার সঙ্গে তিনি চাতুরী খেলিবেন কেন? আরো এক কথা। যদি তাঁহারা এখানে আইসেন, যদি ভূপেশচন্দ্র এখানে উপস্থিত হন, আমি কোথায় রহিয়াছি, তাহা তিনি কিরূপে জানিতে পারিবেন? মনে যে কত চিন্তাতরঙ্গের খেলা হইতেছে, যে সকল দৈবজ্ঞ আকাশের নক্ষত্র গণনা করিবার ভাণ করেন, তাঁহারাও সে সকল তরঙ্গের গণনা করিতে অক্ষম। যাঁহার বাড়ীতে বাসা, একদিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া অপ্সরা জানিলেন, কথা নিশ্চয়। আগ্রহসহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! মিনতি করিতেছি, সত্য করিয়া বলিতে পারেন, সেই সেনাদল এখানে কত দিনে আসিবে?"

"না মা!"—গৃহস্বামী সস্নেহভাবে উত্তর করিলেন, "না মা! আমি সে সংবাদটী ঠিক জানি না। রাজা রাজড়ার কথা। আমি গরিব লোক, সে সকল সংবাদ কিরূপে জানিতে পারিব? শুনিয়াছি আসিবে, কেবল এই মাত্র জানি।"

গৃহস্বামীর নিকটে ইহার অতিরিক্ত তিনি আর কোন তত্ত্ব জানিতে পারিলেন না। আরও এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল। মানস-সহচরী চিন্তা; গৃহ-সহচরী জয়ন্তী। এই দুটী সহচরীর সহিত দিবানিশি তিনি খেলা করেন, এক এক রজনীতে ক্ষণকালের জন্য নিদ্রা আসিয়া সহচরী হন-কিন্তু সে যে সহচরী, তাহা যেন অন্য রূপে। নিদ্রার নাম শান্তিদায়িনী, কিন্তু সেরূপে তিনি অপ্সরাসুন্দরীর নয়নে দর্শন দিতে পারেন না। ক্ষণে ক্ষণে স্বপ্ন আসিয়া তাঁহাকে ঠেলিয়া ফেলে। দিনমানের ত কথাই নাই; শান্তিকাল নিশাকালেও এই অবস্থা। একদিন অপরাহ্নে বিষণ্ণবদনে কিঙ্করীকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "জয়ন্তি! বল্ দেখি, এখন কি করি?" জয়ন্তী অতি চতুরা। চতুরা বুদ্ধিকে হৃদয়ে আনয়ন করিয়া জয়ন্তী তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল, "এক কর্ম্ম আছে। সন্ধ্যাকালে চল আমরা একবার নগরে

যাই। কোন উপায়ে যদি কোন ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করিতে পারি, তাহা হইলে অবশ্যই নিশ্চিত সংবাদ জানিতে পারিব।”

নিশ্বাস ফেলিয়া অপ্সরা কহিলেন, “কাজে কাজে সেই পরামর্শই ভাল। ছেলেবেলা থেকে এ নগরের পথঘাট সমস্তই আমার চেনা। আর সন্ধ্যা করিবার আবশ্যক নাই। তুই যা। একখানা পাল্কী ডাকিয়া আন্। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আমি বাহির হইব। মন বড় অস্থির, জয়ন্তি! মন বড়ই অস্থির। তুই যা।”

জয়ন্তী চলিল। আমাদের ব্যাকুলিনী চিন্তাকুলা নায়িকা গৃহমধ্যে ব্যস্তভাবে এদিক ওদিক বিচরণ করিতে লাগিলেন। দেয়ালে একখানি দর্পণ ছিল অনিচ্ছায় সেই দর্পণের কাছে গেলেন। দর্পণে তাঁহার রূপের ছায়া পড়িল। আপনার চক্ষের জল আপনি দেখিতে পাওয়া যায় না, বুকে যখন গড়াইয়া পড়ে, তখন দেখা যায়, ছোট ছোট নদীর মত স্থতার ধারে বারিধারা। নদীরা পর্ব্বত হইতে আইসে। চক্ষু ত পর্ব্বত নয়, স্বচ্ছ দর্পণ-স্বরূপ। দর্পণ হইতে জল কিরূপে আইসে? সন্তাপীর হৃদয় তাহা বলিতে পারিবে অপ্সরাসুন্দরী বলিতে পারিবেন, কিন্তু আমরা শীঘ্র মীমাংসা করিতে পারিব না। দর্পণে মুখ দেখিয়া অপ্সরা দেখিলেন, দুটী চক্ষে জল। এক হস্তে নয়ন আবরণ করিয়া দর্পণের নিকট হইতে সরিয়া আসিলেন।

জয়ন্তী ফিরিয়া আসিল। অতি শীঘ্র বসন পরিবর্ত্তন করিয়া গাত্রের অলঙ্কারগুলি খুলিয়া রাখিয়া কেবল দুই গাছি কঙ্কণহস্ত অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতা মধুমতী অপ্সরা গৃহ হইতে বাহির হইলেন।

শিবিকা চলিল। সঙ্গে সঙ্গে জয়ন্তী চলিল। নগরের যে দিকে ভদ্র পল্লী, সেই দিকে একটী প্রাচীন বটবৃক্ষতলে শিবিকা থামিল। জয়ন্তীর ইঙ্গিতক্রমেই থামিল। অপ্সরাসুন্দরী শিবিকা হইতে বাহির হইলেন না। কিন্তু শিবিকার দ্বার উদার উন্মুক্ত। সন্ধ্যা হইয়াছে, আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে, পৃথিবী বেশ দেখা যাইতেছে। জয়ন্তী একটু দূরে কি যেন দেখিতে গিয়াছে, শিবিকাবাহকেরা দূরে বসিয়া বস্ত্রসঞ্চালনে বাতাস খাইয়া শ্রান্তি দূর করিতেছে। পথে অনেক লোক চলিতেছে। দেখিতে দেখিতে জন-স্রোত কমিয়া গেল। ইত্যবসরে একটী লোক অস্থিরচরণে সেই পথ দিয়া

উত্তর মুখে যাইতেছে। দীর্ঘ দীর্ঘ রুক্ষচুল বাতাসে ফুর্‌ফুর্ করিয়া উড়িতেছে। বক্ষ পর্য্যন্ত দাড়ী ঝুলিয়াছে, বদন পাণ্ডুবর্ণ। অবয়ব কৃশ; গতি চঞ্চল। শিবিকামধ্য হইতে অপ্সরাসুন্দরী সেই মূর্ত্তি নিবীক্ষণ করিলেন। অনেকক্ষণ দেখিলেন, কি দেখিলেন, সে সময় তাহা ঠিক্ ঠিক অনুধাবন করিতে পারিলেন না। লোকটী অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। কি ভাবে কি ভাবিয়া যে দাঁড়াইল, অপ্সরাসুন্দরী তাহা বুঝিলেন না। আবার দেখিলেন। চন্দ্রের দীপ্তিতে মুখখানি আবার,—আবার,—আবার ভাল করিয়া দেখিলেন। অস্ফুট চীৎকার করিয়া ব্যগ্র বিচঞ্চলপদে শিবিকা হইতে বাহির হইলেন। সেখানে সেই মূর্ত্তি অচঞ্চলে দাঁড়াইয়া, উন্মাদিনীর ন্যায় সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া রোদনস্বরে অপ্সরা কহিলেন, "পিতা! পিতা! কোথায় যাইতেছ? তোমার এমন অবস্থা কেন? কি হইয়াছে তোমার? শুনিয়াছিলাম তুমি পঞ্জাবে। পিতা! তুমি কি পঞ্জাবে গিয়াছিলে? কবে গিয়াছিলে? সেখানে কত দিন ছিলে? তোমার কি শক্ত পীড়া হইয়াছিল? আরাম হইয়াছ? কবে আসিয়াছ? আমি অভাগিনী, আমি তোমাকে দেখিতে আসিয়াছি। আমাকে চিনিতে পার?"

"কে তুমি?"—সেই মূর্ত্তি অন্য দিকে চাহিয়া আবার সেই দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কে তুমি?"

অপ্সরাসুন্দরী চমকিতা হইলেন। বুদ্ধি যেন তাঁহাকে মনের কথা ভুলাইয়া দিতে লাগিল।

পাঠক মহাশয় হয় ত বুঝিতে পারিয়াছেন, যিনি সেই স্থানে দাঁড়াইয়া, তিনি সেই মহাসন্তাপী বৃদ্ধ রাজা বিরাটকেতু। নূতন রাণীকে হারাইয়া অবধি তিনি পাগলের মত হইয়াছেন। অনবরত অধিক পরিমাণে বিষাক্ত মদ্য পান করিয়া এক প্রকার শ্রীভ্রষ্ট,—বুদ্ধিভ্রষ্ট হইয়াছেন। অপ্সরাসুন্দরীর বাক্য শ্রবণ করিয়া বিরক্ত বদনে তিনি বারম্বার কহিতে লাগিলেন, "কে তুমি? পঞ্জাবে গিয়াছি? কে পঞ্জাব? কোথাকার পঞ্জাব? পীড়া হইয়াছে? কাহার পীড়া? কে তুমি?"

"আমি তোমার অভাগিনী অপ্সরা।"

"অঁ্যা ? অপ্সরা ? অপ্সরা কে ? আমার এক অপ্সরা ছিল,—উঃ ! সে অপ্সরা ত আমার আর নাই ! তুমি কে ? এত দিনের পর সে নাম আমার কর্ণে কেন শুনাইলে ? বেশ ছিলাম, আবার কেন আমাকে সে নাম শুনাইলে ? কে তুমি ?"—ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে এইরূপ অসম্বদ্ধ কথা কহিয়া রাজা বিরাটকেতু নেত্রে হস্তাবরণ দিয়া অশ্রুবর্ষণ করিলেন।

চরণ ধারণ করিয়া অপ্সরাসুন্দরী কহিলেন, "পিতা ! কেন পিতা ! তোমার অটল মন এত বিভ্রান্ত হইল কেন ? আমি তোমার চরণে অপরাধিনী হইয়াছি ; সেই নিমিত্তই কি এই ক্রোধ ? আমি তোমার সেই অপরাধিনী অভাগিনী অপ্সরা।"

"অপ্সরা ! তুই কেন এখানে ? যাহা বিসর্জ্জন দিয়াছি, অবাধ্য জানিয়া যাহাকে আমি ত্যজ্যপুত্রী করিয়াছি, সে কেন এই দুরবস্থার সময় আমার চক্ষের সম্মুখে আসিয়া যন্ত্রণা দেয় ? ভুলিয়াছিলাম, ছিলাম ভাল ; আবার কেন এই নূতন দাবানল ? আমার অপ্সরা নাই, আমার কন্যা নাই। আমি মরিতে যাইতেছি, বাধা—বাধা—বাধা !—"

উন্মত্তভাবে এই সকল কথা বলিয়া রাজা বিরাটকেতু অন্য দিকে দ্রুত পদবিক্ষেপে যেন ছুটিয়া যাইতে লাগিলেন। সম্মুখের পথ অবরোধ করিয়া সরোদনে অপ্সরাসুন্দরী তাঁহার চরণতলে নিপতিত হইলেন। রোদন করিতে করিতে কহিলেন, "পিতা ! এ জন্মে কি আর এই অপরাধিণী তনয়াকে ক্ষমা করিবে না ? আমার ভাগ্যে কি এতই যন্ত্রণা লেখা ছিল ? পিতা ! স্বীকার করিতেছি, আমি অপরাধিনী। অভাগিনী বলিয়া তুমি আমারে ক্ষমা কর।"

"ক্ষমা নাই ! ক্ষমা নামে কোন কথাও পৃথিবীতে নাই। তোরে আমি অনেক অবকাশ দিয়াছিলাম, শেষে একবার বিদেশে সাক্ষাৎ করিয়া বিবেচনা করিবার সময় দিয়াছিলাম। তুই কি না এক ক্রীতদাসের কপট মায়ায় মোহিত হইয়া আমার সমস্ত অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়াছিস্ !—এখন আর আমার নিকটে ক্ষমা নাই !"

"পিতা ! পাপিনী আমি। অনুতাপিনী আমি। যাঁহাকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করিয়া মনধন সমর্পণ করিয়াছি, তাঁহাকে পরিত্যাগ করা

আমার অসাধ্য। তাহা বলিয়া কি পিতার স্নেহে,—পিতার ক্ষমায় বঞ্চিত হইতে হইবে?"

"এখনও সেই কথা? এখনও সেই কুকুরের নাম আমার কর্ণে?—দূর হইয়া যা! আমার ক্ষমা নাই। আপনি শয্যা প্রস্তুত করিয়াছিস্, যত দিন বাঁচিস্, সেই শয্যায় শয়ন করিয়া থাক্।" ঘৃণার সহিত সক্রোধে এই সকল কথা বলিয়া পদতলশায়িনী অভাগিনীকে দূরে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া আপনা আপনি কি বকিতে বকিতে ব্যস্তপদে পশ্চিম দিকে চলিলেন। যাইতে যাইতে ফিরিয়া আসিয়া অপ্সরাকে কহিলেন, "আর দেখ্! কলঙ্কিনী তুই! আর দেখ্, বাধ্য হইয়া আমার কথা শুনিলে এত দিনে তুই রাজরাণী হইতে পারিতিস্। তোর অদৃষ্টে সে সুখভোগ নাই। ভাগ্যের দোষ, আমি কি করিব? পঞ্জাবের সেনাদল এইখানে আসিতেছে। আজ রাত্রেই আসিবার কথা। যদি সেই লোকের সঙ্গে তোর আবার সাক্ষাৎ হয়, সাবধান করিয়া দিস্, সে যদি আমার সঙ্গে দেখা করে, তাহা হইলে,—তোর মনে আছে,—তুই যখন ছোট, তখন আমি কুকুরকে যে রকমে পদাঘাত করিতাম,—তোর মনে আছে,—সেই রকমে তাহাকে আমি লাথী মারিয়া দূর করিব।"

অপ্সরা ক্রন্দন করিলেন। রাজা বিরাটকেতু আর কথা কহিলেন না। ক্রোধের সময় মানুষের গতি অত্যন্ত দ্রুত হয়। সেইরূপ দ্রুতগতিতে রাজা বিরাটকেতু অনেক দূর চলিয়া গেলেন। যেন অচলা প্রতিমার মত অপ্সরা-সুন্দরী সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। কি মনে ভাবিয়া রাজা আবার ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন, "অপ্সরাসুন্দরি! মা! তুই থাকিস্ কোথায়? যাবি কোথায়? আমার সঙ্গে আয়। সে ভাবে নয়,—অন্য ভাবে; কোন বিদেশিনীকে যেরূপে আমি আশ্রয় দিই, সেই রকমে তোরেও আশ্রয় দিয়া রাখিব।"

"না পিতা! আমি যাইব না, আশ্রয়ে আমার প্রয়োজন নাই। তুমি গৃহে যাও।"—কাঁদিতে কাঁদিতে পিতাকে এই কথা বলিয়া অভিমানিনী বিষাদিনী নায়িকা যেন বিদ্যুৎগতিতে শিবিকামধ্যে প্রবেশ করিলেন। রাজা চলিয়া গেলেন।

জয়ন্তী ফিরিয়া আসিল। শিবিকার সমীপবর্ত্তিনী হইয়া জয়ন্তী কহিল,

"দেবি! সংবাদ জানিতে পারিয়াছি। তাঁহারা আজ রাত্রেই এখানে আসিয়া পৌঁছিবেন।"

"আমিও সংবাদ পাইয়াছি। কিন্তু জয়ন্তি! আমার সঙ্গে কিরূপে সাক্ষাৎ হইবে? কিরূপে তিনি আমাদের ঠিকানা জানিবেন?"

"জয়ন্তী বুঝি তেমনি কাঁচা মেয়ে? সব ঠিক্ ঠাক্ করিয়া আসিয়াছি। যাহার মুখে সংবাদ পাইলাম, সে লোকটী অতি ভালমানুষ। তাহার স্ত্রীও বড় সুশীলা। আমি তোমার পরিচয় দিয়া আর রাজকুমারের নাম করিয়া আমাদের ঠিকানা দিয়া আসিয়াছি। তিনি আসিলেই সেই লোকটী তাঁহাকে সব তত্ত্ব বলিয়া দিবে। রাজকুমার এই রাজ্যে অনেক দিন ছিলেন কি না, সকলেই তাঁহাকে জানে। দর্শনের জন্য ভাবিতে হইবে না।"

"জয়ন্তি! তুই বেঁচে থাক্! তোর পরামর্শেই আমি এতদূর আসিয়াছি, তোর কল্যাণেই মনস্কামনা পূর্ণ হইল। তুই বেঁচে থাক্।"

আশীর্ব্বাদ শুনিয়া অবনতবদনে জয়ন্তী হাস্য করিল।

রাজার সহিত কথোপকথনে কত সময় গিয়াছিল, অপ্সরাসুন্দরী তাহা অনুভব করিতে পারেন নাই। এখন রাত্রি প্রায় এক প্রহরের কাছাকাছি। শিবিকাবাহকেরা তাঁহাকে নির্দ্দিষ্ট স্থলে পৌঁছাইয়া দিল। জয়ন্তীর সহিত অপ্সরাসুন্দরী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বাহকেরা বিদায় হইয়া গেল।

আজ রাত্রে আসিবেন। কত রাত্রে আসিবেন? রাত্রে কি সাক্ষাৎ হইতে পারিবে? অসম্ভব। আমি যত ভাবিতেছি, তিনি কি তত ভাবেন? ভূপেশ! আমার মন যত ব্যাকুল হইতেছে, তোমার মন কি সেইরূপ? আমি যত কাতরা, তুমি কি তত কাতর? হইতেও পারে, হইতে পারেও না। ভূপেশ! বিশুদ্ধ প্রণয়ে অদর্শন কি অসহ্য যন্ত্রণা! দময়ন্তী জানিতেন, নলরাজা জীবিত আছেন, সীতাদেবী জানিতেন, রামচন্দ্র জীবিত আছেন, শুদ্ধ অদর্শন। কিন্তু সেই অদর্শনে তাঁহারা যে কত যন্ত্রণানলে দগ্ধ হইয়াছিলেন, সেই শাস্ত্রের কথা তোমার কি মনে আছে ভূপেশ? সেই যন্ত্রণাগুনে আমি জ্বলিতেছি। সে আগুন তুমি দেখিতে পাইতেছ না।

প্রণয়পাত্রের উদ্দেশে এইরূপ কতই মনের কথা কহিলেন, হৃদয়ের ভার অনেকটা যেন লঘু হইল। জোড়করে করুণস্বরে পরমপিতাকে ডাকিলেন।

স্বর্গ হইতে যেন দৈববাণী শ্রবণ করিলেন, "ভূপেশচন্দ্র আসিতেছেন।" হৃদয়ানন্দে হৃদয়ধাম যেন পরমপবিত্র বোধ হইতে লাগিল। যেন কতই আলো হইল। আরও কত কি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, সেইরূপ পবিত্র প্রেমপূর্ণ হৃদয় যাঁহাদের, তাঁহারাই তাহা বুঝিবেন।

অপ্সরার অটল চিত্ত অন্য দিকে টলিল। মনে পড়িল, বুড়ী, মনে পড়িল, সেই নরকনিবাস, মনে পড়িল, ঘৃণিত নারকী স্বর্ণভূষণ, মনে পড়িল, সেই অর্থ অপহারক ছদ্মবেশী প্রতারক লোক! লোমে লোমে কাঁপিলেন। মনে মনে কহিলেন, কি ভয়ানক প্রতারণা! এত ভয়ানক প্রতারণাও মানুষে সৃজন করিতে পারে? রাজা বিরাটকেতু প্রয়াগে, আমরা ছিলাম পঞ্জাবে, তাহারা ছিল পঞ্জাবে, অথচ কি মায়া বিস্তার করিয়া তাহারা আমারে মোহিত করিয়াছিল? আমি স্ত্রীলোক, আমারে ত পারেই, কিন্তু সেই লোকটা আমার অপেক্ষাও ভূপেশচন্দ্রকে ভুলাইয়া দিয়াছিল! আমি এখানে আসিবার পূর্ব্বে সে কুহক ভুলি নাই। রাজা বিরাটকেতু সত্য সত্য সেখানে পীড়িতাবস্থায় রহিয়াছেন কি না, নানা সূত্রে আমি তাহার প্রকৃত তত্ত্ব জানিবার চেষ্টা পাইয়াছিলাম। কেহই কিছু সন্ধান বলিতে পারে নাই। পারিবে কি? কাণ্ডই মিথ্যা।

কেবল চিন্তায় চিন্তায় অপ্সরাসুন্দরীর সেই দুঃখময়ী সর্ব্বরী অতিবাহিত হইয়া গেল। একবারও তিনি চক্ষের পাতা বুজিতে পারিলেন না। প্রভাতে উঠিয়া উৎকণ্ঠিতভাবে কিঙ্করীকে কহিলেন, "জয়ন্তি! যা দেখি, একবার জেনে আয় দেখি, সেনাদল পৌঁছিল কি না?"

একদিনের জন্যও জয়ন্তী একটীও কথার অবাধ্য হয় নাই। দ্বিরুক্তি না করিয়া,—কিছু মাত্র বিতণ্ডা উত্থাপন না করিয়া জয়ন্তী গৃহ হইতে বহির্গত হইল। যেখানে যেখানে যাহা যাহা জানিবার, সেই সেই স্থলে সকল তত্ত্ব অবগত হইয়া বেলা প্রায় এক প্রহরের সময় জয়ন্তী ফিরিয়া আসিল।

উৎকলিকাকুল লোচনে চাহিয়া অপ্সরাসুন্দরী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি সংবাদ জয়ন্তী?"

"সমস্তই মঙ্গল। সমস্তই সুসংবাদ। তিনি আসিয়াছেন, আমরা যেখানে আছি, সমাচার পাইয়াছেন, অবিলম্বেই সাক্ষাৎ হইবার আশা।"

"আশা? এ কি কথা জয়ন্তী তোর? প্রাণের বস্তুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবার আশা? তুই ছুঁড়ি কি লো?"—অনেক দুঃখের পরে,—অনেক নিরাশার পরে মনে আনন্দস্রোত আসিয়াছে। সেই আনন্দে প্রমোদিনী হইয়া রহস্যচ্ছলে আমাদের বিরহিণী নায়িকা একটু একটু হাসিয়া কহিলেন, "তুই ছুঁড়ি কি লো? প্রাণের প্রিয়বস্তুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবার আশা? আশা যে চপলা!"

"কে জানে দেবি, চপলা কি বিপলা; যেমন শুনিয়া আসিলাম, তাহাই কহিলাম। যিনি সংবাদ দিলেন, তিনিই কহিয়া দিলেন, অবিলম্বেই সাক্ষাৎ হইবার আশা।"

অপ্সরাসুন্দরীর পদ্মমুখখানি অকস্মাৎ যেন সন্ধ্যার অন্ধকারে জলের পদ্মের ন্যায় মলিন হইল। কৃষ্ণবর্ণ মেঘ যেন পূর্ণচন্দ্রকে ঢাকা দিল। করুণ স্বরে তিনি কহিলেন, "জয়ন্তি!"

"দেবি!"

"অবিলম্বে?—এ অবিলম্বের অর্থ আমি কি বুঝিব? আজিও হইতে পারে, কালিও হইতে পারে, পাঁচ দিন পরেও হইতে পারে।"

"না দেবি! এমন হইতে পারে না। আজিই তিনি আসিবেন। যেরূপ আগ্রহ জানাইয়া আমি বলিয়া আসিয়াছি, তাহাতে যে তিনি বহুদিন বিলম্ব করিবেন, এমন কথনই মনে করিও না। আমি তোমার চরণের দাসী, তাঁহারও চরণের দাসী।"

অপ্সরাসুন্দরী আর কথা কহিলেন না। অন্যমনস্ক হইয়া মুহুর্মুহু মুহূর্ত্ত গণনা করিতে লাগিলেন। মুহুর্মুহু প্রবেশদ্বারের দিকে তাঁহার নেত্রদ্বয় বিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। একটু কিছু শব্দ হয়, অমনি মনে করেন, ঐ বুঝি আসিতেছেন। এমন চঞ্চলভাব চক্ষে দেখিতে অতি সুন্দর, কিন্তু মনে ধারণা করিয়া সহ্য করা দুষ্কর।

জয়ন্তী অন্যান্য গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃত। অপ্সরাসুন্দরী চিন্তাকে কোলে করিয়া আশার আবাহনে ব্যাপৃত। নিরবচ্ছিন্ন আশাপথ চাহিয়া রহিয়াছেন। বেলা দ্বিপ্রহর হইতে অনুমান একদণ্ড বাকী। চক্ষের জ্যোতিকে আরও জ্যোতির্ম্ময়ী করিয়া বীরবর ভূপেশচন্দ্র সেই অপরিচিত নূতন গৃহমধ্যে

প্রবেশ করিলেন। পাঠক মহাশয়! এমন আকাঙ্ক্ষিত দর্শন আপনাদের কাহারও ভাগ্যে কখনও যদি ঘটিয়া থাকে, এই সময় একবার স্মরণ করিয়া দেখিবেন, তৎকালে সেই দর্শনে আপনার মুখে হাসি আসিয়াছিল, কি চক্ষে জল আসিয়াছিল। অপ্সরাসুন্দরীর চক্ষে জল আসিল। আসন ত্যাগ করিয়া দ্রুতগতিতে নিকটবর্ত্তিনী হইয়া যুগল হস্ত বিস্তার করিলেন। সে হস্ত বিস্তারের যে কি অর্থ, তাহা তিনি নিজে বুঝিলেন, আর যদি সম্ভব হয়, ভূপেশচন্দ্র বুঝিলেন; আর কেহই না। রুমালে নেত্রাবরণ করিয়া ভূপেশচন্দ্র নয়ন নীর পরিমার্জ্জন করিলেন। অতি অল্পক্ষণ নির্ব্বাক অভি-নয়ের পর উভয়ে ভিন্ন ভিন্ন আসনে উপবেশন করিলেন। অগ্রে কথা কহি-লেন অপ্সরাসুন্দরী। যিনি প্রথমে কথা কহেন, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তাঁহাকে সাবধান হইতে হয়। অপ্সরা কহিলেন, "ভূপেশ! এই বুঝি তোমার শীঘ্র? এক পক্ষের অধিক হইল, আমি এখানে আসিয়াছি। তুমি কি চঞ্চলক্রীড়া শিখিয়াছ?"

"পরাধীন জীবনের এই প্রকার দুর্গতি! তুমি জান অপ্সরা! আমি সাত বৎসরের জন্য পরাধীন?"

"আর কাঁদায়ো না ভূপেশ! আর কাঁদায়ো না। সব কথা আমার মনে আছে। সেই সাত বৎসরের আর ক বৎসর বাকী প্রাণাধিক?"

"গতা বহুতরা কান্তে!—অতি অল্পমাত্র বিলম্ব। আর তিন মাস পরেই আমি মুক্ত হইব।"

"উঃ! এখনও তিন মাস! চন্দ্রগ্রহণের কি এত দীর্ঘকাল স্থিতি?"

"হাঁ প্রাণাধিকে! নূতন পঞ্জিকা অনুসারে।"

"তাহাই ত দেখিতেছি। এখন তোমার সমস্ত কুশল?"

"কুশল আমার ভবিষ্যতের গর্ভে। দুশ্চক্রীদল জীবিত থাকিতে আমার কুশলের আশা অনেক দূরে দূরে বিচরণ করিবে। তুমি ত এখন নিরাপদে কুশলে আছ স্বর্গসুন্দরী?"

নয়ন মার্জ্জন করিয়া ঈষৎ ঈষৎ হাস্য করিয়া অপ্সরাসুন্দরী উত্তর করিলেন, "কুশল?—আমার কুশল ভূপেশচন্দ্র?—জীবনাধিক! তোমার কুশল,—তোমার কুশলের আশা দূরে দূরে বিচরণ করে, কিন্তু আমার কুশল,—

আমার কুশলের আশা একবার আসে, একবার যায়। যতক্ষণ, তোমারে নয়নে দেখি, ততক্ষণ আমার কুশল; যখন তুমি আমার চক্ষের অন্তরে যাও, তখন আমার কুশলের আশা একটী বারও দেখা দেয় না। সেই জন্যই বলি, আশা-চপলা একবার আসে, একবার যায়। আচ্ছা! ভূপেশ! তুমি যে সেই লোককে আমাদের যথাসর্ব্বস্ব দান করিলে,—এত দিন সে চিন্তা আমার ছিল না,—এখন তোমারে নিকটে পাইয়াছি, এখন জিজ্ঞাসা করিতে পারি,—যাহাকে তুমি সর্ব্বস্ব দান করিয়াছিলে, তাহার কি কোন সন্ধান পাইয়াছ? পিতার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইয়াছে,—শৈশবাবধি যাঁহাকে পিতা বলিয়া ডাকিয়া আসিয়াছি, পিতা না বলিয়া তাঁহাকে আর অন্য সম্বোধনে সম্ভাষণ করিতে পারা যায় না,—পিতার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইয়াছে। তাঁহার কোন পীড়া হয় নাই, তিনি পঞ্জাবেও যান নাই, সমস্তই প্রতারণা;—মহা মহা ষড়্‌যন্ত্রজালজড়িত দুর্জ্জয় প্রতারণা। তুমি ভূপেশচন্দ্র! সে প্রতারণার কি কিছু সন্ধান করিতে পারিয়াছ?”

“সন্ধান করিবার সময় আসিবে, অবশ্যই আমি চক্রব্যূহ ভেদ করিব। কিন্তু রাজা বিরাটকেতু যে সত্যবাদী, তাহার কিছু প্রমাণ তুমি আমাকে দেখাইতে পার কি?”

মনে যেন কিছু আঘাত লাগিল, একটু কাতর হইয়া অপ্‌সরা কহিলেন, “প্রমাণ? অন্য বিষয়ে পারি না পারি, কিন্তু এই উপস্থিত বিষয়ে আমি নিজেই তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ। তিনি যে পঞ্জাবে যান নাই, তাহা আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি।”

“আচ্ছা! সে সকল কথার মীমাংসা পরে হইবে। এখন আমি যে আগুনে পুড়িতেছিলাম, তোমাকে দেখিয়া সে আগুন নির্ব্বাণ হইল। তোমার নয়নে শান্তিজল আছে, মুখে অমৃত আছে। সেই শান্তিজলে আর ঐ অমৃতময় বাক্যে সমস্ত অনল শীতল হইয়াছে। আমিও শীতল হইয়াছি। তুমি দেবি, এখন আমারে কি বলিতে ইচ্ছা কর?”

“ভূপেশ! তোমারে আমি অনেক কথা বলিতে ইচ্ছা করি। গ্রহচক্রে পড়িয়া তুমি যেমন কাঁদিতেছ, আমিও তেমনি কাঁদিতেছি। সেই দিনের কথা মনে করিয়া দেখ দেখি, যে দিন সেই দুষ্ট লিঙ্গেশ্বর তোমারে অঙ্গীকারে

বন্ধ করিয়া অগ্রিম মুদ্রা প্রদান করিয়াছিল, সেই মুদ্রা প্রত্যর্পণ করিয়া আমি তোমারে স্বাধীন করিয়াছিলাম; তুমি সত্যবাদী, সত্যপথ হইতে একপদও বিচলিত হও না; বাক্যমূল্যে স্বাধীনতারত্ন বিক্রয় করিয়াছ! এখনও তিন মাস? উঃ! ভূপেশচন্দ্র! এখনও তিন মাস?"

"ভয় কি জীবিতেশ্বরি! যখন ছয় বৎসর নয় মাস অতিক্রান্ত হইয়াছে, তখন তিন মাসের জন্য আমি কিছুমাত্র ভয় করি না।—সূর্য্যের অস্তগমনের পর দ্বিতীয় প্রভাতে দ্বিতীয় দিবসের সূর্য্য যেমন আমরা দর্শন করি, এই তিন মাস ঠিক সেইরূপে অতিবাহিত হইবে। পৃথিবীর কবিরা বলেন, সময়ের পাখা আছে। আকাশের পক্ষী অপেক্ষা সময়পক্ষী শীঘ্র শীঘ্র উড়িয়া যাইতে পারে, যায়ও তাই। এই সামান্য তিনমাস দেখিতে দেখিতে উড়িয়া যাইবে। তুমি শান্ত হইয়া গৃহে থাক। আমি অসময়ে আসিয়াছি, অধিকক্ষণ থাকিতে পারিব না, এখন বিদায় হই। কেমন আছ, অনেক দিন সংবাদ পাই নাই, এই নিমিত্তই আসিয়াছি। এখন বিদায় হইলাম, যদি সুবিধা হয়, রাত্রিকালে সাক্ষাৎ করিব।"

অপ্সরাসুন্দরী মৌনভাবে সম্মতি দান করিলেন, ভূপেশচন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দুইচারি পদ অগ্রসর হইয়া সহাস্যবদনে হাস্য করিয়া চক্ষু ফিরাইয়া কহিলেন, "অদ্য রজনীপ্রভাতে এই সুপবিত্র প্রয়াগধামে এক চমৎকার কাণ্ড আছে।"

"কি আছে?—কি আছে? বলিয়া যাও; কিঞ্চিৎকাল অপেক্ষা কর, সংশয়সঙ্কটে ফেলিয়া রাখিয়া যাইও না। অনেক বার অনেক সময়ে, অনেক কারণে, অনেক বিষয়ে আমি অন্ধকারে থাকিয়াছি। চরণে ধরি ভূপেশ! আর আমারে অন্ধকারে রাখিয়া যাইও না।"

"কল্য শুনিতে পাইবে, আজ আর সময় নাই। ঈশ্বর তোমাকে দিবারাত্রি নিরাপদে রক্ষা করুন, আজ রাত্রে না পারি, কল্য যথাসময়ে সাক্ষাৎ করিয়া সুখী হইব।" সংক্ষেপে এই কথা বলিয়া ভূপেশচন্দ্র তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

অষ্টপঞ্চাশৎ প্রবাহ।

এক পাপের এক প্রায়শ্চিত্ত।

ফৌজদারী মোকদ্দমা।

"In those days of chivalry, of Romance, *** many assumed the Cross from a mere love of wandering and adventure, others to have their debts handsomely cancelled, and many ** to fight faithfully ** for the recovery of the holy places from the, profanation of the infidels."

James Grant.

বিধাতার নাম বিশ্বকর্ম্মা কিম্বা বিশ্বকর্ত্তা। ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইলে বিদ্যালয়ের শিক্ষকের মত স্পষ্ট করিয়া বলিতে হয়, বিশ্ববিধানের কর্ত্তা। বিধাতার লিপিতে পাঠক মহাশয়ের যদি বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে মনে করিবেন, সে লিপি কেহ খণ্ডন করিতে পারে না। আমি যদি সে লিপিতে অবিশ্বাস করি, যাহারা হাসিবার লোক আছেন, হাসিবেন; তাঁহাদিগকে আমি প্রণাম করিব, নমস্কার করিব, আশীর্ব্বাদ করিব। আমি অদৃষ্টবাদী। যদি ইচ্ছা করি, তাঁহাদের বাক্যে বাক্যে বর্ণে বর্ণে সায় দিয়া কহিব, বিধিলিপি অখণ্ডনীয়। মানবজীবনে যে দিন যেটী ঘটিবার,—কেবল দিনে কেন, যে দণ্ডে, যে লহমায়, যে মুহূর্ত্তে, যখন যেটী ঘটিবার, অবশ্যই তাহা ঘটিবেই ঘটিবে। পাঠক মহাশয় অনেক কাণ্ড দেখিয়াছেন, অনেক শুনিয়াছেন, এই ক্ষেত্রে,—এই পবিত্রধাম প্রয়াগক্ষেত্রে, একটী চমৎকার দৃষ্টান্ত দর্শন করিবেন।

রাত্রি প্রভাত হইয়াছে। চাঁদ ছিলেন, তাঁহার হয় ত কি দেখিবার ইচ্ছা ছিল, নিষ্প্রভ হইয়াও অনেক ক্ষণ তিনি তামাসা দেখিবার জন্য পশ্চিম দিকে বসিয়া ছিলেন। লুকাইলেন; ধৈর্য্য ধারণ করিতে না পারিয়া বিশ্রামমন্দিরে লুকাইলেন। নক্ষত্রেরা উষাকে দেখিয়াই লুকাইয়া গিয়াছিল।

এখন সূর্য্যদেব আসিয়াছেন। তিনি না কি জগতের চক্ষু; তিনি উদয় না হইলে জগতের না কি চক্ষু ফোটে না, সেই নিমিত্তই তিনি লুকাইতে পারিলেন না। পদ্মিনীর চক্ষু ফুটিয়াছে। হাসিহাসিমুখে পদ্মিনীসতী সূর্য্যদেবকে দর্শন করিতেছেন। রাত্রে যে সকল ফুল ফোটে, তাহারা কুমুদিনীর মত পতিব্রতা নহে। সূর্য্যকে দেখিয়া কুমুদিনীর মত তাহারা ম্লান হয় না। তাহারা যেমন ছিল, তেমনি ফুটিয়া রহিয়াছে। কেবল আমাদের কুমুদিনীসতী চক্ষু বুজিয়া ম্লানমুখী হইয়াছেন।

বেলা অনুমান দেড় প্রহর। এলাহাবাদের ফৌজদারী আদালত লোকে লোকে লোকারণ্য। কি এক মোকদ্দমা আছে, তাহা দেখিবার নিমিত্ত সহরের ছোট বড় সমস্ত লোক সেই বিচারালয়ে সমাগত। এখন আমাদের দেশে ইংরাজের রাজত্ব; দিবা দুই প্রহরের চারি পাঁচ দণ্ড পূর্ব্বে বিচারপতি বিচারালয়ে দর্শন দেন; বাদী, প্রতিবাদী, উকীল, মোক্তার, সাক্ষী, সকলেই সেই নির্দ্দিষ্ট সময়ে বিচারগৃহে উপস্থিত হন। দর্শকেরাও ঠিক সেই সময়ে হাজির হয়। কিন্তু যখনকার কথা, তখন এ দেশে সাহেব আসিয়াছিলেন, দিল্লীর সিংহাসন কাঁপিয়াছিল, কিন্তু সাহেবের রাজত্ব হয় নাই। বেলা দুই প্রহরের পর মুসলমান হাকিম উজ্জ্বল পরিচ্ছদে সুসজ্জিত হইয়া বিচারাসনে বার দিলেন। সে দিন কেবল একটী মাত্র মোকদ্দমা। ফরিয়াদী রাজা বিরাটকেতু,—আসামী কুমার স্বর্ণভূষণ রাও। অভিযোগ, প্রলোভনে ভুলাইয়া রাণী জগৎকুমারীকে দুষ্ট অভিপ্রায়ে গৃহের বাহির করা।

আদালতের সমস্ত লোক হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিয়াছে। উভয় পক্ষ কতক্ষণে হাজির হয়, দেখিবে।

প্রথমে ফরিয়াদী রাজা বিরাটকেতু।—বিচারাসনের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তিনি যেন বোবা হইয়া গেলেন। তাঁহাকে একটু সরাইয়া উকীল বলবন্ত সিংহ আদালতকে সেলাম করিয়া সম্ভ্রমের স্বরে কহিলেন, "হুজুর। ইনি রাজা, নিজকুলের কলঙ্কের কথা নিজের মুখে প্রকাশ করিতে পারিবেন না। আমি ইহাঁর প্রতিনিধি; ইহাঁর যাহা কিছু বলিবার আছে, আমিই এজেহার করিব।"

ইংরাজের রাজত্ব হইলেও প্রতিনিধির কথা গ্রাহ্য হইত। পলাসীর

যুদ্ধের তখনও পাঁচ সাত বৎসর বিলম্ব। ভারতবর্ষে তখন ইংরাজ, ফরাসী, ওলন্দাজ, দিনামার, পর্তুগিজ, সব জাতি আসিয়াছে। ক্ষমতাতে ছোট হইলেও তখনও পর্য্যন্ত দিল্লীর সিংহাসনে মোগলবংশের ক্ষুদ্র প্রদীপ জ্বলিতেছিল। সেই প্রদীপের একটী সলিতা এলাহাবাদের বিচারাসনে।

রাজা বিরাটকেতুর প্রতিনিধি বলবন্তসিংহ বিচারাসনের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া যাবনিক ভাষায় কহিতে লাগিলেন, "রাজা রঘুবর রাও বাহাদুরের পুত্র কুমার স্বর্গভূষণ রাও এই মোকদ্দমার আসামী। রাজা বিরাটকেতু প্রথম রাণীর বিয়োগে কয় বৎসরকাল শোকাভিভূত হইয়া সংসারে এক প্রকার অনুরাগশূন্য হইয়াছিলেন। তাঁহার একটী কন্যা ছিল, এখন আছে কি নাই, তাহা বলিবার জন্য আমি উপদেশ পাই নাই। গৃহশূন্য রাজা কয়েক বৎসর পরে একটী রমণীকে দর্শন করেন; তখন তাঁহার কন্যা গৃহে ছিল না। যে সুন্দরীকে তিনি দেখেন, সেই সুন্দরী পরমাসুন্দরী। বয়সে যদিও অমিলন, রাজার বয়স অধিক, সেই সুন্দরীর বয়স অল্প, তথাপি উভয়ের সম্মতিতে বিবাহ হয়। বিরাটকেতু সেই নূতন রাণীকে পরমযত্নে রাখিয়াছিলেন। ভালবাসার ত্রুটী ছিল না। রাণী যখন যাহা ইচ্ছা করিতেন, রাজা তৎক্ষণাৎ তাহা প্রদান করিতে কাতর হইতেন না। রাণীর নাম জগৎকুমারী। তিনি বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কার ভালবাসিতেন। যতই কেন মূল্য হউক না, আদেশমাত্র প্রদান করিতে রাজা কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না। দুই বৎসর উভয়ে সুখে ছিলেন। দুই বৎসর পরে সেই সুখপ্রাসাদের চতুর্দ্দিকে কণ্টকাকীর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষ জন্মিতে আরম্ভ হইল। বৃদ্ধি হইয়া হইয়া বন,—নিবিড় বন,—নিবিড় অরণ্য, সেই অরণ্যে সর্প প্রবেশ করিল।—অলঙ্কারশাস্ত্র ছাড়িয়া দিয়া স্থূল কথায় আমি বলি, বিচারালয় সাক্ষী,—ধর্ম্মরূপী সাক্ষাৎ ধর্ম্মপতি বিচারপতি সাক্ষী, সেই সর্প এই মোকদ্দমার আসামী রাজকুমার স্বর্গভূষণ রাও। নানা কারণে মনের বিরাগে রাজা বিরাটকেতু রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত বাটীতে থাকিতেন না, স্বর্গভূষণ রাও সেই অবকাশে রাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া রাজার অনেক নিন্দা করিতেন, নানা প্রলোভনবাক্যে রাণীকে ভুলাইতেন, অবশেষে রাণী কুমতি-পরিচালিতা হইয়া স্বর্গভূষণের সহিত গৃহত্যাগ করেন।"

আদ্যোপান্ত সমস্ত এজাহার সুস্থির চিত্তে শ্রবণ করিয়া হাকিম জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার সাক্ষী আছে?"

উকীল উত্তর করিলেন, "প্রত্যক্ষ সাক্ষী একজন মাত্র, কিন্তু যে যে চক্রে যে যে ঘটনা, তাহার অনেক সাক্ষী আছে।" এই কথা বলিয়া ফরিয়াদীর উকীল আদালতকে সেলাম করিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।

"আচ্ছা! প্রধান সাক্ষীকে তলব কর।"

প্রধান সাক্ষী সারদা।—সাক্ষীমঞ্চে দাঁড়াইয়া সারদাসুন্দরী কহিল, "আমি রাজমহিষী জগৎকুমারীর কিঙ্করী।"

"হাঁ, হাঁ! শুনিয়াছি, শুনিয়াছি; তুমি কিঙ্করী। আচ্ছা, কিঙ্করি! তুমি এ মোকদ্দমার কি জান?"

"মকদ্দমা!—ও বাবা! মকদ্দমা!—আমি মেয়েমানুষ, মকদ্দমার কথা আমি কি জানি?"

"ভয় পাও কেন? রাণী জগৎকুমারী গৃহ ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন কেন, তাহা কি তুমি জান?"

"আমি গরিবের মেয়ে, পেটের দায়ে দাসীবৃত্তি করি, রাজারাণীর কথায় কথা কহিতে আমার বড় ভয় হয়।"

"এখন তুমি রাজারাণীর বাড়ীতে নও। এখন তুমি রাজার আদালতে। সত্যকথা না বলিলে সাজা পাইতে হইবে। তাহা তুমি জান?"

কাঁপিতে কাঁপিতে সারদা কহিল, "আমাকে কি কথা বলিতে হইবে, ভাল করিয়া বুঝাইয়া বল, আমি উত্তর করিতে পারিব। ভয় দেখাইলে আমি একটীও কথা কহিতে পারিব না।"

উকীল কহিলেন, "ভয় কি তোমার? হাকিম তোমাকে ভয় দেখাবেন কেন? বিচারের আসন, ধর্ম্মের আসন। এখানে ভয়ের কথা কিছু নাই। সত্যকথা বলিলে পুরস্কার আছে, যাহারা মিথ্যা বলে, তাহারা সাজা পায়। তুমি সত্যকথা কও। তুমি কি রাণী জগৎকুমারীর দাসী?"

"হ্যাঁ। আমি রাণীর দাসী, রাজার দাসী।"

"আচ্ছা! তুমি স্বর্ণভূষণকে জান?"

"আগে জানিতাম না, মহারাজ একদিন তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া

যুদ্ধের তখনও পাঁচ সাত বৎসর বিলম্ব। ভারতবর্ষে তখন ইংরাজ, ফরাসী, ওলন্দাজ, দিনামার, পর্ত্তুগিজ, সব জাতি আসিয়াছে। ক্ষমতাতে ছোট হইলেও তখন পর্য্যন্ত দিল্লীর সিংহাসনে মোগলবংশের ক্ষুদ্র প্রদীপ জ্বলিতেছিল। সেই প্রদীপের একটী সলিতা এলাহাবাদের বিচারাসনে।

রাজা বিরাটকেতুর প্রতিনিধি বলবন্তসিংহ বিচারাসনের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া যাবনিক ভাষায় কহিতে লাগিলেন, "রাজা রঘুবর রাও বাহাদুরের পুত্র কুমার স্বর্গভূষণ রাও এই মোকদ্দমার আসামী। রাজা বিরাটকেতু প্রথম রাণীর বিয়োগে কয় বৎসরকাল শোকাভিভূত হইয়া সংসারে এক প্রকার অনুরাগশূন্য হইয়াছিলেন। তাঁহার একটী কন্যা ছিল, এখন আছে কি নাই, তাহা বলিবার জন্য আমি উপদেশ পাই নাই। গৃহশূন্য রাজা কয়েক বৎসর পরে একটী রমণীকে দর্শন করেন। তখন তাঁহার কন্যা গৃহে ছিল না। যে সুন্দরীকে তিনি দেখেন, সেই সুন্দরী পরমাসুন্দরী। বয়সে যদিও অমিলন, রাজার বয়স অধিক, সেই সুন্দরীর বয়স অল্প, তথাপি উভয়ের সম্মতিতে বিবাহ হয়। বিরাটকেতু সেই নূতন রাণীকে পরমযত্নে রাখিয়াছিলেন। ভালবাসার ক্রটী ছিল না। রাণী যখন যাহা ইচ্ছা করিতেন, রাজা তৎক্ষণাৎ তাহা প্রদান করিতে কাতর হইতেন না। রাণীর নাম জগৎকুমারী। তিনি বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কার ভালবাসিতেন। যতই কেন মূল্য হউক না, আদেশমাত্র প্রদান করিতে রাজা কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না। দুই বৎসর উভয়ে সুখে ছিলেন। দুই বৎসর পরে সেই সুখপ্রাসাদের চতুর্দ্দিকে কণ্টকাকীর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষ জন্মিতে আরম্ভ হইল। বৃদ্ধি হইয়া হইয়া বন,—নিবিড় বন,—নিবিড় অরণ্য, সেই অরণ্যে সর্প প্রবেশ করিল।—অলঙ্কারশাস্ত্র ছাড়িয়া দিয়া স্থূল কথায় আমি বলি, বিচারালয় সাক্ষী,—ধর্ম্মরূপী সাক্ষাৎ ধর্ম্মপতি বিচারপতি সাক্ষী, সেই সর্প এই মোকদ্দমার আসামী রাজকুমার স্বর্গভূষণ রাও। নানা কারণে মনের বিরাগে রাজা বিরাটকেতু রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত বাটীতে থাকিতেন না, স্বর্গভূষণ রাও সেই অবকাশে রাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া রাজার অনেক নিন্দা করিতেন, নানা প্রলোভনবাক্যে রাণীকে ভুলাইতেন, অবশেষে রাণী কুমতি-পরিচালিতা হইয়া স্বর্গভূষণের সহিত গৃহত্যাগ করেন।"

আদ্যোপান্ত সমস্ত এজাহার সুস্থির চিত্তে শ্রবণ করিয়া হাকিম জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার সাক্ষী আছে?"

উকীল উত্তর করিলেন, "প্রত্যক্ষ সাক্ষী একজন মাত্র কিন্তু যে যে চক্রে যে যে ঘটনা, তাহার অনেক সাক্ষী আছে।" এই কথা বলিয়া ফরিয়াদীর উকীল আদালতকে সেলাম করিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।

"আচ্ছা! প্রধান সাক্ষীকে তলব কর।"

প্রধান সাক্ষী সারদা।—সাক্ষীমঞ্চে দাঁড়াইয়া সারদাসুন্দরী কহিল, "আমি রাজমহিষী জগৎকুমারীর কিঙ্করী।"

"হাঁ, হাঁ! শুনিয়াছি, শুনিয়াছি; তুমি কিঙ্করী। আচ্ছা, কিঙ্করি! বলি এ মোকদ্দমার কি জান?"

"মকদ্দমা!—ও বাবা! মকদ্দমা!—আমি মেয়েমানুষ, মকদ্দমার কথা আমি কি জানি?"

"ভয় পাও কেন? রাণী জগৎকুমারী গৃহ ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন কেন, তাহা কি তুমি জান?"

"আমি গরিবের মেয়ে পেটের দায়ে দাসীবৃত্তি করি, রাজারাণীর কথায় কথা কহিতে আমার বড় ভয় হয়।"

"এখন তুমি রাজারাণীর বাড়ীতে নও। এখন তুমি রাজার আদালতে। সত্যকথা না বলিলে সাজা পাইতে হইবে। তাহা তুমি জান?"

কাঁপিতে কাঁপিতে সারদা কহিল, "আমাকে কি কথা বলিতে হইবে, ভাল করিয়া বুঝাইয়া বল, আমি উত্তর করিতে পারিব। ভয় দেখাইলে আমি একটীও কথা কহিতে পারিব না।"

উকীল কহিলেন, "ভয় কি তোমার? হাকিম তোমাকে ভয় দেখাবেন কেন? বিচারের আসন, ধর্ম্মের আসন। এখানে ভয়ের কথা কিছু নাই। সত্যকথা বলিলে পুরস্কার আছে, যাহারা মিথ্যা বলে, তাহারা সাজা পায়। তুমি সত্যকথা কও। তুমি কি রাণী জগৎকুমারীর দাসী?"

"হাঁ। আমি রাণীর দাসী, রাজার দাসী।"

"আচ্ছা! তুমি স্বর্ণভূষণকে জান?"

"আগে জানিতাম না, মহারাজ একদিন তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া

আনিয়াছিলেন, সেই দিন দেখিয়াছিলাম,—সেই দিন জানিয়াছিলাম, তাঁহার নাম রাজকুমার স্বর্গভূষণ।"

"আচ্ছা! সে দিন তোমাদের রাণীর সঙ্গে স্বর্গভূষণের অন্য কোন কথা হইয়াছিল?"

"মহারাজ উপস্থিত ছিলেন, তাঁহার সঙ্গে কি কথা হইয়াছিল, আমি দাসী, তাহা আমি কিরূপে বলিব?"

"আচ্ছা, যখন তোমার মহারাজ উপস্থিত ছিলেন না, এমন কোন সময়ে স্বর্গভূষণ তোমাদের রাণীর সঙ্গে দেখা করিয়াছিলেন, তাহা তোমার মনে হয়?"

"কেন গা? আমাকে তোমরা ও কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ, কেন গা? আমি দাসী। আমি ও সকল কথার কি জানি? আমার গা কাঁপে।"

"কাঁপিলে হইবে না, সত্যকথা বলিতে হইবে। রাজা যখন গৃহে থাকিতেন না, স্বর্গভূষণ সে সময় তোমাদের রাণীর সঙ্গে দেখা করিতে যাইতেন কি না? যদি সত্যকথা না বল, এই বিচারপতি তোমাকে কারাগারে দিবেন।"

"কারাগারে?—কেন গা? আমাকে কারাগারে দিবে কেন গা? আমি তোমাদের কি করিয়াছি?"

"মিথ্যাকথা বলিতেছ।"

"না ত! আমি ত একটীও মিথ্যাকথা বলিতেছি না। রাজকুমার স্বর্গভূষণকে আমি চিনি। তিনি রাজবাড়ীতে আসিতেন। রাজা থাকিলেও আসিতেন; না থাকিলেও আসিতেন।"

"আচ্ছা! কিছু শুনিয়াছ? রাণীর সঙ্গে স্বর্গভূষণের যে সকল কথা হইত, তাহা তুমি কিছু শুনিয়াছ?"

"সে সকল ভাল কথা। রাজা আমাদের দুপুর রাত পর্য্যন্ত বাইরে বাইরে থাকিতেন, রাণী সেই সকল দুঃখের কথা রাজকুমারকে বলিতেন। বলিতেন, আর কাঁদিতেন।"

আসামীর উকীল দাঁড়াইয়া উঠিয়া ভীম গর্জ্জনস্বরে সারদাকে জেরা করিলেন, "রাজকুমার স্বর্গভূষণ তোমাকে কোন্ প্রকারে কিছু পুরস্কার

দিয়াছিলেন কি না ? তুমি তাঁহার কাছে নম্রতা দেখাইতে, সেই গুণের জন্য তিনি তোমাকে পুরস্কার দিয়াছিলেন কি না ?"

"এক পয়সাও না।" দুই হস্ত ঊর্দ্ধে তুলিয়া সারদা উত্তর করিল, "এক পয়সাও না। আমি যাঁহাদের দাসী, তাঁহাদের হইয়াই এই কথা কহিতেছি, অন্য লোকের কথায় আমার মুখে তোমরা চাপা দাও কেন ?"

ফরিয়াদীর উকীল বলবন্ত সিংহ সাক্ষীবাক্যে বল প্রাপ্ত হইয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "আচ্ছা সারদা। তোমাদের রাণী আর স্বর্ণভূষণ কোন দিন নির্জ্জনে বসিয়া কোন কথা কহিতেছিলেন, তাহা কি তুমি শুনিয়াছ ?"

"শুনিয়াছি, দেখিয়াছি, সব জানি। সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইয়াছি, তাঁহারা ভয় পাইয়াছেন, তাহাও জানি। গরিব মানুষের মেয়ে আমি, তোমাদের কাছে মিথ্যাকথা কহিব কেন ? যে কথা কহিবার নয়, স্বর্ণভূষণ তাহা কহিয়াছেন। যে কার্য্য দেখিবার নয়, তাহা আমি দেখিয়াছি। কিন্তু আমি দাসী। রাণীর নিষেধ ছিল, কোন কথা প্রকাশ করি নাই।"

"আচ্ছা। রাণী এখন কোথায়, তাহা তুমি জান ?"

"আমি কেমন করিয়া জানিব ? স্বর্ণভূষণ জানেন। স্বর্ণভূষণ এক রাত্রে পর্দ্দার আড়ালে লুকাইয়া ছিলেন, রাণীর ভয়ে রাজাকে কোন কথা না বলিয়া চুপি চুপি আমি তাহাকে বাহির করিয়া দিয়াছিলাম। স্বর্ণভূষণ আমারে কহিয়াছিলেন, এ কথা কেহ যেন জানিতে না পারে।"

"আচ্ছা! রাণী যে দিন গৃহ হইতে অদৃশ্য হন, সে দিন তুমি গৃহে ছিলে ?"

"গৃহ হইতে আমি কোথাও যাই না।"

"সে কথা জিজ্ঞাসা হইতেছে না। রাণী যে রাত্রে বাহির হন, সে রাত্রের কথা তুমি কিছু জান ?"

"বোধ করি, ঘুমাইয়া ছিলাম।"

"সত্যকথা কও, সাবধান হও, মিথ্যাকথার অনেক সাজা। আর কোন কথা তোমার মনে আছে কি না ?"

ভাবিয়া ভাবিয়া সারদা কহিল, "আর একটী কথা আমার মনে আছে। আমাদের রাণী এক রাত্রে তাঁহাকে তাড়াইয়া দেন। তাহার পর একজন

স্ত্রীলোক একটী বাক্স আনিয়া রাণীকে দেয়, সেই বাক্স পাইয়া রাণী একখানি পত্র লিখিয়া কিছু দিন পরে আমারে স্বর্ণভূষণের বাড়ীতে পাঠাইয়া দেন।”

“আচ্ছা! আচ্ছা! সে পত্র তুমি কাহার হস্তে দিয়াছিলে?”

“রাজকুমারের হস্তে।”

“উত্তর পাইয়াছিলে?”

“পাইয়াছিলাম। পত্রে নহে, মুখে। রাজপুত্র কহিয়াছিলেন, রাত্রে দেখা হইবে।”

“আচ্ছা! আচ্ছা! রাত্রে দেখা হইয়াছিল?”

“হঁ্যা।”

“সে রাত্রের কথা তুমি কিছু জান?”

“জানি।—সে রাত্রে রাণীর রাগ হইয়াছিল, বিদায়ের সময় উভয়ে দেখা হয় নাই।”

“আচ্ছা। তুমি বলিতে পার, বাক্সের গায়ে কোন নাম লেখা ছিল?”

“পারি। লেখা ছিল, গয়াপ্রসাদ।”

“আচ্ছা! গয়াপ্রসাদ কে, তাহা তুমি জান?”

“না।”

“আচ্ছা! বাক্সে কি ছিল, তাহা তুমি জান?”

“জানি। কতকগুলি কাপড় আর একখানি চিটি।”

“তবে বোধ হয়, কাপড়ের মহাজন সেই গয়াপ্রসাদ।”

“তাহা হইতে পারে; কিন্তু আমি তাহা ঠিক জানি না।”

বিচারালয়ের একজন হর্‌করা বিচারালয়ের আদেশে বস্ত্রপটীতে যাইতেছিল, বাধা দিয়া ফরিয়াদীর উকীল হাকিমসাহেবকে কহিলেন, “হুজুর! আসামী স্বর্ণভূষণ উপস্থিত আছেন, আদালত ইঁহাকে জিজ্ঞাসা করুন, ইনি সেই গয়াপ্রসাদকে জানেন কি না?”

স্বর্ণভূষণ আসামীরূপে দণ্ডায়মান হইলেন।

দস্তুরমত শপথ করাইয়া হাকিমসাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, “রাজকুমার! তুমি কি কোন স্ত্রীলোকের নিকট কোন বস্ত্রালঙ্কার উপহার পাঠাইয়াছিলে?

গয়াপ্রসাদ কাহার নাম, তাহা কি তুমি বলিতে পার? সেই বস্ত্রালঙ্কারের মহাজনের নাম কি গয়াপ্রসাদ?"

স্বর্গভূষণ মাথা হেঁট করিয়া নিরুত্তর হইলেন।

হাকিম কহিলেন, "লজ্জা করিতে নাই, আদালতে লজ্জা করিতে হয় না, সত্যকথা বল। রাণী জগৎকুমারীকে কি তুমি বসনভূষণ উপঢৌকন প্রেরণ করিয়াছিলে?—পত্র লিখিয়াছিলে?"

স্বর্গভূষণ উত্তর করিলেন না।—মৃদুহাস্য করিয়া বিচারপতি পুনর্ব্বার কহিলেন, "খোদার খেলা বড় চমৎকার। তুমি রাজপুত্র পঞ্জাবে ছিলে, আমি আগরায় ছিলাম। এই মোকদ্দমার বিচার আজ এখানে হইবে, ইহা আমি জানিতাম, তুমি জানিতে না। কিন্তু দেখ দেখি, কেমন খেলা! ঠিক্ ঠিক্ সময়ে পঞ্জাবীদল এখানে। একদিনেই আমি এই ঘৃণাকর মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিব।—পেয়াদা!"

"হুজুর!"

"বস্ত্রব্যবসায়ী গয়াপ্রসাদকে হাজির কর।"

পেয়াদা গেল। গয়াপ্রসাদকে লইয়া অনতিবিলম্বেই আদালতগৃহে পুনঃপ্রবিষ্ট।—সাক্ষীমঞ্চে গয়াপ্রসাদ।

ইংরাজের রাজত্ব হইলে, ইংরাজের বিচারালয় হইলে অনেক প্রকার আড়ম্বর হইত,—অনেক প্রকার আদব কায়দা থাকিত, কিন্তু তখন মোগল-রাজ্যের শেষ দশা। দিল্লীর সম্রাটের নামমাত্র আছে। তথাপি বিচারের নামে বিচার বিক্রয় হয় না। গয়াপ্রসাদ সাক্ষীমঞ্চে।

হাকিম জিজ্ঞাসা করিলেন, "গয়াপ্রসাদ। তুমি কি কার্য্য কর?"

উত্তর হইল, "বস্ত্রব্যবসা।"

"আচ্ছা! রাজকুমার স্বর্গভূষণ রাওকে তুমি জান? স্বর্গভূষণ তোমার কাছে কোন দিন কোন বস্ত্র ক্রয় করিয়াছিলেন?"

"হুজুর।"

"সে সকল বস্ত্র কি হইল? তিনি কি সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন?"

"না;—রাণী জগৎকুমারীর নামে কোন স্ত্রীলোকের দ্বারা বাক্সবন্দী করিয়া পাঠাইবার উপদেশ দিয়া গেলেন।"

"আচ্ছা! তোমার কথা আমি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেছি। আচ্ছা, কি কি বস্ত্র লইয়াছিলেন, তাহা তোমার মনে আছে?"

"খাতা দেখিলে ঠিক বলিতে পারি।—মনে আছে,—সাড়ী, কাঁচুলী, ওড়না আর পেসোয়াজ।"

"আচ্ছা, সে সঙ্গে কোন পত্র ছিল?"

"আমার অজ্ঞাতে যদি থাকে, জানি না, কিন্তু চক্ষে দেখি নাই।"

"আচ্ছা। তুমি বিদায় পাও। স্বর্ণভূষণ! এ সকল কথা কি তুমি অস্বীকার করিতে সাহস কর?"

"মিথ্যাকথা অস্বীকার করিতে কে সাহস না করে? তুমি বিচার করিতে আসিয়াছ, বিচার কর। তুমি চাকর, আমি কাহারো চাকর নই।"

"বটে!—চাকর নও?—তবে রুগ্ন শরীরে প্রাণসঙ্কট সেনানীপদে যবনের অর্থে উদর পোষণ করিতে গিয়াছ কেন? তুমি চাকর নও?— চাকরের চাকর। বিচারালয়ের সম্মুখে এখনও তোমার এতদূর জোর জোর কথা? রাজপুত্র বলিয়া আমি তোমাকে এতক্ষণ রাজসম্ম প্রদান করিতেছিলাম, কিন্তু এখন?—উঃ! তোমার এতদূর অহঙ্কার! কুলস্ত্রীর সতীত্বনাশক! আজ অনেক সাক্ষীর জোবানবন্দী বাকী রহিল। চোপ্‌দার! এই আসামীর কাণ ধরিয়া খাড়া কর। কল্য প্রভাতে ইহার বিচার হইবে।"—উত্তেজিত-ভাবে এইরূপ হুকুম দিয়া ফৌজদারী ফৌজদার চঞ্চলভাবে বিচারাসন হইতে উঠিয়া গেলেন। হুকুম হাজত।

দ্বিতীয় দিবসের এজ্‌লাস। বেলা প্রায় আড়াই প্রহর। আদালত হাকিম-শূন্য। দর্শকেরা রং চায়। ফরিয়াদী বিচার চায়, আসামী পরিত্রাণ চায়, আর আর লোকেরা অর্থ চায়। বেলা আড়াই প্রহরের পর হাকিমসাহেব এজ্‌লাসে আসিয়া বার দিলেন। প্রথমতঃ তৃতীয় সাক্ষীর জোবানবন্দী।

সাক্ষীর নাম কাশীম আলী। শপথপাঠের পর হাকিম তাহাকে প্রশ্ন করিলেন, "তুমি রাজা বিরাটকেতুকে চেন?"

সেলাম করিয়া সাক্ষী উত্তর করিল, "হুজুর!"

"তুমি স্বর্ণভূষণ রাওকে চেন?"

"হুজুর"

মস্তক সঞ্চালনপূর্ব্বক হাকিম সাহেব পুনর্ব্বার প্রশ্ন করিলেন, "তাঁহাদের উভয়ে পরস্পর কি সম্পর্ক, তাহা তুমি জান?" *

"না খোদাবন্দ!"

"আচ্ছা! তাঁহাদের উভয়ে পরস্পর মাফিক আছে কি দুস্‌মনী আছে, তাহা জান?"

"জানিতাম মাফিক আছে। রাজকুমার স্বর্গভূষণ মাঝেমাঝে রাজা বিরাটকেতুর বাড়ীতে যাইতেন, রাজা বিরাটকেতুও তাঁহাদের বাড়ীতে আসিতেন।"

"তুমি কিরূপে জানিলে?"

"স্বচক্ষে দেখিয়াছি। দুই রাজার বাড়ীতেই আমার গতিবিধি আছে, তাহাতেই জানি।"

"আচ্ছা! রাজা বিরাটকেতুর মহিষী রাণী জগৎকুমারী এখন সেই রাজবাড়ীতে বাস করিতেছেন কি না, ইহা তুমি বলিতে পার?"

"শুনিয়াছি, রাজকুমার স্বর্গভূষণের সঙ্গে তিনি পলায়ন করিয়াছেন।"

"স্বর্গভূষণের সঙ্গে একজন রাণী পলায়ন করিবে, এ কথায় কি তুমি বিশ্বাস কর? বিরাটকেতুর রাণীর সঙ্গে কুমার স্বর্গভূষণের কি কোন প্রকার দুষ্য সম্পর্ক ছিল?"

"এইরূপ অনুমান হয়।"

"কিসে অনুমান করিলে?"

"যে পল্লীতে রাজা বিরাটকেতুর বাস, বন্দা সেই পল্লীতেই বাস করে।"

"এক পল্লীতে বাস কর বলিয়াই কি তুমি ঐরূপ অনুমান করিতে পারিতেছ?"

কটু থতমত খাইয়া কাশীম আলী উত্তর করিল, "না খোদাবন্দ! তাহাতে অনুমান করিতে পারি নাই। অনুমানের অন্য কারণ আছে। আমি একজন দোকানদার। বাটীতে আসিতে প্রায়ই অধিক রাত্রি হয়, দুই তিন রাত্রি আমি দেখিয়াছি, রাজকুমার স্বর্গভূষণ রাও অনেক রাত্রে রাজা বিরাটকেতুর বাড়ীর দিক্ হইতে টলিতে টলিতে আপন বাড়ীতে আসিতেছিলেন।"

কিঞ্চিৎ বিস্ময় প্রকাশ করিয়া ফৌজদারসাহেব কহিলেন, "টলিতে টলিতে কি নিমিত্ত? এ কথার তাৎপর্য্য কি? স্বর্গভূষণ কি দারু খাইয়া থাকে?"

"বেআদবি মাফ হয়, বন্দা সেইরূপ দেখিয়াছে।"

"ওঃ! তবে ত হইতেই পারে। আচ্ছা! বলিয়া যাও। টলিতে টলিতে আসিতেছে দেখিলে, তাহার পর?"

"তাহার পর, এক রাত্রে দেখিলাম, বেএক্তার। আমি তাঁহাদের অনেক নিমক খাইয়াছি, সেই রাজসংসারে অনেক দিন চাকরী করিয়াছি, তাঁহাকে সেইরূপ বেএক্তার অবস্থায় একাকী পথে ছাড়িয়া যাওয়া ভাল কর্ম্ম হয় না, এইরূপ বিবেচনা করিয়া বাড়ী পর্য্যন্ত তাঁহাকে আমি রাখিয়া আসি।"

"টলিতে টলিতে আসিতে দেখিয়াছ, এক রাত্রে বেএক্তার দেখিয়াছ, সঙ্গে করিয়া বাটীতে রাখিয়া গিয়াছ, ইহাতেই কি অনুমান করিলে, রাণী জগৎকুমারীর সহিত স্বর্গভূষণের দুষ্য সম্পর্ক?"

"না খোদাবন্দ। আরো কারণ আছে। যে রাত্রে বেএক্তার অবস্থায় আমি তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া আনি, সেই রাত্রে তাঁহারই মুখে জড়ানো জড়ানো কথায় আমি শুনিয়াছি, তিনি বলিয়াছিলেন,—যদিও সকল কথা বুঝিতে পারি নাই,—তথাপি দুই তিনবার শুনিয়াছিলাম, তিনি বলিয়াছিলেন, বিরাটকেতুকে জব্দ করিব। আমার সঙ্গে চাতুরী খেলিয়াছে, আমিও দেখাইব। জগৎকুমারীকে লইয়া কিরূপে সুখী হয়, দেখিব।"

আসামীর উকীল চঞ্চলভাবে উঠিয়া আদালতকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "হুজুর! ঐ কথার কি ঐ অর্থ? যদি সত্যই হয়,—আমার ত সত্য বোধ হয় না, যদি সত্যই হয়, তাহা হইলেও রাণীর সঙ্গে রাজকুমারের কোন দুষ্যভাব বুঝায় না। রাজার উপর আক্রোশ থাকিতে পারে, রাজাকে জব্দ করিবার কথা হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে রাণীর—"

"তুমি সাহেব গোলমাল করিতেছ।"—একটু বিরক্ত হইয়া হাকিম সাহেব কহিলেন, "তুমি সাহেব গোলমাল করিতেছ। এই সাক্ষী প্রথমেই বলিয়াছে, ফরিয়াদীর সঙ্গে আসামীর কোন মনোবাদ ছিল না। তবে অন্য কোন নিগূঢ় কারণ ভিন্ন হঠাৎ তাঁহার উপর আক্রোশ জন্মিবেই বা কেন?

তাঁহাকে জব্দ করিবার কথাই বা বলিবে কেন? তুমি জেরা করিবার মৎলব জান না। আমি তোমাকে জেরা করিতে নিষেধ করিতেছি।"

"না ধর্ম্মাবতার! আমি ত সাক্ষীর উপর জেরা করিতেছি না। উহার বাক্য যে পরস্পর অসম্বদ্ধ, হুজুরের নিকট তাহাই আন্দাস করিতেছি।"

"আন্দাস করিতে হইবে না। যে কথার অর্থ নাই, আদালত তাহা শুনিতে চাহেন না। তুমি স্থির হইয়া উপবেশন কর। তোমাদের উভয় পক্ষের কথা পরে শুনা যাইবে। সাক্ষি! তুমি কি বলিতেছিলে, বলিয়া যাও। স্বর্ণভূষণ সেইরূপ বেগতিক অবস্থায় রাজা বিরাটকেতুকে জব্দ করিবার কথা কহিয়াছিলেন, তাহাতে তুমি রাণীর চরিত্রে দোষারোপ করিতে পার, এমন কিছু আরো প্রমাণ আছে?"

"না খোদাবন্দ! অন্য কোন বিশেষ প্রমাণ নাই, লক্ষণে লক্ষণে কেবল সন্দেহ মাত্র।"

"এই সন্দেহ ছাড়া আর কোন সন্দেহ তোমার মনে হয়?"

"না খোদাবন্দ।"

"আচ্ছা! তুমি বিদায় পাও। চতুর্থ সাক্ষী তলব কর।"

চতুর্থ সাক্ষী গণপত্‌লাল। তাহাকে সাক্ষীমঞ্চে দাঁড় করাইয়া হাকিম-সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি?"

"গণপত্‌লাল জহুরী।"

"পিতার নাম?"

"যুগলদাস জহুরী।"

"তুমি কি কার্য্য কর?"

"এই সহরে জহরাতের কারবার।"

"এ মোকদ্দমার তুমি কি জান?"

"ধর্ম্মাবতার! মোকদ্দমার স্থূলকথামাত্র শুনিয়াছি; নিগূঢ় নির্ঘণ্ট অবগত হই নাই।"

"আচ্ছা! রীতিমত শপথ করিয়া বল, রাজা বিরাটকেতুকে তুমি জান কি না?"

শপথ করিয়া গণপতলাল কহিল, "পূর্ব্বে জানাশুনা ছিল না. রাজার

নূতন বিবাহ হইবার পর অবধি সর্ব্বদাই তাঁহাদের বাড়ীতে,—দিন-মানেও,—রাত্রিকালেও,—সর্ব্বদাই আমার গতিবিধি ছিল।"

"কি অছিলায়?"

"আমাদের আর অছিলা কি খোদাবন্দ! কারবার সম্বন্ধে।—নূতন রাণী নিত্য নিত্য নূতন অলঙ্কার ভালবাসেন, সেই নিমিত্তই সর্ব্বদা তলব হয়, মণিমুক্তাপ্রভৃতি বহুমূল্য রত্ন সরবরাহ করি। তাহাতেই ক্রমে ক্রমে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি হইয়াছে।"

"আচ্ছা! রাণীকে কি তুমি দেখিয়াছ?"

"প্রথম প্রথম দেখি নাই, কিন্তু নিত্য যখন তাঁহার নূতন নূতন ফরমাস্, তখন সুতরাং রাজার আদেশে আমাকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে হইত।"

"আচ্ছা! রাণী তোমার সম্মুখে বাহির হইতেন?—তোমার সঙ্গে কথা কহিতেন?"

স্পষ্ট বাহির হইতেন না, স্পষ্ট মুখামুখী কথা কহিতেন না, জানালার আড়ালে দাঁড়াইয়া থাকিতেন, একজন দাসী নিকটে থাকিত, তাহাকে উপলক্ষ করিয়া আমার সহিত কথা কহিতেন। দাসীকে উপলক্ষ করিয়া আমিও তাঁহার সহিত কথা কহিতাম। উপলক্ষ মাত্র। রাণীর কথা আমি বিলক্ষণ শুনিতে পাইতাম। যখন সে দিকে চাহিতাম, তখন তাঁহার শরীরের অর্দ্ধাংশ আমার নজরে পড়িত। বেশী কথা কি বলিব হুজুর, অদালতে সে কথা বলিতে সঙ্কোচ করিতে হয়, কুণ্ঠিত হইতে হয়, লজ্জাসম্ভ্রম আইসে, কিন্তু কি করি, শপথ করিয়াছি, সত্যকথা গোপন করিতে নাই, যাহা জানি, সমস্তই সত্য বলিতে হইবে, তাহাতে ব্যবসায়ী লোক আমরা, কারবারের খাতির, হস্তের অলঙ্কারের জন্য যখন হস্তের মাপ লইবার প্রয়োজন হইত; স্বেচ্ছাপূর্ব্বক তিনি হাত বাড়াইয়া দিতেন, স্পর্শ করিয়া আমি কাজে কাজেই মাপ লইতাম।"

"বস্ বস্! ও কথা আর না। রাণীর ভাবভঙ্গী দেখিয়া তোমার কিরূপ অনুমান হইত?"

"বড় ভাল বুঝিতাম না। অত্যন্ত চঞ্চলা, অত্যন্ত লজ্জাহীনা, নয়নের

চেহারাতে যেন চাতুরী মাখা। মুখ চক্ষু দর্শন করিয়া আমি মনে মনে ভাবিতাম, ভদ্রলোকের গৃহে এমন মেয়েও থাকে।''

''বস্ বস্! ও কথাও আর না। তুমি স্বর্গভূষণ রাওকে জান?''

''জানি খোদাবন্দ!''

''জান?—আচ্ছা! কোন দিন স্বর্গভূষণকে তুমি রাজা বিরাটকেতুর বাটীতে দেখিয়াছিলে?''

"অনেক দিন গতিবিধি করিয়া একদিনও দেখি নাই। শুনিতাম, স্বর্গ-ভূষণ মধ্যে মধ্যে রাজা বিরাটকেতুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যান, মধ্যে মধ্যে রাণীর সঙ্গেও সাক্ষাৎ হয়, কিন্তু আমি একদিনও দেখি নাই। দৈবাৎ এক দিন সন্ধ্যার পর রাণীর একটী প্রয়োজন পড়িয়াছিল, আমাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন, আমি গিয়াছিলাম। রাজা তখন গৃহে ছিলেন না। আমি বাহির হইয়া আসিতেছি, সদর দরজায় দেখি, রাজকুমার স্বর্গভূষণ। তিনি আমার সঙ্গে কোন কথা কহিলেন না, আমি নমস্কার করিয়া, পাশ কাটাইয়া বাহির হইলাম, তিনি প্রবেশ করিলেন।"

কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া হাকিমসাহেব গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গণ—তোমার নাম কি বলিলে? গণপত্?"

"হুজুর!"

"আচ্ছা! গণপত্! রাণী এখন কোথায় আছেন, তাহা তুমি জান?"

"নিশ্চয় জানি না ধর্ম্মাবতার! কিন্তু লোকে বলে, কুমার স্বর্গভূষণ তাঁহাকে ধর্ম্মপথভ্রষ্ট করিয়া কোথায় লুকাইয়া রাখিয়াছেন।"

"আচ্ছা! তুমি বিদায় পাও।—না, না, রও, রও! আর একটী কথা। তুমি যে সকল অলঙ্কার সরবরাহ করিতে, ঠিক্ ঠিক সময়ে তাহার উচিতমত মূল্য পাইতে কি না?"

"সে বিষয়ে রাজা বিরাটকেতু খুব খাঁটী। রাণী যখন যাহা বলিতেন, আমি যখন যে দাম চাহিতাম, রাজা তৎক্ষণাৎ তাহা প্রদান করিতেন। একটী ছাড়া দুটী কথা তাঁহার মুখে ছিল না।"

"তবে বোধ করি নূতন রাণীকে রাজা বিরাটকেতু যথেষ্ট আদর করিতেন।"

"আমি যতদূর দেখিয়াছি হুজুর। তাহাতে সে বিষয়ে একটুও সন্দেহ হয় না।"

"আচ্ছা। তুমি বিদায় পাও।—পঞ্চম সাক্ষী তলব কর।"

চতুর্থ সাক্ষী বিদায় হইয়া গেল, শপথ করিয়া পঞ্চম সাক্ষী হাকিমের সম্মুখে দাঁড়াইল। আজ কাল ইংরাজের আদালতে যেমন না না গোলযোগ, একজন প্রশ্ন করেন, আর একজন অর্থ বুঝাইয়া দেন, একজন উত্তর করে, আর একজন তাহার অন্য ভাষা ভাঙ্গিয়া হাকিমের কর্ণগোচর করেন, তখন এ রকম ছিল না। হাকিম যে ভাষায় কথা কহিতেন, আসামী, ফরিয়াদী ও সাক্ষীরা সেই ভাষা বুঝিত; হাকিম নিজেই তাহাদের ভাষা বুঝিতেন, কোন প্রকার গোলযোগের প্রয়োজন হইত না। পঞ্চম সাক্ষীকে হলফ করাইয়া হাকিম সাহেব প্রশ্ন করিলেন, "তোমার নাম কি?"

"আজ্ঞা, আমার নাম গাজী নফর আলী।"

"আচ্ছা নফর আলি! তুমি আর কতবার সাক্ষী হইয়া কত মোকদ্দমায় কোন্ কোন্ আদালতে কতবার হাজির হইয়াছ?"

"একবারও না খোদাবন্দ। আমি গরিব মানুষ, দিনমজুরী করিয়া সংসার গুজরাণ করি; কোন আদালতে কাহারও কখনও সাক্ষী হই নাই। এই আমার প্রথম, এই আমি নূতন।"

"আচ্ছা! বেস্! তুমি জানিতে পার, এই সহরে বিরাটকেতু নামে এক রাজা আছেন?"

"হুজুর।"

"তুমি তাঁহাকে ভাল জান?"

"হুজুর।"

"তুমি কি কার্য্য কর?"

"দর্জ্জীর কাম করি।"

"আচ্ছা। রাজা বিরাটকেতুর নূতন বিবাহ হইবার পর তোমার সঙ্গে তাঁহার কি আর দেখা হইয়াছিল?"

"অনেকবার খোদাবন্দ।"

"কি সূত্রে?"

"আমাদের আর অন্য কি সূত্র থাকিতে পারে হুজুর! নূতন মহিষীর পোশাক জোগাইবার সূত্রে।"

"তুমি কি একাকী সমস্ত পোশাকই জোগাইতে?"

"হুজুর।"

"আচ্ছা! রাণী কি কি পোশাক ভালবাসিতেন?"

"সে কথা খোদাবন্দ আমি ঠিক্ ঠিক্ মনে করিয়া বলিতে পারিব না। কেবল এই কথা বলিতে পারিব, রাণী কখনও বাসী পোশাক গায়ে দিতেন না। নিত্য নিত্য নূতন নূতন হুকুম হইত। কখনো আমরা যে সকল পোশাকের নামও শুনি নাই, সেই সকল নূতন নূতন নাম রাণীর মুখে শুনিতে পাইতাম। আমি বড়োমানুষ। অনেক দেখিয়াছি, অনেক শুনিয়াছি, তথাপি অন্য স্থানের অন্য লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া রাণীর হুকুম তামিল করিতে হইয়াছে।"

"রাণী তবে বড় পোশাকপ্রিয় ছিলেন?"

"হুজুর।"

কিঞ্চিৎ ব্যঙ্গভাবে হাকিমসাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে সকল পোশাক পরাইয়া দিত কে?—তুমি?"

মাথা হেঁট করিয়া নফর আলী উত্তর করিল, "আদালতকে সেলাম, গরিবমানুষের ততদূর সাহস হয় না। রাণীর অনেক দাসী ছিল, তাদের মধ্যে একজন, নাম তার সাবদা;—সেই সাবদা পোশাকগুলি পরাইয়া দিত; ঠিক ঠিক চোস্ত হইল কি না, আমি কেবল একবার চক্ষের দেখা দেখিতাম। বুড়োমানুষ আছি কি না, আমাকে দেখিয়া রাণীর লজ্জা হইত না।"

"বড় লজ্জাবতী রাণী!" অস্ফুটবাক্যে আপনা আপনি এই কথা বলিয়া হাকিমসাহেব অন্য লোকের অলক্ষিতে মৃদুহাস্য করিয়া গম্ভীর ভাবে প্রশ্ন করিলেন, "আচ্ছা! নফর আলি! যখন তুমি রাণীর পোশাকের চোস্ত পরীক্ষা করিতে, তখন তোমার সঙ্গে রাণীর কোন কথা হইত?"

"হইত খোদাবন্দ! কিন্তু সে সকল কথা আমার ঠিক মনে নাই।" এই মাপ, এই রকম, এই এতটুকু, আর একটু ঝুলিবে, হাতের এই পর্য্যন্ত ঢাকা থাকিবে, বুকের উপর এই পর্য্যন্ত উঠিবে, পায়ের নীচে এত টুকু

দেখা যাইবে, এই রকম খাপছাড়া খাপছাড়া ছোট ছোট কথা। সে সকল কথা ঠিক্ ঠিক্ আমার মনে পড়ে না হুজুর!”

“আচ্ছা! রাজা বিরাটকেতুকে তুমি দেখিয়াছ?”

“তিনি আমার মালিক। তাঁহার মেহেরবানীতে আমি বাঁচিয়া আছি। জেন্দেগানি তাঁহারি কাছে বাঁধা।”

“আচ্ছা! রাজকুমার স্বর্গভূষণকে তুমি জান?”

“ও খোদা!”—কোথায় আসিয়া কাহার কাছে কথা কহিতেছে, চিত্ত-ভ্রমে তাহা যেন ভুলিয়া গিয়া গাজী নফর আলী দুই হাত তুলিয়া বলিয়া উঠিল, “ও খোদা! কাহার নাম কাণে এলো! স্বর্গভূষণ? স্বর্গভূষণ যে আমাদের ঘরের ছানা।”

“এ কি কথা নফর আলি? তুমি বৃদ্ধলোক। তোমার ভুল হইতে পারে, কোথায় আসিয়াছ, কাহার সম্মুখে কথা কহিতেছ, তাহা তোমার মনে না থাকিতে পারে; কিন্তু মনে কর নফর আলি! তুমি দিল্লীশ্বরের আদালতে দাঁড়াইয়া। দিল্লীশ্বরের নামের প্রতিনিধি আমি। আমার নিকটে তুমি এক কোজদারী মোকদ্দমার সাক্ষী হইয়া আসিয়াছ। এখনও তোমাকে অনেক কথার জবাব দিতে হইবে। এ সকল কি ভুলিয়া যাইতেছে? তুমি মুসলমান! স্বর্গভূষণ হিন্দু, তিনি তোমার ঘরের ছানা হইবেন কিরূপে?”

“দোহাই খোদাবন্দ! বৃদ্ধকে মাফ করিতে আজ্ঞা হয়; আমি ভুলি নাই, একটী কথাও ভুলি নাই। স্বর্গভূষণ আমাদের ঘরের ছানা। আমার সঙ্গে তার অনেক দিনের দোস্তী। সে যখন খুব ছোট; কাপড় পরিতে শিখে নাই, তখন অবধি আমাদের বাড়ীতে আসে। আমার ছোট বেটার একটা ছোট বেটী আছে কি না, তাহার উমরে আর ওর উমরে এক সমান। ওরা দুজনেই নেঙ্গা। উমর চার কি পাঁচ। তখন থেকে স্বর্গভূষণ আমাদের বাড়ীতে খেলা করে। মক্কা খায়, রুটী খায়, মুরগী খায়, রোসুন চিবাইয়া ফেলে, আমার জরু বি পিয়ার করে, আমি বি পিয়ার করি। সেই লেড়কীটার নাম—ভাল কি ভাল ‘দেলে আসে না, লেড়কীটার নাম ছিল্লিলা। দুজনেই দুজনের পিয়ারা।”

গম্ভীর বদনে হাকিমসাহেব কহিলেন, "কি বকিতেছ নফর আলী? স্বর্গভূষণকে তুমি চেন কি না?"

"চিনি না খোদাবন্দ? রাজার ছেলে, বড় পিয়ারা। এখন বড় হইয়াছে, লায়েক হইয়া উঠিয়াছে, আমার সঙ্গে সর্ব্বদা এক ঠাঁই বসিয়া দারু পিয়ে।"

"সে কি? সে কি? তুমি বৃদ্ধ, নফর আলি! তুমি বৃদ্ধ, পেগম্বর মহম্মদের বৃদ্ধ শিষ্য; এই বৃদ্ধ বয়সে তুমি দারু পিয়ো?"

এই প্রশ্নে নফর আলী উত্তর করিল না। তাহার দুই চক্ষু দিয়া দর্‌দর্‌ করিয়া বারিধারা পড়িল। শ্বেতবর্ণ দীর্ঘ দীর্ঘ দাড়ী ভিজিয়া গেল।

"কি কর নফর আলী? তুমি কর কি? কাঁদো কেন? ফৌজদারী মোকদ্দমার সাক্ষী তুমি, এখনও তোমাকে অনেক কথা বলিতে হইবে। স্থির হইয়া শোনো। স্থির হইয়া উত্তর দাও। কাঁদো কেন? আসামী স্বর্গভূষন তোমাদের কি?"

"স্বর্গভূষণ আমাদের ছানা।"—এই কথা বলিয়াই বৃদ্ধ আবার কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

"কি বিপদেই পড়িলাম!" ঈষৎ বিরক্তভাবে, ঈষৎ হাস্যসহকারে হাকিম সাহেব কহিলেন, "আর আমি তোমাকে বেশী কথা জিজ্ঞাসা করিব না। তুমি দারু পিয়ো? স্বর্গভূষণ তোমার সঙ্গে দারু পিয়ে?"

"হাঁ! তাই ত বলিতেছি! দারু পিয়ে। শুধু তাই কি না। শুধু দারু না, খানা কি খায়। রাজপুত্র স্বর্গভূষণ মোরগ বড় ভালবাসে। বক্‌রী কি ভালবাসে, আর,—আর,—আর, বক্‌রিদের সময়—গো—"

"তোমার জোবানবন্দী শেষ হইয়াছে।" বিরক্ত হইয়া ব্যস্তভাবে হাকিম কহিলেন, "তুমি পাগল আছ, ইহা জানিতাম না। জানিলে সাক্ষীর ফর্দ্দ হইতে তোমার নাম কাটিয়া দিতাম। হলফ করিয়াছ, এখন ছাড়িয়া দিতে পারি না। একটী শেষ কথা বাকী আছে। বল দেখি,—পিয়ারার কথা ভুলিয়া যাও,—এখন সত্য করিয়া বল দেখি, রাজা বিরাটকেতুর নূতন মহিষীর সঙ্গে স্বর্গভূষণের কোন দুষ্ট সংস্রব আছে কি না?"

"তাই?—তাই তুমি হুজুর আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ? দুষ্ট অদুষ্ট

জানি না, বেশ ভাব আছে।—যায়, আসে, কত কি খেলা করে, দুজনে বেশ ভাব। আমার সাক্ষাতে স্বর্ণভূষণ কত দিন বলিয়াছে, বুড়ো রাজা রাণী জগৎকুমারীর চক্ষের শূল। হিন্দুরা যদি মাথা তুলিয়া কথা না কয়, স্বর্ণ-ভূষণ সেই জগৎকুমারীকে ফের সাদি করিতে পারে। এক দিন না, দশ দিন, বিশ দিন, অনেক দিন স্বর্ণভূষণ আমাকে এ কথা বলিয়াছে। রাণী জগৎকুমারীও তাই চায়। আর কিছু আমাকে জিজ্ঞাসা করিবার আছে? আমি আরো অনেক কথা জানি। রাজা রঘুবর রাজাতর বিরাটকেতুর চেয়ে বড় রাজা। আমি অনেক কথা জানি। তুমি ত ফিরোজ সাহ পাঁচ দিনের বালক। বিচারতক্তে বসিয়া আমাকে ভয় দেখাও কি? জগৎ-কুমারীর উপযুক্ত পাত্র—"

"আর না! নফর আলি! আর না।—তোমার মুখে যাহা শুনিবার আশা ছিল, তাহা অপেক্ষা আমি অনেক শুনিয়াছি। তুমি বিদায় পাও। আজিও বিচারের নিষ্পত্তি হইল না। বিবেচনা করিয়া কল্য ইহার হুকুম দিব। চাপরাসি! আসামীকে হাজতে লইয়া যাও। চূড়ান্ত হুকুম কল্য।"

দুই পক্ষের দুই জন উকীল বন্য সর্পের মত গর্জ্জন করিয়া উঠিয়া দাঁড়া-ইলেন, তাঁহাদের কথা ফুটিবার অগ্রেই ফৌজদার সাহেব আসন ত্যাগ করিয়া পার্শ্বকক্ষে প্রবেশ করিলেন।

এজলাস ভঙ্গ হইল। যাহারা তামাসা দেখিতে আসিয়াছিল, আশা-ভঙ্গে ম্রিয়মাণ হইয়া তাহারা গৃহে ফিরিয়া গেল। আসামী হাজতে।

সকল সাক্ষীর উপরে এক সাক্ষী আছেন। মানুষের চক্ষু সে সাক্ষীকে দেখিতে পায় না। দিনমানে সেই সাক্ষীর প্রতিনিধি সূর্য্য, নিশাকালে সেই সাক্ষীর প্রতিনিধি চন্দ্র। এই কথা তুলিয়া সচরাচর সাধারণ লোকে সর্ব্বদাই বলে, চন্দ্রসূর্য্য সাক্ষী। কিন্তু ইহা কি কখনও সম্ভব হইতে পারে? এক সময়ে চন্দ্রসূর্য্য উভয়ে আকাশে থাকিবেন, মানুষের বাদবিসম্বাদের সাক্ষী হইবেন, এমন আশা কেহই করিতে পারে না। আমাদের আশা,—কেবল আমাদেরই বা কেন,—জীবসংসারের সকলেরই আশা সমভাবে চপলা। নাম ধরিয়া আশাকে আমি ডাকি, আশা চপলা। সেই আশা চপলা দিবসে কি রজনীতে চন্দ্রসূর্য্যকে এক সঙ্গে দেখাইতে পারেন না।

এক এক দিন আমরা দেখি বটে, দিবামানে আকাশে চাঁদের দাগ থাকে। সূর্য্যপ্রতাপে নিস্তেজ, নিষ্প্রভ। সেটী তিথিমাহাত্ম্য। তিথির পরমায়ু ফুরাইলেই সে দাগ মিলাইয়া যায়। সূর্য্য কেবল একাকী রাজত্ব করেন। সেই সূর্য্য অস্তগত।

শোকতাপ সহ্য করিতে কেহ ভালবাসে না। অনবরত দুঃখের কান্না শ্রবণ করিতে কাহারও কর্ণ উৎফুল্ল হইয়া থাকে না। ভয়ঙ্কর বিভীষিকা দেখিতে কাহারও চক্ষু বিস্ফারিত হয় না। নূতন নূতন রং তামাসা দেখিতে অনেক লোকেই অভিলাষী হয়। রাত্রের মত সেই তামাসা ফুরাইয়া গেল, যাহারা ঘুমাইতে পারে, তাহারা ঘুমাইল, যাহাদের অন্তরে অধিক তন্ত্র বাজে, তাহারা জাগিয়া জাগিয়া যামিনী প্রভাত করিল।

তৃতীয় দিবসের এজলাস। আসামী, ফরিয়াদী, আর উভয় পক্ষের দুইজন উকীল বিচারকের সম্মুখে উপস্থিত। প্রথমতঃ ফরিয়াদীর উকীল দণ্ডায়মান হইয়া আদালতকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিতে আরম্ভ করিলেন, "আমার সাক্ষিগণ যেরূপ জোবানবন্দী দিয়াছে, তাহাতে আসামীর অপরাধ সপ্রমাণ হইতে বাকী নাই। আসামী রাজকুমার স্বর্গভূষণ যদিও সেনাদলে প্রবেশ করিয়াছেন, তথাপি তাঁহার শরীর নানাবিধ ব্যাধিতে জীর্ণশীর্ণ। এরূপ লোক কি প্রকারে দৈহিক পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইয়া সামরিক নিয়মের অন্যথা করিয়াছেন, এ মোকদ্দমায় আমি তাহার আলোচনা করিতে নিরস্ত থাকিলাম। স্থূলতঃ কথা এই যে, কুমার স্বর্গভূষণের চরিত্র ভাল নহে। সকলেই ইহা জানেন। স্ত্রীজাতির সতীত্বের ইনি একজন পরমশত্রু। অনেক বিষয়ে অনেক প্রমাণে ইহা আমাদিগের জানা হইয়াছে, সর্ব্বসাধারণেও ইহা বিলক্ষণরূপে অবগত আছেন, যদি প্রয়োজন হইত, তাহা হইলে শত শত সাক্ষী আমি আদালতে উপস্থিত করিতে পারিতাম, কিন্তু জগৎপিতাকে ধন্যবাদ। ততদূর অগ্রসর হইতে হইল না। পাঁচটী সাক্ষীর মুখে যথেষ্ট সত্যকথা পরিব্যক্ত হইয়াছে। এই স্বর্গভূষণ অনেক বার অনেক প্রকার অপরাধ করিয়া কেবল অর্থবলে দুষ্ট লোকের সহায়ে পরিত্রাণ লাভ করিয়াছেন, কিন্তু ধর্ম্মাবতার! পাপকর্ম্ম কতদিন ঢাকা থাকে? কতদিন পাপের প্রায়শ্চিত্ত লুকাইয়া থাকে? পদ্মিনী সতী সূর্য্যের পত্নী,

সূর্য্য তাঁহার নিকটে আসেন না, কৃষ্ণবর্ণ ভ্রমরেরা পদ্মে পদ্মে মধুপান করে, পদ্মিনীপতি তাহা দেখিতে পান, কিন্তু কেহই পদ্মিনীকে কলঙ্কিনী বলিতে সাহস করে না ; সূর্য্যকেও কেহ কলঙ্কী বলে না। জগৎশাস্ত্রে সূর্য্যদেব যে অপরাধে অপরাধী, চন্দ্রদেবও সেইরূপ ; কিন্তু প্রভাকর তেজস্বী, সুতরাং তিনি অকলঙ্কী ; সুধাকর শীতল, সুতরাং তিনি কলঙ্কী। যাঁহার অধিক তেজ, ভয়ে ভয়ে লোকে তাঁহার কলঙ্ক ঢাকিয়া রাখে। যিনি ঠাণ্ডা, সামান্য দোষ পাইলেও লোকে তাহাতে বহু অলঙ্কার দিয়া বাড়াইয়া জুড়িয়া কলঙ্ক বিস্তার করে। রূপক পরিত্যাগ করিয়া আমরা অনেক সময়ে অনেক সাদা সাদা কথা কহিয়া থাকি ; এখানেও তাহাই করিতে হইবে। এই রাজকুমার স্বর্গভূষণ মহারাজ রঘুবর রাও বাহাদুরের একমাত্র পুত্র। মহারাজের অতুল বৈভব,—অতুল ঐশ্বর্য্য,—কুমার স্বর্গভূষণ সেই অতুল ঐশ্বর্য্যের একমাত্র উত্তরাধিকারী। সেই অহঙ্কারে ইনি মানুষকে মানুষ জ্ঞান করেন না। যখন যাহা মনে আইসে, অহঙ্কারে অন্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাই করিয়া থাকেন ; দরিদ্রের উপর উৎপীড়ন, প্রতিবাসীর সর্ব্বস্ব অপহরণ, সতীর সতীত্ব হরণ, এ সকল কার্য্য যেন তাঁহার অঙ্গের নিত্য আভরণ ;—জীবনের নিত্য ব্রত। আমি আজ আদালতে উপস্থিত হইয়া কর্ত্তব্যানুরোধে যে সকল কথা কহিতেছি, তাহা এই নগরের সকলেই জানেন। স্বর্গভূষণ যে, রাণী জগৎকুমারীকে ধর্ম্মপথভ্রষ্ট করিয়াছেন, তাহাতে আমার অণুমাত্র সংশয় নাই। অর্থবলে এই স্বর্গভূষণ জয়ী হইবেন ভাবিয়াছিলেন, কিন্তু পরমেশ্বর উপরে আছেন, পৃথিবীর রাজারা সেই সর্ব্বময় পরমেশ্বরের ছোট প্রতিনিধি। সর্ব্বেশ্বরের চক্ষুকে যেমন কেহই আচ্ছন্ন করিতে পারে না, ধর্ম্মশীল রাজার নেত্রকেও সেইরূপ সহজে কেহ ফাঁকি দিতে পারে না। রাজা বিরাটকেতু যেন পাগলের মত হইয়াছেন, তাঁহার কন্যা অপ্সরাসুন্দরী তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, অপ্সরাসুন্দরীর জননী অনেক দিন পূর্ব্বে স্বর্গবাসিনী হইয়াছেন, অনেক দুঃখে এই মোকদ্দমার ফরিয়াদী রাজা বিরাটকেতু পুনর্ব্বার বিবাহ করিয়াছিলেন। স্ত্রীজাতির ধর্ম্মবিনাশক আসামী স্বর্গভূষণ সেই নূতন রাণী জগৎকুমারীকে দুষ্ট কৌশলে হরণ করাতে পাগল রাজা আরও পাগল হইয়াছেন। স্বর্গভূষণের অনেক টাকা আছে, রাজা

বিরাটকেতু এই অপমানের ক্ষতিপূরণের নিমিত্ত যে বিংশতি সহস্র মুদ্রা দাবী করিয়াছেন, স্বর্ণভূষণের পক্ষে তাহা যৎসামান্য, কিন্তু ধর্ম্মাবতার! আমি যাঁহার অনুবলে আজ এই বিচারালয়ের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়াছি, সেই রাজা বিরাটকেতু এক স্থানে, এক এজ্‌লাসে দুই প্রকার বিচার প্রার্থনা করেন। দেওয়ানী আর ফৌজদারী।

আসামীর উকীল সর্পগর্জ্জনে গর্জ্জন করিয়া হাকিমকে সম্বোধনপূর্ব্বক,—দূর হইতে ছুটিয়া আসিয়া উচ্চকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, 'খোদাবন্দ! সমস্তই মিথ্যা। কুমার স্বর্ণভূষণ অতি সচ্চরিত্র, তাঁহার স্বভাবে কিছুমাত্র দোষ নাই, ইহারা মিথ্যা মোকদ্দমা সাজাইয়াছে, একজন সুভ্রান্ত রাজপুত্রকে দশের নিকটে অপযশের ভাগী করিয়া দণ্ড ভোগ করাইবার জন্য কুচক্র সৃজন করিয়াছে, রাণী জগৎকুমারী কুলকলঙ্কিনী; সহরের সমস্ত লোক তাহারে ভাল জানে; বৃদ্ধ রাজাকে অগ্রাহ্য করিয়া সেই কুলটা রাণী অন্য লোকের সঙ্গে আপন ইচ্ছাতেই বাহির হইয়া গিয়াছে। মহারাজ রঘুবর বাহাদুরের পুত্র শ্রীমান্ রাজকুমার স্বর্ণভূষণের সহিত জগৎকুমারীর কিছুমাত্র সংশ্রব নাই।"

"থাক্ থাক্, আর বলিতে হইবে না. সমস্তই আমি বুঝিয়াছি। এই মোকদ্দমার আসামী রাজকুমার স্বর্ণভূষণ রাও বাস্তবিক কেমন প্রকৃতির লোক, মোকদ্দমার ভাবগতিক দেখিয়া,—অবস্থা শ্রবণ করিয়া তাহা আমি বিলক্ষণরূপে জানিতে পারিয়াছি।—রাজপুত্র হইয়া সামান্য সৈনিকের কার্য্যে নিযুক্ত হইবার কোন এক বিশেষ নিগূঢ় তাৎপর্য্য আছে বোধ হয়। ইতিপূর্ব্বে একবার আমি একটী নির্য্যাতনসঙ্কল্প শ্রবণ করিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহা স্মরণ হইল। কিন্তু এ স্থলে সে কথা প্রকাশের প্রয়োজন নাই। তুমি উকীল, তোমার যাহা কর্ত্তব্য, বিশেষ যোগ্যতার সহিত তুমি তাহা পালন করিলে; তোমার উপর আমি পরমসন্তুষ্ট হইলাম; কিন্তু মোকদ্দমাটী কিছু জটিল, আজিও আমি নিষ্পত্তিপত্র প্রদান করিতে পারিলাম না। বিবেচনা করিয়া হুকুম দিতে হইবে। চাপ্‌রাসি! আসামীকে হাজতে লইয়া যাও।"

সংক্ষেপে এইমাত্র হুকুম দিয়া হাকিমসাহেব ব্যস্তভাবে আসন হইতে উঠিয়া গেলেন।

উনষষ্টিতম প্রবাহ।

ভয়ঙ্কর দৃশ্য!—রহস্যভেদ!

ভীষণ বিপদক্ষেত্র, ভীষণ ভীষণ!
একাকী কখনো নাহি করে আগমন—
বিপদ দুর্ভাগ্য যত; আসে আর যায়;—
সঙ্গে সঙ্গে থাকে তার অপর সহায়॥

আর্য্যরত্ন।

রাত্রি প্রায় ছয় দণ্ড। আকাশক্ষেত্রে অসংখ্য নক্ষত্রমালা বিরাজ করিতেছে।

কুমার ভূপেশচন্দ্র অনেক দিনের পর অপ্সরাসুন্দরীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। মুখ রক্তবর্ণ, কেশ রুক্ষ, গাত্রবস্ত্র ছিন্নভিন্ন. ঠাঁই ঠাঁই রক্তের দাগ; চক্ষু যেন জবাফুলের মত লাল; সেই জবাফুল যেন চক্রে চক্রে ঘুরিতেছে। ঘন ঘন নিশ্বাস। দৃষ্টি চঞ্চল, চরণ চঞ্চল, ঠিক্ যেন একটী পাগল। গৃহে প্রবেশ করিয়াই চঞ্চলকণ্ঠে তিনি অপ্সরাসুন্দরীকে কহিলেন, "অপ্সরা! প্রাণাধিকে! প্রিয়তমে! তুমি কেমন আছ?"

মূর্ত্তি দেখিয়া অপ্সরার ভয় হইল। কি বলিবেন কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত পলকশূন্য নয়নে ভূপেশচন্দ্রের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। কে জানে কেন,—যাঁহার চক্ষু, তিনিই জানেন,—সেই পদ্মচক্ষে অকস্মাৎ জল পড়িতে লাগিল।

ভূপেশচন্দ্র কহিলেন, "স্বর্গদেবি! তুমি কাঁদিতেছ? কেন জীবিতেশ্বরী? তোমার কমলনয়নে জলধারা কেন?"

"তুমি যে ভয় দেখাইতেছ প্রাণেশ্বর!"

শেষের কথাটী ভূপেশচন্দ্রের কর্ণে প্রবেশ করিল না। তিনি যেন উন্মত্তপ্রায় হইয়াছিলেন। উন্মত্তভাবে ছাড়া ছাড়া কথায় কহিতে লাগিলেন,

"অপ্সরাসুন্দরি! জগৎসুন্দরি! স্বর্গসুন্দরি! তুমি এমন করিতেছ কেন? তোমার পদ্মচক্ষু এমন ঘুরিতেছে কেন? ঐ,—ঐ,—ঐ যেন দেখিতেছি, রক্তবস্ত্র।—উঃ!—অপ্সরা! তোমার চক্ষে কি কেহ রক্ত মাখাইয়া দিয়াছে? গাত্রে কি কেহ রক্তবস্ত্র ঢাকা দিয়াছে? না,—না,—তা কেন? ঐ যেন কে আসিতেছে। আমাকে ভয় দেখাইতে আসিতেছে! তোমার চক্ষের কাছে নাচিতেছে! আমার চক্ষের কাছে নাচিতেছে! কে ওরা?—তাড়াইয়া দাও। প্রাণাধিকে! তোমার কাছে মোহর আছে?"

"মোহর?—মোহর জীবিতেশ্বর?—মোহরে এখন কি আবশ্যক?"

"আবশ্যক?—জান না জীবিতেশ্বরী? আমি খুন করিয়াছি! মানুষ মারিয়াছি! বেলা দুই প্রহরের সময় আমি মানুষ খুন করিয়াছি! দেখিতেছ না, আমার সর্ব্বাঙ্গে রক্তমাখা!—উঃ!—জগদীশ্বর! এ কি হইল! হৃদয়েশ্বরি! আমি কি করিলাম!—মনে কর,—মনে কর,—মনে করিয়া দেখ, যে হস্ত,—যে পবিত্র হস্ত এক সময়ে তোমার ঐ কোমল করপদ্ম স্পর্শ করিয়া সুখী হইয়াছে,—যে হস্ত এক সময়ে তোমার ঐ অমৃতময় ওষ্ঠপদ্ম স্পর্শ করিয়া বিমল পবিত্র সুখ অনুভব করিয়াছে, এক সময়ে যে হস্ত তোমার ঐ সুগন্ধময় কেশকলাপের স্পর্শসুখে নিত্যানন্দ অনুভব করিয়াছে, যে হস্ত এক সময়ে দরিদ্রের দুঃখমোচনে,—বিপন্নের বিপদমোচনে দয়াপরবশে অকপটে বিস্তারিত হইয়াছে, জীবনেশ্বরি! সেই হস্ত,—তোমার ভূপেশচন্দ্রের সেই পবিত্র হস্ত আজ দিবা দ্বিপ্রহরে নরশোণিতে কলঙ্কিত!"

কথা কহিতে কহিতে ভূপেশচন্দ্র হঠাৎ লাফাইয়া উঠিলেন। অপ্সরাসুন্দরীকে ধরিবার জন্য লাফাইলেন। মধুমতী নায়িকা তখন যেন বিজয়ার প্রতিমার ন্যায় হেলিয়া হেলিয়া পড়িতেছিলেন, ভূপেশচন্দ্র ধরিতে পারিলেন না। সেই প্রতিমা অজ্ঞান হইয়া ধরাতলে পতিত হইলেন।

"কি হইল! কি হইল!—কি করিলাম! কি করিলাম!—কি করি! কি করি!"—পাগলের মত এইরূপ বকিতে বকিতে ভূপেশচন্দ্র তাঁহার অপ্সরাকে কোলে করিয়া লইলেন। শয্যার উপর শয়ন করাইলেন। মুখে চক্ষে জল সিঞ্চন করিলেন। অপ্সরাসুন্দরী অনেকক্ষণ অচেতন। বুঝি প্রাণ গেল, মনে এইরূপ আশঙ্কা করিয়া উন্মত্তপ্রায় নায়ক নিতান্ত অধীর হইয়া

নায়িকার বক্ষের উপর অনবরত চক্ষের জল পরিবর্ষণ করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে অপ্সরার জ্ঞান হইল। ধীরে ধীরে চাহিয়া দেখিলেন, নিকটে প্রাণাধার ভূপেশচন্দ্র। নেত্রনীরে ভাসিয়া মৃদুকম্পিতকণ্ঠে কহিলেন, "আছ? ভূপেশ! তুমি আছ? আমি কোথায় আসিয়াছি? তুমি আমারে কোথায় আনিয়াছ? ঘুমাইতেছিলাম, স্বপ্ন দেখিতেছিলাম, রক্ত। উঃ! ধারে ধারে কতই রক্ত! ভূপেশ! ভূপেশ! সে ত স্বপ্ন নয়! উঃ! আর আমি চাহিয়া থাকিতে পারি না। রক্তময়ী মূর্ত্তি যেন আমার চক্ষের নিকট ছুটিয়া ছুটিয়া আসিতেছে! ভূপেশ! ধর আমারে! শুইয়া শুইয়া আমি যেন পড়িয়া যাইতেছি! ভূপেশ! তুমি মানুষ খুন করিয়াছ? দেব! তোমার ঐ দেবহস্ত কি নররক্তে কলঙ্কিত? কেন বল দেখি জীবিতেশ্বর! চামুণ্ডাদেবীর মন্দিরের কথা কি তোমার মনে পড়ে না? তোমারে পশ্চাতে রাখিয়া আমি কত মুণ্ড নিপাত করিয়াছিলাম। তখন ত আমার এত ভয় হয় নাই; আজ আমার এমন হইতেছে কেন? কোন বিপদে যে গাত্র কম্পিত হয় না, আজ আমার সেই গাত্র এত ঘন ঘন কাঁপে কেন? ভূপেশ! প্রাণাধিক! কেন তুমি খুন করিলে?"

"কেন?—এ কথার আমি উত্তর জানি না। তোমার কাছে মোহর আছে?"

"মোহর কোথায় পাব প্রাণেশ্বর? জীবনের শেষ সম্বল কেবল পাঁচটী মাত্র টাকা আছে।"

"তাহাই আমাকে দাও। সেখানে বড় বিপদ। শীঘ্র! শীঘ্র!—"

কথার তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া সরলহৃদয়া অপ্সরাসুন্দরী আস্তে-ব্যস্তে শয্যা হইতে উঠিয়া সবেমাত্র সম্বল সামান্য পঞ্চমুদ্রা ভূপেশচন্দ্রের হস্তে সমর্পণ করিলেন। উদাসনয়নে তাঁহার বদন নিরীক্ষণ করিয়া কাতর বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন তুমি কোথায় যাবে প্রাণাধিক?"

"সেই খানে,—সেই খানে।—যে খানে আমার জন্য তাহারা দাঁড়াইয়া আছে, সেই খানে যাইব।"

"এখন না।—মিনতি করি,—পায়ে ধরিয়া মিনতি করি, এখন না। একটু বিলম্ব কর, দুটী কথা আমার বলিবার আছে।"

"তোমার কথা আছে, কিন্তু আমার সময় নাই।" সংক্ষেপে এই মাত্র উত্তর দিয়া ভূপেশচন্দ্র ব্যস্তপদে গৃহ হইতে বাহির হইলেন। অপ্সরাসুন্দরী কাঁদিতে লাগিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে ঊর্দ্ধদিকে মুখ করিয়া কৃতাঞ্জলি-পুটে সজল নয়নে ডাকিলেন, "জগদীশ! আমি অভাগিনী, অনাথিনী, কাঙ্গালিনী; দয়াময়! তুমি ভিন্ন ত্রিসংসারে আমার রক্ষাকর্ত্তা কেহই নাই। দীননাথ! শাস্ত্রে শুনিতে পাওয়া যায়, তুমি দীনবন্ধু; তুমি জগতের সমস্ত দীনজনের একমাত্র আশ্রয়। কিন্তু হে ভবদুঃখনিবারণ! এই অভাগিনীর দুঃখের কি শেষ হইবে না? আমার মনজীবনসর্ব্বস্ব ভূপেশচন্দ্র অযত্নে আমারে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। তিনি বিপদে পড়িয়াছেন, দীনবন্ধু! তোমার নাম বিপত্তের মধুসূদন। সেই বিপদ হইতে আমার ভূপেশচন্দ্রকে তুমি রক্ষা করিও। আমার ভাগ্যে যাহা থাকে ঘটুক্, আমি তাহাতে ভয় করি না, মাথায় করিয়া সমস্ত বিপদ আমি বহন করিতে পারি, কিন্তু করুণাময়! আমার প্রাণময় ভূপেশচন্দ্রের যেন কোন প্রকার বিপদ না ঘটে।—

দাসী আমি দীননাথ! চরণে তোমার।
হৃদয়ে ও পাদপদ্ম করিয়াছি সার॥
রক্ষা কর! রক্ষা কর! তুমি রক্ষাময়।
দাসী বোলে পদতলে দিও হে আশ্রয়॥"

উপাসনার সঙ্গে সঙ্গে অপ্সরাসুন্দরীর নয়ন হইতে শ্রাবণভাদ্রমাসের বৃষ্টিধারার ন্যায় অনর্গল অশ্রুধারা পরিবর্ষিত হইল।

রাত্রি দেড় প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। আকাশে মেঘ আছে, একটীও নক্ষত্র দেখা যাইতেছে না। ভূপেশচন্দ্র রাজপথে। নিত্য নিত্য তত রাত্রে পথে যত লোক চলে, সে রাত্রে তত লোক ছিল না,—বৃষ্টির ভয়ে অনেকেই সকাল সকাল গন্তব্য স্থলে গমন করিয়াছিলেন। তখন দৈবাৎ দুটী একটী লোক গতিবিধি করিতেছিল; ভূপেশচন্দ্র রাস্তায়। কতক দূর তিনি অগ্রসর হইয়াছেন, অকস্মাৎ সেই অন্ধকারে একজন লোকের সঙ্গে

দেখা হইল। সেই লোকের হস্তে একটা মশাল। মশালের আলোতে সেই লোক দেখিল, ভূপেশচন্দ্র। অন্য কোন প্রসঙ্গ উত্থাপন না করিয়াই হাকিমী হুকুমের স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "রাজপথের কুকুর! এত রাত্রে তুই বাহির হইয়াছিস্?"

ভূপেশচন্দ্র স্বরে বুঝিতে পারিলেন, লিঙ্গেশ্বর;—পাঠক মহাশয়ও বুঝিতে পারিলেন, লিঙ্গেশ্বর।—উভয়েই উভয়ের মুখ দেখিতে পাইতেছেন, ভীম গর্জ্জনস্বরে লিঙ্গেশ্বর আবার জিজ্ঞাসা করিল, "তুই বুঝি এই মেঘ অন্ধকারে এই রাত্রে চুপি চুপি শিবির হইতে পলাইয়া আসিতেছিস্?"

ভূপেশচন্দ্র উত্তেজিত ছিলেন, সেইরূপে উত্তেজিতভাবে উত্তর করিলেন, "এই বুঝি পলাইবার পথ? তুই পাজি! পথ ছাড়িয়া দে, আমি শিবিরে যাইতেছি।"

"এখন বুঝি ভয় হইল? তোর অবাধ্যতাকে কতবার দণ্ড দিয়াও আমরা শায়েস্তা করিতে পারিলাম না। তার উপর আবার গালাগালি? কয়েদী, বন্দী, পলাতক, দাগী, বদ্‌মাস! এখনও তোর অহঙ্কার কমে না? ঘৃণিত কুকুর! কোথায় জন্ম, তাহার ঠিকানা নাই। এত অহঙ্কার কিসের? পাজি! শূওরের বাচ্ছা! রাস্তার আবর্জ্জনা! দেশের কলঙ্ক! এত অহঙ্কার তোর? বন্দী অবস্থায় চুপি চুপি পলায়ন করিতেছিলি, আমি ধরিয়াছি। যমের হাতে পড়িয়াছিস্! কে তোকে নিস্তার করে, করুক্! এতদূর স্পর্দ্ধা! আমাকেই গালাগালি? আমি পাজি?"

অটল নিঃশঙ্কভাবে ভূপেশচন্দ্র উত্তর করিলেন, "হাঁ! যাহা আমি বলিয়াছি, আবার তাহা বলিব। তোর ঐ বিষাক্ত বদন দেখিয়া আমি ভয় পাইব না। তুই পাজি! তুই ধূর্ত্ত! তুই নরঘাতক। তুই বিশ্বাসঘাতক! তুই ভয়ানক প্রবঞ্চক! তুই কুকুর! তুই শেয়াল! তুই শূওর! যদি আমি ইচ্ছা করি,—অকারণে কাহারও শরীরে আমি রক্তপাত করি না,—কিন্তু যদি আমি ইচ্ছা করি, এই দণ্ডে তোকে আমি শৃগালকুকুরের দন্তে সমর্পণ করিতে পারি। পৃথিবীতে যত কিছু দুষ্কর্ম্ম আছে, সেই সকল দুষ্কর্ম্মের একটী একটী অণু পরমাণু লইয়া বিধাতা তোকে গঠন করিয়াছেন। তোর অবয়বে আমি সমস্ত পাপরিপু দর্শন করি, সমস্ত নরক দর্শন করি। সরিয়া যা!

সরিয়া দাঁড়া! আমি শিবিরে প্রবেশ করিব।—পৃথিবীতে যত রকম পাজী আছে, সব তুই! পথ ছাড়িয়া দাঁড়া,—আমি শিবিরে যাই।"

বীরোচিত বীরদর্পে এই সকল কথা বলিতে বলিতে ভূপেশচন্দ্র সেই নরপিশাচকে এক পদাঘাত করিলেন। এই অবসরে আর একজন লোক আসিয়া দেখা দিল। কে সেই লোক, পাঠকমহাশয়ের যদি অনুভবে না আইসে, সন্দেহভঞ্জনের জন্য সুতরাং স্পষ্ট করিয়া পরিচয় দিতে হইল। সে লোক আর কেহ নহে, হাজতী আসামী পলাতক স্বর্ণভূষণ বাও!

এ কি আশ্চর্য্য কথা! স্বর্ণভূষণ হাজতে। সে লোক কি প্রকারে অত রাত্রে প্রকাশ্য রাজপথে?—সকলেরই বিস্ময় বোধ হইতে পারে, কিন্তু যাহারা এইরূপে অভ্যস্ত, তাহারা ইহাকে ছোট কথা মনে করিয়া তাচ্ছিল্য করিতে পারে। কিন্তু,—কিন্তু, বদমাস লোকের দুশ্চরিত্রে ভাল করিয়া দাগ দিবার জন্যই আমরা রঙ্গভূমে অবতীর্ণ হইয়াছি। ছোট অপরাধকে ছোট বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারি, কিন্তু একজন বদ্‌মাস যাহাকে ছোট বলিয়া জানে, আমি তাহাকে হিমালয় পর্ব্বত অপেক্ষা উচ্চ বলিয়া জানি। সতীর সতীত্বহরণ অপরাধে স্বর্ণভূষণ হাজতী আসামী। রাণী জগৎকুমারী যথার্থ সতী কি না, তাহা জানি;—আরও, হাকিমের কাগজাৎ মোলাহেজায় বুঝা হইয়াছে, এই স্বর্ণভূষণ সেই অপরাধে অপরাধী। সেই হাজতী আসামী,—সেই সতীত্বহরণ অপরাধে অপরাধী নরপিশাচ স্বর্ণভূষণ রাত্রিকালে হাজত হইতে কিরূপে বাহির হইল?

কথা বড় শক্ত। আমরা যদি কোতোয়ালীর লোক হইতাম, হাকিমের নিকটে কৈফিয়ৎ দিতে হইত। কিন্তু তাহা ত নহে; আমরা ত দিল্লী-দরবারের মসহারা প্রত্যাশা রাখি না, আমাদের কৈফিয়ৎ অন্য প্রকার। কথা চাহি না, ঘুস চাহি না, দলস্থ লোকের উপরোধ অনুরোধ কিছুই গ্রাহ্য করি না, সত্য ঘটনার সত্য অর্থ,—সত্যকথাই আমাদের কৈফিয়ৎ। সে কৈফিয়ৎ আমরা জগৎসংসারকে শুনাইব। পাঠকমহাশয়! আপনার যদি নিরপেক্ষ চিন্তাশক্তি থাকে, তাহা হইলে আপনিই আমাদের,—জগৎসংসারের সাক্ষী, জগৎসংসারের প্রতিনিধি।

স্বর্ণভূষণ হাজত হইতে পলায়ন করিয়াছেন। কিন্তু কিরূপে পলায়ন?—

হাজত গারদের পশ্চিম দিকে একটী গবাক্ষ ছিল ;—পূর্ব্বদিকেও সেইরূপ আর একটী ক্ষুদ্র গবাক্ষ। সেই দিকে প্রহরী পাহারা। পূর্ব্ব গবাক্ষের নিকটে মুখ বাড়াইয়া হাজতী আসামী চুপি চুপি ডাকিলেন, "প্রহরি!"

গবাক্ষের নিকট প্রহরী আসিল। আসামী চুপি চুপি কহিলেন, "বাদ্‌সাহের কি এইরূপ হুকুম? পিপাসায় জল পাওয়া যায় না?"

প্রশ্নচ্ছলে প্রহরী উত্তর করিল, "তুমি কি জল চাও?"

"জল চাই, বাতাস চাই, তুই চাই।"

"তুমি একটু আস্তে আস্তে কথা কও।"

এই কথা বলিয়া প্রহরী সরিয়া যাইতেছিল, অনুচ্চস্বরে আবার ডাকিয়া আসামী কহিলেন, "সকলে কি ঘুমাইয়াছে?"

"কেন? এ কথা জিজ্ঞাসা করিবার তোমার প্রয়োজন?"

"হুস্‌। চুপি চুপি কথা কও, প্রয়োজন আছে। শতমুদ্রা পুরস্কার।"

প্রহরী চমকিত হইল। সেই চারি দেয়ালের মধ্যে এমন পুরস্কারের কথা তাহার কর্ণে আর কখনও প্রবেশ করে নাই। গবাক্ষের নিকটে মুখ লইয়া গিয়া প্রহরী কহিল, "সকলে আপনার আপনার ছন্দায় আমোদ আহ্লাদ করিতেছে। তুমি কি বলিতে চাও?"

আসামী কহিলেন, "সত্য আমার জলতৃষ্ণা পায় নাই। চুপি চুপি তুমি দরজা খুলিয়া দাও, শতমুদ্রা পুরস্কার। আমার সঙ্গেই তাহা আছে, এখনই তাহা প্রদান করিতে পারি। আমি রাজপুত্র; আমাকে অবিশ্বাস করিও না। দরজা খুলিয়া দাও। আমি প্রস্থান করি। পশ্চিম দিকে যে গবাক্ষ আছে, জোরে তাহা তুমি ভাঙ্গিয়া রাখিও। সম্মুখের দরজায় যেমন চাবী আছে, সেইরূপ চাবী দিয়া রাখিও। প্রভাতে যখন তদারক হইবে, তখন নির্ভয়ে বলিও, গবাক্ষ ভাঙ্গিয়া রাজকুমার পলায়ন করিয়াছে; বুঝিয়াছ আমার পরামর্শ? এই লও, শতমুদ্রা পুরস্কার।"

প্রহরী হাত পাতিল, পাঁচটী স্বর্ণমোহর গবাক্ষরন্ধ্র দিয়া তাহার হাতে আসিয়া পড়িল। আহ্লাদে উন্মত্ত হইয়া সেই ব্যক্তি গারদের দ্বারের চাবী খুলিয়া দিল, স্বর্ণভূষণ শঙ্কিত অশঙ্কিতভাবে হাজত হইতে বহির্গত হইলেন। সমস্তই পরিষ্কার,—সমস্তই নিরাপদ।

সেই সময়ে লিঙ্গেশ্বরের সঙ্গে ভূপেশচন্দ্রের বচসা হইতেছিল। মধ্য-স্থলে উপস্থিত হইয়া স্বর্গভূষণ চীৎকার করিয়া কহিলেন, "কাহাদের কথা শুনিতেছি? লিঙ্গেশ্বর! এই ভিক্ষারী কি তোমাকে অপমান করিতেছে? ধর উঁহাকে! মার উঁহাকে! মার! মার! মার! এখনই গুলি কর!"

পশুপতি সিংহ যেমন সম্মুখে শিকার দেখিলে লাফাইয়া পড়ে, তেমনি দর্পে লাফাইয়া উঠিয়া ভূপেশচন্দ্র সজোরে স্বর্গভূষণের নাসিকায় এক সুদৃঢ় মুষ্ট্যাঘাত করিলেন। লিঙ্গেশ্বরকেও পুনরায় এক পদাঘাত। উভয়েই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল। ভূপেশচন্দ্র সুস্থিরভাবে সেই স্থানে দাঁড়াইয়া সিংহের মত গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। কাপুরুষের মত পলায়ন করিলেন না। কি বিপদ আসিবে, মনেও তাহা তিনি ভাবিলেন না। লিঙ্গেশ্বরের একটু জ্ঞান হইল। তাহার সঙ্গে বাঁশী ছিল, জোরে ফুৎকার দিয়া সেই বাঁশী বাজাইয়া দিল। অন্যূন একশত প্রহরী দক্ষিণ দিক হইতে ছুটিয়া আসিল। মহা কলরবে স্বর্গভূষণের চৈতন্য ফিরিয়া আসিল। কাঁপিতে কাঁপিতে দাঁড়াইয়া উঠিয়া সক্রোধে তিনি হুকুম দিলেন, "এই নরঘাতক ভূপেশচন্দ্রকে তোমরা বন্দী কর। সামরিক বিচারালয়ে কল্য ইহার বিচার হইবে।"—লিঙ্গেশ্বর আবার অজ্ঞান।

হাজত হইতে বাহির হইয়া স্বর্গভূষণ ভাবিয়াছিলেন, পিতৃভবনে লুকাইবেন। সেখানে প্রবেশ করিলে আর কোন রাজক্ষমতা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। কিন্তু লিঙ্গেশ্বর অজ্ঞান। যদিও মিট্ মিট্ করিয়া চাহিতেছে, তথাপি সম্পূর্ণ জ্ঞান হয় নাই। তাহাকে তুলিয়া লইয়া সেই রাত্রে স্বর্গভূষণকে শিবিরে যাইতে হইল। প্রহরীরা ভূপেশচন্দ্রকে বন্দী করিয়া শিবিরে লইয়া গেল।

রজনীকে আমরা শান্তিদায়িনী বলি। জগতের সমস্ত জীব, সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া সেই শান্তিদেবীর শান্ত ক্রোড়ে বিশ্রাম লাভ করে। সত্য কথা। কিন্তু এই তিন জন সে রাত্রে শান্তিদেবীর কোলে একটুও শান্তি পাইলেন না। গগনের নক্ষত্রেরা ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রভাতের পূর্ব্বে নূতন অন্ধকারে ডুবিয়া গেল; নূতন উষা বিশ্বক্ষেত্রে দেখা দিলেন; প্রভাত আসিয়া উপস্থিত হইল। নূতন প্রভাতে রাজকুমার স্বর্গভূষণ রাও আপনার

পিতৃপ্রাসাদে উপস্থিত। মহারাজ রঘুবর আর মহারাণী মঙ্গলক্ষ্মী একটী গৃহে বসিয়া ছিলেন, কুমার স্বর্গভূষণ তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া উত্তেজিত-ভাবে কহিলেন, "শত্রু নিপাত হইয়াছে!" একটু দূরে পিসীমা ছিলেন। শান্ত করিবার অভিপ্রায়ে মিষ্ট বাক্যে তিনি কহিলেন, "বৎস! একটু শান্ত হও! অত উত্তেজিত হইলে মনের বেগ স্থির রাখিতে পারিবে না।"

"কেন পিসীমা? তুমি আমাকে ঘৃণা কর। তুমি আমাকে বিষনয়নে দেখ। আচ্ছা! আমি আসিতেছি।"

মাতাপিতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, পিসীমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, কুমার স্বর্গভূষণ গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। কি কি কথা হইল, তাহা এ স্থলে প্রকাশ করিবার প্রয়োজন নাই। সময়ে ব্যক্ত হইবে।

দুই দিন গেল, দুই রাত্রি গেল, দুই দিনের সূর্য্য, দুই রাত্রের চন্দ্র, দুই রাত্রের নক্ষত্রমালা উদয়াচলে উদয় হইয়া অস্তাচলে অস্ত গেলেন, দুই বার প্রভাত হইল, দুইবার সন্ধ্যা হইল, তৃতীয় দিবসের প্রভাত। দেখিতে দেখিতে বেলা এক প্রহর। রাজা রঘুবর, মহারাণী মঙ্গলক্ষ্মী, শান্তমুখী পিসীমা এক গৃহে বসিয়া আছেন, স্বর্গভূষণ প্রবেশ করিলেন।

রাজা হাস্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্বর্গভূষণ! তুমি কোথায় গিয়াছিলে? সে লোকটার কি হইল? বিচার কি শেষ হইয়াছে? তার নাম কি?"

"কাহার নাম? সেই শূকরীর বাচ্ছার?—তাহার নাম ভূপোশ্, ভূতোশ্ ভূতোশ।"

"হাঁ, হাঁ, ভূপেশ;—বিচারে তাহার কি হুকুম হইল?"

পাঠক মহাশয় পিসীমার একটী নূতন নাম শ্রবণ করিয়াছেন। সত্যই সেটী নূতন নাম। সে নাম তাঁহার প্রকৃত নাম নহে। তাঁহার সত্য নাম শ্রীমতী যশেশ্বরী দেবী।

যশেশ্বরী দেবী চঞ্চলভাবে রাজার প্রশ্ন শুনিয়া চঞ্চলভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিচার?—বিচার?—ভূপেশচন্দ্রের বিচার? কেন স্বর্গভূষণ! বৎস! একটী নিরাশ্রয় বালককে এত যন্ত্রণা দিয়াও কি তোমরা নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছ না? এবারে আবার তাহার কি অপরাধ?

মুখ বিকট সিকট করিয়া স্বর্গভূষণ কহিলেন, "অপরাধ? তুমি সে কুকুরকে জান না পিসীমা! মানুষ দেখিলেই ঘেউ ঘেউ করে, তাড়িয়া কামড়াইতে যায়। সে দিন অনেক রাত্রে লিঙ্গেশ্বরকে রাস্তায় একাকী পাইয়া কত রকম গালিগালি দিয়াছিল। এমন পাজী, অমন পাজী, তেমন পাজী, আমরা যে সকল কথা কখনও জানি না, সেইরূপ হরেক রকম পাজীর নাম করিয়া কত কি বিশ্রী নামে ডাকিয়া তাহার অপমান করিয়াছিল। লাথী মারিয়াছিল। সে জানে না লিঙ্গেশ্বর তাহার অপেক্ষা কত বড় উঁচুদরের লোক। সে একজন ভিকারী লিঙ্গেশ্বর একজন বড়লোক। সম্ভ্রান্ত সেনাদলের হাবিলদার। ভিকারীটা খাইতে পাইত না, লিঙ্গেশ্বর অনুগ্রহ করিয়া চাকরী করিয়া দিয়াছেন। কেমন কালের ধর্ম্ম, তাঁহার উপরেই জোর। এ কি সহ্য হয় পিসীমা! লিঙ্গেশ্বর ভালমানুষ, সাত চড়ে রা কাড়ে না, তাহার উপরেই দৌরাত্ম্য! পদাঘাত করিয়াছিল, প্রহার করিয়াছিল, ভাগ্যে ভাগ্যে সেই সময় আমি উপস্থিত হইয়াছিলাম, সেই জন্যই রক্ষা, তাহা না হইলেই মারিয়া ফেলিত।"

মুখ ফিরাইয়া মৃদু মৃদু হাস্য করিয়া যশেশ্বরী কহিলেন, "লাথী মারিয়াছিল? খুন করিতে পারে নাই? তবে কেন ভূপেশচন্দ্র লোকের কাছে ক্ষত্রিয় নামে পরিচয় দেয়?"

"বল কি তুমি পিসীমা? খুন করিয়া ফেলিবে? খুন করিলেই কি তুমি তুষ্ট হইতে? ক্ষত্রিয়?—সেই দাসীপুত্র কুকুরটা ক্ষত্রিয়?—কে সে?"—স্বর্গভূষণের চক্ষু রক্তবর্ণ হইল। মাতাপিতার দিকে চাহিয়া, চক্ষু হইতে যেন অগ্নি বর্ষণ করিতে করিতে তিনি সদর্পস্বরে কহিলেন, "এই রাক্ষসী যদি আমার পিসী না হইত,—যদি আমার পিতার সহোদরা ভগ্নী না হইত, তাহা হইলে দেখিতাম, কে কাহাকে খুন করে!"

হাস্য করিয়া যশেশ্বরী কহিলেন, "তুমি অমন করিতেছ কেন স্বর্গভূষণ? লাথী মারিয়াছে, খুন করিতে পারে নাই, ক্ষত্রিয়কুলের কলঙ্ক, কেবল তাহাকে নয়, আর যাহারা যাহারা—"

লম্ফ দিয়া ভূতলে পদাঘাত করিয়া স্বর্গভূষণ সক্রোধে কহিলেন, "কাহার কথা বলিতেছ? আমাকে খুন করিবার কথা?" মুষ্টি বন্ধন করিয়া কট মট

চক্ষে পিসীমার দিকে চাহিতে চাহিতে দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিতে করিতে রাজকুমার স্বর্গভূষণ রাজার কাছে ছুটিয়া গেলেন। কাণে কাণে চুপি চুপি কহিলেন, "মাসী পাগল হইয়াছে।"

চুপি চুপি কহিলেন বটে, কিন্তু সে কথা রাজা শুনিলেন, রাণী শুনিলেন, পিসীমাও শুনিতে পাইলেন।

আবার হাস্য করিয়া দেবী যশেশ্বরী কহিলেন, "স্বর্গভূষণ! ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম তুমি জান, বিপক্ষকে যাহারা বিনাশ করিতে না পারে, তাহারা ক্ষত্রিয় নামে পরিচয় দিবার যোগ্য নয়।"

"তাই বুঝি?—তাই বুঝি তুমি মনে করিয়াছ? সেই কুকুর ক্ষত্রিয় বুঝি? কোথায় জন্ম, কাহার সন্তান, কি জাতি, কেহই জানে না। তুমি তাহাকে ক্ষত্রিয় বলিতেছ? সত্যই তুমি পাগল হইয়াছ।"

মস্তক সঞ্চালন করিয়া যশেশ্বরী কহিলেন, "তাই বটে! স্বর্গভূষণ! তাইই বটে! আমি পাগল হইয়াছিই বটে! সিদ্ধেশ্বরকে লাথী মারিয়াছে, আর ত কিছু করে নাই?"

"না করিয়াছে কি?"—ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইয়া স্বর্গভূষণ কহিলেন, "না করিয়াছে কি? বাকী রাখিয়াছে কি? আমাকেও ঘুসী মারিয়াছে।"

রাজা রঘুবর বাও চমকিয়া উঠিলেন। রাণী মহালক্ষ্মী কাঁপিয়া উঠিলেন। দেবী যশেশ্বরী নীরবে রহিলেন। স্বর্গভূষণের চক্ষে আগুন জ্বলিতে লাগিল। ক্রোধে কম্পিত হইতে হইতে রাজা কহিলেন, "আমার পুত্রের গাত্রে হস্ত স্পর্শ করে, এতদূর সাধ্য কাহার? সম্মুখে পাইলে আমি তাহাকে উপবাসী ব্যাঘ্রের মুখে নিক্ষেপ করিতাম। তাহার বিচার কি শেষ হইয়াছে?"

সদর্পে স্বর্গভূষণ কহিলেন, "সমস্তই শেষ হইয়াছে। আর পাঁচদিন পরে আরো শেষ হইবে। প্রাণদণ্ডের আদেশ। পাঁচদিন পরেই ফাঁসীকাষ্ঠে তাহার পাপপ্রাণ উড়িয়া যাইবে!"

"বেস্ হইয়াছে!"—প্রফুল্লমুখে রাজা কহিলেন, "বেস্ হইয়াছে!" মুখ টিপিয়া হাসিয়া রাণী প্রতিধ্বনি করিলেন, "বেস্ হইয়াছে! লোকটা আমাদের চক্ষের শূল। চিরশত্রু, জাতশত্রু। চক্ষের নিকটে আসিলে

আমাদের গায়ে যেন আগুন ঢালিয়া দিত। বিষ ঢালিয়া দিত! ফাঁসীর হুকুম হইয়াছে, বেস্ হইয়াছে।"

দেবী যশেশ্বরী নিস্তব্ধ হইয়া এই সকল কথা শুনিতেছিলেন, অকস্মাৎ অজ্ঞাতসারে মূর্চ্ছা আসিয়া তাঁহার চৈতন্য হরণ করিল। ঘন ঘন কাঁপিতে কাঁপিতে তিনি জ্ঞানশূন্য হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন।

"কি হইল! কি হইল!" বলিয়া আসন হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক রাজা রঘুবর রাও স্বয়ং আদরিণী ভগিনীর বদনে জল সিঞ্চন করিয়া শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। অনেক ক্ষণেও জ্ঞান হইল না।

রাজা রঘুবর রাও দেবী যশেশ্বরীকে যথোচিত স্নেহ করিতেন। কিন্তু রাণীর বিলক্ষণ বিদ্বেষভাব ছিল। স্বর্গভূষণও মাতৃধর্ম্মের অনুবর্ত্তী।

দেবী যশেশ্বরী রাজা রঘুবর অপেক্ষা দশ বৎসরের ছোট। সহোদরকে তিনি যেমন ভক্তি করেন, তেমনি ভয়ও করেন। রাজাও সেই নিমিত্ত স্নেহ-পূরবশ। রাণী বিরক্ত হন, রাজপুত্র বিরক্ত হন, যশেশ্বরীর সত্য সত্য কথা শুনিয়া। কিন্তু রাজা সত্যমর্ম্ম বুঝিতে পারিয়া ভগিনীর প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করেন না। সে দিন সেই ক্ষেত্রে তাঁহার চিত্ত কিছু চঞ্চল হইয়াছিল; কিন্তু অকস্মাৎ যশেশ্বরী মূর্চ্ছিতা হওয়াতে সে চাঞ্চল্যকে তিনি মনে মনেই গোপন করিয়া রাখিলেন। দুই জন কিঙ্করীকে ডাকিয়া মূর্চ্ছিতা দেবীকে তাঁহার শয়নকক্ষে পাঠাইয়া দিলেন। রাণীকেও সঙ্গে যাইতে অনুরোধ করিলেন। ইচ্ছা ছিল না, তথাপি অগত্যা পতির আদেশ পালন করিতে হইল; অনিচ্ছায় রাণী তাঁহার সহচারিণী হইলেন। একটু পরেই ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন, "এখনও চৈতন্য হয় নাই। বড় বেগতিক। বোধ করি, চৈতন্য হয় ত আর আসিবে না।"

স্বর্গভূষণের বদন রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। রাজা মহা উদ্বিগ্ন হইলেন। একজন পদাতিক প্রহরীকে আহ্বান করিয়া আদেশ করিলেন, "তুমি অবিলম্বে আমাদের চতুর্ভুজলালকে ডাকিয়া আন। বলিও, বাড়ীতে শক্ত পীড়া, এখনই আসিতে হইবে।"

পদাতিক চলিয়া গেল। স্বর্গভূষণ শিহরিয়া উঠিলেন। তাঁহার মনে তখন কি এক সংশয় আসিয়া আবির্ভূত হইল; ব্যস্ত হইয়া তিনি কহিলেন,

"পিতা! আমার মাথা ধরিয়াছে। অনুমতি প্রদান করুন, আমি অন্য গৃহে গিয়া বিশ্রাম করি।"

রাজা তৎক্ষণাৎ অনুমতি করিলেন। ললাটে করার্পণ করিয়া চিন্তিত চিত্তে অন্যমনস্কভাবে রাজপুত্র মৃদুগতিতে কক্ষান্তরে প্রবেশ করিলেন।—বসিয়া বসিয়া কেন যে স্বর্গভূষণের মাথা ধরিল, কিঞ্চিৎ পরেই পাঠকমহাশয় তাহা জানিতে পারিবেন।

স্বর্গভূষণ সে গৃহ ত্যাগ করিবার অব্যবহিত পরেই আর একটী লোক সেই স্থানে প্রবেশ করিলেন। পরিধান পীতাম্বর, গাত্রে সবুজবর্ণ আলখাল্লা, মস্তকে গোটাদার লোহিতবর্ণ তাজ, হস্তে একগাছি কৃষ্ণবর্ণ যষ্টি। তাঁহাকে দর্শন করিয়া রাজা রাণী উভয়েই আসন হইতে উঠিয়া করজোড়ে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। পাঠক মহাশয় স্মরণ রাখিবেন, তিনিই এই রাজ-পরিবারের গুরু,—মন্ত্রদাতা দীক্ষাগুরু। বয়স অনুমান ৬৫ বৎসর, নাম অশ্বানন্দস্বামী।

রাজনির্দ্দিষ্ট মখমলমণ্ডিত আসনে গুরুদেব উপবেশন করিলেন। কিঞ্চিৎ দূরে রাজমহিষী, নিকটে রাজা উপবিষ্ট। প্রসঙ্গাধীন দুই চারি কথার পর রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "গুরুদেব! ভূপেশচন্দ্র নামে একজন মজুর এই রাজ্যে থাকিত, আপনি তাহাকে জানেন?"

"কি নাম?—কি নাম?—ভূপেশচন্দ্র?"—কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া গুরুদেব আবার উচ্চারণ করিলেন, "ভূপেশচন্দ্র?—ওঃ! সেই লোকটা? যে তোমাদের বাড়ীতে ভিকারী ছিল? সেই লোকটা? সেই হতভাগা? কিন্তু কেন? কি তাহার?"

হাস্য করিয়া রাজা কহিলেন, "ধর্ম্ম আছেন কি না? দুষ্ট লোকের দণ্ড তিনি নিজেই দেন। অনাহারে মরিতেছিল, আমি আশ্রয় দিয়া রাখিয়াছিলাম, বিরাটকেতুকে বলিয়া চাকরি করিয়া দিয়াছিলাম, বিরাটকেতুর বাটীতেই থাকিত, শেষে কি না তাহারি সর্ব্বনাশ! তাহার মেয়েটীকে চুরী করিয়া লইয়া গেল। কি ভয়ানক লোক! ভয়ঙ্কর কৃতঘ্ন! আরো শুনুন গুরুদেব! সিংহশাবকের সহিত ঘৃণিত শৃগালশাবকের বিরোধ! আমার স্বর্গভূষণকে সে ঘুসী মারিয়াছে!"

"অ্যাঁ!—অ্যাঁ! বল কি রাজা! ঘুসী? স্বর্গভূষণকে ঘুসী? স্বর্গভূষণ তাহার মুণ্ড ছিঁড়িতে পারিল না?"

হাস্য করিয়া রাণী কহিলেন, "না গুরুদেব! অমন আশীর্ব্বাদ করিবেন না। আমার স্বর্গভূষণ সোণার সঙ্গে ওজন হয়, অমন ঠাণ্ডা ছেলে আমার নজরে ত একটীও ঠেকে না। সে কেন মানুষের গায়ে হাত তুলিবে? যিনি উপরে আছেন, তিনিই বিচার করিবেন। তিনিই বিচার করিয়াছেন। সেই হতভাগার ফাঁসীর হুকুম হইয়াছে।"

"ফাঁসী?—প্রাণদণ্ড?"—আহ্লাদে করতালি দিয়া প্রফুল্লবদনে গুরুদেব কহিলেন, "প্রাণদণ্ড! বা! উত্তম বিচার হইয়াছে! উচিত শাস্তি হইয়াছে! ধর্ম্মের জয় হইয়াছে! আমি—"

পদাতিকের সহিত চতুর্ভুজ আসিয়া প্রবেশ করিলেন। যথোচিত সমাদরে রাজা তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া নিকটস্থ আসনে উপবেশন করাইলেন। যে নিমিত্ত আহ্বান, সংক্ষেপে তাহা ব্যক্ত করিয়া যশেশ্বরীর গৃহে গমন করিতে অনুরোধ করিলেন। গুরুদেব অশ্বানন্দস্বামী ক্ষণকাল চাহিয়া চাহিয়া চতুর্ভুজের হস্ত ধারণপূর্ব্বক অমায়িকস্বরে কহিলেন, "অনেক দিন পরে তোমাকে দেখিলাম। ভাল আছ?"

মৃদুহাস্য করিয়া চতুর্ভুজ উত্তর করিলেন, "দর্শনেই ভাল

এই সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিন্ন গুরুদেবের সহিত চতুর্ভুজ আর কোন কথা কহিলেন না।

রাণী একটু মুখ বাঁকাইলেন। চতুর্ভুজকে সঙ্গে করিয়া রাজা রঘুবর রাও যশেশ্বরীর গৃহে গমন করিলেন। তখনও পর্য্যন্ত যশেশ্বরীর চৈতন্য হয় নাই। কিঙ্করীরা জল সিঞ্চন করিতেছে, বাতাস করিতেছে, চিকিৎসকের সহিত রাজা গিয়া উপস্থিত। নাড়ী পরীক্ষা করিয়া চিকিৎসক কহিলেন, "আকস্মিক মূর্চ্ছা, ইহা কোন ব্যাধি নহে, অল্পক্ষণের মধ্যেই জ্ঞান হইবে। কোন চিন্তা নাই। আমার নিকটে এক প্রকার ঔষধ আছে, নাসারন্ধ্রে তাহা ধরিবামাত্র মূর্চ্ছা ভাল হয়। আমি শীঘ্রই সেই ঔষধ প্রেরণ করিতেছি। কোন চিন্তা করিবেন না।"

"আপনি এইখানে একটু থাকুন। গুরুদেবকে রাখিয়া আসিয়াছি,

আমি চলিলাম। রাণীকে পাঠাইয়া দিতেছি। যেরূপ ব্যবস্থা করিতে হয়, তাঁহাকেই বলিবেন।”—চিকিৎসককে এই কথা বলিয়া রাজা সেই গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। উপবেশনগৃহে উপস্থিত হইয়া রাণীকে কহিলেন, “মহিষি! তুমি সেই ঘরে যাও। চিকিৎসক যেমন যেমন বলেন, সেই মত কার্য্য করিও।”

মহিষী নিতান্ত অনিচ্ছায় রাজাজ্ঞা প্রতিপালন করিলেন। রাজাকে নির্জ্জনে পাইয়া গুরুদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি পীড়া? কাহার পীড়া? তুমি এত ব্যস্ত হইতেছ, ইহা দেখিয়া আমি বোধ করি, পীড়া কিছু শক্ত।”

“না গুরুদেব! শক্ত নয়, সামান্য।—আমার ভগিনী কতকগুলি কথা শুনিতে শুনিতে হঠাৎ মূর্চ্ছা গিয়াছেন, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত জ্ঞান হয় নাই; কিছু ভয় হইয়াছে;—সেই জন্য।”

“ঐ চতুর্ভুজ কি তোমাদের নির্দ্দিষ্ট চিকিৎসক? সর্ব্বদাই কি উহার এখানে গতিবিধি আছে? উহার চিকিৎসায় লোকেদের শক্ত শক্ত পীড়াও কি আরাম হয়?”

“নির্দ্দিষ্ট চিকিৎসক নয়, শক্ত পীড়া আরাম করিতে পারে কি না, তাহাও জানি না, সর্ব্বদা উহার এখানে গতিবিধিও নাই, তবে কি না, সামান্য মূর্চ্ছা মাত্র, নিকটেই উহার বাড়ী, সেই নিমিত্তই ডাকা হইয়াছে।—আচ্ছা গুরুদেব! চতুর্ভুজের সহিত আপনি যেরূপে সম্ভাষণ করিলেন, তাহাতে বোধ হইল, লোকটী আপনার চেনা। উহার সঙ্গে কি আপনার বন্ধুত্ব আছে?”

“জন্মেও না!—কস্মিন্ কালেও না!—বন্ধুত্ব?—বন্ধুত্ব দূরের কথা, চেহারা পর্য্যন্ত দেখি নাই। চেহারা দেখিয়া মনে কেমন একটা ঘৃণার উদয় হইল, সেই জন্যই রহস্যচ্ছলে সেইরূপ সম্ভাষণ করিয়াছিলাম। বিশেষতঃ—বিশেষতঃ কি জান রাজা,—ওর নাম কি ভাল,—আমরা হলেম সাধুলোক, লোকের মন্ত্রদাতা গুরু, পরিত্রাণের কর্ত্তা, সকল লোককে ভাল কথায় তুষ্ট রাখিতে হয়, সকলের সঙ্গেই যেন জানাশুনা আছে, সকলকেই যেন চিনি, এইরূপ ভাব দেখাইতে হয়। ফল কথা, জন্মেও আমি উহাকে চিনি না। দেখেছ রাজা,—ওর নাম কি ভাল,—চেহারাটা কেমন কদাকার! দেখিলেই ক্রোধ

আসিয়া উপস্থিত হয়। ঘৃণার সঙ্গে মূর্তিমান হইয়া সেই মহাক্রোধ যেন স্তবকে স্তবকে আমার অন্তর্দাহ করে।"

"সত্য গুরুদেব! লোকটার উপর আমারও কিছুমাত্র শ্রদ্ধা নাই। যখনই দেখি, তখনই রাগ হয়। ইচ্ছা করিলে আমি উহাকে বিলক্ষণ জব্দ করিতে পারি, কিন্তু সিংহ হইয়া ইঁদুর মারাটা ভাল দেখায় না।"

"দেখায় না বটে, কিন্তু দুষ্ট লোককে প্রশ্রয় দেওয়াটাও ভাল দেখায় না। যে যেমন লোক, তাহাকে সেই প্রকারে বাধ্য রাখাই ভাল। তুমি যে কথা বলিতেছ, তাহা সত্য। রাজা হইয়া একটা সামান্য লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎসম্বন্ধে বিরোধ করাটাও রাজমর্য্যাদার উপযুক্ত নয়। আমাকে যদি বল, তাহা হইলে এমন কৌশলে আমি উহাকে এমনি শিক্ষা দিতে পারি যে, সদ্য সদ্য ঐ চতুর্ভুজকে অকালে চতুর্ভুজলোকে চলিয়া যাইতে হয়। এক দিন আমি—"

স্বর্গভূষণের সহিত চতুর্ভুজ প্রবেশ করিলেন। কথায় বাধা পড়িয়া গেল। চতুর্ভুজ যে পথ দিয়া যশেশ্বরীর গৃহে গমন করিয়াছিলেন, প্রত্যাগমনকালে সে পথ নির্ণয় করিতে না পারিয়া অন্য দিক্ দিয়া আসিতেছিলেন, হঠাৎ দেখিলেন, পাশের একটা ঘরের দরজায় স্বর্গভূষণ দাঁড়াইয়া।—সহাস্যমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজকুমার! তুমি এখানে রহিয়াছ? আমি তোমার পিসীমাকে দেখিতে আসিয়াছিলাম। তিনি অকস্মাৎ মূর্চ্ছা গিয়াছেন।"

স্বর্গভূষণের বদন বিবর্ণ হইল। মনের ভাব গোপন করিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে যাইতেছিলেন, ঈষৎ হাস্য করিয়া চতুর্ভুজ কহিলেন, "রাজপুত্র! লুকাইলে হইবে না। তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে। ভাল ভাল কথা।—রাজার কাছে চল। সে সকল কথা রাজারেও শুনিতে হইবে।" স্বর্গভূষণ দেখিলেন, লোকটা নাছোড়। সুতরাং অগত্যা চতুর্ভুজের সঙ্গে রাজসমীপে উপস্থিত হইয়াছেন। একটু পরেই রাণীর পুনঃপ্রবেশ। রাণীর মুখখানি তখন কিছু ভাবি ভাবি। যেন ক্রোধ, কিম্বা অভিমান, কিম্বা লজ্জা, কিম্বা আশঙ্কা, সেই মুখে দীপ্যমান। সকলে উপবেশন করিলে সর্ব্বপ্রথমে চতুর্ভুজ কহিলেন, "মহারাজ!

একজন পদাতিক আহ্বান করুন। একখানি পত্র লিখিয়া দিতেছি, আমার গৃহ হইতে মূর্চ্ছার ঔষধ আনয়ন করুক। একটী বিশেষ কারণে এখানে আমার কিয়ৎক্ষণ বিলম্ব হইবে।”—এই শেষ কথাটী বলিয়া চিকিৎসক চতুর্ভুজলাল যেন কিছু বিকৃত ভঙ্গীতে গুরুদেবের মুখের দিকে চাহিলেন। সেই দৃষ্টিপাতে গুরুদেব যেন শিহরিয়া উঠিলেন।

পত্র লইয়া পদাতিক চলিয়া গেল। রাজা, রাণী, আর স্বর্ণভূষণ একত্রে খুব নিকটে নিকটে উপবেশন করিলেন। গুরুদেব আর চতুর্ভুজ কিঞ্চিৎ দূরে উপবিষ্ট। চতুর্ভুজ একবার গাত্রোত্থান করিয়া গৃহের দ্বারদেশ পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে গুরুদেব উঠিয়া সবলে তাঁহার হস্ত ধারণ করিলেন। কাণের কাছে মুখ লইয়া গিয়া মিনতিপূর্ব্বক চুপি চুপি কহিলেন, “দয়া কর।”

হাস্য গোপন করিয়া চতুর্ভুজলাল ফিরিয়া আসিয়া রাজার অদূরস্থ আসনে উপবিষ্ট হইলেন। রাজার দক্ষিণ পার্শ্বে গুরুদেবের উপবেশনের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল।

এই স্থলে পাঠক মহাশয়কে একটী সূক্ষ্ম কথা জানাইয়া রাখা উচিত। ইত্যগ্রে চিকিৎসকের অনুপস্থিতিকালে রাজার সহিত গুরুদেবের যে সকল কথা হইতেছিল, তাঁহারা যেরূপে চতুর্ভুজের নিন্দা করিতেছিলেন, গৃহে প্রবেশের অগ্রে স্বর্ণভূষণের সহিত কিঞ্চিৎ অন্তরালে দাঁড়াইয়া চতুর্ভুজ তাহার শেষ কথাগুলি শ্রবণ করেন। গৃহে প্রবেশ করিয়া,—যেন কিছুই শুনিতে পান নাই,—একটী কথাও যেন তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করে নাই, ঠিক সেইরূপ ভাবে উৎসাহিতচিত্তে পত্র লিখিতে বসেন। এই বাক্যের সহিত ভবিষ্যৎ ঘটনার সবিশেষ সম্বন্ধ থাকিবে।

রাজাকে সম্বোধন করিয়া চতুর্ভুজ কহিলেন, “মহারাজ! অনেক দিনের পর একটী কথা,—একটী নিগূঢ় কথা আমার স্মৃতিপথে উদিত হইয়াছে। সেই কথাটী মহারাজের কর্ণগোচর হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। আর মহারাণি! আপনাকেও সেই কাহিনীটী স্থিরমনে শ্রবণ করিতে হইতেছে। রাজকুমার স্বর্ণভূষণ! তুমিও চঞ্চল হইও না। কাহিনী শুনিলে তোমাদের সকলেরই নূতন জ্ঞান লাভ হইবে।”—এই কথাগুলি ব্যক্ত করিবার সময়েও

চতুর্ভুজলাল ঘন ঘন ভ্রূকুটী ভঙ্গীতে গুরুদেবের দিকে নেত্রপাত করিলেন। রাজা, রাণী ও রাজপুত্রকে সম্বোধনের পর গুরুদেবকে সম্বোধন করিয়া সেই সুচতুর বক্তা মিষ্ট মিষ্ট বাক্যে কহিলেন, "স্বামীজি! আপনিও অনুগ্রহ করিয়া সেই বৃত্তান্তটার আদ্যোপান্ত শ্রবণ করুন।"

সকলের দিকে একবার নেত্র ঘুরাইয়া বক্তা চতুর্ভুজলাল কথা আরম্ভ করিলেন।—"মহারাজ! ছাব্বিশ বৎসর অতীত হইল, তখন আমি সবে এই সহরে নূতন; ঊর্দ্ধসংখ্যা দুই তিন মাস আসিয়াছি, এখানে তখন বড় বড় নামজাদা হাকিম, ভাল ভাল কবিরাজ সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। দুই তিন মাসে আমি কিছুই পসার করিয়া উঠিতে পারিলাম না। তাঁহাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। লোকে প্রতিদ্বন্দ্বী ও প্রতিযোগীর সহিত যুদ্ধ করে, আমি তখন তাহার পরিবর্ত্তে প্রতিদিন দরিদ্রতারাক্ষসীর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে লাগিলাম। পরিবারের মধ্যে আমি, আমার স্ত্রী, দুটী ছোট ছোট পুত্র, আর একটা অষ্টম বর্ষীয়া কন্যা। চিকিৎসাব্যবসায়ে,—ভিতরে কিছু থাকুক না থাকুক,—বাহিরে আসর-সম্ভ্রম দেখাইতে হয়। গাড়ী, পাল্কী, বেহারা, দাসী, ইত্যাদি আসবাব প্রয়োজন করে। আমি সে সকল আড়ম্বর দেখাইতে পারিলাম না,—ক্ষমতা হইল না, কেবল যাহা না হইলেই নহে, তাহাই রাখিতে হইল। একজন দাসী রাখিলাম।—রাখিলাম ত বটে, কিন্তু খাই কি, খাওয়াই কি, তাহার সংস্থান নাই!"

"কেহই প্রায় ডাকে না। যদি দৈবাৎ কেহ কখনও ডাকে, আমার ভাগ্যের মত তাহার ভাগ্যেও কমলা অপ্রসন্ন। আমরা ভারতবর্ষের লোক। জানেন ত মহারাজ! ভারতবর্ষের আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র কেমন চমৎকার উপদেশ প্রদান করে, কোথাও ধর্ম্ম, কোথাও পুণ্য, কোথাও অর্থ, কোথাও যশ। চিকিৎসকদিগকে এই পন্থা অবলম্বনে চলিতে হয়। আমার তখন যেরূপ অবস্থা, তাহাতে সেই শাস্ত্রবাক্য পালন করিতে পারি, এমন ভরসা ছিল না। তথাচ যতদূর পারিয়াছি, সাধ্যমতে তাহার ত্রুটী করি নাই। দুই দিন, পাঁচ দিন, কখনও বা সাত দিন অন্তর যৎকিঞ্চিৎ প্রাপ্ত হইতাম, অতিকষ্টে তাহাতেই দিন যাপন হইত। এক দিন সন্ধ্যাকালে।

আমি আর আমার স্ত্রী এক সঙ্গে বসিয়া আছি, কথাবার্ত্তা হইতেছে। সে অবস্থায়, আর কিসের কথাবার্ত্তা? রজনীপ্রভাতে কি উপায়ে অবোধ সন্তানসন্ততির ক্ষুধাতৃষ্ণা নিবারণ করিব;—কাতর হইয়া যখন,—ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর হইয়া যখন তাহারা আমাদের মুখপানে চাহিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিবে, তখন তাহাদের কি বলিয়া থামাইব! কিছুমাত্র সম্বল নাই, সন্ধ্যা পর্য্যন্ত যাহা যৎকিঞ্চিৎ আছে, তাহাতে কেবল শিশুদের যথাকথঞ্চিৎ ক্ষুধা নিবৃত্তি হইতে পারে। কিঙ্করী পরের মেয়ে, তাহাকেও উপবাসিনী রাখা হয় না। বণ্টন করিয়া তাহাদিগের ক্ষুন্নিবৃত্তি করা হইল। আমরা স্ত্রীপুরুষে উপবাসী রহিলাম।"

"রাত্রি যখন প্রায় দুই প্রহর, সেই সময় অকস্মাৎ সদর দরজায় আঘাত হইল। বাটীর সকলেই নিদ্রাগত; কেবল একমাত্র আমি জাগিয়াছিলাম। পুনঃ পুন আঘাত হইতে লাগিল। আমি তখনও শয়ন করি নাই। চিন্তার নিকটে কি অন্য কেহ স্থান পাইতে পারে? হৃদয়ে আমার মহা ভয়, যেমন তেমন চিন্তা নয়, জঠরচিন্তা। আমি বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছিলাম। শুভ যাত্রে দরজায় আঘাত করে কে, জানিবার জন্য একটী জ্বলন্ত বাতী হস্তে লইয়া সংশয়ে সংশয়ে আমি দ্বার মুক্ত করিয়া দিলাম। দেখি সম্মুখে একজন অপরিচিত ভদ্রলোক। পরিচ্ছদ দর্শন করিয়া আমি বুঝিতে পারিলাম, বিদেশী নহেন, এই পশ্চিমাঞ্চলেরই লোক অধিবাসী। পরিধান নীলবর্ণ ঢিলা পায়জামা, শ্বেতবর্ণ চাপ্ কান, পীতবর্ণ ফুলপাগ্ড়া, মাথায় পীতবর্ণ পাগড়ী।—লোকটী ত্রস্তভাবে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন, অনাহূত প্রবেশ।—প্রবেশ করিয়াই স্বহস্তে দরজার আগল বন্ধ করিয়া দিলেন।"

এই পর্য্যন্ত কথা হইতেছে, ওদিকে গুরুদেব অমানন্দ স্বামী দুই হস্তে দুই চক্ষু আবরণ করিয়া নতমস্তকে ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন। অন্যমনস্কভাবে সেই দিকে একবার চাহিয়া অলক্ষিতে বড় একটু হাস্য করিলেন। গুরুদেবের ভঙ্গী আর চতুর্ভুজের হাসি, রাজারাণী দেখিতে পাইলেন না; স্বর্ণভূষণও দেখিতে পাইলেন না। সেইরূপে আর একটু হাসিয়া চতুর্ভুজলাল আবার আরম্ভ করিলেন।

"মহারাজ! সেই লোকটী চুপি চুপি আমাকে কহিলেন, একটী বিশেষ প্রয়োজনে আমি তোমার কাছে আসিয়াছি। যদি তুমি আর কাহারো নিকট প্রকাশ না কর, আর যাহা আমি বলিব, তাহাতে যদি সম্মত হও, তাহা হইলে এই রাত্রেই আমি তোমাকে হাজার টাকা দিব। ভাবুন মহারাজ! রাত্রে স্ত্রীপুরুষে উপবাসী,—প্রভাতে এককালে নিঃসম্বল, শিশু পুত্র, শিশুকন্যা উপবাসী থাকিবে, এমন অবস্থায় হাজার টাকা লাভের আশায় পৃথিবীর কোন্ নরলোক কোন্ সুদৃঢ় নিয়মে সম্মত হইতে না চায়? আশার আনন্দে,—যদিও আমি জানি, আশা চপলা,—তথাপি সেই কথা শুনিয়া আশার আনন্দে আমার হৃদয় যেন নৃত্য করিতে লাগিল। আমি তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলাম।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া চতুর্ভুজলাল পুনর্ব্বার স্বামীজীর প্রতি কটাক্ষপাত করিলেন। তখন আর জোরে জোরে নিশ্বাস পড়িতেছিল না। কিন্তু মস্তক পূর্ব্ববৎ অবনত, হস্তাবরণে মুখচক্ষু পূর্ব্ববৎ আবৃত। তখনও পর্য্যন্ত রাজা-রাণীর দৃষ্টি কেবল চতুর্ভুজের মুখে। যেন সমুদ্রের তরণীর কম্পাস! গুরু-দেবের প্রতি তাঁহাদের তখনও ভ্রূক্ষেপমাত্র ছিল না। বক্তা পুনরায় আরম্ভ করিলেন।—

"আমার সম্মতি প্রাপ্ত হইয়া সেই লোকটী সেই প্রকার মৃদুস্বরে আমাকে কহিলেন, একটী যবতীর প্রসববেদনা উপস্থিত। কিন্তু দেখিও, সাবধান, যেন প্রকাশ হয় না। সে যুবতীর বিবাহ হয় নাই।"

"আমি যেন কাঁপিয়া উঠিলাম। কিন্তু জানেন মহারাজ! নিঃসম্বল অব-স্থায় সহস্র মুদ্রা প্রত্যাশা।—পারিলাম না,—অস্বীকার করিতে পারিলাম না। সেই লোকটী আবার কহিলেন, তোমাকে সেই খানে যাইতে হইবে। সহরে যে সকল সুপ্রতিষ্ঠিত চিকিৎসক আছেন, তাঁহারা সকলেই আমার চেনা। তাহাদের কাছে আমি এ লজ্জার কথা প্রকাশ করিতে পারিব না। তুমি নূতন, সকলে তোমাকে দেখে নাই, আমিও তোমাকে চিনি না, তুমিও আমাকে দেখ নাই। তোমার দ্বারাই এ কার্য্য ভাল হইবে। কিন্তু আর একটী কথা।—তোমার চক্ষে কাপড় বাঁধিয়া আমি লইয়া যাইব। কেমন, রাজী আছ?—বিবেচনা করুন মহারাজ! আমার মত দরিদ্র লোকের

এক সহস্র মুদ্রা লাভের আশা। আমি কি অস্বীকার করিতে পারি? তাঁহার মুখের কথা বাহির হইতে না হইতেই আমি উত্তর করিলাম, কেবল চক্ষু কেন, তুমি আমার মুখ বাঁধো, পা বাঁধো, হাত বাঁধো, প্রাণে মেরো না, যাহা ইচ্ছা, তাহাই কর, যেখানে ইচ্ছা, সেই খানেই লইয়া চল, কিছুতেই আমার আপত্তি নাই।"

এই পর্য্যন্ত শুনিতে শুনিতে পণ্ডিত অশ্বানন্দ স্বামী যেন বিদ্যুতাহত প্রান্তরবিহারী পথিকের ন্যায় বিত্রাসিতপদে সন্ত্রস্তভাবে আসন হইতে উত্থিত হইয়া পলায়নের উপক্রম করিলেন। দ্বারের নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন, সর্পের মত গর্জ্জন করিয়া, ব্যাঘ্রের মত লম্ফ দিয়া চতুর্ভুজলাল তাঁহার দুই বাহু আকর্ষণ করিলেন। হুহুঙ্কারগর্জ্জনে কহিলেন, "কোথায় যাও? শেষ পর্য্যন্ত না শুনিয়া এ গৃহ হইতে একজনও বাহিরে যাইতে পাইবে না।, তুমি স্বামীজী, তুমি গুরুদেব, তুমি বড় বড় রাজার গুরুদেব, তুমি সাধুপুরুষ, লোকের পরিত্রাণের কর্ত্তা, তোমার কি অত অশান্ত হওয়া শোভা পায়? সুস্থির হও, সুস্থির হইয়া উপবেশন কর। কি বলেন মহারাজ! রাজগুরুর কি এত অস্থির হওয়া সাজে?"

রাজা ইহার কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। কেবল উদাসনেত্রে একবার গুরুদেবের দিকে, একবার চিকিৎসকের দিকে কটাক্ষপাত করিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। রাণী কাঁপিলেন। অল্পে অল্পে উঠিয়া দাঁড়াইয়া যেন শীঘ্র কোথাও চলিয়া যাইবেন, ঠিক সেই প্রকার ভাব!—বুঝিতে পারিয়া চতুর্ভুজ কহিলেন, "সে কি মহারাণি! আপনি করেন কি? শ্রোতা পাই নাই বলিয়াই আমার এই চমৎকার কাহিনী এই সুদীর্ঘ ছাব্বিশ বৎসর কাল বুকের ভিতর লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম। এমন সুন্দর রাজসভা না হইলে সে কথা প্রকাশ করা যেন অরণ্যে রোদনমাত্র সার। উপবেশন করুন, আর অধিক আড়ম্বর নাই। স্থূল স্থূল গুটীকতক কথা বলিয়াই আমি বিদায় হইব। আপনারা স্থির হইয়া বসুন।"

অশ্বানন্দস্বামী দায়ে পড়িয়া উপবেশন করিলেন। কিন্তু মস্তক পূর্ব্বরূপ অবনত। রাণীও দায়ে পড়িয়া উপবেশন করিলেন। তিনিও তখন নম্রমুখী। রাজা ইহার ভাবভঙ্গি কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। ওদিকে ঔষধ লইয়া

পদাতিক ফিরিয়া আসিয়াছে। কিঙ্করীর দ্বারা সেই ঔষধ পিসীমার গৃহে প্রেরিত হইয়াছে, পিসীমা চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, ব্যস্তপদে তিনি রাজার উপবেশনগৃহে প্রবেশ করিলেন। আরো ভাল হইল। চতুর্ভুজ মনে মনে কহিলেন, আরো ভাল হইল। রাজাকে সম্বোধন করিয়া তিনি কহিলেন, "মহারাজ! যদি অনুমতি করেন, দ্বারগবাক্ষ বন্ধ করি। দেবীর গায়ে এখন শীতল বাতাস লাগিলে ঔষধের ক্রম কমিয়া যাইবে। আবার হয় ত মূর্চ্ছা আসিতে পারে।"

একটু সন্দিগ্ধভাবে রাজা তাহাতেই অনুমোদন করিলেন। একে একে গবাক্ষগুলি অবরুদ্ধ হইল। চতুর্ভুজ নিজেই প্রবেশদ্বারে চাবী দিলেন। ফিরিয়া আসন গ্রহণ করিয়া, দুইবার হাই তুলিয়া, আরব্ধ বাক্যের ধূয়া মিলাইয়া কবিরাজ মহাশয় কহিলেন, "আমি ত মহারাজ সেই লোকটীর সকল কথায় অনুমোদন করিলাম। আমার বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য তিনি অগ্রিম পাঁচ শত টাকা আমার হস্তে প্রদান করিলেন। আশ্বাস দিয়া কহিলেন, কার্য্যসাধন হইবা মাত্র অবশিষ্ট অর্দ্ধেক সেই ক্ষেত্রেই প্রদান করিবেন।"

"মহারাজ! আপনি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি। আপনি জানিতে পারেন না, পাঁচ শত টাকার মূল্য কত। আমি কিন্তু সেই পাঁচ শত টাকা হাতে পাইয়া মহানন্দে বিহ্বল হইয়াছিলাম। লোকটীকে সেইখানে দাঁড় করাইয়া ঘরের ভিতর ছুটিয়া গেলেম। আমার উপবাসিনী সহধর্ম্মিণী ঘুমাইতে পারেন নাই, তখন জানিলাম, ঘুমন্ত ছেলেগুলি লইয়া জাগিয়া ছিলেন, গৃহে তৈল ছিল না, গৃহ অন্ধকার। আমার হস্তের বর্ত্তিকা সেই অন্ধকার গৃহ আলো করিল। —না,— বাতী আলো করিল না,—সেই পাঁচ শত মুদ্রা!—সেই পাঁচ শত মুদ্রা আমার পত্নীর হস্তে প্রদান করিয়া স্বপ্নের মত আনন্দকথা তাঁহার কর্ণে শুনাইয়া তৎক্ষণাৎ আমি নীচে নামিয়া আসিলাম। আমার দাসী তখন জাগিয়া ছিল না, তাহাকে ডাকিয়া তুলিয়া সঙ্গে করিয়া আনিলাম। বিনা বাক্যব্যয়ে সেই লোকটীর সঙ্গে আমি রাস্তার বাহির হইলাম। দরজা বন্ধ করিয়া দাসী উপরে চলিয়া গেল।"

চতুর্ভুজ কথা কহিতেছেন, আর আড়ে আড়ে গুরুর দিকে আর রাণীর দিকে কটাক্ষবর্ষণ করিতেছেন। তাঁহাদের ত মাথা হেঁট। তাঁহারা কিছুই

দেখিতেছেন না, রাজাও যেন অন্যমনস্ক। স্বর্ণভূষণ বিরক্ত হইতেছেন। তাঁহার মুখ দেখিয়াই সেই বিরক্তিলক্ষণ স্পষ্ট অনুভূত হইতেছে।

চতুর্ভুজলাল সকলের মুখপানে চাহিয়া মনে মনে হাসিতেছেন। একটু অবসর আছে। রাজা বঘুবর রাও যেন ঘোর অমাবস্যার রজনীর ঘোর অন্ধকারের মধ্যে একটু একটু আলো দেখিতেছেন। বাঙ্গালী পাঠক মহাশয় ভাদ্রমাসের চতুর্থীর নষ্টচন্দ্রের মাহাত্ম্য জানেন। কিন্তু সে চতুর্থীতে চন্দ্র ছোট হইলেও চন্দ্রের আলো কমে না। পূর্ণিমাতে যখন চন্দ্রগ্রহণ হয়, পূর্ণচন্দ্র যে রাত্রে সমস্ত পৃথিবী কৌমুদীময়ী করেন, সে রাত্রি অন্ধকারপূর্ণ। শশধরের সর্ব্বগ্রাস। বড় লোকের,—বড় ঘরের কলঙ্ক সেই প্রকার। সাধু ইচ্ছাতে, অসাধু ইচ্ছাতে সে কলঙ্ক ঢাকা থাকাই ভাল। প্রায় থাকেও তা। কিন্তু যখন বিধিনির্ব্বন্ধে বিশ্বসংসারের পাকে চক্রে সেই কলঙ্ক প্রকাশ হইয়া পড়ে, তখন উচ্চ মাথা নীচু হইয়া যায়। আকাশ যেন রসাতলে প্রবেশ করে। আকাশের দেবলোক যেন পাতালের নাগলোকের আশ্রয়ভিকারী হন। আজ এই প্রয়াগধামে রাজা বঘুবর রাও বাহাদুরের,—কেবল তাঁহার না,—সেই সম্ভ্রান্ত রাজপরিবারের ঠিক সেই প্রকার অবস্থা।

চাঁদে গ্রহণ লাগিয়াছে। রাহুর ভয়ে চাঁদ কাঁপিতেছেন। ধরাধাম অন্ধকারময়। চতুর্ভুজলাল সকলের মুখেই বিষাদচিহ্ন দর্শন করিতেছেন। কেবল আমাদের পিসীমা হাসিমুখী।

চতুর্ভুজ কহিলেন, "লোকটীর সঙ্গে আমি রাস্তায়। যে পল্লীতে আমার বাসা ছিল, সেই পল্লীর প্রায় দুই তিন রশী পথে গাড়িপাল্কী চলে না। এত সংকীর্ণ পথ। সেই দুই তিন রশী পথ আমরা পদব্রজে অতিবাহন করিলাম। তাহার পরেই বড় রাস্তা। পথের মুখে একখানি ছোট গাড়ী দাঁড়াইয়া ছিল। গাড়ীর লণ্ঠনের আলোতে আবার ভাল করিয়া আমি দেখিলাম; সেই চেহারা।—সে চেহারা এখনও আমার নেত্রদর্পণে যেন প্রজ্বলিত হইয়া প্রতিবিম্বিত হইতেছে। লোকটী অতি ভালমানুষ। অতি শান্তমূর্ত্তি, অমায়িক স্বভাব, মুখে রূঢ়বাক্য মাত্র নাই; যেমন পবিত্র তীর্থ, ঠিক তাহারি অনুরূপ পুণ্যবান্ সাধুপুরুষ। সেই সাধুপুরুষ আমাকে আজ্ঞা করিলেন,—(শ্রীবিষ্ণু!) মিনতি করিয়া কহিলেন, এইখানে আমি তোমার চক্ষে কাপড় বাঁধিব।

আমি নমস্কার করিলাম। তিনি একখানি সুদীর্ঘ সালের রুমাল বাহির করিয়া আমার চক্ষু বন্ধন করিলেন। কোথায় আসিয়াছি, কোন্ দিকে যাইতে হইবে, কিছুই আর তখন আমি অনুভব করিতে পারিলাম না। রুমালখানা এত পুরু যে, জোনাকি পোকার মত বাতীর আলো আমার চক্ষে তখন প্রতিবিম্বিত হইতে পারিল না। বোধ করিলাম, আমি তখন যেন জন্মকাণা। লোকটী আমার হাত ধরিয়া গাড়ীতে তুলিলেন। চক্ষু যখন খোলা ছিল, তখন দেখিয়াছিলাম, একজন লোক ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া অন্য দিকে মুখ করিয়া গাড়ীর পাশে দাঁড়াইয়া ছিল, আমাকে কাণা করিবার একটু অগ্রে সেই লোক সরিয়া গেল। ভাল করিয়া দেখিতে পাইলাম না, কিন্তু চেহারা মনে আছে। আবার যদি কোথাও দেখিতে পাই, তাহা হইলে চিনিতে পারিব, এমন যেন অনুভবে আইসে। একটু একটু মনে হইতেছে, অ. বও কোথাও যেন সেই চেহারার একজন লোক আমার চক্ষের নিকটে আসিয়াছিল।"

"গাড়ীর ভিতর আমি একা। আমার সঙ্গী লোকটী ঘোড়ার লাঙ্গুলের কাছে বসিয়া গাড়ী হাঁকাইতে আরম্ভ করিলেন। যেন সাপ খেলাইতেছে। কোন্ দিক দিয়া কোথায় যাইতেছে, ঠিক পাইতেছি না। ছাব্বিশ বৎসরের কথা, বলেন কি মহারাজ! অত দিনের কথা কি ঠিক্ ঠিক্ মনে থাকে? তবু আমি অনেক মনে করিয়া বলিতেছি, বাঁকা বাঁকা অনেক পথে গাড়ীখানা ঘুরিতেছে; এক একবার থামিতেছে। সোজা পথে যাইলে যদি আমি ঠিক্ পথ মনে করিয়া রাখিতে পারি, সেই ভয়ে, সেই সন্দেহে, সেই লোকটী কেবল বাঁকা বাঁকা পথে গাড়ী ফিরাইতেছেন। পাঁচ সাত বার গাড়ী থামিল। আমি মনে করিলাম, আমাকে ভুলাইবার জন্যই এত বক্রগতি।"

"প্রায় দুই দণ্ডকাল পথে পথেই গেল। শেষে একটা বাড়ীর ফটকে গাড়ীখানা থামিল। ফটক আমি কিরূপে জানিলাম? গাড়ীর গতিতে। লোকটী আমাকে হাত ধরিয়া নামাইল। হাত ধরিয়া লইয়া চলিল। যতক্ষণ গাড়ীতে ছিলাম, ততক্ষণ সেই লোকটী বার বার আমার দিকে ফিরিয়া ফিরিয়া চাহিয়া আদেশ করিয়াছিলেন, প্রাণের উপর হাত রাখ উপর দিকে

হাত তুলিও না। কেন জানেন মহারাজ! কেন জানেন মহারাণি! কেন জান স্বর্গভূষণ! কেন জান যশেশ্বরি! কেন জান গুরুদেব! পাছে আমি চক্ষের বাঁধন খুলিয়া ফেলি, সেই ভয়। কিন্তু আমি কি বোকা?—তাহা আমি কেন করিব? সহস্র মুদ্রা!"

"সেই লোকটী আমার হাত ধরিয়া,—আমি যেন কাণা,—কাণা না হইয়াও কাণা,—লোকটী আমার হাত ধরিয়া একটী দ্বিতল গৃহের উপর লইয়া চলিলেন। একজন পরমেশ্বর উপরে আছেন, তিনি সমস্তই দর্শন করেন, সমস্তই শ্রবণ করেন। যে জীব নিরুপায়, তাহার সম্মুখে আসিয়া হৃদয়ে হৃদয়ে পরামর্শ দেন। আমি একটী পরামর্শ শুনিলাম। তিনি যেন কহিতেছেন, উপরে উঠিবার সময় সিঁড়ি গণনা করিও। হৃদয়ে বল পাইলাম, মনে সাহস পাইলাম, উঠিবার সময় সিঁড়ি গণনা করিলাম। বত্রিশ। উপরের চাতাল তেত্রিশ। তাহার পর আর একটী ছোট, চৌত্রিশ। বেশ চওড়া চওড়া দীর্ঘ দীর্ঘ পরিষ্কার পরিষ্কার কাষ্ঠনির্ম্মিত সিঁড়ি।"

রাণী মহালক্ষ্মী কহিলেন, "মহারাজ! আমার বড় অসুখ করিতেছে। অনুমতি করুন, বিশ্রামগৃহে প্রবেশ করি।"

রাজা তখন তন্মনস্ক হইয়া চতুর্ভুজের কথা শুনিতেছিলেন, রাণীর দিকে চাহিয়া দেখিলেন মাত্র, কিন্তু তাঁহার কথার কোন উত্তর দিলেন না।—দিলেন না কি দিতে পারিলেন না, তাহা আমরা বলিতে পারিব না।

চতুর্ভুজ কহিলেন, "সঙ্গী লোকটী আমাকে একটী গৃহমধ্যে লইয়া গেলেন। গৃহে রাখিয়াই কাহাকে কি যেন বলিয়া তথা হইতে বহির্গত হইলেন। ভিতর হইতে গৃহদ্বার রুদ্ধ হইল। একটী নারীকণ্ঠস্বর আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি বিশ্বাস রাখিতে জান?"

রাণী আসন হইতে উঠিলেন। রাজা আসন হইতে উঠিয়া রাণীর হাত ধরিয়া কহিলেন, "মহিষি! গল্প শুনিতে শুনিতে তুমি এত অধীরা হইতেছ কেন?—শ্রবণ কর।"

"না মহারাজ! আমি আর বসিতে পারিতেছি না। তুমি আমাকে ছাড়িয়া দাও! আমার বড় অসুখ করিতেছে। গুরুদেব সাক্ষী, আমি—"

কথায় বাধা দিয়া চতুর্ভুজ কহিলেন, "সেই কথাই ত আমি বলিতেছি।

গুরুদেব তোমার সাক্ষী, গুরুদেব ত এইখানে ;—আমি আবার গুরুদেবের সাক্ষী। অতি অল্পমাত্র বাকী আছে। পায়ে ধরি, একটু স্থির হইয়া শ্রবণ কর। আমি তাড়াতাড়ী বলিয়া যাইতেছি। শ্রবণ কর।"

"স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর বার বার আমাকে সাবধান করিল। আমি সাবধান হইয়া কহিলাম, চক্ষের বন্ধন খুলিয়া দিতে পার ?"

"তিরস্কার করিয়া সেই স্ত্রীকণ্ঠ সরোষে উত্তর করিল, বিশ্বাস হারাইব না। আমিও প্রতিধ্বনি করিলাম, বিশ্বাস হারাইব না। যদি চক্ষু খুলিয়া না দাও, যে জন্য আসিয়াছি, সমস্তই মিথ্যা হইবে। মিথ্যা হইয়া মিথ্যা-সাগরে ভাসিয়া যাইবে।

"স্ত্রীলোকটী আমার চক্ষের বন্ধন খুলিয়া দিল। আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য!! আশ্চর্য্য!!! এক রকমের পোষাকপরা দুটী রমণী। দুই বদনে স্থূল স্থূল কৃষ্ণবসনের অবগুণ্ঠন। মুখ দেখা গেল না। একটী শয়ন করিয়া রহিয়াছে, আর একটী দাঁড়াইয়া আছে। যাহার সঙ্গে আমার কথা হইতেছিল, সেই স্ত্রীলোকটী আবার আমাকে কহিল, প্রকাশ করিও না। বড় বিপদে পড়িয়াছি।"

"কাহার কথা শুনিতেছি, কাহার কথায় কি উত্তর করিব, ভাবিতেছি, এই অবসরে শয্যাশায়িনী কামিনী একটী পরমসুন্দরী কন্যা প্রসব করিল। প্রসবলক্ষণ কেহ জানিতে না পারে, তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া আমি বিস্মিতনয়নে সেই নবপ্রসূতা কন্যাটীর মুখপানে অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিলাম। বড় দয়া হইল। অবসর ছিল না, শীঘ্র চলিয়া আসিতে হইবে, আবার আমার চক্ষে রুমাল বাঁধিয়া দিবে, মনে সেই আশঙ্কা। বিধাতা ছেলেমানুষ, বিধাতা যুবাপুরুষ, বিধাতা প্রাচীন ; কে তাঁহাকে চিনিতে পারে ? কে তাঁহার মহিমা বুঝিতে পারে ? কে তাঁহার জুয়াখেলা ধরিতে পারে ? কেহই নয়। প্রসূতির মুখাবরণ সরিয়া গেল। আমি দেখিলাম, সৌদামিনী! আবার ঢাকা পড়িল। আমি দেখিলাম, কৃষ্ণবর্ণ মেঘ! সেই মেঘের ভিতর হইতে একটী কথা আসিল, এই কন্যাটী তুমি লইয়া যাও।"

"আমার শরীরে যেন শতসহস্র সৌদামিনীর খেলা হইল। কি উত্তর দিব, ভাবিতেছি, এমন সময় দ্বিতীয় রমণী আপন মুখের অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া

সহাস্যমুখে আমাকে কহিল, তোমার ঠিকানা বলিয়া যাও, এই প্রভৃতি মাসে মাসে তোমাকে পঞ্চাশটী টাকা পাঠাইয়া দিবেন, কন্যাটীকে তুমি যত্নে প্রতিপালন করিও।"

"মহারাজ! এ আশ্চর্য্য কাণ্ড আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। ভাবিলাম, দ্বিতীয় রমণী ধাত্রী। ভাবিয়া ভাবিয়া ধাত্রীর কথার উত্তর করিব মনে করিতেছি, অকস্মাৎ দ্বারে আঘাত। ধাত্রী শশব্যস্ত হইয়া আমার চক্ষে সেই রুমালখানি বাঁধিয়া দিল,—খুব শক্ত করিয়া বাঁধিল,—দুই তিনবার পরীক্ষা করিয়া দেখিল, খুলিতে পারি কি না। আমার ত সে চেষ্টা ছিল না, আশা ছিল, অবশিষ্ট পাঁচ শত। আমি চুপ করিয়া রহিলাম। দ্বার মুক্ত হইল, অনুভবে বুঝিলাম, সেই লোকটী প্রবেশ করিলেন। নম্রস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, নিরাপদ?—সাহসে ভর করিয়া আমি উত্তর করিলাম, ঈশ্বরপ্রসাদে সমস্তই নিরাপদ।—লোক কহিলেন, তবে আর বিলম্ব কেন;—চল, যেস্থান হইতে তোমাকে আনিয়াছি, সেই স্থানে রাখিয়া আসি।"

"ধাত্রীর সঙ্গে আমার কি কি কথা হইয়াছিল,—মহারাজ যাহা শুনিলেন, তাহা ছাড়া আর কি কি কথা হইয়াছিল, তাহা এখন প্রকাশ করিবার ইচ্ছা নাই। ছাব্বিশ বৎসরের কথা; সমস্ত হয় ত মনে হইতে পারে না, কলুর গরুর মত সালের ঠুলী পরিয়া আমি গাড়ীতে উঠিলাম। গাড়ী যত বাঁকা পথে আসিয়াছিল, তাহা অপেক্ষাও আরো বাঁকা বাঁকা পথে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া রাত্রি প্রায় তৃতীয় প্রহরের সময় আমাকে বাসার নিকটে বড় রাস্তায় পেঁছাইয়া দিল। পদব্রজে বাসায় যাইয়া দ্বারে আঘাত করিলাম।—দাসী ঘুমায় নাই। শব্দ পাইবামাত্র দ্বার খুলিয়া দিল, সেই স্থলে আমি অবশিষ্ট পাঁচ শত মুদ্রা প্রাপ্ত হইলাম। লোকটী আমাকে কহিলেন, গোপনীয় কথা গোপনে রাখিও। আমার ঠিকানা মনে রাখিও। ভাল ভাল সম্ভ্রান্ত স্থানে আমি তোমার পরিচয় দিয়া দিব। বাধ্যবাধকতার কারণ কি, প্রকাশ করিও না। প্রয়াগধামে একমাত্র আমি তোমার অকপট বন্ধু রহিলাম। বিপদে স্মরণ করিলেই,—কিছুমাত্র সংবাদ পাইলেই, আমি তোমার উপকারে আসিব।"

রাণী মহালক্ষ্মী মূৰ্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। গুরুদেব অশ্বানন্দস্বামী মূৰ্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। গৃহে হাহাকারশব্দ। চিকিৎসক চতুর্ভুজলাল মূর্চ্ছার ঔষধ ভাল জানিতেন, রাজবাটীতেও সে ঔষধ ছিল। সেই ঔষধবলে, সেই ঔষধের আঘ্রাণে তাঁহাদের উভয়ের চৈতন্য সম্পাদন করিয়া তিনি হাস্য করিতে করিতে রাজাকে কহিলেন, "মহারাজ! আমার ভ্রম হয় নাই, উঠিবার সময় গণনা করিয়াছি, চৌত্রিশ, নামিবার সময় গণনা করিয়াছি, চৌত্রিশ। বদ্ধনেত্রে যে বাড়ীতে আমি প্রবেশ করিয়াছিলাম, সেই বাড়ী এই মহারাণী মহালক্ষ্মীর পিতৃনিকেতন। মহালক্ষ্মীর পিতা মহারাষ্ট্ররাজ্যে সর্ব্বদাই বাস করিতেন, পুত্রসন্তান নাই, এই মহালক্ষ্মীই তাঁহার সংসারের সর্ব্বময়ী। আপনার এই গুরুদেব তাঁহাদের বাটীতে সর্ব্বদাই গতায়াত করিতেন। ইনি মহালক্ষ্মীর পিতৃগুরু। মহালক্ষ্মী তখন কুমারী। ইনি সেই কুমারীকে বিদ্যাশিক্ষা দিতেন, কুমারী কোন বিরুদ্ধভাব মনে করিতেন না, যৌবনে এই গুরুদেবের কন্দর্পের মত রূপ ছিল, চাতুরীজালে বন্দী করিয়া মহারাজের এই গুরুদেব কুমারীকালে কুমারী মহালক্ষ্মীর কুমারীধর্ম্ম বিনাশ করেন। সেই সংযোগের ফল একটী কুমারী। আমি যে কন্যার কথা কহিলাম, সেই কুমারীই এই পাপীযুগলের অপন্মের ফল। সতী কুমারীর পবিত্র সতীত্বচোর এই পণ্ডিত অশ্বানন্দস্বামী সেই অভাগিনী কুমারীর জনক, আর অবিবাহিতা কুমারী অবস্থায় এই মহারাণী মহালক্ষ্মী সেই অভাগিনী কুমারীর গর্ভধারিণী জননী। মহারাজ! আপনি ইহার কিছুই জানেন না। এই নরকের পিশাচ আপনার গুরুদেব! পরমসাধু!—জীবের পরিত্রাণের কর্ত্তা!—এমন গুরুদেবকে আমি তুষানলে দগ্ধ করিয়া হাতে হাতে স্বর্গ দেখাইতে পারি। মহারাজ! এই পাপাত্মা তোমার সাক্ষাতে আমার গ্লানি করিতেছিল, তুমিও মহারাজ! ধূর্ত্তের তোষামোদের দাস! তুমিও তাহাতে সায় দিতেছিলে। কিন্তু দেখ দেখি রাজা! এখন কি হইল? জিজ্ঞাসা কর, এই পাপিষ্ঠ পামর দস্যুকে জিজ্ঞাসা কর, অস্বীকার করিতে সাহস থাকে, অস্বীকার করুক। রাণীকে জিজ্ঞাসা কর, ইনিই বা কি উত্তর করেন। আমি তখন অন্ধ ছিলাম, এখন ত আর অন্ধ নই। রাজা!—রাজা রঘুবর রাও! তোমার উজ্জ্বল কুল কলঙ্কিত! তুমি কাহাকে বিবাহ করিয়াছ? তোমার

গুরুদেব কোন নরকে স্থান না পাইয়া তোমার এই পবিত্র রাজপুরীকে নরকপুরী করিয়াছে! এখনও তুমি জাননা রাজা, কাহার সম্মুখে বসিয়া রহিয়াছ। হা ভাগ্য! তুমি কেন নিরুত্তর। তুমি কি এই পাপাত্মাকে ভয় কর? আচ্ছা! থাক তুমি! রাণী মহালক্ষ্মি! তোমার কি লজ্জা হইতেছে? মহালক্ষ্মি! রাণী হইয়া তুমি বুঝি মহালক্ষ্মী নাম ধারণ করিয়াছ? তোমার নাম কি স্বৈরিণি। আমার মুখে আবরণ দিতে পারিবে না;—তুমি কুলটা; তোমার কন্যা কোথায়? সেই গোপনীয় সূতিকাগৃহে তুমি—তুমি, কিম্বা তোমার ধাত্রী,—ঠিক মনে হয় না, আমাকে কহিয়াছিলে, কিম্বা কহিয়াছিল, লজ্জাকন্যা লইয়া যাও। সে কথা আমার মনে আছে, সে কথা আমার মনে ছিল। রাণী মহালক্ষ্মি। তুমি এখনও স্থির হইয়া বসিয়া রহিয়াছ; কিন্তু আমি যে স্থির হইতে পারিতেছি না।—গুরুদেব। তুমি সাধুপুরুষ! তুমি লোকের মন্ত্রদাতা গুরু,—সর্ব্ব লোকের পরিত্রাণের কর্ত্তা! তুমি কুলকুমারীর সতীত্বনাশক। তোমার মত সাধুপুরুষ এ সংসারে আর কজন আছেন? চক্ষু ঢাকা দিলে কি হইবে? মানুষের কাছে চক্ষু ঢাকা দাও, কিন্তু সেই সর্ব্বচক্ষু বিশ্বপতি, তাঁহার কাছে কি তোমার চক্ষু ঢাকা থাকিবে? স্বীকার কর,—পাপকর্ম্ম স্বীকার কর। রাজার গুরু তুমি, আমি তোমাকে রাজার সম্মুখে পদাঘাত করিতে পারিতেছি না, কিন্তু স্বীকার কর! তোমার ঔরসে কুমারীগর্ভের সেই কুমারী এখন কোথায়?"

"মহারাজ! আর তোমার মহারাণীকে মহারাণী বলিতে ইচ্ছা করে না। মহালক্ষ্মী মহারাণি! এতক্ষণ সম্ভ্রম দিয়া আসিলাম, এতক্ষণ মর্য্যাদা দিয়া আসিলাম, আর তোকে আমি মহারাণী বলিয়া মহারাণী নামে কলঙ্ক দিতে পারিব না। তোর সেই কুমারী কন্যা কোথায়? জানিস্।—পাপিষ্ঠা! দুশ্চারিণি! রাজরাণি! তুই জানিস্! সে কন্যা আমার কাছে কত দিন ছিল? লোকে জানিত, আমারি কন্যা। কন্যাও জানিত, আমিই তাহার পিতা; কিন্তু শুদ্ধ কেবল সহস্র মুদ্রার অনুরোধ। আমি তোরে বেশ জানি। রাজা রঘুবর রাও গণ্ডমূর্খ। রাণী বলিয়া তোরে পরিগ্রহ করিয়াছেন। উঠেন, বসেন, বাঁচেন, মরেন, তোর কথায়। দেশে যদি এমন রাজা না থাকিবে, তবে ভারতবর্ষের এমন দুর্গতি হইবে কেন? হিন্দু রাজা ত গিয়াইছিল,—

তুই সামান্য স্ত্রীলোক, তোর কাছে অধিক কথা আর কি বলিব, এই রাজা রঘুবর রাও সূর্য্যবংশের সন্তান। পৃথিবী কেন যে ইহাঁকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন, মাটীর পৃথিবীই তাহা বলিতে পারেন। রাণি! এখনও তোকে আমি বলি রাণী। তোর কুমারী অবস্থার সেই কুমারী কন্যা এখন কোথায়? গুরুদেব! কথা কও না কেন? চক্ষু ঢাকিয়া বসিয়া রহিলে কেন? রাজার সঙ্গে কথা কও না কেন? ধিক্! ধিক্!! ধিক্!!! সূর্য্যবংশে ধিক্! চন্দ্রবংশে ধিক্! যদি কিছু বংশমহিমা থাকে, রামচন্দ্রের সঙ্গে,— রাজা যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে সে মহিমা অগাধ সাগরে ডুবিয়াছে। রাণি! তুমি ত সকল কথাই জান, বল দেখি তোমার সেই কুমারী কন্যা এখন কোথায়? আমাকে দিয়াছিলে, আমি পালন করিয়াছিলাম। কিন্তু এখন কোথায় গেল? জানিতেছি, তোমার অপেক্ষা আমার শোক বেশী। রাণি! যে হও তুমি, তবু এখন রাণী। আচ্ছা রাণি! মনে পড়ে, মেয়েটার নাম কি? তোমার মনে পড়িবে না, মনে পড়িলেও তুমি এখন ফুটিবে না, কেন না, তুমি এখন রাজরাণী। আমি আজ সকল কথা বলিব। মেয়েটীর তিন নাম। এক নাম কীর্ত্তি। এক নাম মিহিরমোহিনী। আর একটী নাম আছে, তাহা আমি এখন বলিব না। সময়ে প্রকাশ হইবে।”

স্বর্ণভূষণ অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। রাজা যেন নূতন পাগলের মত উচ্চ-হাস্য করিয়া কপালে বক্ষে করাঘাত করিতে লাগিলেন।

“স্থির হও রাজা, স্থির হও। সকলে অস্থির হইলে আমি কথা কহিব কিরূপে? আর কেবল আমার দুটী কথা আছে। তোমার গুরুদেব সম্মুখে, সাধুপুরুষ অমায়িক ভাব, পবিত্রাণের কর্ত্তা, দুষ্ট লোককে জব্দ করিবার যন্ত্র, এমন গুরু নিকটে থাকিতে তোমারে অবসন্ন হইতে হয়, এ বড় আশ্চর্য্য কথা রাজা।”

“রও রও। স্বর্ণভূষণ অচেতন। ইহাকে আগে আমি জ্ঞান দান করি, তাহার পর শেষের কথা বলিব।” পিসীমা এতক্ষণ চুপ্ করিয়া ছিলেন; শেষের কথা শুনিয়া করুণবচনে কহিলেন, আমার কাছে ত ঔষধ আছে। যে ঔষধে আমি ভাল হইয়াছি, সেই ঔষধে স্বর্ণভূষণের মূর্চ্ছা ভাল হইবে। অঞ্চলে বাঁধা আছে তোমরা লইয়া স্বর্ণভূষণের নাকের কাছে ধর।”

আর কে ধরিবে? রাজা কাঁপিতেছেন, রাণী কাঁপিতেছেন, গুরু কাঁপিতেছেন, নিষ্কম্প কেবল চতুর্ভুজ আর পিসীমা। ইহাই ও ঠিক। পিসীমা নিজেই অঞ্চল হইতে ঔষধ খুলিয়া স্বর্ণভূষণের নাকের কাছে ধরিলেন। মূর্চ্ছা সরিয়া গেল। রাজপুত্র উঠিয়া বসিলেন। স্নিগ্ধকর খাদ্যসামগ্রী মুখের কাছে ধরিয়া দিয়া পিসীমা কহিলেন, "খাও বাছা, খাও! কেন যাদু অমন কর?"

"মিহিরমোহিনী।"

"কেন যাদু! ও নাম এখন তোমার মুখে কেন?"

"কে জিজ্ঞাসা করিতেছে?"

"তোমার পিসীমা।"

"পিসীমা! মিহিরমোহিনীই কি সেই কীর্ত্তি?—মা! পিসীমা! তারা দুজনেই কি এক?"

"চুপ্ কর বাছা, চুপ্ কর। প্রলাপ বকিতে নাই! মিহিরমোহিনী তোমার ভগ্নী হয়, তোমার জননীর গর্ভের কন্যা।"

স্বর্গভূষণ আবার আছাড় খাইয়া পড়িলেন;—সংজ্ঞা নাই। আবার ঔষধের আঘ্রাণ দিয়া পিসীমা তাঁহার চৈতন্য আনিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্বর্গভূষণ! মিহিরমোহিনীর সঙ্গে তোমার কিরূপে দেখা হইয়াছিল?"

স্বর্গভূষণ উত্তর করিলেন না।

চতুর্ভুজ কহিলেন, "সব কথা আমি জানি। দেবী যশেশ্বরি! তুমি একটু শান্ত হইয়া থাক। তোমাকে সকলে কুমারী বলিয়া জানে, কিন্তু তুমি যে কি, তোমার মাননীয় সহোদর রাজা রঘুবর রাও পর্য্যন্ত তোমার চরিত্রের সত্য বৃত্তান্ত জানেন না। এত দিন যাহা অপ্রকাশ ছিল, আজ তাহা প্রকাশ পাইবে। আমাকে দেখিলে গুরুদেবের রাগ হয়, গুরুদেব আমাকে চতুর্ভুজলোকে পাঠাইতে পারেন। ঠাণ্ডা কথা! আমাকে দেখিলে রাজার রাগ হয়, ইচ্ছা করিলে ইনি আমাকে জব্দ করিতে পারেন, কেন জান দেবী যশেশ্বরি! আমি দরিদ্র; রাজার অতুল ঐশ্বর্য্য! সংসারে যাঁহাদের ঐশ্বর্য্য থাকে, লোকের কাছে তাঁহারাই সকল প্রকারে সম্ভ্রম প্রাপ্ত হন। যাহারা দরিদ্র, তাহাদের মান কোথাও নাই।"

যশেশ্বরী কহিলেন, "চতুর্ভুজ! অমন কথা কেন বল! আমার এই ভাইটী একটী দেবতা।"

"তাহা আমি জানি, কিন্তু সেই দেবতা আমাকে নষ্ট করিতে ইচ্ছা করেন।—স্বর্গভূষণের কি জ্ঞান হইয়াছে?"

"হইয়াছে।"

"তবে পরিচয় দাও।"

যশেশ্বরী কহিলেন, "কাহার কাছে কাহার পরিচয় দিব?"

"রাজার কাছে পরিচয় দাও।"

"লজ্জা করে।"

"বিপদসময়ে লজ্জাকে একটু দূরে রাখিতে হয়।"

রাজা এই প্রশ্নোত্তরের নিগূঢ় ভাব কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। মহা-সন্দেহে, মহাবিস্ময়ে, দারুণ লজ্জায় তিনি আর কাহারও দিকে চাহিতে পারিতেছেন না। এই অবসরে পণ্ডিত অশ্বানন্দস্বামী তদ্রূপ নতশিরে থাকিয়াই ক্ষীণমৃদুস্বরে রাজাকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, "আমার অত্যন্ত অসুখ করিতেছে।"—অশ্বানন্দের কথার উত্তর না দিয়া ঘৃণাব্যঞ্জকস্বরে রাণীকে সম্বোধনপূর্ব্বক রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাণি! তোমারও কি অসুখ করিতেছে?"

লজ্জা পাইয়া রাণী মস্তক নত করিলেন। ইচ্ছা হইল, গৃহ হইতে বাহির হইয়া যান, গুরুদেবেরও,—স্বর্গভূষণেরও সেইরূপ আকিঞ্চন; কিন্তু নিরুপায়। কাহারই বাহির হইবার উপায় নাই।

আড়ে আড়ে সকলের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া চতুর্ভুজ কহিলেন, "মহারাজ! আমি সত্য কহিতেছি, কি মিথ্যা কহিতেছি, তাহা পরীক্ষা করা তোমার কর্ত্তব্য। রাণী স্ত্রীলোক, তিনি যদি লজ্জায় কিছু বলিতে না পারেন,—তাহাই সম্ভব,—কিন্তু গুরুদেব সাধুপুরুষ, সত্যবাদী। লজ্জার অনুরোধে তিনি কখনই নিরুত্তর থাকিবেন না। গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করুন, যাহা যাহা আমি কহিলাম, তাহা সত্য কি মিথ্যা। আমার কথা মিথ্যা হইতে পারে,—আমার কথায় অবিশ্বাস জন্মিতে পারে, কিন্তু জীবের পরিত্রাণের কর্ত্তা সাধুপুরুষের কথা কখনই মিথ্যা হইবে না। সাধুপুরুষের

বাক্যে কেহই অবিশ্বাস করিবেন না। বিশেষ, মহারাজের জীবাত্মার ত্রাণকর্ত্তা পরমদেবতাই ইনি। ইহাঁর কথায় তোমার কখনই অবিশ্বাস হইবে না। জিজ্ঞাসা কর! আমি যদি মিথ্যা বলিয়া থাকি, ইহাঁর যদি সাহস থাকে, খণ্ডন করুন।”

রাজা কিয়ৎক্ষণ ইতস্তত করিয়া গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “উত্তর কর! এই কবিরাজমহাশয় যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তাহার উত্তর কর। আমার পদের নখাগ্র হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত জ্বলিয়া যাইতেছে, কে যেন আমার সর্ব্ব শরীরে আগুন ধরাইয়া দিতেছে!”

গুরুদেব উত্তর করিতে পারিলেন না। রাজা দুই তিনবার জিজ্ঞাসা করিলেন, একটীও উত্তর নাই। মস্তক যতদূর মাটীর দিকে নীচু হইয়াছিল, তদপেক্ষা আরও নীচু হইল। নেত্রপুট সমভাবে করপুটে আচ্ছাদিত।

“কি গো স্বামীঠাকুর! অসময়ে মৌনব্রত কেন? রাজার সঙ্গে তৎক্ষণ অত কথা কহিতেছিলে, তোমার রসনানদীতে যেন ভাদ্রমাসের বন্যা আসিয়াছিল, এখন একেবারে ভাঁটা পড়িয়া গেল কেন? কথা কও। রাজার প্রশ্নে উত্তর কর। আমার কথার প্রতিধ্বনি কর। গাঁউটুলি করিয়া যদি গোপন করিবার চেষ্টা কর, নিস্তার পাইবে না। নগরে আমি ঢাক বাজাইয়া দিব। দেশে বিদেশে, তুমি অনেক বড় বড় রাজার গুরু, সমস্ত শিষ্যের দ্বারে দ্বারে ঘোষণাপত্র লট্‌কাইয়া দিয়া দিব। যদি প্রয়োজন হয়, হাকিমের কর্ণেও তোমার ধর্ম্মের কথা তুলিব। এখনও চারিপ্রাচীরের মধ্যে লুকাইয়া আছে, এখনও সেই গুহ্য-ঘৃণিত বৃত্তান্ত এক্কারশ কর্ণে প্রবেশ করে নাই, এখনও সরল হইয়া ধর্ম্মকথা স্বীকার কর।”

অশ্বানন্দের ভয় হইল। পাপীলোকের মন গাছের পাতার শব্দ পাইয়াও ভয় পায়। এখানে স্পষ্ট স্পষ্ট রহস্যভেদ!—যোগীরা দেহতন্ত্রে যেরূপে ষট্‌চক্র ভেদ করেন, ইহা তাহা অপেক্ষাও যেন বহুগুণে অধিক। সংসার-চক্রে বহু চক্রভেদ! অবনতমস্তকে অনেকক্ষণ কি চিন্তা করিয়া অশ্বানন্দ কহিলেন, “চতুর্ভুজ মহাশয়! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।”

“আমাকে কি চিনিতে পারিলে?—এই বলিতেছিলে, কস্মিন্‌কালেও দেখ নাই, জন্মেও না, এতক্ষণে,—আচ্ছা, কি ক্ষমা করিব, স্পষ্ট করিয়া বল।

ক্ষমা করিতে আমি ভাল জানি। ছাব্বিশ বৎসরকাল আমি ক্ষমা করিয়া আসিয়াছি, এখনও তোমার না কি বিষদন্ত ভগ্ন হয় নাই, সেই নিমিত্তই এই রাজপ্রাসাদে সেই ছাব্বিশ বৎসর পূর্ব্বের রহস্যপ্রকাশ। আমাকে তুমি শত্রু বিবেচনা কর, আমাকে দুষ্টলোক বলিয়া রাজার কর্ণে মন্ত্র প্রদান কর, আমাকে নষ্ট করিবার পরামর্শ কর; পরামর্শ দাও, আমাকে জব্দ করিবার কৌশল অবিষ্কার কর, তথাপি আমি ক্ষমা করিতে জানি। একটী সাধারণ প্রচলিত কথা আছে, "যে সয় সে রয়।" তুমি এখন স্পষ্ট স্পষ্ট স্বীকার কর, কোন্ অপরাধের ক্ষমা করিতে হইবে। স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত কর, অবশ্যই আমি ক্ষমা করিব।"

রাজা রঘুবর রাও বিস্মিতনয়নে চতুর্ভুজের বদন নিরীক্ষণ করিয়া প্রশান্তস্বরে কহিলেন, "সাধু! সাধু! সাধু তুমি চতুর্ভুজ! এত বড় পাপীকে তুমি ক্ষমা করিতে পার! আজ আমার চৈতন্য হইল।"—দুটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া রাজা কহিলেন, "আজ আমার চৈতন্য হইল। এমন মহাপাতকীকে আমি গুরু বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলাম! অশ্বানন্দস্বামি! তুমি দাঁড়াও! আমি তোমার শিষ্য, সত্য, কিন্তু আমি আদেশ করিতেছি, তুমি দাঁড়াও! চক্ষের আবরণ খুলিয়া ফেল। ছলনা করিয়া মুখ নীচু করিয়াছ, আমার দিকে স্পষ্ট করিয়া চাও, ভণ্ডলোকের ভণ্ডতা আমি বিলক্ষণ বুঝিতে পারি। সমস্তই সত্য,—চতুর্ভুজ যাহা বলিতেছেন, সমস্তই সত্য। যদি সত্য না হইবে, তাহা হইলে তুমি অমন করিয়া মাটীর সঙ্গে মিশাইতে যাইবে কেন? তোমার দণ্ড আমার হস্তে ছিল, কিন্তু দীক্ষা হইয়াছে। আমি তোমার অঙ্গস্পর্শ করিব না। কিন্তু সত্যকথা বলিয়া যাও রাজকুলের কলঙ্ক যেন এই গৃহের বাহিরে যাইতে না পায়। অসত্যের আবরণে যদি তুমি সেই সকল কথা গোপন করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে আমার এই পরমবন্ধু চতুর্ভুজলাল মুখেও যাহা বলিলেন, কাজেও তাহা করিবেন। সম্ভ্রমের যদি বিন্দুমাত্র ভয় থাকে, সত্যকথা বলিয়া যাও।"

"অত কথা আমি বলিতে পারিব না মহারাজ!"—ভয়ে লজ্জায় আরও অধোমুখ হইয়া মহাঝটিকা-বিকম্পিত দীর্ঘ বৃক্ষের ন্যায় কম্পিত হইতে হইতে অশ্বানন্দ কহিলেন, "অত কথা আমি বলিতে পারিব না মহারাজ!

দয়া করিয়া আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। চারিদিকে অন্ধকার দেখিতেছি। রক্ষাকর্ত্তা কেহই নাই; আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।"

"সে কি কথা ঠাকুর! আমি তোমাকে গুরু বলিয়াছি, তুমি আমাকে মন্ত্রশিষ্য করিয়াছ, আমার কাছে ক্ষমার কথা তুলিও না। চতুর্ভুজের কাছে ক্ষমা চাও। পাপ স্বীকার কর, প্রায়শ্চিত্ত হউক, তাহার পর আমার মহাভ্রমের জন্য আমি অনুতাপ করিব।"

রাজার সাহসে আরও সাহস প্রাপ্ত হইয়া চতুর্ভুজ কহিলেন, "বুঝিয়াছ স্বামীজি! পাপ স্বীকার করিতে হইবে। ভাল করিয়া বিবেচনা কর। আপনা হইতে যদি তুমি সেই সকল পূর্ব্বপাপের কথা,—পূর্ব্ব অপেক্ষা আরও যদি কিছু পূর্ব্ব থাকে,—পূর্ব্বের পর আরো কিছু যদি পরের কথা থাকে, পূর্ব্বাপর একত্র করিয়া স্পষ্ট স্পষ্ট স্বীকার কর; কোন ভয় নাই। আমি তোমার অনিষ্ট করিব না। দশের নিকটে আমি তোমাকে নিন্দা-নরকে ডুবাইব না। সত্য কথা বল, ক্ষমা আছে।"

"কি কি বলিতে হইবে, জিজ্ঞাসা কর।"

হাস্য করিয়া চতুর্ভুজ কহিলেন, "এই কথাটী আরও ভাল। আচ্ছা! প্রথম কথা, তুমি কোন্ অবিবাহিতা অবলা কুমারীকন্যার কুমারীব্রত ভঙ্গ করিয়াছ কি না?"

অশ্বের নিশ্বাস অপেক্ষাও উচ্চ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া অগ্নানন্দ নিস্তব্ধ।

"কাহাকে তবে আমি ক্ষমা করিব? অঙ্গীকার করিয়া,—শুন—অশ্বা,—অঙ্গীকার করিয়া যে ব্যক্তি প্রথম প্রশ্নে মৌন হয়, কোন্ আশুপ্রত্যয়ী তাহাকে বিশ্বাস করিতে পারে? দেখিতেছি, তোমার পাপ আমি আর অপ্রকাশ রাখিতে পারিলাম না!"

রাজা মাথা হেঁট করিয়াছেন, রাণী মাথা হেঁটে করিয়াছেন। গালে হাত দিয়া স্বর্গভূষণ অন্য দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। পিসীমা তেজস্বিনী। চতুর্ভুজ পুনর্ব্বার কহিলেন, "তুমি কি আমার কথার উত্তর করিবে না? সম্ভ্রমের অপেক্ষা তোমার মুখের বাক্যের মূল্য কি এতই অধিক? পাপ স্বীকার করিবে, তাহাতে এত লজ্জা করিলে চলিবে কেন?"

"তবে আবার জিজ্ঞাসা কর।"

"আচ্ছা! তুমি কি কোন অবিবাহিতা কুলকুমারীর সতীত্বধর্ম্ম নষ্ট করিয়াছ?"

"মনের ভ্রমে।"

"আমি ভ্রমের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি না, তুমি বল, সেই অবলা কুলকন্যাকে কোন প্রলোভন দেখাইয়াছিলে কি না?"

"অনেক দিনের কথা, ঠিক্ স্মরণ হয় না, বোধ করি হয় ত কোনরূপ প্রলোভন দেখাইয়া থাকিব।"

"রাখ তোমার বোধ করি, রাখ তোমার হয় ত, রাখ তোমার থাকিব, আমি স্পষ্ট স্পষ্ট কথা চাই। কুমারী কন্যার কুমারীব্রত তুমি জ্ঞানপূর্ব্বক নষ্ট করিয়াছ কি না?"

"করিয়াছি। ভাবিয়া দেখিলাম, মনে পড়িল, করিয়াছি।"

"আচ্ছা! সেই কুমারী কি এই মহারাণী মহালক্ষ্মী?"

রাণীর দিকেও চাহিতে পারিতেছেন না, রাজার দিকে চাহিতেও সাহস হইতেছে না, যিনি প্রশ্ন করিতেছেন, তাঁহার দিকে চাহিবার ত কথাই নাই, কোন দিকেই চাহিতে পারিতেছেন না। বিমর্ষে অশ্বানন্দ অধোমুখে নিস্তব্ধ।

চতুর্ভুজ কহিলেন, "চুপ করিয়া থাকিলে হইবে না। সূর্য্যদেব অস্ত যাইতেছেন, করালমূর্ত্তি বিকাশ করিয়া রজনীদেবী দুরন্ত মানবকুলকে গ্রাস করিতে আসিতেছেন, এখন চুপ্ করিয়া থাকিলে, অন্ধকার-রাক্ষস, অন্ধকার ব্যাঘ্র তোমার ঐ পাপদেহের উপর লাফাইয়া পড়িবে।"

কাঁপিয়া কাঁপিয়া অশ্বানন্দ কহিল, "কি বলিতে হইবে বল।"

"সেই অবলা অনূঢ়া কুলকুমারী কি এই মহারাণী মহালক্ষ্মী দেবী?"

"ঐ নাম বটে।"

হাস্য করিয়া চতুর্ভুজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "যদি ঐ নাম বটে, তবে কেন মানীলোকের কুলমান অগ্রাহ্য করিয়া তেমন দুষ্কর্ম্মে তোমার মতি হইয়াছিল?"

"তখন ও নাম ছিল না।"

মৃদুহাস্য করিয়া চতুর্ভুজ বলিলেন, "কি নামে তুমি সতীর সতীত্ব নষ্ট

করিয়াছ? কি নামে তুমি কুমারীর কুমারীব্রত ধ্বংস করিয়াছ, তাহা কি তোমার মনে হয়?"

"লক্ষ্মীয়া।"

"এখন সেই লক্ষ্মীয়াই কি এই মহারাণী মহালক্ষ্মী?"

"তাহাই ত বোধ হয়।"

"বোধ হয় আমি বুঝিতে পারি না, পরিষ্কার প্রশ্নের পরিষ্কার উত্তর চাই। কুমারী লক্ষ্মীয়াই কি এই রাজপ্রাসাদের মহারাণী মহালক্ষ্মী?"

মাথা হেঁট করিয়া দুরাচার অশ্বানন্দ উত্তর করিল, "হাঁ, তাই।"

পুনরায় হাস্য করিয়া চতুর্ভুজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "নাম স্বতন্ত্র হইলে বুঝি কুমারীহরণে পাপ হয় না?—আচ্ছা, বেশ গুরু!—আচ্ছা,—অনূঢ়া অবস্থায় লক্ষ্মীয়া যখন গর্ভবতী, যখন তাহার প্রসবকাল উপস্থিত, অনেক রাত্রে তখন কি তুমি আমাকে ডাকিতে গিয়াছিলে?"

"গিয়াছিলাম।"

"সহস্র মুদ্রা পুরস্কার অঙ্গীকার করিয়াছিলে?"

"করিয়াছিলাম।"

"আমার চক্ষে রুমাল বাঁধিয়া যখন তুমি নির্জ্জন নিকেতনে লইয়া যাও, আমি সেখানে যাহা দেখি, যাহা যাহা করি, সে সকল কথা কি তোমার মনে আছে?"

"আছে।"

"একটী ফুট্‌ফুটে মেয়ে সেই কুমারীর গর্ভ হইতে প্রসূত হইয়াছিল, তাহা তোমার মনে পড়ে?"

"পড়ে।"

"ধাত্রী মনে পড়ে?—লক্ষ্মীয়া কিম্বা সেই ধাত্রী, সদ্যপ্রসূতা কন্যাটীকে আমার হস্তে সমর্পণ করিতে চাহিয়াছিল, আমি পাঠাইয়া দিতে বলিয়াছিলাম, উপযুক্ত সময়ে ধাত্রী সেই কন্যাকে আমার গৃহে রাখিয়া আসিয়াছিল, তাহা তোমার মনে পড়ে?"

"পড়ে।"

"আচ্ছা! লজ্জাকন্যাটী দিন দিন আমার বাড়ীতে বড় হইতেছিল।

মধ্যে মধ্যে তুমি দেখিতে যাইতে, মধ্যে মধ্যে লক্ষ্মীয়া দেখিতে যাইত, তাহা তোমার মনে আছে?—কি বল রাণী মহালক্ষ্মি! সে সকল কথা কি তুমি ভুলিয়া গিয়াছ?"

রাণী কথা কহিলেন না। মুখ যেন রক্তশূন্য হইয়া পাংশুবর্ণ ধারণ করিল। অশ্বানন্দ কহিলেন, "আমার মনে আছে।"

রাজার দিকে মুখ ফিরাইয়া নেত্রভঙ্গী করিতে করিতে চতুর্ভুজলাল কহিলেন, "মহারাজ! তোমার গুরুদেবটী বেশ চট্‌পটে। যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাহাই চট্‌পট করিয়া বলিতেছেন।—বাঃ! এমন গুরু যদি আমি একটী পাই, আদরে যত্ন করিয়া লৌহপিঞ্জরে পুষিয়া রাখি। আচ্ছা! স্বামীঠাকুর! ঐ এক লক্ষ্মীয়া ছাড়া তুমি আর কোন কুলস্ত্রীর কুলধর্ম্ম বিনাশ করিয়াছ কি না, মনে করিতে পার?"

অশ্বানন্দস্বামী ঠিক যেন বজ্রাহত হইলেন। অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন না, দুষ্টলোকে দুষ্ট কথা শুনিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়ে না, কিন্তু গর্জ্জন করিয়া চতুর্ভুজ কহিলেন, "সত্য বল, আকাশের বজ্র আসিতেছে, বজ্রধারী ইন্দ্রদেব আসিতেছেন, দেবতার উপকারে স্বেচ্ছাবশে প্রাণ ত্যাগ করিয়া দধীচি-মুনি অস্থি রাখিয়া যান, সেই অস্থিতে দেবরাজের বজ্র নির্ম্মাণ। এখনও সাবধান হও! এখনও শেষকথা বল! শচীপতি আসিতেছেন, চাহিয়া দেখ, দেবতারা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে পারেন, যেখানে সত্য, সেই খানেই দেবতা, যেখানে পাপ, সেই খানেই নরক। ঐ দেখ, গৃহের চতুর্দ্দিক আলোকময় করিয়া শূন্যপথে কে একজন আসিতেছেন।—

"জীমূতবাহন বজ্রী, ভীম বজ্র করে!"

"কৈ!—কৈ!—কোথায়?—কে আসিতেছে?—কৈ?—ইন্দ্র?—বজ্র? জীমূত? কৈ?—কেন?—আমি তাহাদের কি করিয়াছি?"—নাসিকার নিশ্বাস মুখে আনিয়া অধরোষ্ঠ বিকাশ করিয়া যুগল হস্ত বিস্তারে অশ্বানন্দ কহিল, "আমার পাপ! উঃ! কোথায় আমি? মহারাজ! মহারাজ!"—বলিতে বলিতে বিদ্যুতাহত লোকের মত সেই লোকটা যেন ঘুরিতে ঘুরিতে ঢলিয়া পড়িল।

"মূর্চ্ছা! মূর্চ্ছা! মূর্চ্ছা!—পাপী লোকের মূর্চ্ছা? ধূর্ত্তলোকের ধূর্ত্ততা,

দুষ্টলোকের দুষ্টতা —সুচতুর শঠের চাতুরী, দয়া করিতে নাই। দেখি! দেখি! মূর্চ্ছাভঙ্গচূর্ণ?"

"আমি প্রস্তুত আছি। পাপীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি প্রকারে হয়, শান্তভাবে বসিয়া বসিয়া তাহা আমি দেখিতেছি।"

"দেখিলে হইবে না, ইহাকে তুলিতে হইবে। ইহার পেটে কত পাপ লুকাইয়া রহিয়াছে, দেখিতে হইবে। ঔষধ শুঁকাইয়া দও। ছলের মূর্চ্ছা ভাঙ্গিয়া ফেল। বদ্‌মাস লোকের শাস্তি পরলোকে না হইয়া ইহলোকে হইলেই ভাল হয়। তাহাই আমি দেখিব।"

পিসীমা আপনার বসনাঞ্চল হইতে মূর্চ্ছাচূর্ণ বাহির করিয়া অশ্বানন্দের নাসিকার কাছে ধরিলেন, অশ্বানন্দের জ্ঞান হইল। শুইয়া শুইয়া কহিল, "তোমরা আমাকে কি জিজ্ঞাসা করিতেছিলে?"

আরক্ত চক্ষে চতুর্ভুজ কহিলেন, "অত জোরে জোরে কথা কহিও না। রাজার গুরু বলিয়া আমি তোমাকে ক্ষমা করিব না। বুকে পা দিয়া গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিব। বল্ পাপিষ্ঠ, বল্, কত পাপ করিয়াছিস্? কত লোকের সর্ব্বনাশ করিয়াছিস্? কত সতীর সতীত্ব নাশ করিয়াছিস্?"

"অনেক!—অনেক!!—অনেক!!!"—একটু উঁচু হইয়া বসিয়া অশ্বানন্দ কহিল, "আমি অনেক পাপ করিয়াছি, যাহা তোমরা বলিতেছ, সব সত্য। আমি অনেক লোকের অর্থ অপহরণ করিয়াছি! অনেক সতীর সতীত্ব হরণ করিয়াছি! মিথ্যাসাক্ষী হইয়া অনেক সত্য হত্যাকারীর সহায় হইয়াছি। আপনার কন্যাকে বিষ খাওয়াইয়া মারিয়াছি! অনেক পাপ করিয়াছি! চতুর্ভুজ! ভাই! আর ত আমার নিশ্বাস পড়ে না! আমি তোমার অনেক উপকার করিয়াছিলাম, তাহার বুঝি তুমি এই প্রতিফল দিলে?"

"না,—প্রতিফল দিলাম না, আপনার পাপের ফল তুমি আপনিই ভোগ করিতেছ, আমি কি করিব?"

"চতুর্ভুজ! ভাই! আমি ত সকল পাপ স্বীকার করিলাম, তবে কেন আমাকে আর আটক করিয়া রাখ? সকল পাপেই আমি পাপী; পরকালে আমার পরিত্রাণ নাই; কিন্তু ইহকালে কেন তুমি আর আমাকে অধিক

দগ্ধ করিবে? বন্ধন খুলিয়া দাও, বাহিরে গিয়া নিশ্বাস ফেলি;—একটু বাতাস খাই!"

"আর একটু থাক। আকাশের বাতাস কাহাকেও বঞ্চনা করে না; আর একটু থাক। আমি তোমাদের শেষকথা পর্য্যন্ত শুনিয়া এস্থান হইতে প্রস্থান করিব। তোমার ক্লেশ হইতেছে? আচ্ছা! একটু স্থির হইয়া থাক, আমি আনন্দাদেবীর সঙ্গে দুটা চারটা কথা কই।"

গৃহ ক্ষণকাল নিস্তব্ধ।

রাজা রঘুবর রাও বিবর্ণবদনে বিস্ফারিতনয়নে মৃত্তিকা দর্শন করিতে-ছিলেন। রাণী মহালক্ষ্মী;—কে জানে কি নাম,—তথাপি রাজবাড়ীতে মহারাণী মহালক্ষ্মী;—নিতান্ত ম্রিয়মাণা হইয়া তিনি আকাশপাতাল ভাবিতেছেন। মাটী তখন যদি ফাটিয়া দুই ফাঁক হইয়া যাইত, তাহা হইলে গুরুদেব হয় ত প্রবেশ করিতে পারিতেন। কিন্তু পাপী গুরুদেব মাটীতে মিশাইতে পারিলেন না। সীতাসতী যেমন সতীত্বের পরীক্ষা দিবার জন্য জ্বলন্ত অনলে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সতীত্বপ্রভাতে সে অনলপ্রভা যেমন নিষ্প্রভ হইয়াছিল, সকলের পক্ষে তেমন হয় না। লজ্জাবতী মহালক্ষ্মী মাটীতে মিশাইতে পারিলেন না।—ত্রেতাযুগের শেষে সীতাদেবীকে যেমন ধরণীদেবী কোলে করিয়া লইয়াছিলেন, এই অসতী মহালক্ষ্মী তেমন সস্নেহভাবে ধরণীজননীর কোলে স্থান পাইলেন না। মাটী ফাটিল না। মহালক্ষ্মী প্রবেশ করিতে পারিলেন না।

চতুর্ভুজ কহিলেন, "গুরুদেবকে আর অধিক কথা জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন হইতেছে না। জিজ্ঞাসার অনেক আছে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে এই পর্য্যন্তই যথেষ্ট। রাণী একবার সায় দিলেই ভাল হয়।"

রাণী ত এতক্ষণ মাটী হইতে চাহিয়াছিলেন, এখনও যেন মাটী হইয়া গেলেন। মুখে কে যেন কালী মাখাইয়া দিল। ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে আসন হইতে উঠিয়া কুণ্ঠিতভাবে তিনি তারি পদ পশ্চাতে গমন করিলেন। চতুর্ভুজ কহিলেন, 'মাহবজা হীরার জননি! আর তোমাকে অত লজ্জা দেখাইতে হইবে না। সায় দিতে বলিতেছিলাম, মুখে আর সায় দিবার আবশ্যক নাই। লজ্জাতেই সায় দেওয়া হইয়াছে। মৌনেই

সম্মতিলক্ষণ জানা যায়। যাহার তত তেজ, তত অহঙ্কার, তত দর্প, সে যখন মৌনবতী, তখন আর পাপ স্বীকারের বাকী কি?"

সকলেই নীরব। চতুর্ভুজ কহিলেন, "মহারাজ। তোমার মহিষীর পরিচয় প্রাপ্ত হইলে, গুরুদেবের পরিচয় প্রাপ্ত হইলে, এখন আর একটি নিগূঢ় পরিচয় প্রদান করিলেই আমার আজিকার পাঠ সমাপ্ত হয়।" রাজাকে এই পর্য্যন্ত বলিয়া পিসীমাকে সম্বোধনপূর্ব্বক প্রশান্ত গম্ভীরবদনে তিনি কহিলেন, "দেবী যশেশ্বরি! আর কেন অপ্রকাশ?—তত্ত্ব প্রকাশের উপযুক্ত অবসর এই। কুচক্রী লোকেরা যেরূপ কুচক্র সৃজন করিয়াছে, তাহার বিষময় ফল ফলিতে না ফলিতে সত্যতত্ত্বটী প্রকাশ করাই ভাল।"

দেবী যশেশ্বরী পুনর্ব্বার যেন কম্পিত হইলেন। রাজার দিকে চাহিয়া আবার চতুর্ভুজের দিকে মুখ ফিরাইয়া সম্মতিসূচক গ্রীবাভঙ্গী করিলেন।

রাজাকে সম্বোধন করিয়া চতুর্ভুজলাল কহিলেন, "মহারাজ! ঐ পণিত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তুমি অধৈর্য্য হইয়াছ, ধৈর্য্য ধারণ কর। এইবারে একটী ভাল কথা শ্রবণ করিতে হইবে।—মহারাজা মহানন্দ বাহাদুর তোমার পরমবন্ধু। তুমি যৎকালে কিছুদিন কাশীধামে বাস করিয়াছিলে, যশেশ্বরী এই গৃহের অধীশ্বরী ছিলেন। তখন ইহাঁর বয়ঃক্রম অপূর্ণ ষোড়শ বৎসর। রাজা মহানন্দ বাহাদুরের প্রতি তোমার সমস্ত রাজকার্য্যের তত্ত্বাবধানের ভার ছিল। তিনি প্রায়ই এই প্রাসাদে উপস্থিত হইয়া স্বচক্ষে কর্ম্মচারিগণের সমস্ত কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। কিঙ্করকিঙ্করী অবধি উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত রাজাবাহাদুরের সদ্ব্যবহারে পরমসন্তুষ্ট। সকলেই তাঁহার অনুগত। রাজাবাহাদুর সস্নেহভাবে রাজকন্যার সহিত সর্ব্বদাই সাক্ষাৎ করিতেন। দেবী যশেশ্বরীও তাঁহাকে যথোচিত শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন। এই রকমে দুই তিন মাস যায়, একদিন সন্ধ্যার পর রাজকুমারী আপনার গৃহে বসিয়া আছেন, নিকটে একজন প্রিয় সহচরী বসিয়া মহাভারতের গল্প করিতেছে, দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর। দেবী যশেশ্বরী একমনে তাহা শ্রবণ করিতেছেন, মধ্যে মধ্যে এটী ভাল, ওটী ভাল না, এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিতেছেন, ইত্যবসরে একজন কিঙ্করী প্রবেশ করিয়া সংবাদ দিল, "মহারাজা মহানন্দ বাহাদুর।"

"সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া কুমার যশেশ্বরী দেবদ্বারদেশ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া মহারাজাকে অভ্যর্থনা করিলেন। রাজা প্রফুল্লবদনে গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিয়া একখানি কৌচের উপর বসিলেন। তাহার তিন হস্ত দূরে আর একখানি ক্ষুদ্রাসনে শ্রীমতী যশেশ্বরীদেবী।"

এই পর্য্যন্ত শ্রবণ করিয়া দেবী যশেশ্বরী সহসা সলজ্জভাবে আসন হইতে উঠিয়া রাজাকে কহিলেন, "মহারাজ! আবার আমার শরীর কেমন করিতেছে। দ্বার মুক্ত করিবার আদেশ করুন, আমি শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া বিশ্রাম করিব।"

কি এক অভাবনীয় সংশয়ে রাজা বদুবররাও শিহরিয়া উঠিলেন। মনে মনে ভাবিলেন, কি দুর্দ্দৈব! এইমাত্র এক বংশকলঙ্ক,—দুর্মোচনীয় কলঙ্ক, শ্রবণ করিলাম। না জানি, এই ক্ষেত্রে আবারই বা কি শুনিতে হয়! কেন আমি পৃথিবীতে আসিয়াছিলাম! পৃথিবীর পথ কণ্টকাকীর্ণ;—চতুর্দ্দিকেই বিপদ ঘেরা। পৃথিবীর নামই বিপদক্ষেত্র। আমার মত লোকে এ ক্ষেত্রে সুস্থির হইয়া থাকিতে পারে না।—ভয়ঙ্কর!!! ভয়ঙ্কর!!! যশেশ্বরীর বাক্যে তিনি উত্তর করিবার অগ্রে চতুর্ভুজ কহিলেন, "কেন দেবি! কেন তুমি শয়নকক্ষে প্রবেশ করিবে? অসুখ বোধ হইতেছে, এই স্থানেই শয়ন কর। যদি সত্য সত্য অসুখ হয়, আমি আরাম করিতে পারিব।"

গৃহের উত্তর দিকে প্রায় দ্বাদশহস্ত দূরে একটী শয্যা বিস্তৃত ছিল, সত্য সত্যই যশেশ্বরী উঠিয়া গিয়া সেই শয্যার উপর শয়ন করিলেন।

পুনর্ব্বার রাজাকে সম্বোধন করিয়া চতুর্ভুজ কহিলেন, "যশেশ্বরীদেবী মহারাজ মহানন্দ বাহাদুরকে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করেন, সন্ধ্যার পর মহারাজের এখানে কি প্রয়োজন?—রাজা উত্তর করিলেন, তোমার ভ্রাতার পত্র আসিয়াছে, কিঞ্চিৎপূর্ব্বে আমি সেই পত্র পাইয়াছি।"—

"আনন্দে কৌতূহলাক্রান্তা হইয়া যশেশ্বরী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, পত্রে তিনি কি লিখিয়াছেন?—রাজা কহিলেন, সঙ্গে করিয়া আনিয়াছি, তোমার সাক্ষাতেই পাঠ করিতেছি, শ্রবণ কর।—রাজা মহানন্দ বাহাদুর সেই পত্রখানি পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন।——"

"শ্রদ্ধাস্পদ

শ্রীযুক্ত মহারাজা মহানন্দরাও বাহাদুর

সহৃদয় চরিতেষু।

মিত্রবর,

বিশ্বেশ্বরধামে আমি ভাল আছি। শরীর যেরূপ অসুস্থ হইয়াছিল, তদপেক্ষা এক্ষণে অনেক সুস্থ বোধ হইতেছে।—অনেকগুলি মাননীয় বন্ধুবান্ধবের সহিত মিলন হইয়াছে। দিবসের মধ্যে অধিকাংশ সময় তাঁহাদের সহিত শাস্ত্রীয় কথালাপনে সুখে সংযাপিত হয়।—বিশুদ্ধ আমোদ লাভ হয়। চিকিৎসকমহাশয়েরা আমাকে আরও কিছু বেশী দিন এখানে অবস্থান করিবার পরামর্শ দিতেছেন। সুতরাং তাঁহাদের পরামর্শ অনুসারে আমাকে আরও কয়েক মাস এখানে থাকিতে হইবে। তোমরা কে কেমন আছ, তোমার বাটীর সকলে কেমন আছেন, আমার স্নেহময়ী ভগ্নী যশেশ্বরী কেমন আছেন, বিশেষ করিয়া লিখিও। তোমাদের শুভসংবাদেই আমার সন্তোষ। যশেশ্বরীকে আমার আশীর্ব্বাদ প্রদান করিও। যশেশ্বরী যেন আমার দীর্ঘকাল অদর্শনে কাতরা না হন, এ কথা বুঝাইয়া বলিও। মিত্র! তোমাকে অধিক লেখা বাহুল্য, যশেশ্বরীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার তোমার উপর সমর্পণ করিয়া আসিয়াছি। যাহাতে তাঁহার কোন অমঙ্গল না হয়, সর্ব্বদা সে দিকে দৃষ্টি রাখিও; সর্ব্বদা তত্ত্ব লইও। বিষয়কার্য্য যাহাতে সুচারুরূপে চলে, কর্ম্মচারীরা যাহাতে অসন্তুষ্ট না থাকে, সে পক্ষে মনোযোগ রাখিও। অন্নপূর্ণাবিশ্বেশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন।

অভিন্নহৃদয়

শ্রীরঘুবর রাও।"

"পত্র শ্রবণ করিয়া যশেশ্বরী আনন্দিতা হইলেন। ভ্রাতার প্রত্যাগমনে অধিক বিলম্ব হইবে, কেবল এই সংবাদটীতে কিঞ্চিৎ বিষাদের উদয় হইল। প্রয়োজনমত কথোপকথন চলিতে লাগিল। এই সাক্ষাতের পূর্ব্বে প্রায় ছয় সাত দিবস মহানন্দবাহাদুর রাজবাটীতে আইসেন নাই। সুতরাং উভয়েরই অনেক কথা বলিবার ছিল, কথা কহিতে কহিতে রাত্রি চারি দণ্ড অতীত হইয়া গেল। প্রয়োজনীয় কথাবার্ত্তার অবসানে রাজা মহানন্দ

বাহাদুর কিয়ৎক্ষণ কি যেন চিন্তা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, যশেশ্বরি! তোমার বিবাহের বয়স হইয়াছে, তুমি কিরূপ পাত্রে অর্পিতা হইতে অভিলাষ কর?—প্রশ্ন শুনিবামাত্র আসনখানি আরও দূরে সরাইয়া লজ্জাশীলা কুমারী অভিনব লজ্জায় নম্রমুখী হইলেন। কিছুই উত্তর করিলেন না।"

"রাজা কহিলেন, প্রবেশের পূর্ব্বে দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া আমি শুনিয়াছি, এই মঙ্গলা বলিতেছিল, (যশেশ্বরীর সহচরীর নাম মঙ্গলা) আমি স্পষ্ট স্পষ্ট শুনিতে পাইয়াছি, মঙ্গলা বলিতেছিল, দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর। সেই নিমিত্তই আমি এই কথা উত্থাপন করিতেছি। মনে করিয়াছিলাম, বিবাহের কথাই হইতেছে।"

"মুখে বস্ত্র দিয়া হাসিতে হাসিতে মঙ্গলা সে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। যশেশ্বরী অবনতবদনে বসিয়া রহিলেন। শান্তভাবে রাজা কহিলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, ইহাতে লজ্জা কি? আমাদের স্বয়ম্বর-প্রথা এক প্রকার উঠিয়া গিয়াছে, কিন্তু তথাপি ইচ্ছামত পাত্রে সমর্পিতা হইতে কোন্ বুদ্ধিমতী সুশীলা কুমারী অভিলাষিণী না হয়? লজ্জা কি? আমার নিকটে মনের অভিলাষ প্রকাশ করিতে কোন দোষ নাই।"

"লজ্জাবনতমুখী লজ্জাশীলা সুশীলা সলজ্জভাবে ধীরে ধীরে কহিলেন, বিবাহ করিতে আমার ইচ্ছা নাই মহারাজ!—বিস্মিতভাবে রাজা কহিলেন, ইচ্ছা নাই?—বিবাহ করিতে তোমার ইচ্ছা নাই? চিরজীবন কি কুমারী অবস্থায় থাকিবে? সে কি কথা যশেশ্বরী?"

"পূর্ব্বরূপ সলজ্জবদনে যশেশ্বরী উত্তর করিলেন, তাহাই আমার অভিলাষ।"

"রাজা পুনরায় কহিলেন, কুলকন্যার এরূপ অভিলাষ ভাল নয়।—চকিতভাবে রাজার মুখপানে চাহিয়া লজ্জাশীলা কুমারী কিঞ্চিৎ ত্বরিতস্বরে কহিলেন, সীতা, দময়ন্তী, দ্রৌপদী, আর ঐরূপ কত রাজকন্যার দুর্দ্দশা পুরাণশাস্ত্রে আমি পাঠ করিয়াছি। সেই সকল কথা স্মরণ হইলেই বিবাহের নামে আমার ভয় হয়।"

"আচ্ছা! আমি তোমাকে বুঝাইব। রাত্রি হয়, আজ বিদায় হইলাম।"

"রাজা বিদায় হইলেন। উপর্য্যুপরি পাঁচসাতদিন এই প্রাসাদে আসিয়া যশেশ্বরীকে তিনি পরিণয়প্রসঙ্গ বুঝাইলেন, যশেশ্বরীর মন ফিরিল। রাজা মহানন্দ রাও স্বয়ং গান্ধর্ব্ববিধানে অগ্নি সাক্ষী করিয়া যশেশ্বরীর পাণি গ্রহণ করিলেন। কালক্রমে যশেশ্বরী গর্ভবতী। যখন পাঁচ ছয় মাস পূর্ণ, সেই সময় লজ্জাবতী গর্ভবতীর মনের ভাব আর এক প্রকার হইয়া দাঁড়াইল। আপনা আপনি রোদন করিলেন, এক রাত্রে নির্জনে বসিয়া একখানি পত্র লিখিলেন।—পত্রখানি দুই তিনবার আপনি পাঠ করিলেন, সে পত্রে তিনি লিখিলেন কি? আমার ঠিক্ ঠিক্ মনে আছে। যশেশ্বরী লিখিলেন :—

"মহারাজ মহানন্দ রাও!

গোপনে অগ্নি সাক্ষী করিয়া তুমি আমাকে বিবাহ করিয়াছ। এ কথা কেহই জানে না। আমি এখন কি করিব, তাহা স্থির করিয়াছি। তুমি আর আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও না। যদি সাক্ষাৎ কর, তৎক্ষণাৎ তোমার সাক্ষাতেই আমি আত্মহত্যা করিব। তোমার সহিত আমার বিবাহ হইয়াছে, গুরুদেবের শপথ, সমস্ত দেবদেবীর শপথ, ইহা কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না। সম্বন্ধ ভুলিয়া যাও। পুনর্ব্বার বিবাহ করিয়া সংসারে তুমি সুখী হও। মনে কর, চক্ষের জলে এই পত্রখানি লিখিলাম।

অভাগিনী

শ্রীমতী যশেশ্বরী।"

"দশম মাস পরিপূর্ণ। যথাসময়ে শ্রীমতী পুণ্যবতী দেবী যশেশ্বরী একটী পরমসুন্দর পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন। নিষ্কলঙ্ক হইয়াও মনে মনে যেন কলঙ্কাশঙ্কায় সঙ্কুচিতা। অশ্রুধারে পুত্রটীর অভিষেক করিলেন। কিঙ্করীরা জানিল, প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। দশম দিবসে দূরস্থ পল্লীর একটী স্ত্রীলোককে ডাকাইয়া তাহার ক্রোড়ে সেই প্রাণাধিক শিশুটীকে সমর্পণ করিলেন। সাবধান করিয়া দিলেন, কাহার সন্তান, কেহ যেন জানিতে না পারেন। জনপ্রাণীও যেন না জানে। সন্তানের প্রতিপালনের নিমিত্ত সেই স্ত্রীলোকের হস্তে পঞ্চাশটী মোহর দিলেন। প্রয়োজনমত আবার দিবেন, অঙ্গীকার রাখিলেন। নিশাকালে সকলের অজ্ঞাতে এই কার্য্য হইল। গুপ্তদ্বার দিয়া বস্ত্রাবৃত শিশুক্রোড়ে অন্ধকার পথে সেই

স্ত্রীলোক বাহির হইয়া গেল। জানেন মহারাজ! সন্তানের মায়া কত বড় মায়া! দেবী যশেশ্বরী মধ্যে মধ্যে সেই স্ত্রীলোকের কুটীরে গিয়া, শিশুটীকে কোলে লইতেন, বক্ষে রাখিতেন, চুম্বন করিতেন, আদর করিতেন, নেত্রনীরে ভাসাইতেন, এই প্রকারে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত স্থানে অজ্ঞাত পরিচয়ে শিশুটী দিন দিন বড় হইতে লাগিল। মহারাজ!—”

এইরূপে অভিলষিত প্রসঙ্গের আভাস রাখিয়া কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বনের পর চতুর্ভুজলাল অবশেষে কহিলেন, “মহারাজ! দেবী যশেশ্বরীর গর্ভজাত কুটীরবাসিনী দুঃখিনীর গৃহপালিত অজ্ঞাত অপরিচিত সেই শিশুকুমার অপর আর কেহই নহে, চিরশুদ্ধচিত্ত, চিরসত্যবাদী, চিরবিমলস্বভাব মহাবীর্য্যবান, কপটাচারী ধূর্ত্তলোকের কপট কূটচক্র তাড়িত, নানা প্রকার যন্ত্রণাপীড়িত, অধুনা অবিচারে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত বীরবর রাজকুমার ভূপেশচন্দ্র।—মহারাজের একমাত্র মহাপরাক্রান্ত ভাগিনেয় রাজকুমার ভূপেশচন্দ্র।”

শাবকভ্রষ্টা বাঘিনী যেমন বিজন অরণ্যমধ্যে ভীমগর্জ্জন করিয়া মহাক্রোধে অপহারকের অন্বেষণে ধাবিতা হয়, ঠিক্ যেন সেইরূপে শয্যা হইতে লাফাইয়া উঠিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে শোকসন্তপ্তা পরিতাপিনী অভাগিনী রাজকুমারী রাজরাণী যশেশ্বরীদেবী দ্রুতগতি চঞ্চল চরণে সহোদরের চরণসমীপে উপস্থিত হইলেন। দাঁড়াইতে পারিলেন না, বক্রভাবে উপবেশন করিয়া রাজার পদতলে মাথা রাখিয়া সরোদনে কহিতে লাগিলেন, “মহারাজ! মহারাজ! ভ্রাত! দয়াময় ভ্রাত! কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ! আমার ভূপেশচন্দ্র! আমার ভূপেশচন্দ্র! মহারাজ! কি হইল! কি হইল! মহারাজ! আমার ভূপেশচন্দ্রকে তাহারা মারিয়া ফেলিবে? আমার প্রাণ যে ছুটিয়া বাহির হইতে চায় মহারাজ! চিরনিষ্কলঙ্ক, ধর্ম্মপরায়ণ, নিরপরাধী ভূপেশচন্দ্রকে দুষ্টলোকে মারিয়া ফেলিবে? হা! আর যে সহ্য করিতে পারি না মহারাজ!—মহারাজ! আমার ভূপেশচন্দ্র যখন তরুণবয়সে মাথায় ঝুড়ী করিয়া লোকের জিনিসপত্র বহিয়া লইয়া যাইত, আমি গবাক্ষে বসিয়া দেখিতে পাইতাম; বুক ফাটিয়া যাইত। আমার ভূপেশচন্দ্র যখন নীচলোকের সঙ্গে নীচ ঘৃণিত কার্য্যে সামান্য উদরান্নের

জন্য মহাকষ্টে প্রবৃত্ত হইয়া আমারি গৃহের সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইত, আমার তখন বুক ফাটিয়া যাইত! আমার ভূপেশচন্দ্র যখন তোমারি আদেশে, তোমার বিপক্ষযুদ্ধে প্রেরিত হইয়াছিল, আমার বুক তখন যেন ফাটিয়া গিয়াছিল! পাপিষ্ঠ ক্রূর লিঙ্গেশ্বর যখন আমার ভূপেশচন্দ্রকে সেনাদলে ধরিয়া লইয়া গেল, তখন আমার বুক যেন ফাটিয়া গিয়াছিল! যখন শুনিলাম, মিথ্যা মিথ্যা করিয়া তাহারা আমার ভূপেশচন্দ্রকে কয়েদ করিয়াছে, বেত মারিয়াছে, দাগ দিয়াছে, তখন আমার বুক যেন ফাটিয়া গিয়াছিল! কিন্তু—আঃ! আর সহ্য হয় না, আর বলিতে পারিব না! মহারাজ! উঃ! আমার ভূপেশচন্দ্রকে তাহারা—"

আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। যশেশ্বরী অচেতন। গৃহ ভয়ানক নিস্তব্ধ। সকলের রসনাই মৌনব্রতী। ভীষণ দৃশ্য! গৃহে যাহারা যাঁহারা সচেতন আছেন, চতুর্ভুজ ছাড়া তাঁহারা সকলেই যেন অচেতন। যিনি যেখানে বসিয়া আছেন, পাথরের পুতুলের মত তিনি সেইখানেই সমভাবে নিশ্চল। রাজা রঘুবর রাও যাঁহাকে চিরদিন ঘৃণা করিতেন,—ঘৃণাপাত্র বলিয়া যাঁহার উপর তাঁহার চিরবিদ্বেষ ছিল, যাঁহাকে কষ্ট প্রদান করিয়া তিনি সুখী হইতেন, পুনঃপুন যাঁহার ভীষণ দণ্ডবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তাঁহার ফুল্ল আনন পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় প্রফুল্ল হইয়াছিল, যাঁহার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা শ্রবণ করিয়া কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে তিনি মহানন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই ভূপেশচন্দ্র যে কে, এত দিনের পর এতক্ষণে তিনি তাহার সত্য পরিচয় প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার সেই চিরঘৃণাপাত্র তাঁহারই বংশের সমুজ্জ্বল চন্দ্রস্বরূপ। স্নেহময়ী সহোদরার একমাত্র গর্ভরত্ন, সুশীল, সচ্চরিত্র, সাধু, রাজকুমার ভূপেশচন্দ্র।

রাজাই প্রথমে কথা কহিলেন। দারুণ মনস্তাপে ঘন ঘন নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে স্বর্গভূষণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "স্বর্গভূষণ! দেখিতেছ, কি ভয়ঙ্কর ঝড় উঠিয়াছে! উঃ! ঐ! ঐ! সমস্ত পৃথিবী যেন কাঁপিতেছে! আমি যেন আসনশুদ্ধ কাঁপিয়া উঠিতেছি! এই মহাঝড়ে আমাদের বংশবৃক্ষ ভাঙ্গিয়া যাইবে! তুমি যাও, শীঘ্র যাও! তোমাদের সেনানায়ককে অনুরোধ কর, ক্ষমা;—এই সম্ভ্রান্ত রাজবংশের অনুকূলে সানুগ্রহ ক্ষমা। রাণি! উঃ! কি যন্ত্রণা! এখনও তোকে বলিতেছি আমি রাণী,—উঃ! রাজবংশে

কেন আমার জন্ম হইয়াছিল? মুক্তাহার মনে করিয়া কালসাপিনীকে আমি গলায় পরিয়াছিলাম! চতুর্ভুজ! দরজা খুলিয়া দাও! পাপিনী, সাপিনীকে বাহির কর! উহাকে সম্মুখে দেখিলে আমি আর মুহূর্ত্তকালও ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিব না। শীঘ্র উহাকে বাহির কর!"

দুই হস্তে দুই চক্ষু আবরণ করিয়া কলঙ্কিনী রাণী কালভুজঙ্গিনীর মত নিশ্বাসপ্রশ্বাসে নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন।

চতুর্ভুজের একটী নিগূঢ় অভিপ্রায় ছিল। শেষ পর্য্যন্ত না শুনিয়া রাণীকে তিনি বাহির হইতে দিবেন না, এই তাঁহার নিগূঢ় অভিপ্রায়। রাজাজ্ঞা তিনি পালন করিলেন না। কিঞ্চিৎ মৃদুস্বরে তিনি কহিলেন,— কথা কহিতে কহিতে রাণীর দিকে অপাঙ্গভঙ্গীতে বক্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ঈষৎ হাস্যসহকারে রাজাকে তিনি কহিলেন, "মহারাজ! রাণীর উপরে ক্রোধ প্রকাশ করা বৃথা। রাণীর দোষ কি? উনি স্ত্রীলোক, সহজে অবলা; তোমার জীবাত্মার পরিত্রাণকর্ত্তা গুরুদেব—"

"আর লজ্জা দিও না চতুর্ভুজ, আর লজ্জা দিও না। মহাঘোর অন্ধকারে আমি রহিয়াছিলাম। চক্ষু যেন অন্ধ হইয়া গিয়াছিল। তুমি কুশলে থাক, করুণাময় মঙ্গলালয় জগদীশ তোমার মঙ্গল করুন, তুমি আমার চক্ষু ফুটাইয়া দিলে।"

রাজার কথায় ধীরে ধীরে মস্তক সঞ্চালন করিয়া চতুর্ভুজলাল মনে মনে কহিলেন, চক্ষু ফুটাইবার এখনও অনেক বিলম্ব আছে। প্রকাশ্যে কহিলেন, "মহারাজ! তুমি এত কাতর হইলে আমি চিকিৎসা করিব কিরূপে?"

"চিকিৎসা? এ রোগের কি চিকিৎসা আছে চতুর্ভুজ?"

"না,—না,—মহারাজ! আমি সে কথা বলিতেছি না, দেবী যশেশ্বরী মূর্চ্ছিতা।"

যশেশ্বরী যে অচেতন হইয়া পড়িয়াছিলেন, রাজা রঘুবর সে দিকে দৃষ্টি রাখেন নাই। অকস্মাৎ চিকিৎসকের বাক্যে পদতলে তিনি নেত্রপাত করিলেন। দেখিলেন, সত্য সত্যই তাঁহার স্নেহময়ী সহোদরা মূর্চ্ছিতা। উন্মত্তের ন্যায় আসন হইতে উঠিয়া দুই বাহু ঊর্দ্ধে তুলিয়া একবার বক্ষে, একবার ললাটে করাঘাত করিয়া বিকট চীৎকারস্বরে কহিতে লাগিলেন,

"যশেশ্বরি! যশেশ্বরি! ভগিনি! স্নেহময়ি! তুমিও চলিলে? ভূপেশচন্দ্র চলিল, তুমিও চলিলে? জানিতাম না, এত যন্ত্রণা আমার কপালে লেখা আছে! কিছুই জানিতাম না।—যশেশ্বরি! তুমি ত যশের মুকুট মাথায় দিয়া স্বর্গে চলিলে, আমি আর কিসের আশায় এই পাপময় নরকসংসারে বাঁচিয়া থাকি?—অজ্ঞানে কলঙ্কসাগরে ডুবিয়াছি, এখন জ্ঞান হইয়াছে। আর না!—কিন্তু কেন জ্ঞান হইল? ভগিনি! সতীলক্ষ্মি! সেই অজ্ঞানেই যদি ধর্ম্মরাজ আমাকে নিজপুরীতে লইয়া যাইতেন, তাহা হইলেই পরিত্রাণ হইত!"

চতুর্ভুজ কহিলেন, "মহারাজ! অত অস্থির হইলে চলিবে না। ধর্ম্মের সংসারে অবিচার হয় না। যাঁহারা যাহারা ধর্ম্মপথে রহিয়াছেন, তাঁহাদের অমঙ্গল হইবে না। মহারাজ! অধৈর্য্যকে তুমি দূরে রাখ। দেবী যশেশ্বরী অচিরেই চৈতন্য প্রাপ্ত হইবেন।"

সে কথা সত্য। ঔষধের ক্রমে অচিরেই দেবী যশেশ্বরী সচেতন হইতে পারিতেন, কিন্তু চতুর্ভুজের সে ইচ্ছা ছিল না। আরও কিছু গোপনীয় কথা পিসীমার অজ্ঞাতে রাজাকে শুনাইবার তাঁহার অভিলাষ ছিল।

ততক্ষণ ধৈর্য্যধারণ করিতে না পারিয়া চীৎকার করিয়া রাজা কহিলেন, "এখনও বিলম্ব করিতেছ? স্বর্গভূষণ! তুমি শীঘ্র যাও, তোমার কথায় না হয়, আমার নাম করিয়া সেনাপতিকে গিয়া বল, ভূপেশচন্দ্রের ক্ষমা আমি ভিক্ষা করি।"

হাস্য করিয়া চতুর্ভুজ কহিলেন, "মিথ্যা অনুরোধ মহারাজ! স্বর্গভূষণ সেখানে যাইতে পারিবেন না। স্বর্গভূষণ বড় শক্ত অপরাধে অপরাধী। একটী বিবাহিতা স্ত্রীকে কুমন্ত্রণা দিয়া ঘরের বাহির করিয়াছেন। ধর্ম্মপথ হইতে অধর্ম্মপথে আনিয়াছেন। সে স্ত্রীলোক ধর্ম্মপথে ছিল কি না, তাহা আমি বলিব না। কিন্তু ঘটনা সেই প্রকারের।"

"বল কি চতুর্ভুজ? স্বর্গভূষণ একটী কুলস্ত্রীকে গৃহ হইতে বাহির করিয়াছে?—আমি—"

"হাঁ মহারাজ!"

বিস্ময়বিস্ফারিতলোচনে চিকিৎসকের মুখপানে চাহিয়া রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এতদূর?"

এতদূর কি মহারাজ! আরও অনেক দূর!—বিচারালয়ের কাগজপত্রে সমস্তই প্রকাশ আছে।”

“বিচারালয়!”—আরও অধিকতর বিস্ময়ে ব্যাকুলিত হইয়া রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, “বিচারালয়?”

“হাঁ মহারাজ!”

“বল কি চতুর্ভুজ! বিচারালয়?—বিচারালয়ে কি হইয়াছে?”

“নালিস হইয়াছে, মোকদ্দমা হইতেছে, অনেক সাক্ষীর জোবানবন্দী হইয়া গিয়াছে। সত্য অপরাধ সপ্রমাণ হইয়াছে। বড় গুরুতর অপরাধে অপরাধী রাজকুমার স্বর্গভূষণ। তাতে আবার হাজত হইতে পলাতক!”

পাগলের মত চুল ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে রাজাবাহাদুর যেন ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণের মত ত্রিভঙ্গভাবে বাকিয়া দাঁড়াইলেন। পাগলের মত হাস্য করিয়া কহিলেন, “চতুর্ভুজ! তুমি মিথ্যাকথা কহিতেছ। যদি তত বড় শক্ত অপরাধ,—যাহার নামে তত বড় শক্ত অপরাধ, সে কি কখনও ঘরে ফিরিয়া আসিতে পারে?”

“তাই বুঝি তুমি ভাবিতেছ রাজা! তাহারা বুঝি তোমার স্বর্গভূষণকে ছাড়িয়া দিয়াছে? তাই বুঝি আমি মিথ্যাবাদী? তাই বুঝি তুমি ভাবিয়াছ? এই বুঝি তোমার বিশ্বাস? কিন্তু না,—যাহা তুমি মনে করিতেছ, তাহা না। বিচার চূড়ান্ত হইয়াছে। দেওয়ানী ফৌজদারী একত্র!—যাঁহার পত্নীর ধর্ম্মনাশ, তাঁহার ক্ষতিপূরণ দাবী বিংশতি সহস্র মুদ্রা। তাহা ছাড়া ফৌজদারী দণ্ড আছে। কুমার স্বর্গভূষণ ফৌজদারী হাজতী আসামী।”

আবার পাগলের মত হাসিয়া রাজা রঘুবর আবার কহিলেন, “চতুর্ভুজ! আমিও পাগল, তুমিও পাগল। হাজতী আসামী কি ঘরে ফিরিয়া আসিতে পারে?”

হাস্য করিয়া চতুর্ভুজ কহিলেন, “আমিও পাগল না, রাজা! তুমিও পাগল না। সব ঠিক্। পলাইয়া আসিয়াছে। রক্ষী প্রহরীকে ঘুস দিয়া তোমার স্বর্গভূষণ পলায়ন করিয়াছে। রাজবাড়ীতে কেহ শীঘ্র প্রবেশ করিতে পারিবে না, সেই ভরসায় লুকাইয়া রহিয়াছে। আমি আসিতেছি শুনিয়া ইহার মাথা ধরিয়াছিল। কিন্তু দেখ দেখি, কেমন চমৎকার! আমি

ইহাকে খুঁজিয়া বাহির করি নাই। আপনা হইতেই আমার চক্ষের কাছে ধরা দিয়াছে। জিজ্ঞাসা কর, কুমার স্বর্ণভূষণ ইহা অস্বীকার করিতে পারেন কি না?

কুমার পলায়নের উপক্রম করিলেন। কিন্তু পলায়নের পথ নাই। গৃহের ইতস্তত কয়েক বার ছুটাছুটী করিয়া পর্য্যঙ্কের পার্শ্বে লুকাইলেন। চতুর্ভূজ হাসিয়া কহিলেন, "মহারাজ! দেখিলেন ত! কেমন মিথ্যাবাদী আমি, তাহা জানিলেন ত। সত্যমিথ্যার বিচার সেই অনাদি অনন্ত ভগবানের হস্তে। অনন্ত নামে আমি দিব্য করিয়া বলিতেছি, এই দরিদ্র চতুর্ভূজের দ্বারা এই মহাসম্ভ্রান্ত রাজপরিবারে,—কোন বিপদ প্রবেশ করিবে না।"

"করিবে না? বন্ধুবর! বন্ধুবৎসল! কোন বিপদ প্রবেশ করিবে না? তোমাকে নমস্কার। তুমি আমার পরম উপকারী বন্ধু! তোমাকে আমি ভাল করিয়া চিনিতে পারি নাই, এখন জানিলাম, তুমি যেন সাক্ষাৎ স্বর্গের দয়াপ্রেরিত পরম উপকারী দেবদূত।"

"চাটুবাদ আমি ভালবাসি না রাজা! মানুষের চর্ম্ম আমার গাত্রে আছে, মানুষের চক্ষু আমার বদনে আছে, মানুষের দয়া আমার হৃদয়ে আছে, অসাধ্য না হইলে মানুষের উপকার আমি করিতে পারি। এখন আমি তোমার কাছে।—অনুমতি কর, মূর্চ্ছিতা দেবীর চৈতন্য সম্পাদন করি।"

"একটু থাক,—চতুর্ভূজ! একটু থাক। যশেশ্বরী যদি এ সকল কথা শোনে,—একে ত পাগলিনী হইয়াছে,—একে ত ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা হইতেছে, এসব কথা যদি শোনে, তাহা হইলে অভাগিনী আর বাঁচিবে না, বেটাটকা মরিয়া যাইবে। একটু থাক।"

"না মহারাজ! আমি আর থাকিব না। আমি এখানে থাকিলে ভূপেশচন্দ্রের—"

"হাঁ! হাঁ! সেই জন্যই ত বলিতেছি। আমি স্বয়ং সৈনিকশিবিরে যাইব। স্বয়ং দয়া ভিক্ষা করিব। দয়া যদি না পাই, এ কলঙ্কিত জীবন আর রাখিব না।"

"কেন মহারাজ এত উতলা হও? আমি তোমার ঘৃণিত দাস হইয়াও

অন্তরে অন্তরে তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী। তুমি যাহা করিতে না পারিবে, আমি তাহা পারিব। অনুমতি কর, দেবী যশেশ্বরীকে মূর্চ্ছা কবল হইতে উদ্ধার করিয়া প্রস্থান করি।"

কত কি চিন্তা করিতে করিতে অস্থিরভাবে রাজাবাহাদুর ব্যগ্রভাবে কহিলেন, "চতুর্ভুজ!"

"মহারাজ!"

"আচ্ছা! যে ঘরে তুমি আছ, যে ঘরে আমি আছি, যে ঘরে এরা আছে, সে ঘরের চারি দিকে চারি দেয়াল। দিবা কি রজনী, তাহা আমার মনে নাই। আচ্ছা! চতুর্ভুজ! আমার বংশের কলঙ্ক কি এই চারি দেয়ালের বাহিরে যাইবে?"

"না মহারাজ! কখনই না।—ছাব্বিশ বৎসর!-উঃ! বহু দীর্ঘ দীর্ঘ ছাব্বিশ বৎসর!—আমি বিশ্বাস রাখিতে জানি। রাজসংসারের যে মর্য্যাদা, যে সম্ভ্রম, তাহা শুভ্রবর্ণ। সে বর্ণে একটু মাত্র দাগ পড়িলে সকল লোকেই দেখিতে পায়। কিন্তু আমি,—প্রত্যক্ষ চন্দ্রসূর্য্যকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি মহারাজ,—আমি সে দাগ কাহাকেও দেখাইব না।—যদিও আমি দরিদ্র, কিন্তু আমার হৃদয় দরিদ্র নয়। এই হৃদয়ে ধর্ম্ম রাজা, দয়া রাণী।"

"পাঁচ সহস্র মুদ্রা পুরস্কার!"

"শিরোধার্য্য! পাঁচ সহস্র ধন্যবাদ!"

"মিনতি করি, একটী কথাও যেন প্রচার না হয়।"

"একটী অক্ষরও না। ধর্ম্মের আমি তত অমর্য্যাদা জানি না। একটু থাক রাজা। দেবী যশেশ্বরীকে জাগাই। মনে বিশ্বাস রাখ, সমস্তই মঙ্গল।"

যশেশ্বরীর মূর্চ্ছা ভঙ্গ করিয়া ধীরে ধীরে চতুর্ভুজলাল তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। সময়োচিত কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমাধা করিয়া রাজা রঘুবরবাহাদুর শশব্যস্তে প্রাসাদ হইতে বহির্গত হইলেন। দিন কি রাত, তাহা অনুভব করিবার সময় হইল না।

ষষ্টিতম প্রবাহ।

নূতন বিভীষণ দৃশ্য !!!

কোথা যাবে প্রাণেশ্বর ! ত্যজিয়া দাসীরে।
জনমের মত পদ ধরিয়াছি শিরে ॥
যাও যদি অধীনীরে সঙ্গে করে লও।
কেন নাথ নিরুত্তর ? দুটী কথা কও !

কবিরত্ন।

অন্ধকূপ। রাত্রি অন্ধকার। রাত্রি এক প্রহর অপেক্ষাও দুই এক দণ্ড বেশী। সেই অন্ধকূপে ভূপেশচন্দ্র বসিয়া আছেন। মনে তাঁহার যে কত প্রকার হতাশচিন্তার উদয় হইতেছে, তাহা তিনি জানেন, আর যিনি সমস্ত বিশ্বসংসারের সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ অধিপতি, তিনিই জানেন। আর কে জানে ? জীবনের চিরদুঃখভাগিনী, কিঞ্চিৎ সুখের অংশিনী অর্দ্ধাঙ্গস্বরূপিণী যদি কোথাও কেহ থাকে, সেই অনাথা অভাগিনী জানে। ঘোর নিশাকাল। কারাকূপ অন্ধকার। ঘোর,—ঘোর,—ঘোর অন্ধকার। একজন রক্ষীর সহিত রক্তবর্ণ পরিচ্ছদধারী এক ব্যক্তি প্রবেশ করিলেন। তিনি কারাগারের অধ্যক্ষ।—প্রবেশ করিয়াই প্রহরীর হস্তস্থিত বাতীর আলোতে ভূপেশচন্দ্রের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া গম্ভীরস্বরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "বন্দি ! এখানে ত তোমার কোন ক্লেশ হইতেছে না ?"

প্রশান্তভাবে,—অটল প্রশান্তভাবে ভূপেশচন্দ্র উত্তর করিলেন, "নিষ্পাপ হৃদয়ে ক্লেশের সম্ভাবনা কি ? তুমি রাজপুরুষ এ রাত্রে অকস্মাৎ এ কথা জিজ্ঞাসা করিতে কেন এখানে আসিলে ?"

"আমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্মই এই। যে বন্দীর প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়, তাহার তত্ত্বাবধারণ করা আমাদের রাজবিধির বিশেষ নিয়ম।"

"আচ্ছা ! বাধিত হইলাম, পরম অপ্যায়িত হইলাম। সন্তুষ্ট হইলাম !

এখন ত তত্ত্বাবধারণ করা হইল, এখন আমাকে নির্জ্জনে বিশ্রাম করিতে দাও। যিনি আমাকে এই অল্প দিনের জন্য এই মায়াময় মায়াধামে প্রেরণ করিয়াছিলেন, নির্জ্জনে আমি তাঁহাকে স্মরণ করি।"

কারাধ্যক্ষ বিস্ময়াপন্ন হইলেন। যে ব্যক্তি জীবনদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত, তাহার এরূপ অটলভাব, এরূপ অকপট ধর্ম্মবিশ্বাস তিনি আর কখনও কোথাও দেখেন নাই। চিবুকে তলোয়ার সংলগ্ন করিয়া ক্ষণকাল স্তম্ভিতভাবে তিনি নিশ্চলে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহার পরে মৌনভঙ্গ করিয়া সান্ত্বনাসূচকস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার মনে এখন কি কি অভিলাষ আছে, অসঙ্কোচে প্রকাশ করিয়া বল।"

ভূপেশচন্দ্র উত্তর করিলেন, "আর বিলম্ব কত? কত দিন আর তোমরা আমাকে এই অন্ধকূপে নিক্ষেপ করিয়া বৈরনির্য্যাতনের দুরভিসন্ধি চরিতার্থ করিতে ইচ্ছা কর?"

বিশাল নয়নে কারাগৃহের চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া বন্দীর নয়নে সেই নয়ন অন্তর্বর্ত্তিত করিয়া কারাধ্যক্ষ মনে মনে আন্দোলন করিলেন, উঃ! এ সকল কার্য্যে ব্রতী থাকা কি ভয়ঙ্কর পাপ! মানুষের হৃদয়ে কি এমন নিষ্ঠুরতা বাস করিতে পারে! এই বন্দী কখনো আমার কোন অপকার করে নাই, যতবার আমি ইহাকে দেখিয়াছি, ততবারই ইহার প্রতি আমার দয়ার সঞ্চার হইয়াছে। যদবধি আমি ইহাকে জানি, তদবধি ইহার স্বভাবে একটুও কলঙ্কবিন্দু দেখি নাই। কিন্তু আজ এখন কেমন করিয়া মুখপানে চাহিয়া চক্ষের সম্মুখে সেই নিষ্ঠুর,—নিষ্ঠুর,—মহানিষ্ঠুরবাক্য উচ্চারণ করিব! কিন্তু করি কি? মানুষ অর্থের দাস! কর্ত্তব্যকর্ম্ম অপেক্ষা অর্থের অধিক মান্য করিতে হয়। সুতরাং সত্যকথা না বলিয়া কিরূপেই বা ফিরিয়া যাই। মনে মনে এইরূপ আলোচনা করিয়া ক্ষুব্ধভাবে কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণস্বরে কারাধ্যক্ষ কহিলেন, "আজিকার রজনী প্রভাত হইবে; কালিকার সূর্য্য উদয় হইবেন; কালিকার সূর্য্য অস্ত যাইবেন; কালিকার রজনী প্রভাত হইবে: দ্বিতীয় প্রভাতে—"

হস্তে নেত্রাচ্ছাদন করিয়া ভূপেশচন্দ্র কহিলেন, "বুঝিয়াছি! আর বলিতে হইবে না! তখন তুমি কি জিজ্ঞাসা করিতেছিলে?"

"আর কিছু নূতন জিজ্ঞাসা নাই, এই আসন্ন সময়ে তোমার মনে কি কি অভিলাষ আছে?"

মানুষের চক্ষু যতদূর বিস্তৃত হইতে পারে, নৈরাশ্যের সহিত ততদূর নেত্র-বিস্তার করিয়া ভূপেশচন্দ্র উত্তর কহিলেন, "ইহজন্মে পৃথিবীর কোন বস্তুতে আর আমার অভিলাষ নাই। কেবল একটী মাত্র অভিলাষ।—প্রাণাধিকা অপ্সরাসুন্দরীর সহিত একটীবারমাত্র সাক্ষাৎ।"

"রজনীপ্রভাতে উত্তর পাইবে।" এই কথা বলিয়া প্রহরীর সহিত কারাধ্যক্ষ কারাগার হইতে বাহির হইলেন। দ্বারে চাবী পড়িল। আবার ভূপেশচন্দ্র অন্ধকারে একাকী।

রজনী প্রভাত। বেলা অনুমান ছয়দণ্ড। অধ্যক্ষ প্রবেশ করিলেন। ভূপেশচন্দ্র কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি সংবাদ আনিয়াছ? আমি কি সেই শাস্তিকুটীরে যাইতে পারিব?"

"অসম্ভব!—এক রজনী প্রভাতে যাহার প্রাণদণ্ড, তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া অসম্ভব। তাহাকে তুমি দেখিতে পাইবে। এইখানে আনিয়াই আমরা তাহাকে দেখাইব। ঠিকানা দাও।"

ভূপেশচন্দ্র ঠিকানা বলিয়া দিলেন, চাবী বন্ধ করিয়া অধ্যক্ষ সাহেব চলিয়া গেলেন।

দুই দণ্ড অতীত।—এক বর্ষীয়সী স্ত্রীলোকের সহিত অপ্সরাসুন্দরী কারাগারে প্রবেশ করিলেন। ঈষৎ ইঙ্গিতে সঙ্গিনী স্ত্রীলোক গৃহ হইতে বাহির হইল। প্রহরীরাও কিঞ্চিৎ দূরে সরিয়া গেল। চাবী পড়িল, এ কথা বলা বাহুল্য।

দুজনেই দুজনের মুখপানে চাহিয়া।—চারি চক্ষে বিন্দুমাত্র জল নাই। নির্জ্জল চক্ষে ভূপেশচন্দ্রের নির্জ্জলচক্ষু দর্শন করিয়া অর্দ্ধস্ফুটস্বরে অপ্সরা-সুন্দরী কহিলেন, "জীবিতেশ্বর! কেন ডাকিয়াছ? আরো কি এই অভাগিনীকে দগ্ধ করিবার এখনো তোমার সাধ আছে? রাক্ষসেরা নিরপরাধে তোমারে,—না—না,—আর বলিতে পারিব না,—প্রাণেশ্বর! তুমি—"

"অপ্সরা! জন্মের মত খেলাধূলা ফুরাইল।—আর আসিব না!—আর কথা কহিব না!—আর যন্ত্রণা দিব না!—তোমার ঐ সুধামুখে আর আমি

সুধাবাণী শ্রবণ করিব না!—জন্মের মত সব ফুরাইল!—এ জন্মে তুমি আর আমাকে দেখিয়া হাসিবে না!—বিদায় দাও!—যদি কখনও কোন অপরাধ করিয়া থাকি, ভুলিয়া যাও!—মার্জ্জনা কর!—ধর্ম্ম তোমাকে রক্ষা করুন!—এ জন্মে আর আশীর্ব্বাদ করিব না!—রজনী আসিতেছে, রজনী যাইবে, রজনী প্রভাতে শীতল বসন্তবাতাসের সঙ্গে আমার জীবন চলিয়া যাইবে!—নূতন সূর্য্য আর আমি দেখিব না!—হৃদয়েশ্বরি!—অনেক সাধ মনে ছিল, সমস্তই ফুরাইয়া গেল!—ফুলের মালা গাঁথিয়া গলায় পরিয়াছিলাম, অসময়ে শুকাইল!—শেষরক্ষা করিতে পারিলাম না!—অনেক যত্নে বারিসিঞ্চন করিয়া চপলা আশাকে ফাঁদ পাতিয়া ধরিয়া লতারূপে হৃদয়ক্ষেত্রে আমি রোপণ করিয়াছিলাম, নিরাশা-তপনে সেই আশালতা আমায় জ্বলিয়া পুড়িয়া গেল!—অপ্সরা!—এ জন্মে তোমাতে আমাতে এই শেষদর্শন!—উঃ! কতদিনের কথা মনে আসিতেছে!—চামুণ্ডাদেবীর মন্দিরে সেই ভয়ঙ্কর নিশাকালে মহারাজ উদয়সিংহ তোমারে আমার হাতে হাতে সমর্পণ করিয়া দিয়াছিলেন; বিবাহের বাকী ছিল কতকগুলি শাস্ত্রসম্মত মন্ত্র!—বিধাতা বাদী হইলেন, তোমাকে আমাকে সে মন্ত্রগুলি উচ্চারণ করিতে দিলেন না; বিবাহ হইল না!—শুদ্ধ বাগদানেই জীবনাভিনয়ের যবনিকা পতিত!—অপ্সরা!—বিদ্যুতের চকমকি!—সতি!—পবিত্র কুমারি!—একাকিনী তোমারে কোথায় ফেলিয়া কোথায় আমি চলিয়া যাইতেছি!—আমি—"

"ভূপেশ!—তোমার অটল মন ত কখনই টলে না! প্রাণাধিক!—আমি তোমারে দেখিতে আসিয়াছি!—ভাল করিয়া একবার আমার মুখপানে চাহিয়া দেখ!—জীবনের খেলা ত ফুরাইল, বুঝিতেছি!—চাহিয়া দেখ, চাহিয়া দেখি!—ভ্রান্তি কেন? কখনও ত এত ভ্রান্তি ছিল না!—এ আবার কি?—চক্ষু কেন বাধা দেয়!—না,—বাধা মানিব না!"—বসনাঞ্চলে নির্জ্জর চক্ষু মার্জ্জন করিয়া অপ্সরাসুন্দরী কহিলেন, "জীবিতেশ!—দাসীর জন্য কত অসহ্য যন্ত্রণাই তুমি সহ্য করিয়াছ!—এই অভাগিনীর জন্য এই দুরন্ত সংসারানলে কতবার কতপ্রকারে তুমি দগ্ধ হইয়াছ!—তথাচ,—তথাচ তুমি ত এত অধৈর্য্য হও নাই।—কিন্তু আজ কেন?—আজ কেন প্রাণেশ্বর!—"

"প্রভাত আসিতেছে! হা! হা! হা! যত কেন প্রভাত আসুক না,—যত কেন সূর্য্যের উদয় হউক না, গগনপটে যত কেন গ্রহনক্ষত্র খেলা করুক না, অনন্ত সূর্য্য, অনন্ত চন্দ্র, অনন্ত নক্ষত্র, হাসিতে হাসিতে আসিবে;—হাসিতে হাসিতে যাইবে,—কিন্তু আমি আর তাহা দেখিতে আসিব না!"

"আমিও আসিব না!—পরলোকে তোমাতে আমাতে আবার সাক্ষাৎ হইবে।—দাসী তোমার সঙ্গছাড়া হইবে না!—মিলন হইবে!"

"মিলন হইবে, ভবিষ্যতের গর্ভে তাহা আছে, বিধাতার মনে তাহা আছে!—কিন্তু দেবি! রাজদণ্ড অনিবার্য্য!"

"কি বল রাজকুমার!—রাজদণ্ড অনিবার্য্য?—দাসীকে যদি, তুমি অনুমতি কর, লহমার মধ্যে যবনের সৈনিকশিবির আমি জীবশূন্য করিতে পারি!"

অকস্মাৎ ঝন্‌ঝন্‌শব্দে কারাগারের দ্বার মুক্ত হইয়া গেল। কপালে হস্ত তুলিয়া হতাশনয়নে ভূপেশচন্দ্রের মুখপানে চাহিয়া অপ্সরাসুন্দরী কহিলেন, "আমার চক্ষে জল পড়িবে না। এ জন্মে এই দেখাই শেষ দেখা!—যদি ধর্ম্ম থাকেন, পুনর্ব্বার দেখাসাক্ষাৎ হইবে!—এখন বিদায়!—হা ধর্ম্ম! হা ধর্ম্ম!! হা ধর্ম্ম!!! তুমিই সত্য!"

অপ্সরা বাহির হইয়া গেলেন। যমরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিবার প্রতীক্ষায় ভূপেশচন্দ্র একাকী বসিয়া রহিলেন। কারাগারের বিশাল প্রস্তরময় কবাট পূর্ব্ববৎ অবরুদ্ধ হইল।

অবরুদ্ধ থাকুক; পাঠক মহাশয়! আপনিও "আশা-চপলার" প্রতীক্ষায় থাকুন। আমি এখন কিছু দিনের জন্য বিদায় হই।

ইতি প্রথম ভাগ।

প্রবাহ-পত্রিকা।

আশা-চপলা।

প্রথম ভাগ।